স্বপনবুড়োর সাহিত্যসম্ভার

স্বপনবুড়োর সাহিত্য সম্ভার

প্রথম খণ্ড

স্বপনবুড়োর

সাহিত্য সম্ভার

॥ প্রথম খণ্ড ॥

স্বপনবুড়ো

শিশুসাহিত্য প্রচার সংস্থা
এম. টি. ৭৩, কলেজস্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

পরম কল্যাণীয়া—

শ্রীমতী আরতি সেন

শ্রীমতী ভারতী সরকার

শ্রীমতী শ্যামলী নিয়োগী

শ্রীমতী মঞ্জু নিয়োগী

সুচরিতাসু—

॥ সূচীপত্র ॥

জন্ম ঃ ৯ই কার্ত্তিক, রবিবার — ১৩০৯ সন।

॥ শুভেচ্ছা ॥

ভারত বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক ও শিশু-মহলের দরদী বন্ধু শ্রীঅখিল নিয়োগী তাঁর পিতৃদত্ত নামের চেয়ে তাঁর কল্পিত নাম "স্বপনবুড়ো" আখ্যায় বেশী পরিচিত এমন কি তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ পাঠক ও শিশু-সাথী—তাঁর আসল নামের কোনো খবরই রাখেন না।

না রেখেও তারা কোনো অভাব বোধ করেন না।

তাঁর 'স্বপনবুড়ো' নাম এত যথার্থভাবে তাঁর আত্মার স্বরূপ দ্যোতনা করেছে যে তাতেই তাঁর মনের ও জীবন-ব্রতের স্বয়ং প্রকাশ ঘোষণা সুস্পষ্ট। পরিণত বয়সের সংসার-জ্ঞান ও বৈষয়িকতার সম্পূর্ণ প্রভাব-মুক্ত হয়ে তিনি বার্ধক্য পর্যন্ত শিশু-চিত্তের কল্পনা সরসতা ও স্বপ্নঘোর অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রবীন্দ্র-নাটকে ঠাকুরদাদার যে অংশ আমাদের শিশুর জীবন-নাট্যে তাঁরও সেই ভূমিকা। তিনি বাঙালী-শিশুর আনন্দ-যজ্ঞের পুরোহিত, তাদের উৎসবের নায়ক ও সহচর। দেশব্যাপী শৈশব-কল্পনার জীবন প্রকাশের প্রেরণা ও উপলক্ষ্য। এক কথায় তিনি শিশুমন মধুচক্রের মক্ষিরানীর পুরুষ সংস্করণ।

শুধু শিশু-সাহিত্য সৃষ্টিতে নয়, শিশুমেলার শিশু-সংগঠনে তিনি শিশুমনের অন্দরমহলে প্রবেশের চাবি-কাঠিটি আয়ত্ব করেছেন।

যেখানেই তিনি যান, বাঙলাদেশের ভিতরে ও বাইরে—বাঙলার জনবহুল শহর ও পল্লীগ্রামে ও বিরলজন দূর প্রবাসে—তিনি দু'এক কথায় সেখানকার কিশোর-সমাজের চিত্তটি জয় করে নেন, ও তাদের তরুণ আত্মার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দেন।

তাঁকে দেখেই ছেলে-মেয়েদের মুখে যে অভ্যর্থনার হাসি স্বতঃই ফুটে ওঠে, তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণে তাদের যে দুরন্ত আগ্রহ সমস্ত বাধা বন্ধ কাটিয়ে উৎসারিত হয়, তাই তাঁর তরুণ চিত্ত অধিকারের রাজকীয় সনদ ও তাঁর চির-নবীন প্রাণের সবুজ নিশান।

দায়িত্বপূর্ণ সংসার জীবনে প্রবেশের আগে শিশু-মনকে তিনি স্বপ্নসায়রে পারাপার করার একচ্ছত্র কাণ্ডারী।

তাঁর কল্পনা চোখে স্বপ্নের কাজল ঘন করে তোলায় রূপদক্ষ।

তাঁর জীবনের এই শিশু-কল্যাণে উৎসর্গিত পশ্চাৎপট থেকেই তাঁর শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি ও শিশু-সংগঠন প্রচেষ্টার মূল-প্রেরণাটি বোঝা যাবে।

শিশু-চিত্তে আনন্দদানের শিশু কল্পনাকে সরস রাখার—শৈশব সারল্য পরবর্তী জীবনে প্রসারিত করার যত রকম উপায় সম্ভব, তার কোনটিই তিনি প্রয়োগ করতে বাকি রাখেন নি। শিশুকে ভবিষ্যৎ নাগরিক রূপে প্রস্তুত করার, তাকে হিতকর শৃঙ্খল-সংযমে কল্যাণময় পরিণতির দিকে প্রবৃত্তি দেবার,—মিলন ও প্রীতি বিনিময়ের মাধ্যমে তার শক্তি-সম্ভাবনাকে বৃহত্তর সমন্বয়ের অভিমুখী করার জন্য তাঁর উদ্যমের অন্ত নেই।

(ডঃ) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্রের

মুখবন্ধ

সহ বা সমকর্মীর, যিনি আমারই মতো অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করে জীবনসায়াহ্নেও লেখনীকে বিশ্রাম দেননি, এবং যাঁর রচনাবলী প্রধানতঃ সৃজনশীল, বিবিধ ও প্রভূত তার সামগ্রিক রূপের আলোচনা সহজও নয়, স্বল্পকথায় সারাও যায় না। আলোচনার বিভিন্ন দিক থাকে এবং তা সমালোচনামূলক, তুলনা-মূলক, প্রশংসামূলক, বিশ্লেষণাত্মক বা পরিচিতিমূলক ইত্যাদি হতে পারে, যদিও এ সবেরই দ্বারা পরিচিতিই ঘটে। প্রথমেই বলি, যাঁর সাহিত্য-কর্মের পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছি বা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে তাঁর ও আমার জীবনের পথ ও দর্শন পৃথক। সুতরাং মতানৈক্য থাকা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য, সুন্দর ও শিবকে, পার্থক্য সত্ত্বেও অস্বীকার করা দুঃসাধ্য যা এই সাহিত্য-কর্মীটির বহুকর্মে উজ্জ্বল। এঁর কর্মের অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্যও তাই—বিরাট পাঠকসমাজকে সুন্দরের, আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান ও কল্যাণ-পথ-প্রদর্শন। বাংলার আধুনিক শিশু ও কিশোর সাহিত্যের পত্তন ইংরেজ আমলে, ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ঊনবিংশ শতকে অর্থাৎ দেড় শতাব্দীরও উর্ধ্বে। আমি বলছি, গ্রন্থবন্দী সাহিত্যের কথা-মৌখিক যদি কিছু রচিত হয়ে থাকে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ তার প্রতীক্ষায় আছি। এই দীর্ঘকাল ধরে যাঁদের হাতে এই সাহিত্যের পুষ্টি ও পরিবর্তন হয়ে আসছে তাঁদের মধ্যে এই বিংশ শতকের অন্যতম 'সাহিত্যিক' —'শিশু' শব্দটি ইচ্ছা করেই বর্জন করলাম, কারণ, 'সাহিত্যিকের' পূর্বে ঐ শব্দটির ব্যবহার ব্যাকরণদোষে দুষ্ট ও অসম্মানজনক—হচ্ছেন অখিল নিয়োগীমশায় যিনি 'স্বপনবুড়ো' নামে বাংলার শিশু ও কিশোর মহলে সুপরিচিত। যে বয়সে ইনি 'বুড়োটেপনার' দিকে ঝুঁকে-ছিলেন সে বয়সে ওটাকে যদি কেউ 'পাকামো' বলতো তো নিন্দার

হতো না। মনে হচ্ছে যেন সংবাদপত্রে কর্মনিযুক্তির ফলেই তাঁর ঐ নাম শুনেছি এবং চিত্রে গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত ও দন্তহীন মুখ দেখেছি। ঐ মূর্তি দেখতে দেখতে তিনি যখন একটী চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ে তার প্রচার-বিভাগে বিজ্ঞাপন রচয়িতা চিত্রশিল্পীপদে নিযুক্ত সেই ছোট-খাট কৃশকায় তরুণ 'শ্রীঅ' ছিলেন, সে রূপ ভুলেই গেছি। আজ তাঁর তারুণ্য ও কৃত্রিম বার্ধক্য নেই, দেহ স্থূল ও মূর্তি বয়সোচিত —আর মাত্র কয়েক বছর পরে অশীতিপর হয়ে ঐতিহাসিক কথা বলবেন যার দাম থাকলেও বয়স ও ব্যক্তিত্ব হবে উপেক্ষিত ও অবমানিত !

নিয়োগীমশায় এক হিসাবে সাংবাদিক যদিও সপ্তাহান্তে পত্রিকার একখানি পৃষ্ঠায় তাঁর মূর্তি, আসর ও পত্রাকারে রচনা দেখা যেত। আমার যেন মনে হয়, দৈনিক সংবাদ-পত্রে তিনিই প্রথম শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের পত্রোত্তর প্রদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ! সুতরাং পত্র-সাহিত্যে তাঁর দান স্বীকৃত।

নিয়োগীমশায় আজ অবধি যা রচনা করেছেন বর্তমান প্রকাশক সেই সম্ভারকে কতকগুলি খণ্ডে প্রকাশে সংকল্পবদ্ধ। তার প্রথমখণ্ড এইখানি। 'সম্ভারখানিতে' আছে পাঁচখানি বৃহৎ ও সুখ্যাত উপন্যাস, যেগুলির মধ্যে 'বাবুইবাসা বোর্ডিংকে' বলা যায় 'রোম্যানটিক।' বস্তুতঃ এই ধরনের প্রচেষ্টা বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর পূর্বে আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। রচনাটিকে অখিলবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনা বললেও অত্যুক্তি হয় না ; আর, এটি জনপ্রিয়ও বটে। ঘটনা-সমাবেশ স্থানে স্থানে অসঙ্গত ও অসংলগ্ন হলেও চরিত্র-চিত্রণ, পরিবেশ বর্ণন, প্রকাশভঙ্গী, ভাষার স্বচ্ছতা, সাবলীলতা ও মিষ্টতা প্রশংসনীয়। যে অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতার কথা পূর্বে বলেছি ঘটনা-প্রবাহ সুকুমারমতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি সেদিকে পড়বার একটুও অবকাশ দেয় না। শিল্পীর রচনাচিন্তায় মগ্নতাই এই ত্রুটির ও অসাবধানতার মূল বলেই মনে হয়। আর এজন্য উপজীব্যের অনভিজ্ঞতাও কিছু দায়ী। বস্তুতঃ বাংলার বিপ্লবী সম্প্রদায়ে যুক্ত না থাকলে তার কর্মকান্ড জানাও সম্ভব ছিল না—ভাসা ভাসা জ্ঞানে গল্প-

উপন্যাস রচনায় তার প্রতি সুবিচার সম্ভবপর নয়। তথাপি অখিলবাবুরএটিশ্রেষ্ঠ রচনা এবং উৎকৃষ্ট কিশোরপাঠ্য 'রোম্যানটিক' উপন্যাস বলতেই হবে।

উপন্যাসের পর লেখকের ছোট গল্পের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলিও সংখ্যায় অল্প নয় এবং গঠনে ও সৌন্দর্যে পরিপাটি, পাঠক-সমাজে সমাদৃত। বহু পত্রিকার ও বার্ষিকীর অলঙ্কারও বটে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলা একান্ত প্রয়োজন যে, আমার এই রচনাটি তাঁর 'সম্ভার' খণ্ডটির ভূমিকা নয় যাতে গ্রন্থস্থ বিষয়ের স্থান বা অংশবিশেষের উদ্ধৃতি ও আলোচনা থাকা প্রয়োজন। এটি মুখবন্ধ মাত্র।

উপন্যাস-গল্প গদ্যরচনাভুক্ত। সেজন্য বিষয়টির উল্লেখ অগ্রে হওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। আর, নিয়োগীমশায় মূলতঃ গদ্যলেখক। এই পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে, তাঁর ভ্রমণকাহিনী যা ভারতের নানাস্থানের ও ভারতের বাইরে ইউরোপেরও একটি অংশের যেখানে ও যে অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন, যাতে আমিও আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষীদের কৌশলে যোগদানে ব্যর্থ হই। এইখানেই অর্থাৎ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতেই সেই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এইখানেই তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পত্নী ও কন্যা বাস করছিলেন। নিয়োগীমশায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলাপের সুযোগলাভে কৃতার্থ হন। এই ঐতিহাসিক ভ্রমণের ফল তাঁর 'সাত সমুদ্র তের নদীপারে' নামক গ্রন্থ। তাঁর পূর্বে প্রধানতঃ আর কোন বাঙালি শিশু ও কিশোর-সাহিত্যরচয়িতা ইউরোপে শিশুকল্যাণ সম্মেলনে যোগদান করেন নি বলেই আমি জানি।

অতঃপর তাঁর কবিতা ও ছড়ার কথায় আসা যাক যে বিষয় রচনায় তিনি সহজাত শক্তিসম্পন্ন। এগুলি বাংলার বিবিধ শিশু ও কিশোর-পাঠ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুকুমারমতি পাঠক-সমাজকে আনন্দিত উপকৃত ও পত্রিকার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

বাংলার শিশু ও কিশোরসাহিত্য উপন্যাস-গল্প-ভ্রমণকথা-কবিতা

ও ছড়ায় সুসমৃদ্ধ হলেও নাটকে তেমন সমৃদ্ধিলাভ করেনি। তার প্রধান কারণ, উপরমহলে শিশু ও কিশোর নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে শিশু-কিশোর চলচ্চিত্র নির্মাণের মতোই উৎসাহের অভাব। কে না জানে নাটক, দৃশ্যকাব্য এবং দর্শকসমাজে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব অপরিসীম? আর, ততোধিক প্রভাব চলচ্চিত্রের যার কাছে নাট্যমঞ্চ আজ ম্লান ছায়াচ্ছন্ন। অখিলবাবু সম্ভবতঃ এই কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করেই শিশু ও কিশোরদের আনন্দ ও শিক্ষাদানোদ্দেশ্যে বিবিধ বিষয় ভিত্তিক নাটক রচনা করে নাট্যসাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। কিন্তু নাটক যদি অভিনীত না হয় তো তা নিরর্থক। অখিলবাবু নিজে নটগুণসম্পন্ন। প্রতিবৎসর তাঁর 'পাত্‌তাড়ির' উৎসবে তাঁর প্রিয় সাহিত্যিক-গণকে নিয়ে, (আমি বাদে) অভিনয় করে দর্শককুলকে আনন্দিত করেছেন। তিনিই প্রথম ও শেষ নাট্যকার যাঁর শিশু ও কিশোরো-পযোগী নাট্যগ্রন্থ 'বিষ্ণুশর্মা', সাধারণ রঙ্গমঞ্চে,—দক্ষিণ কলিকাতার 'কালিকামঞ্চে'—অভিনীত হয়। দর্শকগণের মধ্যে বাংলার তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় রাজাজীও ছিলেন। দেশে শিশু ও কিশোর অভিনেতার অভাব নেই, নাট্য-সাহিত্য ও শক্তিশালী নাট্যকারও আছেন, অভাব তার প্রয়োজনীয়তা বোধ, উৎসাহ, দেশের ও সমাজের ভবিষ্যতের প্রতি যোগ্য দৃষ্টিদান এবং মঞ্চের যেখানে আপামর শিশু ও কিশোরসাধারণের পক্ষে যোগ দেওয়া সহজ। স্বাধীনতার মতো সাহিত্যে অনুপ্রবেশ, নাট্যমঞ্চের আনন্দ ও শিক্ষালাভ প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার। তার এই পথ সহজ ও সুগম হতে হবে।

অখিলবাবুর সাহিত্য সম্বন্ধে এই আমার সংক্ষেপিত বক্তব্য। তিনি যেমন সাহিত্য-কর্মী ও সাংবাদিক তেমনি সংগঠকও বটে। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-কর্মজীবনে বাংলায় কতকগুলি মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক শিশু ও কিশোর-পাঠ্য সাময়িক-পত্রের প্রকাশ ও বিলুপ্তি ঘটেছে। এই পত্র-পত্রিকা জগতে আমারও কিছুটা অংশ ছিল। সুতরাং উভয়-

কেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামতে হয়। সে দুঃখজনক ইতিহাসের পরিচয় এখানে আর না দিয়ে বলি, উভয়েই জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নয় সমকর্মী ও বন্ধুরূপেই সাহিত্যিকের দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করে যাচ্ছি। সেকালে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, আজও সে অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, কেবলমাত্র শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে জীবিকার্জন ছিল স্বেচ্ছায় কঠোর দারিদ্র-বরণের সমান। তা ছাড়া, সেকালে, একালেওসাহিত্যের এই অংশের সাহিত্যিকের বিশেষ সম্মানও না ছিল নেইও। বরং তাঁর বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাই সহ্য করতে হোতওহয়। এখনকার মতো তখনও গোষ্ঠী বা চক্র ছিল। যিনি গোষ্ঠী বা চক্রেরবাইরেথাকতেন তাঁর জীবন-সংগ্রাম ছিল কঠোরতর এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার্জন সহজ-সাধ্য ছিল না।

এবার অখিলবাবুর সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বলি। সেকালে প্রকাশকের সংখ্যা ছিল অল্প, ব্যবসায়-ক্ষেত্র ছিল সংকুচিত। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক উৎসর্গীকৃত প্রাণ শিশু ও কিশোর-সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন যাঁদের মধ্যে অখিলবাবু, সুনির্মল বসু ও ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যের নাম আজও শিক্ষিত বাঙালি স্মরণে রেখেছে এবং তাঁদের কালজয়ী সাহিত্যের মাধ্যমে স্মরণে রাখবেও। উপরোক্ত তিন সাহিত্য-কর্মী ছিলেন, অভিন্ন হৃদয় সুহৃদয়। এই গোষ্ঠীর কেন্দ্রে ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পপ্রাণ ক্ষিতীশ চন্দ্র। এই তিনজনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 'মাস পয়লা' যার প্রাণ ছিলেন প্রিয়দর্শন ক্ষীণকা, গৌরবর্ণ ক্ষিতীশচন্দ্র। যমকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ যেমন তাঁর সন্তানের নামকরণ করেন—ফক্কা, ঐ তিন তরুণ গোষ্ঠীর পত্রিকাখানিরও বিলুপ্তি ও অনিয়মিত প্রকাশ যাতে না ঘটে, কতকটা যেন সেই উদ্দেশ্যেই নাম রাখাহয়—'মাসপয়লা।' বলা বাহুল্য এতদসত্ত্বেও ফক্কার যেমন অক্কা প্রাপ্তিতে বাধা ঘটে না, 'মাসপয়লারও' তেমনি নামকে তাচ্ছিল্য করে মাসের প্রথম দিনটি বাদে যে কোন তারিখে প্রকাশিত হবার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতো না। আমরা এই গোষ্ঠীভুক্ত না হলেও আমাদের রচনাকে এঁরা যথোচিত মর্যাদা

দিয়ে প্রকাশ করতেন। আরোও কথা, ক্ষিতীশচন্দ্র আর্থিক স্বচ্ছলতা ভোগ না করলেও আমাদের মতো অভাবগ্রস্ত সাহিত্যিককে সাধ্যমতো, ঋণ করেও, পারিশ্রমিক দান করেছেন। 'মাসপয়লা, সেকালে সুখ্যাত পত্রিকা ছিল, বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও কবি তা'র পৃষ্ঠাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সে গোষ্ঠী আজ নেই। কিন্তু অখিলবাবু সেদিনের স্মৃতি নিয়ে এখনও আছেন। এই পত্রিকাতেই নিয়োগী মশায় শিশু কিশোর পাঠক সমাজের চিঠি-পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর দান রীতির প্রবর্ত্তন করে পথিকৃতের কর্ম করেন। অখিলবাবুর সাংগঠনিক শক্তি কেবল এই কর্মক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। 'পাততাড়ির' ও 'সবপেয়েছির আসর' গুলিও তিনিই সংগঠিত করেন বলেই আমার জানা আছে। এই সব আসর ভারতেরসর্বত্র বিস্তৃত। তবে এর দ্বারা শিশু-কিশোরদের কতটা ও কি কল্যাণ সাধিত হয়েছে বুঝতে পারি না।

অধুনা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিশু ও কিশোরসাহিত্য রচয়িতার সন্ধান বড় একটা চোখে পড়ে না, বরং দেখা যায়, বাড়তি বৃত্তিরূপে এই সাহিত্যরচনাকে কেউ কেউ গ্রহণ করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং খ্যাতি ভোগ করছেন। এই সাহিত্যে সেকালে সরকারী বা বে-সরকারী কোন পুরস্কারই ছিল না বরং তিরস্কার-তাচ্ছিল্যকারীর অভাব সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে ঘটে নি। তবে একালে কয়েকটী পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশক সংস্থা একটীবেশ বড়বর্তব্য সম্পাদন করছেন, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিশু ও কিশোর-সাহিত্যিকগণের সাহিত্য-সম্ভার গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করে। এই সম্পদগুলি যদি রক্ষা করা না যায় তো বাঙলা সাহিত্যের এই অংশের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সাহিত্যের এই অংশের ইতিহাস রচনাকালে আমাকে নিকট ও দূর অতীতের অন্ধকারে বহু ক্লেশ ও হতাশা ভোগ করতে হয়েছে। এরমধ্যে আছে, ঊনবিংশ ও বিংশশতকের বহু উজ্জ্বল মণি-রত্ন। ইদানীং একটা কথা শোনা যাচ্ছে, এ দেশের শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের উন্নতি করতে হলে, নাকি বিদেশের শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তবে এই রক্ষা যে যাঁরা বা যিনি এ উক্তি করছেন তাঁরা বা তিনি এ

পথের পথিক নন। এই উক্তির জবাবে, এইটুকু বলতে পারি, সে দেশে আর এ দেশে বহু দিকেই পার্থক্য। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন ও অর্বাচীন শিশু ও কিশোরপাঠ্য সাহিত্য সে দেশে অনূদিত হয়েছে অপকর্ষের জন্য নয় উৎকর্ষের জন্য। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা', 'গল্পস্বল্প', 'ভোম্বল সর্দার প্রভৃতি' তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব স্বাভাবিক ঘটনা এবং তা সুন্দর আলোচ্য বিষয়ীভূত হয়, সহনীয়ও বটে কিন্তু অনুকরণ অসহ্য ও সর্বথা পরিত্যজ্য।

অখিববাবুর কর্মাবলীর আরও দু-চারটির পরিচয় দেওয়া দরকার। এক সময়ে 'বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের একটি অংশ ছিল, বঙ্গ-শিশু-সাহিত্য-সম্মেলন। এই বিভাগটিকেকোন সম্মেলনে আর অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। তবে 'নিখিল ভারত শিশু-সাহিত্য' সম্মেলন কয়েক বৎসর থেকে ভারতের নানা শহরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। তারই কয়েকটি অনুষ্ঠিত হয় অখিলবাবুর সভাপতিত্বে।

অখিলবাবু এমনই জনপ্রিয়তার্জন করেন যে এক সময়ে গ্রামো-ফোনে 'স্বপনবুড়ো' নামক রেকডও প্রকাশিত হয়! সে রেকরড্ আমরা নানা জায়গায় শুনেছি। এই রকম একজন গুণীকে 'মৌচাক' পুরস্কার ও 'ভুবনেশ্বরী পদকে' ভূষিত করা যথেষ্ট নয় বলেই আমার ধারণা।

যা হোক, অখিল নিয়োগী মশায়কে ও তাঁর 'সাহিত্যিকে আমি যে-ভাবে দেখি ও বুঝি তা সংক্ষেপে বললাম। এই প্রসঙ্গে 'শিশু-সাহিত্য প্রচার সংস্থাকেও' আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে, তাঁরা আমাদের দেশের একটী মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের ভার এই মহার্ঘতা ও প্রতিযোগিতার বাজারে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করে 'অ্যাডভেনচারে' বেরিয়েছেন। মহৎ উদ্দেশ্য, সৎ সাহিত্য, একাগ্রসাধনা, আত্মবিশ্বাস ও ত্যাগ আশু ফলপ্রসূ না হলেও তা কখনো ব্যর্থ হয় না। শ্রদ্ধাবান জ্ঞান ও সাফল্য লাভ করেই।

এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শিশু-সাহিত্যের উন্নতি যাতে ব্যাহত না হয় তার দিকে নজর দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৫৯, দেবীনিবাস রোড
দক্ষিণ দমদম, কলিকাতা-৭৪
১০.৯.৭৬

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিশু সাহিত্য সেবী
শ্রীঅখিল নিয়োগী

বাংলা শিশু-সাহিত্যের আসরে শ্রীঅখিল নিয়োগী 'স্বপনবুড়ো' নামেই বেশী পরিচিত। অথচ, পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত 'স্বপনবুড়ো'-র আবির্ভাব ঘটেনি এবং ঐ ছদ্মনামের আড়ালে না গিয়েও তিনি স্বনামেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। স্বনামধন্য শিশু-সাহিত্যসেবী স্বর্গত সুনির্মল বসু ছিলেন শ্রীঅখিল নিয়োগীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দুজনে প্রায় সমবয়সী এবং প্রায় একই সঙ্গে শিশু-সাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হয়ে শিশু ও কিশোর পাঠকদের মন জয় করে নেন। কবিতা আর ছড়ায় সুনির্মল বসু যেমন চমক লাগিয়েছিলেন, গল্প আর উপন্যাসে তেমনি সাড়া জাগিয়েছিলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী। অখিল বাবু তাঁর প্রথম কিশোর-উপন্যাস 'বেপরোয়া' দিয়েই শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কয়েক যুগ আগেকার লেখা সেই উপন্যাসখানির সঙ্গে এ-যুগের কিশোর পাঠকদের পরিচয় আছে কি না জানি না। কিন্তু এ যুগের কিশোর পাঠকরা যদি বই-খানি সংগ্রহ করে পড়ে তাহলেই বুঝতে পারবে লেখকের কৃতিত্ব কোথায়। 'বেপরোয়া'-র কাহিনীটি যেমন রসঘন ও কৌতূহলদ্দীপক, তেমনি কিশোর-পাঠকদের ভীরুতা বিসর্জন দিয়ে সাহসী করে তোলবার অনুপ্রেরণা জোগায়।

'স্বপনবুড়ো' শ্রীঅখিল নিয়োগীর আসল নামটা হলো শ্রীঅখিলবন্ধু নিয়োগী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তাঁর জন্ম। জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের (পূর্ব-পাকিস্তানের) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার সাকরাইল গ্রামে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের (১৯০২ খ্রীঃ অব্দের) ৯ই কার্তিক রবিবার। তাঁর বাবার নাম দীনবন্ধু নিয়োগী। মার নাম ভবতারিণী দেবী। বালক অখিলবন্ধু মানুষ হন তাঁর মামা কবিরাজ যদুনাথ সেনগুপ্তের কাছে। সেই সাকরাইল গ্রামেই। সেখানকার পল্লী-

প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশ তাঁর বালক মনে যে একটা সুগভীর রেখাপাত করেছিল, তা তাঁর অজস্র লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ছেলেবেলায় পল্লী-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো, নৌকো করে খাল-বিল পেরিয়ে নানা জায়গায় যাওয়া-আসা করা, যাত্রাগানের আসরে কৌতূহলভরা দু' চোখ মেলে রাত কাটানো, সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে চড়ুইভাতি করা, নাটকাভিনয় করা,—এ সবে উৎসাহের অন্ত ছিল না তাঁর। পূর্ববঙ্গের পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যেমন সুনিবিড় পরিচয়, তেমনি সেই অঞ্চলের পল্লী-সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা বড়ো কম নয়।

বালক অখিলবন্ধুর লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায় (নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে)। গুরুমশাইয়ের নাম ছিল তীর্থবাসী পণ্ডিত। সেখানকার পাঠ সাঙ্গ হলে তিনি চলে আসেন কলকাতায়! এখানেও তিনি তাঁর মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন সিটি কলেজে। যথা সময়ে সেই কলেজ থেকেই তিনি আই. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর বি. এস, সি পড়বার কথা। কিন্তু, সে দিকে না গিয়ে তরুণ অখিলবন্ধু হঠাৎ একদিন গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে (এখনকার গভর্ণমেণ্ট আর্ট. কলেজ) গিয়ে ভর্তি হলেন। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল তাঁর। বোধকরি সেই আকর্ষণেই বিজ্ঞানের অঙ্গন ছেড়ে শিল্পকলার প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তিনি। তারপর যথাসময়ে সেই সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যিক শিল্পকলা শিক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে বেশ কিছুকাল কাজ করেছেন অখিলবাবু।

অখিলবাবু যখন আর্ট স্কুলের ছাত্র, তখনই তিনি লিখতে শুরু করেন ছোটোদের জন্য। তাঁর প্রথম লেখা আত্মপ্রকাশ. করে 'শিশু-সাথী' পত্রিকায়। তাঁর কিশোর উপন্যাস 'বেপরোয়া'-ও ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয় এই কাগজে। পরে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

তারপর থেকে তাঁর লেখা অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে থাকে। আর্টস্কুলে থাকতেই তিনি "আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং সেই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই সমিতির পক্ষ থেকেই বের হয় হাতেলেখা একটি পত্রিকা, নাম ছিল 'চিত্রা'। তাতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সেকালের অনেক বিখ্যাত শিল্পীই ছবি এঁকে দিয়েছেন।

কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করতে করতেই অখিলবাবু চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন ছবিতে তিনি যেমন শিল্পপরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন, প্রচারের দায়িত্ব বহন করেছেন, তেমনি আবার স্বরচিত কয়েকটি কাহিনীর রূপদান করেছেন পরিচালক হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তিনি অবিভক্ত বাংলা সরকারের শিল্প-বিভাগের (ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্টের) পক্ষে 'শ্রীনিকেতন' সম্পর্কেও একটি দলিল-চিত্র বা ডকুমেণ্টারী ফিল্মের চিত্রনাট্য রচনা করেন। তাছাড়া সিনেমা ও রেকর্ডের জন্য এক সময় তিনি বহু গানও রচনা করে দিয়েছেন। রেকর্ডেই তিনি সর্বপ্রথম 'স্বপনবুড়ো নামটি ব্যবহার করেন। তাঁর লেখা 'স্বপনবুড়ো' নামে ছোট্ট একটি রূপক নাটিকা রেকর্ডে বের হলে বেশ সাড়া পড়ে যায়। রেকর্ডখানি সে যুগে অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই রেকর্ড-নাটিকায় স্বপনবুড়ো'র-ভূমিকাটি তিনি নিজেই রূপদান করেছিলেন।

শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'স্বপনবুড়ো' শ্রীঅখিল নিয়োগী হলেন সব্যসাচী লেখক। ছোটোদের জন্য একাধারে তিনি গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, হাসির কবিতা ও ছড়া লিখেছেন, নাটিকা লিখেছেন, গান লিখেছেন, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন এবং আজও লিখে চলেছেন। বার্ধক্যের দ্বারে এসে হাজির হলেও তাঁর মনটি এখনও তরুণ ও তাজা। ছোটোদের কাছ থেকে বা ছোটোদের জন্য কোনো আহ্বান এলে সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন না। ছোটোদের গল্প-বলার আসরে এখনও

তিনি কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটিও ভারী সুন্দর।

১৯৪৫ সালের কথা। বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এ 'ছোটদের পাত্‌তাড়ি' বিভাগের পরিচালক রূপে যোগদান করলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী 'স্বপনবুড়ো' ছদ্ম-নামে। সেই থেকে 'স্বপনবুড়ো' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত হলেন ছোটোদের কাছে। 'ছোটদের পাত্‌তাড়ি'-র মাধ্যমেই তিনি আবার প্রতিষ্ঠা করলেন 'সব পেয়েছির আসর' নামক একটি কিশোর-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা আজ ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রবাসী বাঙালী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও। সংগঠনমূলক কাজে অখিলবাবুর উৎসাহ ছেলেবেলা থেকেই। কিশোর বয়সে তিনি যেমন সহপাঠী বন্ধুদের সহযোগিতায় নিজের গ্রামে পাঠাগার ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, আর্টস্কুলে পড়বার সময় যেমন 'আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্বপনবুড়োতে পরিণত হয়ে তিনি তেমনি সব পেয়েছির আসর প্রতিষ্ঠা করে নিজের সংগঠন-শক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যিকদের দিয়ে নাটকাভিনয় করানো এবং 'সব পেয়েছির আসর'-এর পক্ষ থেকে সাহিত্যিক সংবর্ধনার রীতি প্রবর্তনের মূলেও রয়েছে তাঁর বিশেষ উদ্যম।

১৯৫২ সালে অখিলবাবু 'আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতি' কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ভিয়েনাতে যান। সেই সুযোগে ইউরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে সেখানকার শিশু-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিভিন্ন শিশু ও কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁর লেখা "সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে" বইটিতে তাঁর সেই ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে উড়িষ্যার কটক শহরে অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য

সম্মেলন”-এর শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন স্বপনবুড়ো শ্রীঅখিল নিয়োগী। এর পর আরও দুবার নাগপুর ও হায়দরাবাদে তিনি “নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন”-এর শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

শিশু-সাহিত্যসেবী বলতে যা বোঝায় তিনি পুরোদস্তুর তাই। নিছক শিশু মনোরঞ্জন বা কিশোর-মনোরঞ্জন নয়, শিশু ও কিশোরদের কল্পনা-শক্তি বিকাশের ও চরিত্র গঠনের সহায়ক হিসাবেও অজস্র বই লিখেছেন অখিলবাবু। তার পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর (উপন্যাস) বেপরোয়া, ভূতুড়ে দেশ, বন পলাশীর ক্ষুদে ডাকাত; বাস্তুহারা; পঙ্ক থেকে পদ্ম জাগে; শশী-শ্যামলের সাঁকো, কিশোর অভিযান, ধন্যি ছেলে, (গল্প) রূপকথা, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প; স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন, স্বপনবুড়োর হাসির গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, মজার গল্প, রকমারী গল্প, (নাটক) বাপ্পাদিত্য, বাণী, বিষ্ণুশর্মা, মহাপূজা, মায়াপুরী কমলা, প্রতিশোধ শিশুনাটিকা, এশিয়ার নৃত্যছন্দ, স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য, ভ্রমণকাহিণী সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে, দেশে দেশে মোর ঘর আছে; (হাসির কবিতা) স্বপনবুড়োর হুল্লোড়; (ছড়া) স্বপনবুড়োর ছড়া; পালাপার্বণ ছড়া-ছন্দ; (স্মৃতিকথা) স্বপনবুড়োর শৈশব (গান) স্বপনবুড়োর গান ও স্বরলিপি প্রভৃতি।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক রূপে ‘স্বপনবুড়ো’ শ্রীঅখিল নিয়োগীকে ‘ফটিক-স্মৃতি পদক’ দিয়ে সম্মানিত করেছেন ‘শিশু-সাহিত্য পরিষদ।’ সম্প্রতি ‘যুগান্তর’এর ‘ছোটদের পাত্তাড়ি’ পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীনিয়োগী এখন অবসর জীবন যাপনের ফাঁকে ফাঁকে শিশু-সাহিত্য রচনায় রত আছেন।

মনোজিৎ বসু

বেপরোয়া

পৌষের প্রথমটা।

সবে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে, তাই পড়াশুনোর কোন চাড় নেই। বাইরের পেয়ারা গাছটায় চড়ে আপন মনে কাঁচা-পাকা পেয়ারা চিবুচ্ছিলুম, এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে মার ডাক শুনতে পেলুম,—"নীলে, পেয়ারা গাছে কি কচ্ছিস্ ?" শীতের দুপুর হলেও সমস্ত রোদটা মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছে, গা-ও বেশ ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল। তাই শান্ত সুবোধ শিশুটির মতো মুখ মুছে ভেতরে এসে বললুম—"দোল খাচ্ছিলুম।" মা চোখ রাঙিয়ে বললেন, "হতভাগা ছেলে, দোল খাচ্ছিলে ? কোঁচড়ে ও-গুলো কি ?"

ধরা পড়ে গেলুম। কোঁচড়েও যে ডজন-দুই আধ-পাকা পেয়ারা জমা রেখেছিলুম তা আর মনে ছিল না। মা কোঁচড় ধরে টানতেই টুপ্‌টাপ্ করে পেয়ারাগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

দিদির ছেলে টিকটিকি একটা আস্তো পেয়ারা মুখে পুরে দিলে। মা হাঁ-হাঁ করে তাকে ধরতে যেতেই সুযোগ বুঝে আমি এক ছুটে পড়ার ঘরে এসে ভূগোলখানা খুলে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলুম—"রংপুর—অ্যাঁ—রংপুর—রংপুর জেলার প্রধান নগর রংপুর—তামাকের জন্য বিখ্যাত।" এমন সময় মা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললেন, "ছেলের পড়ার চাড় দেখ না ! যা, তোকে পড়তে হবে না, একখানা গাড়ী ডেকে আন দেখি শীগ্‌গীর।" হাঁ করে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খুব একটা বড় রকম শাস্তিরই আশঙ্কা কচ্ছিলুম, এমন সময় কি না গাড়ী ডাকতে হবে। একটু সাহস পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললুম, "কোথায় বেড়াতে যাবে মা ?"

মা বললেন, "আমার ছেলেবেলার সই এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা আছে।" গাড়ী ডেকে মা, মেজদি, আমি যখন মার সইয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম তখন বিকেল হয়ে গেছে।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাইরের ঘরে কেউ নেই, তারপর একটা সরুগলি পেরিয়ে ভেতরে উঠোনেতে ঢুকতেই দেখতে পেলুম, ঠিক মার বয়সী আর আমার মেজদির বয়সী দু'জন মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

বয়সে যিনি বড়, আমাদের পায়ের শব্দ শুনে তিনি হাসি চেপে—উঠে মাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "একি বাসন্তী যে। তুই যে লোক পাঠিয়েছিলি সে

খবর পেয়েছি।” মা বললেন, “হাঁ, তোরা এখানে এসেছিস্ শুনে দেখতে এলুম ; তোর বিয়ের পর তো দ্যাখাশুনো নেই।—তবু ভাগ্যি চিনতে পেরেছিস্। আমি ভাবছিলুম বুঝি চিনতেই পারবিনে। মার সই হেসে বললেন, “তা বই কি, তোরাই শুধু মনে রাখিস্ আর আমরা বুঝি ভুলে যাই ?”

মেজদির বয়সী মেয়েটি হাঁ করে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মার সই বললেন, “অরুণা, প্রণাম কর্, তোর মাসিমা হয় যে !” মেয়েটি মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। মার চোখের ইশারায় আমি আর মেজদিও তাঁকে প্রণাম করলুম। মা আমাদেরও বলে দিলেন, “এঁকে মাসিমা বলে ডেকো—বুঝলে ?” মাসিমা বললেন, “দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বোস্ না বাসন্তী !” তারপর সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “যা তো মা অরুণা, তোর মাসিমাকে বসবার একটা আসন এনে দে।”

মা বললেন, “তা না হয় বসছি। কিন্তু তোরা এত হাসাহাসি কচ্ছিলি কেন বল্ দেখি ?” মাসিমা আবার ফিক্ করে হেসে ফেললেন, বললেন, “ও আমার ছোট ছেলে নাড়ুর কাণ্ড”। অরুণাদি আসন নিয়ে ফিরে আসতে, মা তার হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে বসে বললেন, “কি কাণ্ড করেছে নাড়ু ?”

মাসিমা মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে দেয়ালের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “ঐ যে—”

চেয়ে দেখি দেয়ালের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে লিখে রেখেছে—“আর একবার সাধিলেই খাইব।” মা হাসতে হাসতে মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “সে আবার কি ?” মাসিমা বললেন, “এখানে এক্‌জিবিসন্ হচ্ছে না কোথায় ? সকাল বেলা উঠে ও বললে, বেলা আটটার মধ্যে ভাত চাই ; খেয়ে দেখতে যাব। শীতের সকাল, অত শীগ্‌গীর কি আর রান্না হয় ? তাই বাবুর হল রাগ। না খেয়েই এক্‌জিবিসন্ দেখতে গেল। ফিরে আসতে আমি আর অরুণা কত সাধাসাধি—নাঃ খাবে না ! এই তো আমাদের খাওয়ার আগেও কত ডেকে গেলুম—কিছুতেই এল না ! তারপর আমরা খেতে গেছি, কোন্ ফাঁকে এসে গোদা-গোদা অক্ষরে ঐ যে লিখে রেখে গেছে।”

সব শুনে আমরা তো হেসে খুন—ভারি মজার ছেলে তো ! মাসিমা অরুণা দিদিকে ডেকে বললেন, “যা তো অরুণা, ওর খাবারটা আলাদা করে ঢেকে রেখে আয়।”

অরুণাদি ততক্ষণে মেজদির সঙ্গে ভাব করে খুব গল্প জমিয়ে তুলেছে। মাসিমার ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, “রেখেছি, রান্নাঘরে ঢেকে, খাবে’খন।”

মেজদি অরুণাদির সঙ্গে গল্প কচ্ছে—আজকাল কি প্যাটার্ণের চুড়ির আদর

বেশী। মেয়েদের ধরণই ঐ, দেখা হলেই চুড়ির গল্প, ব্লাউজের গল্প! যখন আর কিছু বলবার থাকে না, তখন কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস ভাই—কি রান্না হয়েছিল তোদের—এমন তরো—ড়ু-উ-উ—চক্ষে যা দেখতে পারি না তাই!

এদিকে চেয়ে দেখি মা আর মাসিমাও কম নন। তাদেরও গল্প চলেছে ছেলে-বেলায় আম বাগানে লুকিয়ে কাঁচা আম খাওয়ার কথা—পুতুলের বিয়ে—এমনি আবোল তাবোল কত কি! উইয়ের ঢিপির মাথা ভেঙে দিলে সব উই যেমন কিল-বিল করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে—খোলা রাস্তা পেয়ে মা আর মাসিমার গল্পের ধারাও ঠিক তেমনি ক্রমাগত একটির পর একটি বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম ভাব করি এমনতরো কেউ নেই। তাই হাঁ করে মাসিমাদের গল্প গিলতে লাগলাম। এমন সময় খুট্ করে একটা শব্দ হতেই পেছন ফিরে দেখি—প্রায় আমার বয়সীই একটি ছেলে পা টিপে টিপে রান্না ঘরের শেকল খুলে ভেতরে ঢুকছে।

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাসিমা চোখের ইশারায় তাঁকে বারণ করলেন।

কাউকে আর কিছু বলতে হল না। মুহূর্ত পরেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এসে হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগলো, "আমি খাবো না—কিছুতেই খাব না,—কেন? কেন বললে ডিমের ডালনা রেখেছি—চিংড়ি মাছ ভাজা রেখেছি"—তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে—ঐ পোড়ামুখী ছোড়দি বুঝি সব খেয়ে নিয়েছে?" অরুণাদি এইবার তার গহনার গল্প থামিয়ে বললে, "হ্যাঁ আমি খেয়েছি! আমি তোরটা খেতে যাব কেন রে?"

"তবে কোথায় গেল আমার ডিমের ডালনা, দে শীগগীর আমার চিংড়ি ভাজা"—বলে ছেলেটি দুমদুম করে পা ফেলে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

মাসিমা উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ তো ফুরিয়ে গেছে, আর একদিন করে দেবো'খন।"

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "হুঁঃ তা বৈকি—ফুরিয়ে গেছে? আমায় ফাঁকি দিয়ে খাওয়াবার জন্যে।" তারপর হঠাৎ, "নাঃ—আমি খাবো না—কিছুতেই খাবো না"—বলে চেঁচিয়ে উঠে, এক ছুটে মাসিমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

মাসিমা ফিক্ করে হেসে ফেল্লেন। মা শুধোলেন, "একি ছেলে রে তোর?" মাসিমা হাসতে হাসতে বল্লেন, "ওই রকমই।"

"তা ইনিই বা কম কি, এই তো পেয়ারা গাছ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এলুম" —এই বলে মা আমার দিকে তাকালেন। মাসিমা আমায় তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "সত্যি নাকি রে? তা'হলে তোদের দুটিতে মিলবে ভালো।"

আমি মাসিমার বুকে মুখ গুঁজে চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগলুম। সত্যি নাড়ুকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

মা বললেন, "বাইরে থেকে নাড়ুকে ডেকে নিয়ে আয়!" আমিও তাই চাই। নাড়ুর সঙ্গে ভাব করতে আমার সমস্ত মনটা বল্‌গা ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। পা টিপে বাইরের ঘরে গেলুম। দেখি দরজার দিকে পেছন দিয়ে নাড়ু পা দোলাতে দোলাতে আপন মনে বলছে "কেন আমায় মিথ্যে বলে খাওয়াতে চাইলে—সেই জন্যই তো আমার রাগ হল। ছোড়দি পোড়ারমুখী আমার খাবারগুলো খেয়ে নিলে কেন? আর যদিই বা খেয়ে থাকে তবে অমন করে বল্লে কি আর আমি খেতুম না?" অভিমানে তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়াতে লাগলো।

আস্তে আস্তে বললুম, "ডাকছে।" সে বোধহয় আমার কথা শুনতে পেলে না, জানলার ফাঁক দিয়ে জলভরা চোখদুটি তুলে রাখ্‌লে। আবার ডাকলাম, "মাসিমা ডাকছে যে"—আমার সাড়া পেয়ে ফস্‌ করে চোখের জল মুছে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে "কি?"

আমি সেই কথাই আবার বললুম। নাড়ু আস্তে আস্তে কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে, "বোস্‌।" তার পাশে বস্‌লুম।

সে বললে "তোর নাম কি রে?" "নীলে।"

আবার বললে, "আমার নাম তো শুনেছিস্‌?"

ঘাড় নেড়ে জানালুম, "হ্যাঁ।"

নাড়ু বললে, "আজ যে মার সইয়ের আসবার কথা ছিল' তুই সেই বাসা থেকে আসছিস্‌ বুঝি?" আমি বললুম, "আমার মা-ই তোমার মার সই।" নাড়ু বললে "ও বুঝেছি।"

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "আজকে আমার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করিস নি তো?"

আমি হাসি চেপে বললুম, "কি কাণ্ড?" খুব সংক্ষেপেই জবাব দিলে, "এই যা সব দেখলি? বললুম, "না আমার ওসব খুব ভাল লাগলো। তাইতো ভাব করতে এলাম।" এইবার নাড়ু খিলখিল করে হেসে বললে "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি ও রকম করি রে, কিছু মনে করিস্‌ নি।"

ও বাসা থেকে ফেরবার সময় নাড়ু আমায় এক কোণে ডেকে নিয়ে বলল "মাঝে মাঝে আসবি তো আমাদের বাসায়? বড্ড একলা রে আমি—ভালো লাগে না।"

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়ীতে উঠলুম।

তারপর প্রায় মাস খানেক নাড়ুর আর কোন খোঁজ খবর পাইনি। সেদিন খাবার

সময় কথায় কথায় মা বললেন, "নাড়ু তো তোদের ইস্কুলে ভর্তি হবে রে।" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কবে গিয়েছিলে ওদের বাসায়।" মা বললেন, "তোর মেজদি এসে যে বললে। ও প্রায়ই ও বাসায় যায় কি না।"

এর দুদিন পরের কথা বলছি। আঁকের ক্লাসের পেছনের বেঞ্চিতে বসে বুড়ো মাষ্টারের ইয়া বড় টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা করছি—এমন সময় সিধু বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে, আমাদের ক্লাসে একজন নূতন ছেলে ভর্তি হল।

খানিক বাদেই দপ্তরী এসে নাড়ুকে আমাদের ক্লাসে পেঁৗছে দিয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে পাশে এসে বস্‌ল। দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই, পেটে পেটে এর কি বুদ্ধি খেলছে। নাড়ু রীতিমত ক্লাসে আসত, আমার পাশটি ছিল তার বসবার জায়গা। ক্লাসের কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এই মুখচোরা ছেলেটাই একদিন সকলের সর্দার হয়ে দাঁড়াবে।

ক্লাসের মধ্যে আমার প্রতাপটাই ছিল সবার চাইতে বেশী। সোজা কথায় আমিই এতদিন সকলকার মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে এসেছি। কি করে আমার হাতের ডাণ্ডা ধীরে ধীরে নাড়ুর হাতে গিয়ে উঠল সেই কথাই এখন বলতে চেষ্টা করবো।

আমাদের যে দলটার কথা বললুম, তাকে ছোটখাটো অনেক কিছুই করতে হত। পাড়ায় ভালো ভালো ফলের বাগান থেকে রাতারাতি ফলচুরি—ও পাড়ার মিত্তির-দের দলের সঙ্গে ঝগড়া—তাদের জব্দ করার উপায় ঠাওরানো—দুষ্টু মাষ্টারকে শায়েস্তা করা—এই সব ছিল আমাদের কাজের অঙ্গ। নাড়ু যখন আমাদের ক্লাসে ভর্তি হলো, ঠিক সেই সময়টাতে এক পণ্ডিত আমাদের বড় জ্বালাতন করছিল। কি করে তাকে জব্দ করা যায়—অনেক দিন থেকেই তার জল্পনা-কল্পনা চলছিল। দলের একটা নিয়ম ছিল—কোন সমস্যা উঠলে লটারী করে একজন বিশিষ্ট সভ্যকে কাজের ভার দেওয়া হত। কি উপায়ে কাজটা হাসিল করতে হবে সেইটে নিয়েই আমাদের সমিতি মাথা ঘামাচ্ছিল, কাজেই লটারীর কথা ওঠেনি মোটেই। আমরা মাষ্টার ঠেঙানো বিদ্যা তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। কারণ আমাদের বয়স ছিল কাঁচা। তারপর তেমন শক্তিও ছিল না, আর বাড়ীতে প্রহারে ভয় যে না ছিল তা বলতে পারিনে!

এর মাস দুই পর—একদিনের কথা বেশ মনে আছে। পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল সকলের শেষে। কি একটা সামান্য কথা দিয়ে পণ্ডিত মশাই ক্লাসের একটি ছেলেকে বেদম প্রহার দিলেন। ইস্কুল ছুটি হবার পর আমরা সকলে মিলে একটা পোড়ো বাড়ীর পেছনে বুড়ো একটা বটগাছের তলায় গিয়ে জড় হলুম। ঠিক হ'ল, আর নয়—পণ্ডিতের একটু সাজা হওয়া খুবই দরকার।

আমি বললুম, "সে তো নিশ্চয়ই। বাজে কথা ছেড়ে লটারী কর—যার নাম উঠবে সে নিজের উপায় খুঁজে নেবে—উপায়ের আশায় বসে থাকলে, সাত জন্মেও পণ্ডিতকে শায়েস্তা করা যাবে না।"

সকলেই আমার মতে মত দিল। লটারী হল, ভার পড়ল গিয়ে অমরের উপর। বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ। বয়সেও সকলের ছোট। সে ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আমি পারবো না নীলুদা।" ছেলেরা বললে—"পারতেই হবে তোকে। লটারীতে নাম উঠেছে যখন, এ কাজ তখন তোকেই করতে হবে।"

বেচারী মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, "পণ্ডিতমশায় আমায় পড়ান যে"! সত্যি, তার পক্ষে বিঘ্ন ছিল যথেষ্টই। অমরকে সকাল-সন্ধ্যে দুবেলাই পণ্ডিতের কাছে পড়তে হয়। পণ্ডিত মশাইকে শায়েস্তা করতে গিয়ে যদিই বা তার কোপানল থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার বাবার তরফ থেকেও আশঙ্কা নেহাৎ কম নয়। অমরের বাবা বেশ রাশভারী লোক। ছেলের এ বখামো তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না! কিন্তু হলে কি হবে, বয়স তখন আমাদের কাঁচা—রক্ত গরম, কাজেই তার এ কাপুরুষতার প্রশ্রয় ত কিছুতেই আমরা দিতে পারিনে। তার ওপর আমি হলাম দলের মোড়ল। আমার কথারও তো একটা মূল্য আছে। তাই বললুম, "তা হ'লে তো চলবে না অমর, দলের স্বার্থের জন্য এ কাজ তোমায় করতেই হবে!

বেচারীর চোখ দিয়ে টপ করে দুফোঁটা জল পড়ল, সে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, "নীলুদা"—

তার মুখে আর কথা ফুটল না।—কিন্তু তার হয়ে কথার জবাব দিল নাড়ু। নাড়ু যে ছুটির পরে আমাদের সঙ্গে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করিনি, এতক্ষণ সে বোধহয় পেছনে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বললে, "নীলে, ওর হয়ে আমি যদি একাজের ভার নি, তা হলে কারো আপত্তি আছে?"

এইবার সকলের চোখ গিয়ে পড়ল নাড়ুর উপর। নাড়ু কিন্তু দমলে না—আমার চোখের উপর চোখ রেখে দু'টো সোজা কথায় বললে, 'কি বল?' "বেশ মনে আছে সেদিন নাড়ুকে এই রকম আপনা থেকে এসে অন্যের ভার নিজের মাথায় তুলে নিতে দেখে কী লজ্জা পেয়েছিলুম!

পরের ভার লাঘব করে গৌরবের রাজটীকা তো আমার কপালেও উঠতে পারতো। দলের মোড়ল আমি, যদি সেধে দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতুম, তা'হলে দলে আমার মাথা আরো উঁচু বই নীচু হত না। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। নাড়ু সে পথের সন্ধান অতি সহজেই দিয়েছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার শুধোলে, "তা হ'লে আপত্তি নেই

তো ?” আমি বললুম, “না আপত্তি আর কি ; তুমি যদি সেধে ওর ভার নাও তো ভালই।”

নাড়ু বললে, “হ্যাঁ, আমিই ওর হয়ে পণ্ডিতকে শায়েস্তা করবার ভার নিলুম।”

পরাজয়ের বোঝা মনে চাপিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। যে ঘটনার উল্লেখ করলুম সেটা হয় তো খুবই সামান্য। কিন্তু, আমার শুধু ঘুরে ফিরে এই কথাটাই মনে হতে লাগল—সেই বা কেন যেচে অমরের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে, আমিই বা নিলুম না কেন ? এতদিন দলের নেতা হয়ে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করেছি। ক্ষমতাও যে নেহাৎ কম দেখিয়েছি তা নয়। দলের সকলেই আমাকে মেনে চল্‌ত, এইটাই যে ছিল সব চাইতে সেরা গর্ব।

আজ কে যেন থেকে থেকে আমার কানে কানে বল্‌তে লাগলো, রাশ ধরবার খাঁটিলোক মিলেছে নীলু, তোমার কাজ ফুরোলো। তাই মনে হলো, এতদিন ধরে শুধু সর্দারীই করে এলুম, কিন্তু কৈ কারো দুঃখের বোঝা বইবার তো কোন চেষ্টা করিনি ! আজ যেন হঠাৎ বুঝতে পারলুম, হুকুম করতে হলে হুকুম মানতেও হয়। এতদিন যে ডাণ্ডা সকলের মাথার উপর ঘুরিয়েছি, সেই ডাণ্ডাগুলো ঠিক যেন হিসেব মতো নিজের মাথায় পড়তে লাগল।

সেদিন রাত্তিরে ভালো ঘুম হল না। আবার এও ভাবলুম, নাড়ু ভার নিল বটে, কিন্তু কি ভাবে যে কাজ শেষ করবে, তা কিছু বললে না। ও নূতন ছেলে, সোজা-সুজি পণ্ডিতকে খোঁচাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে, তবে সমস্ত ঝুঁকিটা আমাকে সামলাতে হবে ! কারণ নাড়ু ধরা পড়লে এটা জানতে আর কারো অসুবিধে হবে না যে, যাদের কথায় নাড়ু এমনতর কাজ করতে গিয়েছিল, সে দলের সর্দার আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

খুব সকালে উঠে নাড়ুদের বাড়ীতে গেলুম। গিয়ে দেখি তার চার বছরের বোনের সঙ্গে ছোট্টটি হয়ে সে পুতুল খেলছে ! এ যেন এক নূতন মানুষ। কে বল্‌বে এই নাড়ুই অন্যের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল !

দলের সর্দার হিসাবে একটা গুমোর আমার বরাবরই ছিল, আর নিজের গুরুত্বও যখন-তখন ছেলে-মহলে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। কিন্তু এ ছেলেটা কি ! এর ভিতর এমন কি শক্তি আছে, যার বলে এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েও দিব্যি পুতুল খেলায় ব্যস্ত ! এক কোণে ডেকে নিয়ে ভারিক্কি চালে বেশ গম্ভীর ভাবে বললুম, “যে কাজটা হাতে নিয়েছ সেটা ঠিক করতে পারবে তো ?”

সে ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বললে, “সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে দেবো।” আমি বললুম, “হ্যাঁ, খুব হুঁশিয়ার হয়ে বুঝে শুনে কাজ করবে, আবাব পণ্ডিতকে ঠ্যাঙাতে যেও না যেন।” নাড়ু হা হা করে হেসে

শুধু বললে, "পাগল"। বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু সারা রবিবারটা বেশ একটা দুর্ভাবনার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালুম।

সোমবার দিন সকাল সকাল ক্লাসে গিয়ে হাজির হলুম। আমার মতো অনেকেই আজ আগে থাকতে ক্লাসে এসেছে। কারণ নাড়ু নূতন ছেলে, এখনও অনেকের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই। সকলেই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "নাড়ু কি করবে?" আমি বল্‌লুম, "তোমরাও যেমন জান আমি তার চাইতে বেশী কিছুই জানিনে। ক্লাসে এলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।" ঘণ্টা বাজবার কিছু আগে রোজকার মতো এসে নাড়ু নিজের জায়গাটাতে বসলে। সকলে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল। নাড়ু তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে বললে, "তোমাদের কারো ভয় নেই, মারামারির ভেতর যাবো না। খুব সহজ উপায়েই আমি পণ্ডিতকে জব্দ করবো।"

ঘণ্টা পড়ল। অন্যান্য দিনের মত ক্লাস চলতে লাগলো। সেদিন পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল ঠিক টিফিনের পর। পণ্ডিত মশায়ের একটা বড় বদ দোষ ছিল, তিনি পড়াতে পড়াতে ঢুলতে শুরু করে দিতেন। সেদিনও খানিকটা পড়াবার পরই পণ্ডিতের হাতের বই টেবিলের ওপর থেকে টপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে পণ্ডিতের মাথাটা পেছনে ঝুলে পড়ল! না, তারপর দেখি নাকটাও বেশ একটু ডাকছে।

ছেলেরা সুযোগ বুঝে গোলমাল শুরু করে দিল। একটা ছেলে আবার পণ্ডিতের টিকির সঙ্গে কী বাঁধতে যাচ্ছিল—এমন সময় নাড়ু চাপা গলায় বললে, "সব চুপ"।

নাড়ুর কথায় যে যার জায়গায় গিয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসলে। সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা শিশি বের করলে। সকলে দেখলে শিশিটা বড় বড় লাল পিঁপড়েয় ভর্তি। সব্বাই শুধোলে, "এ কি হবে?"

নাড়ু বললে, "দেখ না মজাটা" এই বলে উঠে গিয়ে পণ্ডিতের কোটের গলাটা একটু ফাঁক করে শিশির ছিপি খুলে সবগুলো পিঁপড়ে ছেড়ে দিলে। ক্লাসময় একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গেল।

নাড়ু বললে "চুপ চুপ—যে যার পড়া করো।" সকলে তখন খুব মনোযোগী হয়ে যে যার পড়ায় মন দিলে। খানিক বাদে পণ্ডিত হঠাৎ তিড়িক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর বইখানা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ রগড়ে বললেন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ পড়া দাও।" আমরা আড়চোখে দেখতে লাগলুম, পণ্ডিত দু'এক জনকে পড়া জিজ্ঞেস করছেন আর থেকে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে আবার চেয়ারে বসছেন। তারপর খানিক বাদে আর যাবে কোথা, লাফিয়ে উঠে কোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ক্লাসে হৈ হৈ চীৎকার শুরু হয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, "সব চুপ করো, পণ্ডিত হয়তো এক্ষুণি হেডমাষ্টারকে ডেকে নিয়ে আসবে।"

সনৎ বললে, "হ্যাঁ, পণ্ডিত যাবে হেডমাষ্টারকে ডাকতে, তুমি পাগল হয়েছ?"

কথাটা ঠিক। পণ্ডিত মশাই আমাদের ওপর যতটা অত্যাচারই করুন না কেন, হেডমাষ্টারকে তাঁর বাঘের মতো ভয়, তা ক্লাস শুদ্ধ সকলকারই জানা।

আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন হ্যাটকোট পরা ইংরিজীনবীশ লোক। মুখে সব সময়ই তাঁর ইংরেজী বুলির খৈ ফুটতো। পণ্ডিত মশায়ের ইংরিজী না জানাই ছিল তাঁর ভয়ের একমাত্র কারণ। তবু সাবধানের মার নেই। একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলুম পণ্ডিত মশাই কোথায় আছেন দেখতে। সে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললে, তিনি বাড়ীর দিকে চোঁ-চা দৌড় মেরেছেন।

যাতে আমাদের ওপর সন্দেহ না হয় সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ইস্কুল ছুটি হতে পণ্ডিতের জামাটা নিয়ে আমরা জনা কয়েক তাঁর বাড়ীতে হাজির হলুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিত জ্বরে ধুঁকছেন! ঔষধের গুণ দেখে আমরা এ-ওর মুখ চেয়ে একটু চাপা হাসি হেসে নিলুম। তারপর কোটটা ফিরিয়ে দিয়ে, হঠাৎ এমনভাবে চলে আসার কারণ শুধোতে পণ্ডিত শুধু জবাব দিলেন, "শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তাই চলে এলুম রে।" এর বেশী আর কিছু তাঁর মুখ থেকে আমরা বের করতে পারলুম না।

আমাদের জানারও তেমন আগ্রহ ছিল না। মনে পড়ে সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে খুব একচোট হেসেছিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে সকলেই বিশেষ করে যাদের ওপর পণ্ডিত মশাই অত্যাচার করেছেন তারা, নাড়ুকে খুব মেনে চলত। এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কাউকে শাসনের গণ্ডীর ভেতর রাখতে চায় না—তবু দশজনে তাকে মেনে চলে। নাড়ুর সম্মানও অনেকটা তেমনি পাওয়া। সে কারো ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা না করলেও ক্লাসের সকলেই তার আধিপত্য চাইত, আর দলের কাজ ছাড়া নিজেদের সামান্য সামান্য কাজেও তার মত নিতো। এমনি করে দলের প্রত্যেকের মনে যে পাকা-পোক্ত আসন নাড়ু পেল, তা থেকে সরাবার ক্ষমতা আমার কেন, কারুরই রইল না।

এর পর কদিন আমাদের বেশ আরামে কেটেছিল। পণ্ডিতের তাড়া নেই—বল্গাছাড়া ঘোড়ার মতো চলছিলাম আমরা বেশ। কিন্তু জ্বর তো কারো চিরদিন থাকে না—পণ্ডিতেরও থাকলো না।

সেদিন ক্লাসে যেতেই অমর এসে খবর দিলে, পণ্ডিত ভালো হয়ে গেছেন, আজ

ক্লাসে আসবেন। রোদ চন্‌চনে পুকুরের বুকে হঠাৎ কাল-বোশেখী মেঘের ছায়া পড়লে যেমনতর দেখায়, এই সুখবরটা শুনে আমাদের ক্লাসের দশাও ঠিক তেমনি হ'ল!

একটি ছেলের মনে বোধ হয় আশা ছিল—পণ্ডিতের জ্বর ছাড়েনি। আস্তে আস্তে অমরকে শুধোলো, "আচ্ছা সত্যিই কি আসবেন? তুমি কি করে জানলে ভাই?"

অমর বললে, "বাঃ। আমায় পণ্ডিত মশাই আজ সকালে পড়াতে এসেছিলেন যে।"

সে বললে, "সত্যি নাকি?"

অমর বললে, "হ্যাঁ, আর আমায় কত দোষ দিলেন, সেদিন মুখে বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর এটা মনে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, কাজ আমাদেরই।" আমি বললুম, "পণ্ডিতকে ছাড়িয়ে দে না, ও ছাড়া কি দুনিয়ায় আর মাষ্টার নেই?"

অমর বললে, "আরে ভাই, এত ভালো লোকে মরে, ওর কি মরণ নেই।"

এইবার নাড়ু হেসে বললে, "আরে পণ্ডিত মরলে কি হবে, তোর ত বাবা বেঁচে, —আবার ঐ রকম এক পণ্ডিত এনে হাজির করবে। যতদিন বাবা আছে—নিস্তার নেই বাবাজী।" ক্লাস সুদ্ধ সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

আমরা মনে করেছিলুম, জ্বরে ভুগে ভুগে পণ্ডিত মশাই বেশ একটু শায়েস্তা হয়েছেন! কিন্তু দেখি, সে দিক দিয়েই নয়। বরং তাঁর আক্রোশটা যেন আরো বেড়ে গেছে বলে বোধ হ'ল। তবে তাঁর সন্দেহটা নাড়ুর ওপর না পড়ে কতকগুলো পুরানো দাগী নাম করা ছেলের ওপরই ছিল।

এর মাসখানেক পরেই আমাদের দলের হরিশ বলে একটি ছেলে পণ্ডিতের পড়ার ঠিক জবাব দিতে পারেনি বলে বেশ উত্তম-মধ্যম এক চোট খেল। সেদিন বোধ হয় পণ্ডিতের রাগটা একটু বেশী উগ্র হয়েছিল, তাই শুধু প্রহারেই সেটার শান্তি হ'ল না। নাড়ুকে ডেকে বললেন, "নাড়ু, এক টুকরো কাগজে ইংরাজীতে লিখে দাও তো ও কোন পড়া করে না, আমি হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

আগেই বলেছি—পণ্ডিত মশায়ের ইংরেজী জানা ছিল না, তাই কোন লেখা পড়ার দরকার হলেই তিনি নাড়ুর ওপর সে ভারটা দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—নাড়ুই এ সব কাজের উপযুক্ত ছেলে।

আমরা দেখলুম, আজ ব্যাপারটা তো অনেক দূর গড়াচ্ছে! সকলে গিয়ে বললুম, স্যার, আজকের মত ওকে মাপ করুন—কাল থেকে ঠিক পড়া করে আসবে। পণ্ডিত তাঁর টেকো মাথাটা দুলিয়ে বললেন, "না না, সে কিছুতেই হবে না—আমি ওকে নীচু ক্লাসে নামিয়ে দেবো।" নাড়ু কিন্তু পণ্ডিতের কথায় খুব সায় দিয়ে বললে, "হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, আপনি ঠিক বলেছেন, নীচু ক্লাসে নামিয়ে দিলে ওরই

উপকার হবে! আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি।" এই বলে খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কী লিখে পণ্ডিতের হাতে দিলে।

আমাদের একটা পশ্চিমা পাঙ্খাওয়ালা ছিল। পণ্ডিত মশাই তাকে দিয়ে কাগজখানা হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ক্লাস সুদ্ধ আমরা সকলে নাড়ুর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে রইলুম। হরিশ তো কাঁদ কাঁদ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো, কিন্তু তিনি পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইলেন—তাঁর মত বদলাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এমন সময় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পাঙ্খাওয়ালা এসে ক্লাসে ঢুকলো! শুধু পণ্ডিত মশাই নন, আমরা সকলেই দেখে অবাক্। প্রথমটা পণ্ডিতের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। তারপর ঝোঁকটা সামলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে—"কি হল ?"

পাঙ্খাওয়ালা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "চিঠি দেখকে সাহেব কো বড়ি গোসা হো গিয়া, হামকো তো বাবু আচ্ছা মার লাগায়া—হাম এয়সা কাম কভি নেই কিয়া।"

পণ্ডিতের তখন হয়ে এসেছে! একেই তো হেডমাষ্টারকে পণ্ডিত এড়িয়ে চলতেন—তার ওপর এই কাণ্ড, তাই ভয় হল, ঝোঁকের মাথায় কি ফ্যাসাদই না বাঁধিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে বললেন, "কেন রে, সাহেব রাগলেন কেন ?"

পাঙ্খাওয়ালা বললে, "হাম কেইসে বলেঙ্গে বাবু ? হামারা তো কুস্ কসুর নেই হুয়া—"

এমন সময় নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, "পণ্ডিত মশাই, হেডমাষ্টারের রাগ তো হতেই পারে। নাঃ, আপনি হরিশের নামে রিপোর্ট করে ভাল কাজ করেন নি।" পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বললে, "কেন কেন ?"

নাড়ু বললে,—আমি শুনেছি পণ্ডিত মশাই, কথাটা নাকি হেডমাষ্টারের কানে গেছে যে, আপনি ক্লাস ঠিক রাখতে পারেন না। তার উপরে আজ আবার হরিশের নামে রিপোর্ট করেছেন। হেডমাষ্টারের খুব ভাল রকম ধারণা হয়ে গেছে, আপনি ক্লাস চালাতেও পারেন না, আর ছেলেদের ঠিকমত শেখাতেও পারেন না! এজন্য বোধ হয় তিনি এতটা রেগে গেছেন যে—বেচারী পাঙ্খাওয়ালাকে সামনে পেয়ে তার ওপরই সমস্ত ঝাল ঝেড়েছেন! আর তা ছাড়া ছেলেদের নামে রিপোর্ট করাটা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। তাঁর ধারণা কি জানেন ? যে মাষ্টার নিজে শেখাতে পারেন না—ছেলেদের নামে নালিশ করেন তিনিই—"

নাড়ুর কথা শুনে পণ্ডিতের মুখ তো চূণ। বললেন, "তুমি আমায় কথাটা আগে

জানালে না কেন ?" "নাড়ু জবাব দিলে, তা কি আমার অতটা খেয়াল ছিল ? আপনি লিখতে বললেন, আমি লিখে দিলুম।"

পণ্ডিতের মুখে আর রা নেই !

আমরা তো অবাক্ ! কি করে কি ঘটল কিছুই বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতের ঘণ্টার শেষে নাড়ুকে সকলে ঘিরে ধরলুম। নাড়ু সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে, 'আরে —সত্যিই কি আর রিপোর্ট করলে হেডমাষ্টার রেগে যায় ? তা মোটেই নয়। আজ বেশ একটু মজা করেছি"। আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, "আঃ, কি করেছ, তাই বল না ছাই"! নাড়ু হাসতে হাসতে বললে, "কি লিখে দিয়েছিলুম জানিস ? লিখেছিলুম The pankhawalla cannot pull the pankha well (পাঙ্খাওয়ালা ভাল রকম পাখা টানতে পারে না)।

হেডমাষ্টার তো তাই পড়ে পাঙ্খাওয়ালাকে উত্তম-মধ্যম বেশ দু'ঘা দিয়েছে। পণ্ডিত কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছে। দেখিস্—আমি বলে দিচ্ছি, বাছাধন আর কখনো কারো নামে রিপোর্ট করবে না।"

সব শুনে ক্লাস সুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আমি বললুম, "বেচারা পাঙ্খাওয়ালার কি দোষ, ওকে শুধু শুধু মার খাওয়ালি কেন ?

নাড়ু হাসতে হাসতে বললে, "আরে বুঝতে পাচ্ছিস নে ? এক ঢিলে দুই পাখী মারলুম।"

আমি বললুম, "সে আবার কি ? নাড়ু বললে, "জানিস না বুঝি ? ঐ যে বেটা পাঙ্খাওয়ালাকে দেখছ—ভাবছ খুব ভাল মানুষটি—কিন্তু মোটেই তা নয়। তোমাদের পিঠের ওপর যে তেল-তেলে বেতগুলো ভাঙে তাতো সব ওরই হাতে তৈরী। বেটা রোজ তেল দিয়ে মেজে কুচ্ কুচে করে রাখে। আমি জানতুমও না এ কথা। সেদিন ছুটির পর লাইব্রেরীতে একটু কাজ ছিল, ফেরবার মুখে দেখি, বসে বসে বেত মাজছে। বললুম ওগুলো ফেলে দে। তো বেটা জবাব দিল কি শুনবি ? বলে— আরে ঘাবড়াতা কাহে ? ইয়ে তো বড়ি আচ্ছা "চিজ হ্যায়।" রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগলো। সেদিন থেকে আমি ভাবতে লাগলুম, এমন একটা উপায় ঠাওরাতে হবে, যাতে নাকি পণ্ডিতও জব্দ হন, আর ও বেটাকেও বেশ একটু শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। এতদিন পরে আজকে তার সুযোগ পেলুম।" নাড়ুর দুষ্টু চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে জ্বলতে লাগলো।

তারপর থেকে পণ্ডিতমশাই খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। মারধোর করবার শক্তি যেন পণ্ডিতমশায়ের একেবারে খোলা শিশির কর্পূরের মত উড়ে গেল।

সাপুড়েরা যেমন গাছের শেকড় দেখিয়ে বিষওয়ালা সাপকে কাবু করে রাখে, নাড়ুর তৈরী সেই ফুস্ মন্তরের জোরে পণ্ডিত একেবারে ভালো মানুষটি হয়ে রইলেন।

এই ঘটনার তিন চার দিন পর সামান্য একটু সর্দি-জ্বর হওয়ায় ইস্কুলে যাইনি, বিকেলের দিকটায় দাদার আলমারী থেকে লুকিয়ে এনে একখানা বাংলা উপন্যাস পড়ছিলাম, রাস্তার দিকে পায়ের আওয়াজ শুনে বইখানা লুকোতে যাব, এমন সময় চেনা গলায় শুনতে পেলাম, ভয় নেই আজকের মত দোষ মাপ করলুম। হেসে আর একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, "একি, নাড়ু কি মনে করে ?"

নাড়ু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বললে, "ইস্কুলে যাওনি, ভাবলুম, শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়, ফিরতি পথে একবার দেখে যাই।"

এতটা আশা করিনি। তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ক্লাসের কেউ তো এল না, "শুধু সে-ই আসে কেন ? তা ছাড়া ওর বাসা থেকে তো কম দূর নয় ! নিজে যতটা সে আমাদের দিয়ে ফেলেছে—আমরা তো কৈ সাহস করে ততটা দিতে পারিনি। কোথায় যেন সংকোচের একটা কাঁটা বিঁধতে থাকে, খোলাখুলি ধরে দিতে দেয় না।

নাড়ু বললে, "মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আমার পেট ভরবে না। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, একবার বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এসো !"

চোখেমুখে হাসি ছড়িয়ে—একবুক আনন্দের বোঝা নিয়ে ছুটলুম মার কাছে খাবার আমতে। সব শুনে মা বললেন, আঃ। কি যে তোদের কাজের ছিরি, বুঝতে পারিনে। ওকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছিস কেন ? ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়, আমার সামনে বসে খাবে'খন।

দুজনে পাশাপাশি জল খাবার খেতে বসলাম। খেতে খেতে নাড়ু বললে, পণ্ডিত আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে রে ! "আমি উৎসুক হয়ে বললুম, "সে কি ? আবার কোন পথে ?" নাড়ু হেসে বললে, "ভয় নেই, এবার অহিংস উপায়ে।" আমি বললুম, "সে আবার কি ?" নাড়ু বললে, এবার মারধোরও নয়—রিপোর্টও নয়, এবার শুধু কথার মার-প্যাচ। সত্যি ভাই, আজকে এমন সব টিপ্পনী দিয়ে কথা বলেছেন যে, পিত্তি শুদ্ধু জ্বলে ওঠে। "আমি চোখ বুজে বললুম, "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী !"

নাড়ু জোর দিয়ে কইলে, "না, কথা দিয়ে কথার মুখ বন্ধ করতে হবে।"

সন্ধ্যা পর্যন্ত নাড়ুর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্তা চললো। যাবার সময় পিঠ চাপড়ে সর্দি-ফর্দি ছেড়ে কাজে নামতে বললে, "হ্যাঁ, কাল আসছ তো ?

আমি মাথা নেড়ে আমার সম্মতি জানালুম। এই নাড়ুই পণ্ডিতের গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার আজ আমি ইস্কুলে যাইনি বলে সেই নাড়ুই ছুটে এসেছে আমায় দেখতে। আমার একটা ধারণা ছিল, একটু বোম্বেটে বেপরোয়া গোছের ছেলে যারা [illegible] সুখ-দুঃখের ধার ধারে না। নিজের আনন্দে নিজেই [illegible] পথ

তৈরী করে চলে যায়। কিন্তু নাড়ু তো ঠিক তা নয়, এ রাস্তা তৈরী করেই ক্ষান্ত নয়, আশে-পাশে চাইবার অবকাশও ওর যথেষ্ট আছে।

তারপরের দিনও শরীর তেমন ভাল ছিল না, কিন্তু নাড়ুর সে ডাক উপেক্ষা করে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না—ক্লাসে গেলুম। গিয়ে দেখি, পণ্ডিতের ওপর আবার সক্কলেই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধ্‌বে কে? ইচ্ছে আছে পুরো দমে সকলেরই, কিন্তু সাহস কৈ? খানিকবাদে নাড়ু এসে হাজির। আমায় দেখে বললে, "সেরে গেছিস্‌? বেশ, বেশ!"

আমি বললুম, "ক্লাস সুদ্ধ সকলেই তো পণ্ডিতের মুণ্ডুপাত কচ্ছে।"

সে শুধু জবাব দিল,—"হুঁ"।

সেদিন ইংরেজী ঘণ্টার পর পণ্ডিতের ক্লাস। ইংরেজীর মাষ্টার চলে যেতে সকলে ভয়ে ভয়ে যে যার জায়গায় বসল।

পণ্ডিত ক্লাসে ঢুকে সকলের উপর টিপ্পনী কাটতে লাগ্‌লেন। হু! চুলের বাহার ত খুব দেখছি! পড়াশুনার বেলায় ঢু ঢু! আবার কাউকে হয়তো বললেন—ওরে জ্ঞানা……এঁঃ, নাম তো খুব জমকালো জ্ঞানাঞ্জন, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন! দ্যাখ, তোর বাবাকে বলিস্‌ তোকে দিয়ে লেখাপড়া হবে না—আরে বাবা, ছাগল, দিয়ে হাল চাষ যদি হ'ত ত কেউ বলদ রাখতো না! আর একজনকে ডেকে বল্লেন জগাকে সেদিন ঐ পাড়ায় বিয়ে বাড়িতে দেখলুম—যেন নব কার্তিকটি। এখানে তোর কিছুই হবে না, বলিস তোর খুড়োকে, পণ্ডিতশাই একজোড়া বলদ কিনে দিতে বলেছেন।

এমনি নানারকম কথার খৈ পণ্ডিত মশায়ের মুখ থেকে ফুটতে লাগলো। তারপর আধঘণ্টা পর ডাক এলো—এই ক্যাবলা, বই নিয়ে আয়, পড়া দে।

সে দিনকার সংস্কৃত পড়ার ভেতর এক জায়গায় ছিল—"শৃণ্বন্‌রে-বর্বর"—

পণ্ডিত মশাই বই না খুলেই আমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠলেন—শৃণ্বন্‌রে বর্বরঃ—

হঠাৎ পিছন দিক থেকে তার জবাব এলো এলো—"গর্দভঃ ব্রূতে"—

ক্লাস শুদ্ধ সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে গুরুতর এক দণ্ডের আশঙ্কায় বসে রইল। জবাব যে কার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, তা এক পণ্ডিত ছাড়া কারো জানবার বাকি রইল না।

পণ্ডিতের কান লাল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলে বইখানা টেবিলের ওপর রেখে পণ্ডিত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদে হেডমাষ্টার মশাই আর তার পিছনে দপ্তরী লিক্‌লিকে একখানা বেত হাতে করে আমাদের ঘরে ঢুকলো।

হেডমাষ্টার প্রথমে আদেশ, শেষে অনুরোধ করেও কে এমন কথা বলেছে, তাকে খুঁজে বার করতে না পেরে, ক্লাস সুদ্ধ সকলের দু'টাকা করে জরিমানা করে চলে গেলেন।

জরিমানা সকলেই দিতে পারব না, তা ছাড়া পণ্ডিতের ক্রোধানল কি নতুন বেশে আবার দেখা দেয়, সে ভয় সকলেরই ছিল। পরদিন প্রথম ঘণ্টাই পণ্ডিতের। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এসে আমরা ক্লাসে ঢুকলুম। কিন্তু খানিক বাদেই আমাদের অবাক করে পণ্ডিতের বদলে অংকের মাষ্টার এসে হাজির। আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। কারণ, পণ্ডিত এসেছেন, এ আমরা ইস্কুলে ঢোকবার সময়েই দেখেছি—অংকের ক্লাস শেষ হতেই একটি ছেলে ছুটে লাইব্রেরীতে গেল খোঁজ নিতে। মিনিট দশেক পরে সে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে—সুখবর দিলে, পণ্ডিত আর আমাদের ক্লাসে পড়াবেন না, তিনি আমাদের নীচু ক্লাসের সঙ্গে রুটীন বদলে নিয়েছেন।

রাম বাঁচা গেল! আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমরা নাড়ুকে ঘিরে ধেই ধেই করে ক্লাসের মধ্যে নাচতে শুরু করে দিলুম।

পণ্ডির আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকেই ক্লাসটা ভয়ানক নির্জীব হয়ে পড়ল। ধাক্কা খেলে লোকের স্বরূপটা যেমন শীগগির বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আর কিছুতে নয়। কষ্টিপাথরের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতেই পাকা সোনার রং ধরা পড়ে।

পণ্ডিতের সে তাড়নাও আর নেই, আমাদের মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন নেই। দিব্যি "গড্ডলিকা" প্রবাহে ভেসে চলেছিলুম, শান্ত নিরীহ মেষ শিশুর মতো। এই সময়েই আমি হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসলাম, "আয় না সবাই মিলে একটা থিয়েটার করি।"

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "ব্যাপারটা তো খুব খারাপ শোনাচ্ছে না। এর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে, সে কথা মানতেই হবে।"

বিপিন বললে, "থিয়েটার করতে আমি সব সব সময়ই রাজী—যদি তোমরা আমায় রাজার পার্ট দাও। এমন অ্যাকটিং করবো যে, সবাই হকচকিয়ে যাবে।"

হরিশ প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "ওরে বাবা, চূণ-কালি মেখে হনুমান সাজা ......আমি ওর মধ্যে নেই!"

আমি হো হো করে হেসে উঠে বললাম, "তাহলে হরিশ, তোমার পরিষ্কার ভাবে জানা আছে যে মুখখানি তোমার ঠিক লংকা পোড়ারই মতো। নইলে নাটকে এত পার্ট থাকতে বেছে বেছে তোমার সেই হনুমানের কথাই মনে হল কেন?"

হরিশ খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, "সত্যি, আসল হনুমানের মতো দেখায়

না কি রে? বাড়ীতে ত' সবাই ওই নামেই আমায় ডাকে। মুশকিল কি হয়েছে জানিস? আমাদের বাড়ীতে কোনো আয়না নেই। নিজের মুখটা যে একবার ভালো করে দেখবো, তার কি যো আছে?"

হরিশের সরস স্বীকারোক্তি শুনে আমাদের সকলকার হাসির মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

বিপিনের যেন আর সবুর সইছে না। বললে, "অত কথার কচ্‌কচির দরকার কি বাপু? তার চাইতে "রাজা হরিশ্চন্দ্র" নাটক করো—"শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র", এমন এ্যাক্‌টিং করবো যে, সবাই শুনে ভিরমি খেয়ে পড়বে।"

নাড়ু মুচকি হেসে ফোড়ন কাট্‌লে, "তোর অ্যাক্‌টিং শুনে সবাই যদি ভিরমি খেয়েই পড়ে তবে মেডেল দেবার জন্য ত' কারো হুঁশ থাকবে না! তা হলে তোর সব বক্তৃতাই যে বেনা বনে মুক্তো ছড়ানোর মত হবে! বিপিন মাথা নেড়ে জবাব দিলে, "সে কথাও ত ঠিক। মেডেল একটা চাই। নইলে লোকে খাতির করবে কেন? আর বাড়ীর লোককে গিয়েই বা কি দেখাবো?

অমর বললে, "পণ্ডিত মশায়ের কুলুঙ্গীতে কতকগুলো যাত্রার বই দেখেছি। সেই থেকে একটা পালা আমরা থিয়েটার করতে পারি। বিপিন লাফিয়ে উঠে বললে, "ওরে বাবা! পণ্ডিত এমনিতেই আমাদের ওপর চটে আছে। তার ওপর যদি যাত্রার বই চাইতে যাই, তবে সবাইকে মেরে একেবারে তক্তা করে ছাড়বে। নাড়ু আঙুল কামড়ে খানিকটা কি ভাবলে, তারপর হঠাৎ দুটো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "ঠিক হয়েছে! চল সবাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে। আরে, ভয়টা কিসের? কবরেজী বড়ির মত আমাদের জল দিয়ে ত আর গিলে খাবে না। পায়ের ধূলো নিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবো'খন।"

হরিশ তখনও গাঁই-গুঁই করছিল।

নাড়ু তার হাতটা ধরে টেনে বললে, "আরে, আয় না আমার পেছন পেছন, পণ্ডিত মশাই রেগে গিয়ে যদি চোখ থেকে আগুন বের করেন ত আমিই না হয় ভস্ম হয়ে যাবো। তোরা সবাই জ্যান্তই ফিরে আসতে পারবি।"

আমরা সবাই গুটি গুটি নাড়ুর সঙ্গে রওনা হলাম। কেন না, এত কথার পরও যদি পেছপা হই, তবে ভীতু বলে বদ্‌নাম হবে যে!

সন্ধ্যার পর পণ্ডিত মশাই চোখে চশমা লাগিয়ে সুর করে রামায়ণ পড়ছিলেন। এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে তাঁর উঠোনে ঢুকতে দেখে সুতো-বাঁধা চশমাটা কপালের ওপর তুলে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলাম। নাড়ু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধুলো জিবে আর মাথায় ঠেকিয়ে বললে, "আপনার

কাছ থেকে একটু উপদেশ নিতে এলাম। ভেবে ঠিক করেছি, আমরা আর আপনার কথার অবাধ্য হব না।”

পণ্ডিত মশাই খুশী হয়ে বললেন, “বেশ! তোমাদের সুমতি হোক্।” তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন, “তা বাবা, তোমরা কি বিষয়ে উপদেশ নিতে এসেছ?” নাড়ুর দেখাদেখি ততক্ষণে আমরাও পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে দাওয়াতে তাঁর পাশে বসে গেছি।

পণ্ডিত মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে নাড়ু বললে, “আজ্ঞে, আমরা একটু ঠাকুর দেবতার নাম করতে চাই। আপনার কাছে সৎপরামর্শের জন্যে এসেছি। আপনি আমাদের একটি পালা বাছাই করে দিন।” পণ্ডিত মশাই আনন্দে মাথা নাড়তে লাগলেন। বললেন, “এইবার তোমাদের সুমতি হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি। তা হলে এক কাজ করো তোমরা। ‘পেহ্লাদের’ পালা ‘পেলে’ করো। হ্যাঁ, আরো একটা কথা, আমার ছোটছেলে ক্যাবলা—আমার নিজের সন্তান বলে বলছিনে বাবা, ওর গানের গলাটা ভারী মিঠে। যখন গলা ছেড়ে গান গায়, “ওরে মধুসূদন—দাও হে শ্রীচরণ—”

তখন আসরে কেউ চোখের জল রাখতে পারবে না। ওকেই তোমরা পেহ্লাদের ‘পার্ট’টা দাও। দেখবে, ক্যাবলা একাই তোমাদের ‘থ্যাটর’ জমিয়ে দিতে পারবে।”

তারপর আমাদের কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই পণ্ডিত মশাই হাঁকলেন, “ওরে ক্যাবলা, শীগ্‌গীর শুনে যা”—

পণ্ডিত মশায়ের ডাকে যে ছেলেটি এসে আমাদের সামনে হাজির হ’ল, সে বোধ করি কিছুক্ষণ আগে লুকিয়ে গুড় খাচ্ছিল। মুখের দু-পাশ বেয়ে গুড়ের ঝোল গড়িয়ে পড়ছে···গলায় একটা প্রকাণ্ড মাদুলী···খালি গা···ধুতিটা কোমরে বাঁধা।

দেখে আমাদেরই লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্যাবলাকে দেখতে পেয়েই তিনি বললেন, “ওরে ক্যাবলা—পেহ্লাদের সেই গানটা গা ত একবার···এই আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা এসেছে, শুনবে।”

ওই মূর্তিতে সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হয়ে গেল। সে যে কী ভঙ্গী, কী সুর আর কী গলা······ঠিক লিখে বোঝানো যাবে না।

গান শেষ হলে নাড়ু বললে, “চমৎকার হবে পণ্ডিত মশাই, তাহলে পালাটা আমাদের দিন—আমরা যে যার পার্ট লিখে নিয়ে ‘মহলা’ শুরু করে দিই। পেহ্লাদ ত আমাদের ঘরেই রইল।”

আনন্দে আটখানা হয়ে পণ্ডিত মশাই বললেন, “ঠিক কথা বাবা! ঠিক কথা।” তারপর বটতলার ছাপা একটি জীর্ণ ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ নাড়ুর হাতে দিয়ে বললেন,

"বই হারিয়ো না যেন বাবা! তোমাদের 'পার্ট' লেখা হয়ে গেলেই আমায় ফেরৎ দিয়ে যেও।"

সে কথা আর বলতে! নাড়ু সাগ্রহে বইখানি হাতে তুলে মাথায় ঠেকালো আর একদফা পণ্ডিত মশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা পথে পা বাড়ালাম।

খানিক দূর আসবার পর আমরা সবাই রাস্তার মাঝখানেই নাড়ুকে ছেঁকে ধরলাম। বিপিন রেগেমেগে বললে, "এটা তোর কি কাণ্ড হল নাড়ু? ওই ক্যাবলা যদি পেহ্লাদ হয়, তবে সবাই আমাদের পালচাপা দেবে···একথা আমি আগেই বলে রাখলাম।"

নাড়ু মুচকি হেসে জবাব দিলে, "আরে তোরা কয়েকটা দিন চুপ করে থাক্ না। তারপর দেখবি, রগড়টা কেমন জমে!"

রগড়ের আশায় আমরা সবাই চুপ মেরে গেলাম। সাতদিন পরেই অভিনয়। আমরা যে যার পার্ট খুব ক'ষে মুখস্থ করেছি। ক্যাবলা যে কি করবে, সেই হয়েছে সক্কলকার মস্ত বড় ভাবনা।

অভিনয়ের দিন পাড়ায় একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। গোটা পাড়া ভেঙে এসেছে—ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই। পণ্ডিতমশাই তাঁর ছেলের ক্যারামতি দেখাবার জন্য ইস্কুলের সব মাষ্টারমশাইকে নেমন্তন্ন করেছেন। খবরের কাগজ জুড়ে জুড়ে সীন তৈরী করা হয়েছে। আর নানান রকম গুঁড়ো রঙ আর ফুল ঘষে ঘষে দৃশ্য আঁকা হয়েছে।

যে দেখছে, সেই ছেলেদের মুনশীয়ানা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

পাড়ার যত ভাঙা ক্যানেস্ত্রা ছিল, তাই জড় করে 'অর্কেষ্ট্রা পার্টি' তৈরী করা হয়েছে। ইস্কুলের সামিয়ানাটা পণ্ডিতমশাই অনেক তদ্বির করে চেয়ে নিয়ে এসেছেন; সেটাও ছেলেরা অনেক কষ্টে টানিয়ে দিয়েছে। ক্যানেস্ত্রা-কনসার্ট বেজে উঠল।

ছেলের দল গোলমাল থামাতে ব্যস্ত।

এমন সময় নাড়ু ষ্টেজের সামনে এসে ঘোষণা করলে, "আজ আমাদের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ের আগে একটা নক্সা হবে।" আশা করি, নক্সাটা আপনারা উপভোগ করবেন। নক্সাটার নাম কি, তা ছেলেরা এক্ষুনি আপনাদের জানিয়ে দেবে।"

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠে গেল। দুটি ছেলে একটি লম্বা কাগজ দু'পাশে ধরে ষ্টেজে হাজির হল। তাতে বড় বড় করে লেখা রয়েছে—"গুঁতিয়ে দিল ষাঁড়ে"। একটি ছেলে ঠিক পণ্ডিত মশায়ের মতো চেহারা করে মঞ্চে ছুটে বেরিয়ে এলো—আর তার পেছনে পেছনে ষাঁড়ের মুখোশ-পরা একটি ছেলে।

পণ্ডিতের ভূমিকায় ছেলেটি যত "বাঁচাও—বাঁচাও" বলে চীৎকার করে······ষাঁড়

তত তার পেছনে তাড়া করে। সেই সঙ্গে চল্লিশটি ক্যানেস্ত্রার শব্দ। ছেলেরা এই মজার কাণ্ড দেখে ক্রমাগত হাততালি দিতে লাগলো।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই ঃ

কিছুদিন আগে পণ্ডিতমশাই যজমান বাড়ী গিয়েছিলেন। চাল কলার পুঁটলি বেঁধে যখন তিনি বাড়ী ফিরে আসছিলেন, তখন এক ষাঁড় তাঁকে তাড়া করে গুঁতিয়ে দেয়। এই কথাটা কি করে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। ষ্টেজের ওপর এই কাণ্ড দেখে পণ্ডিত মশাই রাগে ফুলছিলেন। তারপর ছেলেরা যখন ক্রমাগত হাততালি দিতে লাগলো, তিনি তখন মরিয়া হয়ে ছাতা নিয়ে ছুটলেন সেই ষ্টেজের দিকে।

চীৎকার করে বললেন, "আজ পরশুরামের মতো সবাইকে নিক্ষত্রিয় করে ছাড়বো। বাঁদর-বিচ্ছুদের একটাও জ্যান্ত রাখবো না!"

পণ্ডিত মশায়ের ওই মার-মূর্তি দেখে ষ্টেজের সাজা-পণ্ডিত আর মুখোশ-পরা ষাঁড় পালিয়ে পগার পার! পণ্ডিতমশাই যাকে সামনে পেলেন, এলোপাথাড়ি ছাতা পেটা করতে লাগলেন। ষ্টেজ-সীন-ভেঙে একাকার। তারপর ছেলেদের হুটোপুটিতে পায়ের ধাক্কায় বাতি গেল নিভে। সুতরাং "পেহ্লাদের গান" যে কেমন জমেছিল, সেটা অনুমান করা একটুও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়! এই অভাবনীয় ঘটনার পর সব বাড়ীর অভিভাবকরাই একেবারে কড়া মেজাজের লোক হয়ে পড়লেন। ছেলেদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া দিন কয়েকের জন্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

কেন না সামনেই আমাদের পরীক্ষা! পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমরা দিন সাতেকের ছুটি পেলুম। এতে পড়াশুনার সুবিধা হলেও আমাদের দলের ভয়ানক ক্ষতি হতে লাগল। কারণ দেখাশুনা এক রকম প্রায় বন্ধ হয়েই গেল। আর এ সময়টাতে বাঙালীর ছেলে আমরা বড় একটা কেউ বাইরের ডাক শুনতে পাইনে। বইয়ের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকাই এ সময়টার চিরকেলে প্রথা।

পরীক্ষার আগের ক'দিন বাইরে যাইনি। এ ক'দিন পড়াশুনায় বাড়ীতেও বেশ ভাল নাম কিনেছিলুম। পরীক্ষার প্রথম দিন সকাল সকাল নেয়ে-খেয়ে পড়বার ঘরে ঢুকতেই মা ডেকে বললেন, "নীলু একবার এঘরে আয়।" গিয়ে দেখি, শোবার ঘরে মেঝেতে একটা ঘটের ওপর আমের পল্লব, আর ঘটের গায়ে তেল সিন্দুর দিয়ে একটি মূর্তি আঁকা। মা তার সামনে আমায় দাঁড় করিয়ে বললেন, "প্রণাম কর।" আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি! হাত তুলে নমস্কার করে পালাতে যাচ্ছি, আমার হাত ধরে মা বললেন, "দাঁড়া, বোস একটু।" নিরুপায় হয়ে বসে পড়লুম। মা আমার মাথায় সাপের মন্তরের মতো বিড়বিড় করে কি সব পড়তে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময়টায় দরজার গোড়া থেকে আওয়াজ এলো, "খুব শক্ত মন্তর পড়ে দিন মাসিমা, পরীক্ষার ভয় মগজে ঢুকতে পারবে না।" আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি

লাফিয়ে উঠলুম। মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোদের আর তর সয় না।" তারপর হাসি মুখে নাড়ুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আয় নাড়ু প্রণাম কর।" নাড়ু বললে, ভূত-প্রেতের আবার যাত্রা অযাত্রা কি মাসিমা, যেখানে-সেখানে অমনি আমাদের রাস্তা করে দেয়।"

মা বললেন, "তোরা যে আজকাল কি হয়েছিস—ঠাকুর দেবতা মানিস নে?"

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "কে বলেছে মাসিমা, আমরা ঠাকুর দেবতা মানিনে? দেখে আসুন আজকে কালীবাড়ীতে—পড়ুয়াদের কি ভিড়! আজকে সব ভক্ত।" নাড়ুর বলবার ভঙ্গি দেখে মা হাসতে লাগলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় নাড়ু মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, "এতেই আমাদের যাত্রাপথে কোন বাধা থাকবে না মাসিমা!" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নে নীলু, মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয় তো সে ওইখানে" বলে একরকম জোর করেই আমাকে মায়ের পায়ের তলায় বসিয়ে দিলে।

দুজনে চুপচাপ রাস্তা চলছিলুম, প্রথমেই নাড়ু কথা বললে। রাস্তার পাশে কালীবাড়ীর দিকে আঙুল উঁচু করে বললে, "ঐ দেখ্।" চেয়ে দেখি, ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের ওপর মাথা ঠুকছে। নাড়ু বলে যেতে লাগলো, "হয়তো এরাই এর আগে কালীবাড়ীর দিকে ফিরেও তাকাতো না। আর কাণ্ড দেখেছ, মাথা ঠুকতে ঠুকতে দেয়ালের গা তেল-তেলে করে দিয়েছে। আরে বাবা, একি আফিসের বড়বাবু, যে একদিন খোসামোদ করলে কিম্বা ডালি পাঠালেই কাজ-হাঁসিল হবে?"

নাড়ু এমনি অনেক কিছু বকছিল। তার কোনো কথার জবাব দিলুম না—শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগলুম—বাস্তবিক আমরা কি হতে যাচ্ছি?

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, উপরো-উপরি দিন কয়েকের পরিশ্রমে শরীরটা একটু ভেঙে পড়েছিল। বিছানার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষার ফলের কথাই ভাবছিলাম—এমন সময় অমর এসে খবর দিলে নাড়ু আমায় ডাকছে। বেরোবার বড় ইচ্ছে ছিল না, তবু ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে অমরের সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলুম। নাড়ুদের ওখানে পৌঁছে দেখি, তার পড়ার ঘরে আমাদের দলের মজলিস বসে গেছে।

নাড়ু আমায় বললে, "কি হে, পোষা মেনিটীর মতো একেবারে ভেতরে সেঁদিয়ে আছ, বেরোবার নামটি নেই।"

বললুম, "শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

আমার দু'হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "আরে ওসব শরীর খারাপ

টারাপ সব সেরে যাবে'খন। দেখো, একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শরীরের পেছনে যতই লাগবে—তোমাকে সে ততই পেয়ে বসবে। মনে স্ফূর্তির ঝড় বইয়ে দাও দেখি"—এই বলে সে আমার সমস্ত শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আরে বাবা সে কি ঝাঁকুনি—তাতে আমি তো আমি, আমার অন্তরাত্মায় পর্যন্ত কাঁপন লাগিয়ে "শরীর খারাপ" যে কোথায় পালিয়ে গেল—তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না !

খগেন বললে, "সত্যি ভাই একটানা জীবন আর ভালো লাগে না। এই একজামিন হয়ে গেল, একটা কিছু করো নাড়ু, একটা চড়ুইভাতিরই না হয় যোগাড় করে ফেল।" সকলে সায় দিয়ে বললে, "ঠিক, ঠিক—একটা বড় রকমের চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করে ফেল দাদা। ওপারে নদীর চরে গিয়ে বেশ হবে'খন।" কথাটায় বেশ রস পেলুম। মুখ চট্‌কে বললুম, "হ্যাঁ, একটা পাঁঠা কিম্বা খাসী যদি যোগাড় করতে পার, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না।"

নাড়ু বললে, "চড়ুইভাতিও হতে পারে, পাঁঠাও চলতে পারে—কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনে নয়। যদি ছলে বলে কৌশলে যোগাড় করতে পার, তবেই বলব তোমাদের বাহাদুরি।"

আমি বললুম, "কথাটা নেহাৎ মন্দ শোনাচ্ছে না, বেশ একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চারও হবে।"

বিপিন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে খাটো গলায় বললে, "ওহে, আমি একটার খোঁজ দিতে পারি।" হরিশ বললে, "কোথায় হে ? পাড়ার মিত্তিরদের সেই কালো পাঁঠাটা বুঝি ?" বিপিন বিরক্ত হয়ে বললে, "না, না মিত্তিরদের হতে যাবে কেন ? ও পাড়ার রায় বাবুদের বেশ একটা নধর পাঁঠা দেখে এলুম। বোধহয়, কোনো প্রজা দিন দুয়েক হল দিয়ে গেছে।"

নাড়ু বললে, "ঠিক। বড়লোকদের জিনিস যাওয়াই ভালো। তার ওপর যখন প্রজার ঘাড় ভেঙে আদায় করেছে, ও তো আমাদেরই পাওনা।"

অনেক গবেষণার পর ঠিক হল, রায়বাবুদের নধর পাঁঠাটি যখন আমাদের রক্ত-মাংস বৃদ্ধি করবার জন্যই মর-জগতে এসেছে, তখন তাকে কিছুতেই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না ! এখন কি উপায়ে ছাগ-নন্দনকে ওখান থেকে সরানো যায়, সেইটেই হল সব চাইতে বড় সমস্যা। নাড়ু বললে, "আগে দু'একদিন গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। কোথায় তাকে সমস্ত দিন বেঁধে রাখে, কে তার রক্ষক—এইসব খুঁটি-নাটি তত্ত্ব আগে যোগাড় করে ফেল—তারপর এক শুভদিন দেখে কাজ সমাধা করলেই হবে।" অমর ছেলেমানুষ, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না—কাজেই টিকটিকির কাজটা তার ওপরেই পড়ল।

এর দু'দিন পরে সন্ধ্যেবেলা—নাড়ুর ওখানে মজলিসটা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে সকলের মাঝখানে ঝুপ করে বসে পড়ল।

হরিশ তার হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললে, "কি রে, ফিটের ব্যামো-ট্যামো নেই তো?"

অমর শুধু চোখ বুজে বললে, "পাখী উড়ে গেছে।"

আমি বললুম, "কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে বল, ভাল বুঝতে পারলুম না।"

অমর বললে, "বলব আমার মাথা আর মুণ্ডু। রায়বাবুদের পাঁঠা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে!" নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, "অ্যাঁ—বলিস কি রে? তার চেয়ে আমার যে জিভে জল আসে, সেই জিভটা কেটে ফেলে দে না রে—।" তারপর ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিলে।

আমি হেসে বললুম, "আহা, আগেই মরা-কান্না শুরু করে দিলে? ওতে আমাদের শুভকাজের অকল্যাণ হবে যে!" নাড়ু শুধোলে, "হয়েছিল কি রে? পাঁঠার কথা কাউকে কিছু বলেছিলি না কি?"

অমর নাড়ুর হাত ধরে বললে, "আমি তোমার গা-ছুঁয়ে বলতে পারি—কাউকে আমি পাঁঠার একটি কথাও বলিনি;—তবে" ব'লে সে একটা ঢোক গিলল।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "আবার 'তবে' কি রে?" অমর মাথা চুলকে বলল, "যে ছোকরা চাকরটা পাঁঠাকে সারাদিন আগলে রাখে, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, পাঁঠাটা রাত্তিরে কোথায় থাকে?" নাড়ু হাঁ করে অমরের কথা গিলছিল—এই কথা শুনে সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে বলল, "এঃ! তবেই সেরেছে! ও নিশ্চয়ই বাড়ীতে গিয়ে এক কথায় দশ কথা সাজিয়ে বলে দিয়েছে। তার ফলে হয় পাঁঠা রায়বাবুদের পেটে গেছে, নয়তো অন্য কোন আত্মীয় বাড়ী রেখে দিয়েছে।" অমর এতক্ষণ বোকা বনে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল, এইবার একটু সাহস পেয়ে খাটের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটা একটু সোজা করে—ধীরে ধীরে চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, "না, আমি জানি, রায়বাবুরা খায়নি।"

হরিশ বললে, "যদি না খেয়ে থাকে—তো আমি জোর করে বলতে পারি ও পাঁঠা দারোগা-বাড়ী গেছে।" নাড়ু বললে, "দারোগা-বাড়ী আবার কোনটা বল্ তো?" আমি বললুম, "দারোগাগিরি করে মেলা টাকা জমিয়ে ছিল—সেই থেকে ওরা জমিদারী কিনে কিনে—আজ মস্ত বড় জমিদার।"

নাড়ু বললে, "ওসব দারোগা-ফারোগা বুঝিনে, যখন একবার লোভ লাগিয়ে দিয়েছ, ও পাঁঠা তখন খেতেই হবে।"

বিপিন বললে, "শেষকালে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? না বাবা, অতটা সহ্য হবে না"—

নাড়ু টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বললে, "কেন হবে না ? আলবৎ হবে।" তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পেটে হাত বুলিয়ে বললে, "এই আমি বলে রাখলাম, ও পাঁঠা আমাদের পেটের মধ্যে আসবেই, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মশলা বাটতে পার।" হরিশ বললে, "গাছে কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দিলে কি আর সব সময় কাঁঠাল ছিঁড়ে পড়ে দাদা ?"

নাড়ু বললে, "কাঁঠাল শুধু ছিঁড়ে পড়বে না—গোঁফের ফাঁক দিয়ে একেবারে মুখের ভেতর গিয়ে সেঁধোবে। তবে বাবাজীদের একটু খাটতে হবে, তা আগেই বলে রাখছি।" সকলে বললে, "তাতে আমরা খুব রাজী—কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা তোমাকেই বাঁধতে হবে।"

নাড়ু বললে, "নিশ্চয়।"

হরিশ বললে, "পাঁঠা তো আগেই পেটে পুরে রাখলে, কিন্তু দারোগা-বাড়ী যেতে হলে যে এক নৌকো ছাড়া আর উপায় নেই, তা জানো ?" নাড়ু চোখ কুঁচকে বললে, "কেন ?" হরিশ বললে, "খেয়ানৌকায় পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু পাঁঠা নিয়ে সকলের সামনে তো আর খেয়া দিয়ে আসতে পারবে না।" বিপিন বললে, "নৌকোর জন্যে আটকাবে না—আমাদের ঘাটে নৌকো রয়েছে, আর সুবিধেও আছে, দাদা বাড়ীতে নেই।" নাড়ু বললে, "তবে চল্ এক্ষুনি আর দেরী নয়।" আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, "আজই ? এক্ষুনি ? তুমি পাগল হয়েছ নাড়ু ?" নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, "কথা যখন উঠেছে, তখন ও পাঁঠার মাংস আজই আমার মুখের মধ্যে চাই।" এই বলে সে মুখ চট্‌কাতে লাগলো। পাঁচ জনে তক্ষুনি উঠে পড়লুম। রাস্তায় কোন কথা হল না। এই কথাটুকুই শুধু সকলে প্রাণে প্রাণে বুঝলুম, যে কাজ আমরা শুধু নিছক আমোদের জন্যে হাতে তুলে নিলুম, তা যে করেই হোক শেষ করতে হবে। আর আমাদের এ কাজ করবার সকল উদ্যমের কেন্দ্র হয়ে রইলো—নাড়ু।

বিপিনদের বাইরের ঘাটেই নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা গিয়ে নৌকোয় উঠলুম। নাড়ু বললে, "বিপিন, হাত-বৈঠে আছে ?"

আছে বলে বিপিন বাড়ীর ভেতর চলে গেল—খানিকবাদে চারখানা বৈঠে নিয়ে এসে নায়ে উঠলো। আমরা চারজন চারখানা বৈঠে ধরলুম। রাস্তা ভালো জানে বলে হরিশ গিয়ে হালে বসলো। কোনো কথা নেই, শুধু ছপ্ ছপ্ শব্দে জল কেটে বৈঠেগুলো নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চললো। সবে চাঁদ উঠেছে। গাছের মাথায় মাথায় ছিটকে ছিটকে জ্যোৎস্না পড়ে আকাশটাকে ফাঁক করে ধরে রেখেছিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে, বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে, জ্যোৎস্না এসে চলতি পথে আমাদের নৌকোর উপর আলো-ছায়ার খেলা শুরু করে দিল। খানিকটা গিয়েই নৌকো বাঁ দিকে চললো। সোজা খাল, ধারে ধানের ক্ষেত।

ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় খড়ের গাদা—ঠিক যেন নির্বাক সাক্ষীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দূরে চাষাদের কুঁড়ে থেকে ক্ষীণ আলো বেরিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে।

এপাড়ে রায়বাবুদের দারোয়ান তেওয়ারীর পাকা কুঠুরী থেকে ভজন গানের দু'একটা রেশ ভেসে আসছিল। আমাদের হাতের বিরাম নেই—ছপ্-ছপ্ শব্দে নৌকো বর্ষার জলে মোচার খোলার মত এগিয়ে যাচ্ছিল। আরো খানিকটা গিয়ে নৌকো একটা সরু খালের ভিতর ঢুকলো। দুধারে লম্বা লম্বা গাছগুলো মাথার ওপর জড়িয়ে এক হয়ে গেছে, চাঁদের আলো তার ভেতর রাস্তা খুঁজে পায় না—ঠিক এমনি একটা খাল দিয়ে নৌকো চলতে লাগলো।

এতক্ষণে আমি একটা কথা বললুম, শুধোলুম, "এর চাইতে কি আর ভালো রাস্তা নেই রে হরিশ ?" জবাব এলো, "কিন্তু তাহলে অনেক ঘুরতে হবে।" নাড়ু বললে, "তবে এইটেই ভালো।

* * *

আবার চুপচাপ। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তালে তালে বৈঠে ফেলতে ফেলতে মনে হলো, আমরাও যেন এই অন্ধকারের এক একটা বিশেষ অংশ। এই নিশ্চল বট—অশ্বত্থের সার, এই মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর ডাক, দু'ধারেই পচা আবর্জনার গন্ধ—এদের সঙ্গে যেন আমরা কোন যুগ থেকে একেবারে মিশে আছি। আমাদের বাদ দিয়ে এই বীভৎস রসের অনুভূতি যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

এ ভাবটা কতক্ষণ ছিল জানি না। চমক্ ভাঙল—যখন নৌকোটা খ—স্ করে এক জায়গায় এসে ভিড়ল। অন্ধকার তত বেশী না থাকলেও জায়গাটাকে যেন আরো ভয়াবহ বলে ঠেক্‌ল।

এতক্ষণ যা দেখছিলাম—তা অন্ধকারের ভেতর দিয়েই দেখছিলাম। বিশেষ একটা আকার পেতে তা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি। কিন্তু এখন আলো-আঁধারের মাঝে যে জায়গায় এসে পৌঁছলুম, সে তার একটা রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। নৌকোটা যেখানে এসে লাগলো, ঠিক তার সামনেই একটা উইয়ের ঢিবি—যেন আশেপাশের গাছগুলোর সঙ্গে বাজি রেখে তার মাথাটা আকাশের ভেতর দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। দুদিকে পানা-পচা দুর্গন্ধে বোধহয় ভূতপ্রেতেরও অরুচি ধরে! আশেপাশের গাছের রাশি রাশি ঝরা পাতা পড়ে সমস্ত জায়গাটার মাটি ঢেকে রেখেছে।

সকলেই বৈঠে রেখে উঠে দাঁড়ালুম। নাড়ু আমায় বললে, "না, সকলে গেলে তো চলবে না। তুমি আর অমর নৌকোয় থাকো। আমরা তিনজনে পাঁঠার খোঁজে

যাব ; আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত নৌকো এখান থেকে কোথাও সরিও না।" তারা তিনজনে নৌকো থেকে নেমে ঝরাপাতার ওপর দিয়ে মর্-মর্ শব্দ করতে করতে ওপরে উঠে গেল। উইয়ের ঢিবির আড়াল হতেই ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে এলো। শীতের সন্ধ্যা, বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস চালিয়েছিল—র‍্যাপারটা ভাল করে মাথার ওপর দিয়ে জড়িয়ে বসলুম।

অমর বললে, "বড্ড মশা হে।"

বাস্তবিক এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এইবার নিজের আশেপাশে চেয়ে দেখি, ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা এসে যেন আমাদের ছেঁকে ধরেছে। তার ওপর অনেকদিন হয় তো মানুষের তাজা রক্তের স্বাদ পায়নি, তাই যেন সব খোঁজ পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে আসতে লাগলো।

বললুম, "র‍্যাপারটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বোস্।"

অমর বললে, "নাহে, শুধু জড়িয়ে বসলে হবে না" এই বলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত র‍্যাপারে ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি বললুম, "ওকি, শুয়ে পড়লি যে!" "অমর শুধু বললে, "হুঁ।"

সেই নির্জন প্রান্তরে আমি একা বসে রইলুম। ছেলে-মহলে সাহসী বলে আমার বেশ নামডাক ছিল। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাব বলেও দু'একবার বাজি রেখেছি। কিন্তু আজ এই ঠাণ্ডা শীতের বাতাসে আলো-আঁধারের মাঝখানে কোত্থেকে ভয়ের একটা রেখা যেন আমার মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল। আস্তে আস্তে ডাকলুম, "অমর—ওরে অম্‌রা—"

র‍্যাপারের তল থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ এলো উ—

বুঝলুম, তোকে ডাকা বৃথা। এইবার যেন চারিদিকের নীরবতা আমাকে আরো পেয়ে বসল। কেন যেন মনে হল, আমি প্রেতপুরীর ঠিক মাঝখানে এসে বসেছি। খানিক বাদেই হয়তো চারদিকের এই ঝোপ-ঝাড়েরফাঁকে ফাঁকে তাদের মজলিস বসে যাবে।

আমি যেন আজ দু'চোখ মেলে সামনা-সামনি তাই দেখতে—কার ডাকে এখানে এসে বসেছি। "তারা আসবে" এই কথাটাই যেন জগতে সব চাইতে সত্যি বলে ঠেকতে লাগল।

হঠাৎ মাথা উঁচু করতেই ওটা কি? নড়ছে, না আমার দিকে এগিয়ে আসছে! চোখ রগড়ে আবার দেখলুম—দেখি, একগোছা কাশফুল বাতাসে দুলছে! মনে হল হাতের মুঠোয় প্রাণটা আবার ফিরে পেলুম। এরপর আর কোন দিকে চাইবারও সাহস রইল না—এবার যদি কাশফুল না হয়ে—

ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপর পেছন দিকে—ও আবার কিসের শব্দ! দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে কাঠের মত বসে রইলুম।

হঠাৎ শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখলুম, এবার আর কিছু নয়—মানুষই বটে! নাড়ু ছুটতে ছুটতে এসে নৌকোয় উঠলো। তখনো আমার সে ভাবটা কাটেনি।

নাড়ুর হাত চেপে ধরে বললুম, "কিসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস?"

সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলে, তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কেন শুনতে পাসনি?" নাড়ু আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, "ভয় পেয়েছিস নাকি রে?"

আমি সে কথায় কান না দিয়েই বললুম, "কিসের শব্দ, তাই বল না!"

হাসতে হাসতে নাড়ু বললে, "আরে বোকা, ও যে মশার ডাক্!"

আমি তো একেবারে চুপ!

নাড়ু বললে, "আয় শিগগীর আমার সঙ্গে—হরিশ নৌকোয় থাকবে।" আমি বললুম, "ওদিকের কি খবর?" নাড়ু বললে, "সব জানতে পারবি—আয় শিগ্গীর!" এই বলে সে একরকম টেনেই আমায় নৌকো থেকে নামাল। ছুটতে ছুটতে যেখানে গিয়ে পৌঁছলুম, সেটা দারোগাবাড়ীর পেছন দিকটা। দেখি বিপিন একটা গাছতলায় বসে আছে। আমাদের আসতে দেখে সে লাফিয়ে উঠে বললে, "ভারী সুবিধা হয়েছে হে। বাড়ীসুদ্ধ সব এইমাত্র থিয়েটার দেখতে গেল। বাড়ীর ভেতর এখন এক মাষ্টার, এক চাকর, আর বাইরে দারোয়ান ব্যাটারা সব আছে। মাষ্টারটাকে হাত করেছি। ওকে কিছু ভাগ দিলেই চল্‌বে। কোন ঘরে ছাগনন্দন আছেন, আমায় দেখিয়ে মাষ্টারটা এই শুতে চলে গেল।"

আমরা বললুম, "তবে আর কি—কাজ তো ফর্সা। কোন ঘরে আছে, চলো দেখি—"

ইশারায় আমাদের থামতে বলে বিপিন চুপি চুপি বললে, "ওহে, অত সোজা নয়, একটু গোলমেলে আছে। পাঁঠা যে ঘরে বাঁধা, চাকর বেটা যে সেই ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে, নইলে কি আমি এতক্ষণ বসে আছি?" নাড়ু একটু ভাবলে, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নীলে, তোর কাছে পয়সা আছে?" আমি পকেটে হাত দিয়ে বললুম, "আছে একটা আনি।" নাড়ু বললে, "ওতেই হবে'খন।" এই বলে আনিটা বিপিনের হাতে দিয়ে বললে, "যা দিকিন্ বাড়ীর সামনের দোকান থেকে দু'পয়সার তেল আর এক পয়সার সরষে নিয়ে আয়।"

বিপিনকে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে, "তাকিয়ে রয়েছিস কেন? শিগগীর নিয়ে আয়।"

বিপিন ছুটে চলে গেল।

আমি বললুম, "তেল আর সরষে দিয়ে কি হবে নাড়ু ?"

নাড়ু বললে, "তুই দেখতে ছোট আছিস্—তোকেই এ কাজ করতে হবে।"

আমি বললুম, "কি করতে হবে বল না ছাই।" নাড়ু ফিক্ করে হেসে বললে, "আনুক তো আগে তারপর দেখ কি হয় !"—

একটু বাদেই কাগজে মোড়া কিছু সরষে আর ছোট্ট একটা শিশিতে সরষের তেল নিয়ে বিপিন হাজির হল।

নাড়ু জিজ্ঞেস করল, "কোন ঘরটায় আছে ?"

বিপিন রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট ঘর দেখিয়ে দিলে। ঘরটার সব দরজাই বন্ধ শুধু একটা জানলা মাত্র খোলা রয়েছে। নাড়ু চুপি চুপি আমায় বললে, "দ্যাখ্ তুই ছোট্ট আছিস—এই জানলা দিয়ে তোকে আমরা দুজন উঁচু করে ধরে গলিয়ে দেব। এই দুটো জিনিস সঙ্গে নে।"

আমি বললুম, "কি হবে ওতে ?"

নাড়ু বললে, "শোন্ না, ভেতরে ঢুকে পাঁঠাটার কানের মধ্যে সরষে ঢেলে দিবি —আর তেল লাগিয়ে দিবি জিভে"—

আমি বললুম, "কেন ?"

নাড়ু বললে, "তা হলে পাঁঠাটা আর ডাকতে পারবে না।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "সত্যি ?"

ও বললে, "হ্যাঁ, আর দ্যাখ তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিবি—আমি আর বিপিন গিয়ে তখন পাঁঠাটাকে তুলে নিয়ে আসবো।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, "যদি চাকরটা জেগে ওঠে ?"

নাড়ু বললে, "আরে দূর বোকা, টের পাবে কোত্থেকে ? তুই তো আগেই গিয়ে পাঁঠাটার ডাক বন্ধ করে দিবি।"

রাজী হলুম।

দুজনে উঁচু করে ধরে আমায় ভেতরে গলিয়ে দিলে। ঢুকেই দেখি কোণে তেলের বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। চাকর বেটা বিছানায় পড়ে ভোস্-ভোস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর পাঁঠাটা এক কোণে শুয়ে কাঁঠালের পাতা চিবুচ্ছে। প্রথমটা আমি থতমত খেয়ে গেলুম। তারপর কি ভেবে ফস্ করে ফু দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুকলো। আস্তে আস্তে নাড়ুর কথামত পাঁঠার জিভে তেল ঘষে দিলুম। শুধু একটিবার ব্যা-আ-শব্দ করেই পাঁঠাটা আর আওয়াজ করতে পারলে না। আমি তো ওষুধের গুণ

দেখে অবাক্। তারপর সব সরষেগুলো দুই কানে ঢেলে দিলুম। পাঁঠাটা মরার মত মাটিতে পড়ে রইল। বাস্ আমার কাজ ফর্সা—

পেছনে চেয়ে দেখি, চাকর বেটা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

নাড়ু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক করেছিস তো ?" আমি বললুম, "হুঁ।"

ওরা দুজনে এসে ঘরে ঢুকলো, তারপর পাঁঠাটাকে ধরাধরি করে বাইরে এনে বললে, "নীলে, দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দে"—

দরজা ভেজিয়ে তিনজনে এসে রাস্তা ধরলুম। নাড়ু বললে, "সদর রাস্ত দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। কেউ দেখতে পাবে হয়তো। সোজা গাছের ফাঁক দিয়ে—চল দেখে।"

আমি বললুম, "সেই ভালো।"

নৌকোয় ফিরে এসে দেখি, দুটোতেই আরাম করে ঘুমোচ্ছে। তাদের ঠেলে তুলে দিলুম! নাড়ু বললে, "নৌকোর তক্তা তুলে পাঁঠাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখ, আর যদি নড়াচড়া করবার চেষ্টা করে তো—একটা কচুর পাতা ওর কানের ওপর রেখে ছোট্ট একটা ঢিল চাপা দিস্।" এই বলে পাশ থেকে গোটাকয়েক কচুপাতা তুলে নৌকোয় ফেলে দিলে।

* * * *

বিপিন বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

নাড়ু বলল, "না, আমি আর নীলে খেয়া দিয়ে যাবো। ওরা পাঁঠার খোঁজ খবর করছে কিনা, একটু খবর নিয়ে যেতে হবে। তোমরা শিগ্গীর শিগ্গীর চলে যাও।"

নৌকা ছেড়ে দিল। নাড়ু আর আমি নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলুম।

দারোগা-বাড়ীর সামনের দিকটায় যেতেই দেখতে পেলুম জনকয়েক দারোয়ান এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একজন এসে জিজ্ঞেস করল, "বাবুজী,—ইধার একঠো বক্‌রী দেখা ?"

আমরা বললুম, "এদিকে, কৈ না তো !"

লোকটা ছুটতে ছুটতে আরেক দিকে চলে গেল। নাড়ু বললে, "আর দরকার নেই, বৃষ্টি আসছে, ছুটে চলো।"

ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, এরি মধ্যে প্রায় আধখানা আকাশ কালো কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। বৃষ্টি এলো বলে। দু'জনে ছুটে চললুম। আধ মাইলটাক যেতেই সামনে খেয়া। নদীটা কোনো কালে খুব বড় ছিল। এখন চর পড়তে পড়তে খুবই ছোট হয়ে গেছে। স্রোতও নেই বললেই চলে।

খেয়ার মাঝি নেই—নৌকার এধার-ওধারে শক্ত রসি দিয়ে দু'ধারের সঙ্গে বাঁধা। লোকে রসি ধরে নৌকাখানা এপার ওপারে টেনে যাতায়াত করে।

নাড়ু বললে, "শিগ্‌গীর ওঠ।" রসি টেনে তো দুজনে ওপারে গেলুম। আবার ছুটতে যাচ্ছি। নাড়ু বললে, "থাম। ছুরি আছে?" পকেট থেকে ছুরি বের করে দিলুম। নাড়ু খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে এপারের সঙ্গে বাঁধা রসিটা কেটে ফেলে দিল।

আমি বললুম, "ও কি হল?" নাড়ু ছুরিটা আমার পকেটে ফেলে দিয়ে বললে, "যাঃ ব্যাটারা আর খেয়া পার হয়ে এদিক পানে খুঁজতে আসতে পারবে না।" তারপর দুজনে সে কি ছুট্—এমন ছোটা জীবনে কখন ছুটেছি বলে মনে পড়ে না। খানিকটা যেতেই মেঘগুলো চাঁদটাকে ঢেকে ফেললে। রাস্তা-ঘাট একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। দু'চক্ষে কিছু দেখবার যো'টি নেই। একবার একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে কাপড়খানা ফ্যাস্ করে গেল ছিঁড়ে। নাড়ু বললে, "আমার হাত ধর।"

তারপর আবার ছুট। বিপিনের বাড়ীর কাছাকাছি গেছি, এমম সময় ঝুপ্-ঝুপ্ করে বৃষ্টি এলো, ভিজতে ভিজতে ওদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উঠলুম। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ফরাসের ওপর তিন মূর্তি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। চৌকীর পায়ার সঙ্গে বাঁধা ছাগ-নন্দন শীতে থরথর করে কাঁপছে।

নাড়ু বললে, "দেখেছিস্ ব্যাটাদের কাণ্ড দেখেছিস্?" এই বলে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সকলকে টেনে তুলল। কাঁচাঘুম ভাঙতেই তারা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললে, "কি—কি—কি হয়েছে?"

নাড়ু রেগে বললে, "হয়েছে আমার মাথা আর তোদের মুণ্ডু। পাঁঠাটাকে যে এখানে বেঁধে রেখেছিস্, তোদের এটা মাথায় এলো না যে, কেউ দেখলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে?"

বিপিন বললে, "তা কি করবো? আজকে রাত্তিরের মত অমনি থাকবে—কালকে যা হয় একটা ব্যবস্থা করলেই হবে।"

নাড়ু বললে, "হ্যাঁ, যাতে নাকি একেবারে হাতে-হাতে ধরা পড়ে যাও। সে সব কথা শুনতে চাইনে। আজকে এক্ষুণি খেতে হবে।" আমরা সব একসঙ্গে বলে উঠলুম, "আজকে—অসম্ভব!"

নাড়ু হেসে বললে, "তার মানেই সম্ভব।"

আমি বললুম, "প্রথম কথা—কাতা কৈ?"

বিপিন বললে, "কাতার জন্য আটকাবে না, পাশের ঘরেই আমাদের পাঁঠা বলি দেবার খড়্গ আছে।"

নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, "নিয়ে আয় কাতা।" তারপর নিজেই ছুটে গিয়ে

পাশের ঘর থেকে কাতাখানা বের করে নিয়ে এলো। হরিশের দিকে তাকিয়ে বললে, "হরিশ, নিয়ে আয় তো পাঁঠাটাকে জলের ধারে"—হরিশও অমনি সুবোধ বালকের মতো পাঁঠার দড়ি ধরে টানতে টানতে জলের ধারে নিয়ে চললো—

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "আহা-হা কর কি নাড়ু—শোনো।"—কিন্তু কার কথা কে শোনে ? নাড়ু ততক্ষণ পাঁঠার ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দিয়েছে !

বিপিন বললে, "তারপর এখন কি করা ?"

নাড়ু কাতাখানা রেখে বলল, "হরিশ , তোমার ওখানে ইক্-মিক্-কুকার আছে —আমি জানি—ওটা এক্ষুণি চাই।"

হরিশ বললে, "নৌকা নিয়ে গেলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসতে পারি।"

নাড়ু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নীলে, নৌকা নিয়ে ওর সঙ্গে যা।" তারপর বিপিনের দিকে ফিরে বললে, "বিন্দেকে জাগিয়ে আমার নাম করে চাল, ঘি, মশলা, —যা যা দরকার সব নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ মাংসটা ছাড়িয়ে ফেলি।

কাছেই একটা মুদির দোকান ছিল। রাত্তিরে বিন্দে বলে একটা ছোকরা দোকান ঘরে শুতো—নাড়ু তার কাছ থেকেই জিনিস পত্তর নিয়ে আসতে বললে।

বিপিন চলে গেল দোকানের উদ্দেশে, আমি আর হরিশ গিয়ে নায় উঠলুম। ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস। তার ওপর টিপটিপ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু উপায় নেই, পাঁঠার সৎগতি আজকেই করতে হবে, কালকে ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা। আর ঠাণ্ডায় পাঁঠার মাংস উপাদেয় সন্দেহ নেই।

ভাগ্যিস্ হরিশের পড়বার ঘরেই কুকারটা ছিল, নইলে অত রাত্তিরে ঐখানেই এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসতে হ'ত। ফিরে এসে দেখি, মাংস বানানো হয়ে গেছে, ছালটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিপিন আর অমর ঘাটে চাল ধুচ্ছে।

নাড়ু কুকার জ্বালিয়ে মাংস চাপিয়ে দিলে। তারপর সকলে কুকারের চারিদিকে ঘিরে বসে গরম হয়ে গল্প করতে লাগলুম।

নাড়ু বললে, "দেখলি বোকারা, শীতের রাত্তিরে কেমন গরম হবার উপায় বাতলে দিলুম। কালকে খেলে কি আর এত মজা হ'ত ?"

তার কথায় আমরা সকলে সায় দিলুম। ঠিক হ'ল আজকের রাত্তিরে বিপিনদের ওখানেই কাটাতে হবে। খেয়ে-দেয়ে আমরা যখন শুয়ে পড়লুম, তখন আড়াইটা বেজে গেছে। পরদিন খুব সকালে পাঁচজনে ঘুম থেকে উঠলুম।

অমরের বাড়িতে একটু ভয় ছিল। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীর বাঁধন আমরা তখন অনেকটা কাটিয়েছি। ততটা ভয় আমাদের ছিল না—বসে বসে বেশ গল্প জমিয়ে তুলেছিলুম। সামনেই ছাগ-নন্দনের ছালটা ঝুলছিল। তাই কালকের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথাই হচ্ছিল বেশী। এমন

সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে বললে, "সাবধান, পাঁঠা যে আমরা খেয়েছি, তা ওরা কি করে টের পেয়েছে, শুনলুম আমাদের এদিকে এক্ষুণি খোঁজ করতে আসবে।"

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লুম।

নাড়ু বললে, "কি করে টের পেলে তারা ?"

অমর বললে, "ওদের কে একজন প্রজা নাকি পাঁঠা আমাদের নৌকোয় তুলতে দেখেছিল—সেই গিয়ে বলে দিয়েছে।"

বিপিন তো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, "দাদা যদি টের পায় তো মেরে হাড় গুড়ো করে দেবে।"

অমর বোধহয় তখনো কাঁপছিল, এইবার খাটের ওপর চুপ করে বসে পড়ে বললে "কি হবে ভাই ? বাবা জানতে পারলে আমায় বাড়ী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।"

হরিশ লাফিয়ে উঠে বললে, "পাঁঠার ছালটা জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে আসি।"

নাড়ু শুধু বললে, "না।"

আমার মনের অবস্থাও যে নেহাৎ ভালো ছিল, তা বলতে পারিনে। বাড়ীতে জানতে পারলে যে রসগোল্লার বাটী এগিয়ে দেবে না, তা জানতুম। তাই নাড়ুকে বললুম, "ছাল ফেলতে তো মানা করলে, কিন্তু উপায় কি হবে ঠাউরেছ কি ?"

নাড়ু জবাব দিলে না, বিপিনের দিকে ফিরে শুধু বললে, "কালো জুতোর ব্রক্ষো আছে ?"

অমর এইবার কেঁদে ফেলে বললে, "নাড়ু তোমার কথায়ই আমরা এমনতর কাজ করলুম, এখন আমাদের বিপদের মাঝখানে ফেলে জুতোর ব্রক্ষোর খোঁজ করছ ? এই কি তোমার বেড়াবার সময় ? হয় তো তুমি পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ, কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হবে বল তো ?"

নাড়ু হা—হা—করে হেসে উঠল। ওর হাসি আমাদের কারো কানে ভালো লাগলো না। সকলেই নাড়ুর উপর চটে উঠলুম। অনেকটা নাড়ুরই আগ্রহে আমরা একাজে হাত দিয়েছিলুম, এখন ওর এমন ছাড়া ছাড়া ভাব দেখে সকলেই খুব দমে গেলুম।

নাড়ু অমরের পিঠ চাপড়ে বললে, "আরে পাগলা, ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? তোর কোনো ভয় নেই," এই বলে মায়ের মতো কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর বিপিনের দিকে আবার ফিরে বললে, "জুতোর কালো কালি থাকে তো নিয়ে আয় না—"

বিপিন একবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কালি আনতে ভেতরে চলে গেল। নাড়ুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস না পেলেও এটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না—হঠাৎ জুতোর কালির তার কি দরকার পড়ল!

বিপিন কালি নিয়ে আসতে নাড়ু কোনো কথা না বলে দেয়াল থেকে ছালটাকে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর জুতোর ব্রাসে কালি লাগিয়ে ছালটা ঘষতে শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে সাদা ছালটা একদম কুচকুচে কালো হয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে সকলে তার কাজ দেখলিলুম। এইবার শুধোলুম, "একি হচ্ছে নাড়ু?"

মুচকি হেসে, নাড়ু বললে, "দেখতেই পাবে।" কালি লাগিয়ে ছালটা আবার দেয়ালে ঝুলিয়েছে—তার একটু পরেই রায় বাবুদের গোমস্তা এসে ঘরে ঢুকলো।

আমাদের তখন একরকম হয়ে এসেছে। হাতে-হাতে ধরা পড়বার ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করছে—তার শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ওপর দিকে চাইবার সাহস পর্যন্ত তখন আমাদের কারো ছিল না।

লোকটা নাড়ুকে সামনে পেয়ে তার সঙ্গেই কথাবার্তা শুরু করল। শুধোলো, "তোমরা নাকি কাল রাত্তিরে একটা পাঁঠা নিয়ে এসেছ?"

নাড়ু ভালো মানুষটির মতো বললে, "হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আমরা একটা চড়ুই-ভাতির বন্দোবস্ত করেছিলুম—একটা পাঁঠাও মেরেছিলুম।"

বল্‌বামাত্রই—ছেলেটা স্বীকার করবে, ভদ্রলোক বোধ হয় ততটা আশা করেনি, তাই, প্রথমে অবাক হলেও সামলে নিয়ে চোখ গরম করে বললে, "কে তোমাদের পাঁঠা মারতে বললে—সে পাঁঠা আমাদের—"

নাড়ু যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, "আপনাদের পাঁঠা—কৈ না, আমরা তো পাঁঠা কাল হাট থেকে কিনে এনেছি" এই বলে আঙুল দিয়ে দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বললে, "ঐ দেখুন না—তার ছাল—"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ হাঁ-করে ছালটার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর বললে, "না, এটা তো আমাদের নয়, আমাদের পাঁঠার রং সাদা" বলে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাড়ু মুচকি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বললে, "দেখলি মজা! বিপ্‌নে তো সাত তাড়াতাড়ি ছালটা ফেলে দিতে চেয়েছিল।"

বাস্তবিক আমাদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না। এই মাত্র মস্তবড় একটা ভূত যেন আমাদের ঘাড় থেকে নেমে গেল।

অমর আনন্দে আত্মহারা। চোখ দুটো বড় বড় করে নাড়ুর হাত দুটো চেপে ধরে বললে, "সত্যি, তুই ভাই মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিস্—বাবা যদি কোনো

রকমে এই কাণ্ড জানতে পারতেন, তবে আমার আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোনো উপায় ছিল না।”

এই কথা শুনে নাডু হো-হো করে হেসে উঠলো।

অমর বললে, “হাসলি যে?”

নাডু হাসতে হাসতে বললে, “তোর আত্মহত্যার কথা শুনে।”

আমি বললুম, “কেন, তাতে হাসির এমন কি কথা আছে?”

নাডু মুখ টিপে বললে, “আমিও একবার করতে গিয়েছিলুম কিনা!”

একটু এগিয়ে এসে বললুম, “কি রকম?” নাডু বললে, “সে এক ভারী মজার গল্প।” যারা শুয়েছিল, গল্পের নামে উঠে ভালো হয়ে বসল। নাডু শুরু করল, “তবে শোন,—তখন আমার বয়স দশ এগারোর বেশী নয়—কি একটা দুষ্টুমি করার জন্যে মা আমায় ঘরে কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রেখেছিলেন, সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। বিকেল বেলা ঘর খুলে খাবার দিতেই থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—লাফিয়ে উঠোনে এসে বললুম, “আজ আমি জলে ডুবে মরবো।”

মা রেগে বললেন, “মরগে যা”—আমি ছুটে খিড়কির দোর দিয়ে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তখন বেশ সাঁতার জানতুম। যতই ডুবতে যাই, আমায় কে যেন ঠেলে ভাসিয়ে তোলে। চেয়ে দেখি, ওপরে দাঁড়িয়ে সকলে মজা দেখছে। মা-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন।

দেখে আমার রাগ হল আরো বেশী।

কী! আমি ডুবতে যাচ্ছি—আর সকলে মজা দেখছে! আরো বেশী করে ডুবতে লাগলাম। কিন্তু ফি বারেই ভেসে উঠি—ডোবা আর কিছুতেই হল না!

এমন রাগ হল আমার! ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গা নিজেই কামড়াই। করলুম কি, একবার ডুব দিয়ে ঘাটের তলায় এসে চুপটি করে বসে রইলুম। তক্তার ঘাট, ফাঁক দিয়ে সব দেখা যাচ্ছিল। মা যখন দেখলেন, এবার ডুব দিয়ে আর আমি উঠলুম না, তাঁর চোখ দুটো যেন ছল্‌ছলিয়ে উঠলো। পাশেই দাঁড়িয়েছিল আমাদের পুরোনো চাকর ভুলুয়া। মা তাকে জলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, “দ্যাখ তো ও গেল কোথায়।”

ভুলুয়া তো ডুবে ডুবে সারা। আমাকে আর খুঁজে পায় না, দেখি, মা পুকুর ধারে কাদার ভেতর থপ্‌ করে বসে পড়লেন। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল। আর থাকতেও পারলুম না।

হি-হি করে হেসে উঠলুম। ভুলুয়াটা আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাটের তলা থেকে হিড় হিড় করে আমায় টেনে বের করে উঁচু করে একেবারে উঠোনে এনে ফেললে। ঠিক এমনি সময় বাবা আপিস থেকে ফিরলেন। সব শুনে বাবা

আমার কানটা ধরে গালে গোটা কয়েক চড় মেরে বললেন, "হতভাগা ছেলে ফের এমন করবি ?" আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ মুছে বললুম, "না, আর কক্ষনো করবো না।"

নাড়ুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনে, ঘরে একটা হাসির তুফান এলো। মুচকি হেসে সে বলল, "কিন্তু সে দিন লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছিল আমার বেশী।"

বিপিন বললে, "কি রকম ?"

হাসতে হাসতে নাড়ু বললে, "বাবার হাতে দুটো চড় খেয়েছিলুম বটে, কিন্তু রাত্তিরে মা কোলে বসিয়ে এক বাটী রসগোল্লা খাইয়েছিলে। বেশ মনে আছে, একসঙ্গে অত রসগোল্লা আর কোনদিন খাইনি" বলে মুখ চোকাতে লাগলো। আমি বললুম, "বেশ বেশ, এই তো বীর পুরুষের লক্ষণ।" সেবারের মতো নাড়ুর কৃপায় আমাদের মস্তবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরের ব্যাপার। বিকেলবেলা খেলার মাঠে একটা হাডু-ডু প্রতিযোগিতা ছিল। খেলা হল পাশের গ্রামের ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। এই প্রতিযোগিতায় আমাদেরই জয় হয়েছে, এই জন্য মন মেজাজ সকলেরই ভালো ছিল।

সবাই নাড়ুকে ধরে বসল, "গরম রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।" নাড়ু হাসতে হাসতে জবাব দিলে, "বেশ খাওয়াতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।"

সবাই একযোগে হামলা করে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "শর্তটা কি শুনি ?"

"হুঁ-হুঁ—শুনলে উৎসাহ কমে যাবে।"

নাড়ু বাঁকা চোখে তাকিয়ে রসিকতা করে।

সকলের চোখ ততক্ষণে উৎসাহে গোলালু হয়ে উঠেছে। নাড়ু সবাইকার কৌতূহলের খোরাক দেয় আস্তে আস্তে ঃ—

"রসগোল্লার দোকানে একেবারে উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হবে। আমি দোকানিকে বলব, গরম গরম রসগোল্লা কড়া থেকে তুলেই তোদের মুখে ফেলে দিতে হবে! অবশ্যি তোরা সবাই সার দিয়ে হাঁ করে বসে থাকবি।"

অমর মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "না-না, তা কেমন করে হবে ?"

নাড়ু বোকা সাজবার ভান করে বললে, "কেন হবে না শুনি ? আলিবাবা আর চল্লিশ দস্যুর গল্প মনে নেই ? মর্জিনা কেমন করে জালার ভেতর গরম তেল ঢেলেছিল ? সেই রকমই গরম রসগোল্লা আর রস ঢালা হবে তোদের মুখে। অবশ্যি সহ্যশক্তির একটা পরীক্ষা দিতে হবে।" বিপিন ফোড়ন কেটে বললে, "হ্যাঁ, যদি প্রাণটা শেষ পর্যন্ত দেহ ছেড়ে পালিয়ে না যায়।"

নাড়ু হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "কেন, জিব চাইছে গরম রসগোল্লা, কিন্তু পরীক্ষা দেবার সাহস নেই কেন? তুয়ো!"

আমাদের এই হাসি মস্করার সহজ সুরে বাঁধা তার হঠাৎ ছিঁড়ে গেল মাঝিপাড়ার বিশ্বম্ভরের কান্নাকাটিতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "একি রে, বিশ্বম্ভর কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?"

বিশ্বম্ভর গামছার খুঁটে চোখ মুছে বললে, "দাঠাকুর, একটা লিখন এসেছে। কদ্দিন আগে খবর পেয়েছি আমার মেয়ের ভারী ব্যামো। তা এই লিখনটা কেউ পড়ে দিতে পারছে না পাড়াতে। লেখাপড়া তো কেউ জানে না! এই দু'মাস আগে আমি পুঁটির বিয়ে দিয়েছি। তুমি লিখনটা পড়ে দাও না···পুঁটি আমার বেঁচে আছে না মরে গেছে।" বুড়ো বিশ্বম্ভর ছোট ছেলের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। আমি চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে পড়লাম; তারপর বললাম, "তোমার মেয়ের শক্ত অসুখই বটে। আজই চলে যেতে লিখছে।"

বিশ্বম্ভরের চোখে-মুখে যেন একটা শেষ আশার আলো ফুটে উঠল। বললে, "এই দেখ! আজকের রেলগাড়ী ত' চলে গেল। সেই কালে আমার লিখনটি যদি কেউ পড়ে দিত, তবে আজকের গাড়ীতেই আমি চলে যেতে পারতুম দাঠাকুর! বুঝলে দাঠাকুর, পাড়ার একটা জোয়ান বেটা লেখাপড়ি জানে না, সব গো-মুখ্যু!"

আমি বললাম, "তুমি যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে নাও গে বিশ্বম্ভর। কাল সকালের ট্রেনেই চলে যেও।"

বিশ্বম্ভর উদাসভাবে বললে, "তা ত' যাবো বাবু। কিন্তু গিয়ে আমার পুঁটুর ধড়ে কি প্রাণটুকু দেখতে পাবো?"

বাঁ হাতের চেটো দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে চলে গেল।

বিশ্বম্ভর এই অঞ্চলের বহুকালের পুরোনো লোক। নৌকোর মাঝিগিরি করে পেট চালায়। সাচ্চা লোক। সবাইকার বিপদে-আপদে একেবারে বুক দিয়ে সে দাঁড়ায়। ওই একমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে তার আর কেউ নেই।

এমন একটা ভালো মানুষের বিপদের কথা শুনে আমাদের সকলকারই মুখের হাসি শুকিয়ে গেল।

হরিশ বললে, "আহা! মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে বেচারা একেবারে মুষড়ে পড়েছে। আমরা যদি কিছু চাঁদা তুলে ওর হাতে দিতে পারতাম, তবে এই দুঃসময়ে ভারী কাজে আসত।"

নাড়ু বললে, "সে প্রস্তাব অবিশ্যি খুবই ভালো। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা।"

আমি শুধোলাম, "কি রে?"

নাড়ু জবাব দিলে, "এই যে আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক চিঠিখানাও পড়তে পারে না···এতে আমাদের জীবনের কত ক্ষতি হয়ে যায়। বিশ্বম্ভর যদি সামান্য লেখাপড়া জানত, তবে আজকের ট্রেনেই সে রওনা হয়ে যেতে পারত··· আর তার মেয়ের রোগ-শয্যার পাশে পেঁাছে যেত। ভগবান না করুক—ও যদি গিয়ে ওর পুঁটুকে দেখতে না পায় ত' সারাজীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে। সত্যি ভাই অশিক্ষা আমাদের অমানুষ করে একেবারে জন্তু-জানোয়ার তৈরী করে রেখেছে।"

খানিকটা চুপ করে করে থাকবার পর হঠাৎ নাড়ুর চোখ দুটো যেন উৎসাহে জ্বলে উঠল। বললে, "আচ্ছা, আমরা সবাই মিলে ছুটির মধ্যে ত একটা ভালো কাজ করতে পারি ?"

অমর জিজ্ঞেস করলে, "কি সে ভালো কাজ ?"

নাড়ু প্রবল উৎসাহে বলতে লাগল, "ধর, আমরা যদি নিজেদের চেষ্টায় একটা নৈশ-বিদ্যালয় পাড়ার মধ্যে গড়ে তুলি, তবে যারা দিন মজুর—সন্ধ্যের পর এসে আমাদের কাছে লেখাপড়া শিখতে পারে। অন্ততঃ বই চিঠি পত্তর পড়তে পারবে··· আর নিজের নাম সইটা করতে শিখবে। এটুকু শিক্ষাও আমরা দিতে পারি।"

নাড়ুর এই প্রস্তাবটা আমাদের খুব ভালো লাগলো। হরিশ লাফিয়ে উঠে বললে, "এ ত' একটা কাজের মত কাজ। শহরে আমরা নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে নেতাদের মুখে এত বক্তৃতা শুনি···এই পল্লী অঞ্চলে আমরা সে ব্যাপারে বেশ খানিকটা কাজ করে যেতে পারি। তারপর ইস্কুলের ছেলেরা আমাদের পরিকল্পনাটা চালু রাখবে। প্রতি বছর নতুন কর্মী আমরা পাবো।"

আমি মাথা দুলিয়ে বললাম, "সবই ত' বুঝলাম। কিন্তু জানো ত' ভাই, ভালো কাজে বিঘ্ন অনেক। নৈশ-বিদ্যালয় আমরা বসাবো কোথায় ? প্রথমেই একটা আস্তানা চাই ত'—"।

নাড়ু বললে, "কেন ? আমাদের বাইরের উঠোনের ওপাশের ঘরটা ত' অমনি পড়ে আছে। ওখানেই আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি।"

অমর বললে, "কিন্তু কেরোসিন তেলেরও ত' দরকার আছে। সেটা মিলবে কোথা দেকে শুনি ?"

নাড়ু জবাব দিলে, "আমরা এক একদিন এক এক বাড়ী থেকে চাঁদা হিসেবে ওটা দেবো···সেটা কি কোন মতেই ব্যবস্থা করা যায় না !"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করা যাবে। ঘোড়া যদি পাওয়া গেল, তবে লাগামের জন্য আটকাবে না। শ্রীদুর্গা বলে কাল থেকেই তা'হলে আমরা কাজ শুরু করে দি।"

পরদিন সকালবেলা নাড়ুদের বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করে আমরা দল বেঁধে

মাঝিপাড়া, কৈবর্তপাড়া, মুসলমানপাড়া, তাঁতি, ছুতোর, কুমোরদের অঞ্চল টহল দিয়ে এলাম। এই ব্যাপারে একটি মুসলমান বন্ধুর কাছ থেকে আমরা খুব উৎসাহ পেলাম। ছেলেটির নাম আব্দুল। শহর অঞ্চলে কোনো একটা ইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ে। ছুটিতে তার মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

নাড়ুদের বাইরের ঘর দেখে সে খুশী হয়ে বললে, "শুধু নৈশ-বিদ্যালয় কেন ? আমরা এখানে একটি পাঠাগারও গড়ে তুলতে পারবো। তোমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ী থেকে পাঁচখানা করে বইও দাও…তবে একদিনেই আমরা পাঠাগার স্থাপন করতে পারি।"

নাড়ু বললে, "আমাদের ঘরে জায়গার অবিশ্যি অভাব হবে না ; কিন্তু গ্রন্থাগার গড়তে গেলে প্রথমেই দরকার একটি আলমারীর। নইলে বইগুলো এনে আমরা সাজাবো কোথায় ?"

ঠিক কথা ! আলমারী একটা না জুটলে লাইব্রেরীর পরিকল্পনাই যে ভেস্তে যাবে।

অমর এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলি গিলছিল। এইবার এগিয়ে এসে বললে, "আমাদের বাইরের ঘরে একটা কাঠের আলমারী অমনি পড়ে আছে…আরশুলারা দিব্যি বাসা করে রয়েছে সেখানে। তবে একটি দরজা তার ভাঙা।"

আব্দুল বললে, "কুচপরোয়া নেই। আলমারীটা আমাদের পাঠাগারে ব্যবহার করতে দিতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তবে ধরাধরি করে ওটাকে আমরা আজই নিয়ে আসবো।"

নাড়ু বললে, "আরো একটা কাজ আমরা করতে পারি। ছুতোরপাড়ার যে সব লোক সন্ধ্যের পর নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়তে আসবে, তাদের বলে-কয়ে আলমারীর দরজাটা সারিয়ে নেয়া খুব শক্ত হবে না।"

উৎসাহ যখন আন্তরিক হয়, তখন কোনো কাজই আটকায় না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা নৈশ-বিদ্যালয় আর পাঠাগার একই সঙ্গে উদ্বোধন করা হল। পাড়ার একজন উৎসাহী অভিভাবক ছোটদের কাজ দেখে খুশী হয়ে সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দেবেন।

ছেলেদের থেকেও বই নেহাত কম জুটল না। প্রত্যেক বাড়ীতেই গল্পের বই, ইতিহাসের কাহিনী, বিজ্ঞানের কথা, ছড়া ছবির বই খুঁজলেই পাওয়া যায়। যে বলেছিল পাঁচখানা বই দেবে—সে দশখানি এনে হাজির করল। বিভিন্ন বিভাগ আলাদা ভাবে সাজিয়ে সংখ্যা বসিয়ে আলমারীতে তুলে রাখা হল।

অমর বললে, "আমি হবো গ্রন্থাগারিক।" এতে কারোই আপত্তি হবার কথা নয়।

আব্দুল, নাড়ু আর আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়াতে শুরু করলাম।

আমাদেরও তাহলে ছাত্র জুটল।

এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বলতে হবে!

দু'দিন পর ছেলেদের কাছ থেকে আরো একটা প্রস্তাব এলো।

নাড়ুদের বাইরের ঘরের পেছন দিকে অনেকটা পতিত জমি ছিল।

বিপিন বললে, "আমরা এই জায়গাটা পরিষ্কার করে একটা ব্যায়ামাগার চালাতে পারি। রোজ সকালবেলা এসে আমরা সবাই এখানে ব্যায়াম করবো। লাইব্রেরীর ঘরে ছোলা ভেজানো আদা আর গুড় থাকবে। ব্যায়ামের পর ভারী উপকারী জিনিস।"

সবার একবাক্যে সম্মতি দেয়াতে মনে হল, কথাটা সবারই মনে ধরেছে।

কথায় বলে—ছেলের হাতে দা!

ওই যে অত জঙ্গল জমেছিল জমিটাতে······দু'দিনে একেবারে সাফ হয়ে গেল।

পাড়ায় দাদাদের বয়সী এক কলেজের ছেলে ব্যায়ামে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের উথলে-ওঠা উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। ফলে নৈশ-বিদ্যলয়, পাঠাগার আর ব্যায়ামাগার বেশ সুন্দরভাবে চলতে লাগলো।

স্থির হল, আমরা যখন থাকবো না, স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই প্রতিষ্ঠান-গুলি পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

* * *

সংগঠনমূলক কাজে ছুটিটা যে কি করে ফুরিয়ে এলো, তা মোটেই টের পাইনি—যখন টের পেলুম—ইস্কুল খোলবার তখন আর মোটে দু'দিন বাকি। ছুটি ফুরোলেই প্রমোশন। পরীক্ষা যে নেহাত খারাপ দিয়েছি তা নয়, আমাদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত—তার ওপর সোনায় সোহাগা—সারা বছর পণ্ডিতের সঙ্গে ছিল আমাদের আগুনে কাঁঠালের বীচির সম্পর্ক। কাজেই সংস্কৃতে আমাদের বেশ একটু ভয় ছিল।

সেদিন দুপুর বেলায় সময়টা আর কাটছিল না। গড়িয়ে, হাই তুলে গল্পের বই পড়ে, কিছুতেই না। হঠাৎ প্রমোশনের ভয় মাথায় ঢুকতেই আমাদের বোধ হয় এমনতর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। বাইরে আমরা যাই করি না কেন, প্রমোশন না পেলে বাড়ীতে অবস্থা যে নেহাত নিরাপদ থাকবে না, সে বেশ ভালো করেই জানতুম। আর জানতুম বলেই আমাদের এমন হেসে-খেলে-উড়িয়ে দেয়া দিনগুলো হঠাৎ যেন কেমন বিস্বাদ হয়ে উঠল।

নাড়ু একবার হাই তুলে বললে, “চল হে, পণ্ডিতের কাছ থেকে নম্বর জেনে আসা যাক্।”

কথাটায় সকলেই রাজী হলুম।

বিপিন বললে, “এই রোদ্দুরে ?”

আমরা সকলে মিলে তাকে টেনে তুলে বললাম, “আরে চল না হে জেনেই আসা যাক্ না—এখানে বসেই বা কি করবে শুনি ?”

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর—শীতকাল হলে কি হবে—হাঁটতে হাঁটতে ঘামে জামা ভিজে গেল—চোখ কান লাল হয়ে উঠল। পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলুম সূর্যিমামা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

রোদে পোড়া ঘাসের ওপর বসে পড়ে, জামা খুলে বাতাস খেতে খেতে বিপিন বললে, “কেন বাবা, বললুম তখুনি, খাসা বিকেলবেলা যাওয়া যাবে'খন, এখন কোথায় পণ্ডিত ? তিনি বোধ হয় আরামসে তাকিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। এদিকে তেষ্টায় প্রায় প্রাণ যাবার যোগাড় আর কি !”

তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললে, “ঝি—ও—ঝি।”

পাঁকাটির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরকার উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখি, কালো মিশমিশে মোটা একটি স্ত্রীলোক বিপিনের আচমকা ডাক শুনে, একহাত ঘোমটা টেনে ছুটে পালাচ্ছে।

নাড়ু জিব কেটে বললে, “ছি-ছি-ছি, কি করলি বল দেখি ?”

বিপিন বললে, “কেন ?—ঝিকে ডাকলুম তো !” নাড়ু ধমক দিয়ে বললে, “হ্যাঁ, ঝিকে ডাকলে বৈ কি ?—ও কে, তা জানো ?” বিপিন বললে, “কে আবার ?”

নাড়ু বললে, “বাঁচতে চাও যদি তো এক্ষুণি পালাও সব। উনি পণ্ডিত মশায়ের শ্বাশুড়ী।” বিপিন বললে, “অ্যাঁ ?”

আর অ্যাঁ ! যেমনি ও কথা শোনা—সক্কলে একেবারে চোঁচা দৌড় ছুট্-ছুট্-ছুট্, খেলার মাঠে পৌঁছুবার আগে একবারও ফিরে তাকাবার সাহস হয়নি আমাদের ! কেননা পণ্ডিতমশাই জানতে পারলে একেবারে হাতে মাথা কাটা যেত।

* * *

এত কাণ্ড করেও শেষটা আমরা পাশই করলুম। প্রমোশনের দিন হেডমাষ্টার মশাই আমাদের সকলের নামই ডাকলেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু শুধু পাশ করলেই তো হয় না—পাশ করেই ভাবনা এলো, এখন কোথায় পড়তে যাবো ?

গ্রামের ইস্কুলের পড়া ত আমাদের সাঙ্গ হল। আশে-পাশে আর ভালো ইংরাজী ইস্কুল নেই। কাছেই একটা ছোট্ট শহর। সেখানেই হয়ত যেতে হবে। আর

দলের সকলেই যে সেই শহরেই যাবে, তার তো কোনো মানে নেই। অনেকেই হয় তো অন্য কোনো জায়গায় আত্মীয়বাড়ী থেকে পড়বে—আবার দূরে যাবার ভয়ে হয় তো আমাদের কেউ কেউ পড়াই ছেড়ে দেবে। এমনতর অনেক কথাই আমাদের মনে আসতে লাগলো। দল ভেঙে যাবে, এই রকম একটা আশঙ্কায় আমরা একেবারে নুয়ে পড়লাম।

এ যে আরো হল ভালো। এখন দেখলুম, পাশের চাইতে ফেল করাই ছিল আমাদের ভালো। বিদায়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে এলো। দল থেকে খসতে খসতে শুধু বাকি রইলুম আমি আর নাড়ু। কেউ ভিন জায়গায় চলে গেল, অনেকেই পড়া ছেড়ে দিলে।

ঠিক হল, আমি আর নাড়ু কাছের ছোট্ট শহরটায় একই ইস্কুলে পড়ব আর থাকবো সেই ইস্কুলের বোর্ডিং-এ।

যাবার দিন চোখের জলের ভেতর দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকোয় উঠলুম। বিপিন ওরা সব হাঁটতে হাঁটতে আমাদের নৌকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির সঙ্গে চেনা যে জায়গাটা, তাকে ছেড়ে যেতে যে ব্যথা মনের কানায় কানায় ভরে উঠল, তা নিতান্ত আপনার জিনিস, বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই তো! আজ এই মুহূর্তে মনে হতে লাগল—এখানকার প্রত্যেকটি গাছ—প্রত্যেক পথের বাঁক—ঐ আমবাগান—শিউলিতলার ঐ বাঁধানো বেদীটা, কালীবাড়ীর আঙিনা—এমন কি, যে পাটক্ষেতের ভেতর ইস্কুল পালিয়ে লুকোচুরি খেলতুম—তারও প্রত্যেকটি পাতা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যেও না—তোমরা যেও না—তোমরা দুটিতে আমাদের মনের কোণে যে আসন পেতে নিয়েছ, তা পড়ে রইল কি শুধু চোখের জলে ভিজতে?—আরো ডাক শুনতে পেলাম। পলাশবনের মাথা—হাটখোলার বাঁক—চৌধুরীদের নাটমন্দির—যেন চোখ টিপে টিপে সরে পড়তে লাগল।

আজ মনে, কারো সঙ্গে বিবাদ রইল না আমাদের। পণ্ডিতমশাই,—চৌধুরীদের পাঁঠা চরাতো যে ছোঁড়া চাকরটা, ওপাড়ার বিশ্বনিন্দুক নসুঠাকুর,—এমনকি ইস্কুলের পাঙ্খাওয়ালা পর্যন্ত আজ আমাদের ভালো বলে ঠেকতে লাগলো—এবং তাদের হারানোকেও আমরা মস্ত বড় ক্ষতি বলে স্বীকার করে নিলুম।

* * *

হোস্টেলে আমরা দুজনে একটা ঘরেই জায়গা পেলুম।

এখানে এসে নাড়ু যেন একেবারে ভালো মানুষটি হয়ে গেল। কারোর সঙ্গে আলাপ নেই, দুজনে চুপচাপ ইস্কুলে গিয়ে এক কোণে বসি, আবার ছুটি হলে ধীরে

ধীরে হোস্টেলে ফিরে আসি। তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম।

চমৎকার নদী এখানকার। তরতরে বয়ে-যাওয়া নদীর ধার দিয়ে, শাড়ীর চওড়া পাড়ের মতো চলে গিয়েছে একটা লাল সুরকির রাস্তা। ঠিক যেন পটুয়ার আঁকা ছবিটি। আর রাস্তার দু'ধার দিয়ে লম্বা সার সার ঝাউগাছ। শীতের বাতাস নদীর জল কাঁপিয়ে, ঝাউগাছের পাতা দুলিয়ে শোঁ-শোঁ করে যখন চলে যায় বেশ লাগে কিন্তু।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যে হয় হয়। জ্যামিতিটা খুলে সোমবারের পড়াটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম। নাড়ু খাট থেকে উঠে বললে, "সন্ধ্যেবেলা আবার পড়া কি রে ? চল নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

নেহাত আপত্তি ছিল না। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে বললুম, "চলো।" দুজনে যখন হোস্টেল ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লুম, তখন জ্যোৎস্না উঠে গেছে।

শীতের শেষটা। বাতাস ঠাণ্ডা হলেও বেশ মিষ্টি লাগছিল। নদীর ঢেউগুলো টুকরো-টুকরো চাঁদ বুকে নিয়ে পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছিল।

আমরা এগিয়ে চললুম। আরো খানিকটা যেতেই দেখলুম, নদীর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও যেখানটায় বেঁকে গেছে, সেই মোড়ের মাথায় ভয়ানক ভিড়।

নাড়ু বললে, "চল্ তো দেখি ওখানটায় কি হচ্ছে ?" দুজন ভিড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখি, সে এক মজার ব্যাপার। একটা ফিরিঙ্গি সাহেব ভয়ানক মদ খেয়ে মাতলামী শুরু করে দিয়েছে। নদীর কিনারায় এমন জায়গায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে যে, আর একটু হলেই একদম নদীর তলায় ! দেখলুম ফিরিঙ্গীটা একটা পা তুলে সুর করে গাইছে।—ওড়বার ভঙ্গীতে—

If the bird can fly
Pray, why can't I ?

তারপর করলে কি, হাত পা তুলে নদীতে এক লাফ !

যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, সকলেই হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কেউ তাকে এগিয়ে ধরতে গেল না। পলক ফেলতে নাড়ু কোটটা আমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ল। আমি তাকে ধরতে কিম্বা মানা করতেও সময় পেলাম না।

সকলে হায় হায় করে উঠল ! নদীতে বেশ স্রোত। তাছাড়া ঐটুকু ছেলে কি করে একটা মাতালকে টেনে তুলবে ? আর যদিই বা সে সাহেবটাকে টেনে ধরে— তবে সেও তো প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে ? তখন দুটো সুদ্ধ মারা যাবে যে ! এমন অনেক কথাই সকলে বলাবলি করতে লাগলো।

আমি যেন আর আমাতে ছিলুম না। মাথাটা কেমন ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো, নদীর দিকে তাকাবারও সাহস রইল না আমার। রাস্তার ওপরেই বসে পড়লুম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে বললে, "ও ছোকরা তোমার কে হয় বাছা ?"

আমি বললুম, "ভাই।"

ভদ্রলোক বললেন, "এই রাস্তা ধরে বরাবর ভাটীর দিকে চলে যাও—খানিক গিয়ে ভেসে উঠবে, ভয় কি ?" তিনি চলে গেলেন।

মনে মনে ভাবলুম ভাই নয় বটে, কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী। আরো খানিকটা বসে রইলুম—আমার চলবার শক্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। যখন উঠলুম, সেখানে তখন আর কেউ ছিল না। চেয়ে দেখি, সব লোক মজা দেখতে ভাটীর দিকে ছুটছে। আস্তে আস্তে উঠে আমিও রওনা হলুম। দেখলুম, লোকগুলো ছুটে চলেছে, আগে-আরো আগে। নদীর দিকে চেয়ে দেখলুম, ঐ দূরে কি একটা ভেসে যাচ্ছে না! ছুটে চললুম—হ্যাঁ নাড়ুই বটে! আরো খানিকটা এগোতে ওকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে নাড়ু একেবারে নদীর ধারে ছিটকে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলুম। দেখি নাড়ুর চোখ লাল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে শুধু তার রাঙা চোখ দুটো আমার মুখের উপর তুলে ধরে বললে, "ভাই ধরেছিলুম ঠিক তাকে, কিন্তু রাখতে পারলুম না," বলেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে নাড়ুকে হোস্টেলে নিয়ে এলুম।

তারপর অনেক রাত্রে তার জ্ঞান হয়েছিল। বেশ মনে আছে, এরপর দু'দিন সে কারো সঙ্গে কথাটি কয়নি—গুম হয়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে আমাকে বলত, "বেচারী প্রাণের ভয়ে আমায় এত জোরে আঁকড়ে ধরলে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। একটা প্রাণ আমি চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলুম না—নীলে।"

নাড়ুর মরা প্রাণে আবার যে জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো, তার নাম সত্য। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। অন্য কোথাও পড়ত সে, তার বাবা এখানে বদলি হওয়াতে, আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হল।

সত্যের একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেছি যে, সে কখনও হাসতে ভোলেনি। হাসি ছিল যেন তার গাছের বারমেসে ফল। নিজেও যেমন হাসতে পারতো, পরকে হাসাবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

এক একজনের কথাবার্তা সে এমন নকল করে বলতে পারতো যে, চোখ বুজে শুনলেই মনে হতো—যার নকল করা হচ্ছে, কথা বলছে যেন সেই। গলার আওয়াজ পর্যন্ত সে এমন হুবহু ধরে ফেলতো যে—অবাক্ কাণ্ড!

একদিন টিফিনের সময় ক্লাশে বেশ জোর আসর বসে গেছে। নাড়ু বললে, 'আচ্ছা সত্য, তুই তো ক্লাসের সকলকার কথাই নকল করতে পারিস্! হেডমাষ্টারের কথা নকল কর দেখি? তবে বুঝবো তোর কেরামতি!"

সত্য হেসে বলল, "তবে দেখবি মজা?" এই বলে দু'হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে মোটা গলায় ডাকলে—"দপ্তরী—দপ্তরী—!"

ঠিক হেডমাষ্টারের গলা! পাশেই দপ্তরীর একটা ছোট্ট ঘর। ডাক শুনে সে ছুটে এসে ক্লাসে ঢুকলো। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হেডমাষ্টারকে না দেখতে পেয়ে দপ্তরী ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ছুটির পর বেরোতেই দেখি গেটের সামনে হেডমাষ্টার নিজে দাঁড়িয়ে। পাশে ইস্কুলের দপ্তরী। মাষ্টার মশাই আমাদের ডেকে বললেন, "তোমাদের ক্লাসে কে নাকি আমার গলা নকল করে কথা কইতে পার?"

বুঝলুম, এ দপ্তরী ব্যাটার কাজ।

কাউকে কিছু বলতে হল না—সত্য এগিয়ে গিয়ে বললে, "হ্যাঁ স্যার, আপনি যা বলছেন, সে কথা ঠিক। আর সে কাজ আমিই করেছি!" হেডমাষ্টার আমাদের ডেকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলুম, সত্যকে ফাইন দিতে হবে।

হেডমাষ্টার ভেতরকার দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর সব মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ছেলেটি নাকি আমার কথা নকল করে কইতে পারে।" তারপর সত্যকে বললেন, "কি বলছিলে বলতো?"

আশ্চর্য এই যে সত্য একটুও দমলে না। সে দপ্তরীকে ডাকা—হেডমাষ্টার কি করে পড়ান—কি করে মাষ্টারদের সঙ্গে কথা বলেন, পড়াতে-পড়াতে Silence বলে চ্যাঁচানো—হুবহু সব নকল করে বলে গেল।

মাষ্টাররা সব দেখি রাগে ফুলছে। হেডমাষ্টার কিন্তু হেসেই খুন। হাসি থামলে, সত্যকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "গুণের আদর না করার মতো মূর্খতা আর নেই," এই বলে তিনি নিজের হাত থেকে সোনার ঘড়িটা খুলে সত্যের হাতে পরিয়ে দিলেন।

আমরা হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি এসে পড়ল। আমি আর নাড়ু আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। খবর পেয়ে আমাদের দলের সব দেখা করতে ছুটে এলো। যারা বাইরে পড়তে গিয়েছিল, তারাও আস্তে আস্তে জুটল। আবার আসর গুলজার হয়ে উঠল।

অমর একদিন এসে বললে, "এ রকমভাবে দু'মাস কি করে কাটবে? চল, একটা কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাক।" হরিশ টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে

বললে, "হ্যাঁ, নূতন কিছু করতে হয়তো চল পায়ে হেঁটে কাশ্মীর। দিব্যি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে পাঞ্জাব অবধি যাওয়া যাবে।"

নাড়ু হেসে বললে, "কাশ্মীর যাবে তোমরা ?" আমি বললুম, "কেন হবে না—ইচ্ছা থাকলেই হয়।" বিপিন বেশ একটু পেটুক। সে মাথা নেড়ে বললে, "না হে না, ও কাশ্মীর-টাশ্মীর ছেড়ে দাও। তার চাইতে চল, রাত্তিরে ভট্টাচাজ্ পাড়ায়। দিব্যি তাদের কলাবাগানে এক কাঁদি কলা পুরুষ্টু হয়ে আছে, খাসা নষ্টচন্দ্র হবে'খন।"

নাড়ু হেসে বললে, "হ্যাঁ, এ জিনিসটা ঠিক কাশ্মীর যাওয়ার মতো শোনাচ্ছে না বটে। তা আপত্তি নেই আমার।"

পেটুক বলে বিপিনের একটা বদনাম আছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় রাজী হলুম সক্কলেই। কথাবার্তা রইল—আসছে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের ভেতর আমাদের রাতের অভিযান শেষ করা হবে। আমার ওপরেই সক্কলকে ডেকে নাড়ুদের বাসায় হাজির হওয়ার ভার ছিল। দলবল নিয়ে যখন ওর বাসায় গিয়ে পৌঁছলুম, সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। বাইরের ঘরটায় কেউ কোথাও নেই, ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ীর ভেতর খবর পাঠিয়ে জানলুম, নাড়ু খেতে বসেছে। খানিক বাদে নাড়ু এলো জামা-কাপড় পরে, হাতে একটা ইউকালিপ্‌টাস অয়েলের শিশি। সবাইকে ইউকালিপটাস্ অয়েল মাখিয়ে দিতে দিতে বললে, "যাবো সেখানে এটা ঠিক, কিন্তু যে জন্য যাওয়ার কথা ছিল—সে উদ্দেশ্যে নয়।" আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বল দেখি—ব্যাপারটা কি শুনিই না ?"

নাড়ু বললে, "ভট্টচাজ্-বাড়ীর কলাবাগানের চারিদিকে উঁচু দেয়াল তো ? তাই কোন্ দিক দিয়ে বাগানে ঢোকা সুবিধে হবে, সেইটে দেখবার জন্য বিকেলে ঐ দিকটায় একবার গিয়েছিলাম।"

আমি বললুম, "তারপর ?"

নাড়ু বললে, "মালী ব্যাটার সঙ্গে আলাপ করে জানলুম, ও বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটার আজ দুপুর থেকে কলেরা হয়েছে—কিন্তু বাড়ীতে দেখবার নাকি কেউ নেই।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, "আমি বলে এসেছি, সব পালা করে রাত্তিরে থাকবো ওখানে।" আমাদের দিকে চেয়ে বললে, "কেমন, রাজী আছ তো তোমরা সব ?"

এ অবস্থায় কেউ কি মুখ ফুটে বলতে পারে, পারবো না ? আমরাও বললুম না। যেখানে ভক্ষক হতে যাচ্ছিলুম—রক্ষক হয়ে ঢুকতে যে একটুও পা কাঁপেনি, তা বলতে পারিনে।

তারপর নাড়ুর সে রাত জেগে সেবা করবার কথা—না হয় নাই বললুম। সেবা কি করে করতে হয়, তা চোখের সামনে এতদিন এমন ভাবে এসে ধরা দেয়নি। পুরস্কারের আশা না রেখে সেই যে রাঁতের পর রাত প্রাণপাত পরিশ্রম—আমার ত' মনে হয়—তা' শুধু নাড়ু বলেই সম্ভব হয়েছিল। এ কেবল যে দেখেছে, তার আপনার মনে গেঁথে রাখবার মতো, বাইরের বিজ্ঞাপনের ধার সে ধারে না। বেশ মনে আছে ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে তাকে একদিন চুপিচুপি বলেছিলাম, "নাড়ু, এসো আমরা একটা সেবক সমিতি খুলি, নিঃস্বের সেবাই হবে সেই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিয়ে আমরা কেউ করবো না, আজীবন আমাদের পরের জন্যই কাটবে।"

এমনিতর ছোটখাটো বক্তৃতাও একটা দিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সে কথা মনে আনতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। নাড়ু আমার হাতটা তার হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছিল, "কাজ কি ভাই আমাদের নামের গেরোতে, মনটা যদি চিরদিন এমনি থাকে তো আপনার কর্তব্য কোনো দিনই ভুলবো না।"

এর দিন তিনেক পরের ঘটনা। ছুটির ভেতর বাড়ীতে যে অংকগুলি করে নিয়ে যাবার কথা ছিল, হিসেব করে দেখা গেল, তার একটিতেও হাত দেওয়া হয়নি!

লেখাপড়ায় ফাঁকি দিচ্ছি আর নিজেই ফাঁকিতে পড়ছি···এই রকম একটা ভাব মনে জাগতে ভারী অনুশোচনা এলো। ঠিক করলাম···আজ অর্ধেক অংক শেষ করে ফেলবো। সেই মতলব নিয়ে খাতা পেন্‌সিল সহ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে মাদুর পেতে বসেছিলাম সন্ধ্যেবেলায়। কিন্তু তার কি যো আছে?

কানে এলো নাড়ুর ডাক, "নীলে, বাড়ী আছিস নাকি?" মা সরস্বতীর আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হতে খাতা পেন্‌সিল ফেলে রেখে উঠে পড়লাম।

নাড়ু কোনো রকম ভূমিকা না করেই বললে, "একটা ভারী মুশকিলে পড়া গেছে —তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বেরুতে হবে যে।"

নাড়ুর মুশকিল যখন, তখন ব্যাপারটা জটিলই বুঝতে হবে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে এতক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, এইবার একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিলাম "ভনিতা রেখে আসল ব্যাপারটা কি তাই বলত? কোনো দুষ্টু মতলব যদি মগজে এসে থাকে, তবে কিন্তু আমাকে বাদ দিতে হবে। আজ অংকগুলো কষে না ফেললেই নয়।" নাড়ু বললে, "অংক না হয় একদিন পরে করলেও চলবে, কিন্তু হরিদাসী পিসির শবদেহটা ত' আর ঘরে পচতে পারে না। তার একটা সদ্‌গতির ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হয়।" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "হরিদাসী পিসী কি মারা গেছে নাকি? কালকেও ত' তার ভাজা মুড়ি খেয়েছি।"

এইখানে হরিদাসী পিসীর একটা পরিচয় দেয়া দরকার। হরিদাসী পিসীর পরিচয়, সত্যি কথা বলতে কি, কেউ জানে না—কবে থেকে যে হরিদাসী পিসী এই অঞ্চলের একান্তে একটি কুঁড়ে বেঁধে বসবাস করছে, তা আমাদের বাবা-কাকা-দাদারাও হিসেব করে বলতে পারবে না।

এই সরকারী পিসীকে কে না চেনে? চেনবার জন্য একটা মুখরোচক কারণ আছে। অমন মুচ্‌মুচে মুড়ি এ তল্লাটে আর কেউ ভাজতে পারে না···তাই হরিদাসী পিসীর এত নামডাক। বর্ষাকালে গল্পের আসর জমাতে হলে হরিদাসী পিসীর মুড়ি আর ফুটকড়াই ভাজা তেল লংকার সঙ্গে যে আমেজ সৃষ্টি করে—বাদশাহী পোলাও, মাংস তার কাছে হার মেনে যায়। তাছাড়া ছেলেমহলে পিসীর দারুণ পসার। টিফিনের ঘণ্টা পড়লে হরিদাসী পিসীর মুড়ি-মুড়কি সোনার দরে বিকোয়। এহেন হরিদাসী পিসী আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে শুনে, সত্যি হকচকিয়ে গেলাম।

আমাদের স্কুলঘরের পাশে যে বিরাট বটগাছ আছে, লোকে জানে সেটা স্কুলের একটা অংশ। ওর ছায়া-ঢাকা অঞ্চলটি বাদ দিয়ে আমরা ইস্কুলের কথা ভাবতে পারিনে। তেমনি হরিদাসী পিসীও আমাদের ছোটদের জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গেছে। শোনা যায় যে, পিসী মুড়ি-মুড়কি বিক্রী করে অনেক টাকা করেছিল। আর তার এক দেওর তাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের ছেলেদের মায়াতেই হোক আর ইস্কুলটাকে ছেড়ে যেতে পারে না বলেই হোক—আমাদের হরিদাসী পিসী চিরটা কাল এখানেই রয়ে গেছে। হরিদাসী পিসীর চেহারা আমরা চিরটা কাল এক রকম দেখে আসছি তাতে জোয়ার ভাঁটা নেই। দেখা হলেই একগাল হাসি হেসে একমুঠ মুড়ি পকেটে গুঁজে দেবে, তার জন্যে অবিশ্যি কোনো কালেই পয়সা চাইবে না! ছোটদের একেবারে অন্তর দিয়ে ভালো না বাসলে কেউ অমন করে দেখা হলেই হাসতে পারে না।

সেই হরিদাসী পিসী মরে গেছে শুনে সত্যি খুব কষ্ট হল।

নাড়ু ধমক নিয়ে বললে, "অমন করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। পিসী কোন্ জাতের লোক, জানা নেই বলে নাকি তাকে পোড়াতে কেউ রাজী হয় নি। ছুতোরপাড়া, কামারপাড়া, ধোপাপাড়া, কৈবর্তপাড়া সবাইকে খবর দেয়া হয়েছিল—কিন্তু সব অঞ্চলের মোড়লরাই মুখ মুছে অস্বীকার করেছে! কিন্তু আমরা ছেলের দল ত' জাত-বিচার নিয়ে বসে থাকতে পারিনে।

এইবার যেন আমি চেতনা ফিরে পেলাম। বললাম, 'সত্যি কথাই ত'। হরিদাসী পিসী আমাদের নিজের পিসীর চাইতে এতটুকুও কম নয়। তার জাত যাই থাক···আমাদের ওপর তার স্নেহ ত' কম ছিল না।"

কাঁধে একটা গামছা তুলে নিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আমি একবার মাকে বলে আসি। আমি জানি মা একাজে কখনই বারণ করবে না। কতবার দেখেছি, হরিদাসী পিসীকে নিজের পুরোনো শাড়ী দিয়ে দিয়েছে—আর পিসী দু'হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেছে।"

নাড়ু বললে, "সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আর বেশী রাত করা ঠিক হবে না। লোকজন যোগাড় করে নিতে হবে ত'।" আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, "সে জন্য আর ভাবনা কি রে? আমাদের ব্যায়ামাগারের দলকে ডেকে নিলেই সব সমস্যা চুকে যাবে। নাই বা এলো সব সমাজপতির দল।"

নাড়ু বললে, "আমিও ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিলাম।"

মার কাছে অনুমতি নিয়ে আমি আর নাড়ু যখন সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম —তখন অন্ধকার ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকির দল লাখো লাখো আগুনের হরির লুট ছড়াচ্ছে। বিপিনটা বেশ গোঁয়ার গোবিন্দ আছে। তাই আমরা প্রথমেই ওর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। একটা চলতি কথা আছে—

"পাগলা ভাত খাবি?"
"না, আঁচাব কোথায়?"

আমাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে নিয়েই, একটা মোটা তোয়ালে কাঁধে ফেললে, তারপর বললে, "চল, আগে হরিশটাকে ঘাড় ধরে বের করে নিয়ে আসি।" এমনিভাবে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী করে—হারাধনের দশটি ছেলে না হোক্—জনা আষ্টেক আমরা জুটে গেলাম।

আরো কয়েকটি ছেলে জোটাবার আশায় আমরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ পাড়ার জনার্দন জ্যাঠামশাই আমাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন।

বললেন, "দেখ বাবাজীরা, তোমাদের একটা কথা বলি। তোমরা সব বামুন, বদ্যি, কায়েতের ঘরের ছেলে হয়ে একটা অজাত-কুজাতের স্ত্রীলোকের মড়া পুড়িয়ে আসবে—এটা মোটেই ভালো কথা নয়।"

নাড়ু বললে, "তা'হলে আমাদের কি করতে বলেন?" জনার্দন জ্যাঠামশাই চশমাটা চাদরের খুঁটে একবার মুছে নিয়ে বললেন, "বাবা, ডোমদের খবর দাও— তারাই এসে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তোমরা ওসব নোংরা কাজ করতে যাবে কেন শুনি? যাও—যাও, যে যার ঘরে ফিরে যাও। তোমাদের বাপ-মারাও যে কেমন বুঝতে পারিনে। এই অন্ধকার রাত্তিরে নোংরা কাজ করতে তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে।"

বিপিনটা চিরকালই একটু গোঁয়ার গোবিন্দ। একটু এগিয়ে এসে বললে, "দেখুন জ্যাঠামশাই, হরিদাসী পিসীর হাতে ভাজা মুড়ি-মুড়কি আপনার বাড়ীর ছেলে-

মেয়েরাও বড় কম খেতো না। সেই মুড়ি যদি সবাইকার মুখে উঠতে পারে, তার শবটারই বা সৎকার হবে না কেন? আর আপনিও ত' সারা জীবন ধরে দেখেছেন যে পিসী এমন কোনো নোংরা কাজ করেনি, যার জন্যে তার শবদেহটা ডোমে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে? আমরা তা হলে রয়েছি কিসের জন্য? তার মুড়িটাই না হয় আমরা দাম দিয়ে খেতাম, কিন্তু তার স্নেহটা।"

জনার্দন জ্যাঠা বিপিনের মুখে একসঙ্গে এতগুলি কথা শুনে খানিকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে শুধু মন্তব্য করলেন, "অর্বাচীন!"

বাঁশ কেটে খাট তৈরী করে তার ওপর হরিদাসী পিসীর শব বেঁধে নিয়ে আমরা যখন শ্মশানের পথে রওনা হলাম, তখন লক্ষ্মীপ্যাঁচা দুই প্রহরের ডাক ডাকছে।

আমাদের অঞ্চল থেকে নদীর ধারের মড়া পোড়ার ঘাট বেশ দূরের পথ। কাঁধ বদলে বদলে ওখানে গিয়ে পৌঁছুতেও কম সময় লাগলো না।

পৌঁছেই নাড়ু বললে, "আমাদের কিন্তু বিশ্রাম করবার সময় নেই। মরা গাছের ডাল আর বাঁশ কেটে আনতে হবে।" পাড়াগাঁয়ে এই একটা মস্ত বড় সুবিধে···কার গাছের ডাল কে তুলে নিচ্ছে, তার কিছু হিসেব থাকে না। বিশেষ করে শ্মশান অঞ্চলে।

বিপিন বললে, "নীলে, মড়া ছুঁয়ে বসে থাক্···আমরা দল বেঁধে গিয়ে গাছের ডাল আর বাঁশ কেটে নিয়ে আসি।" আমরা বুদ্ধি করে অমরদের বাড়ী থেকে দা আর কুড়ুল বেঁধে নিয়ে এসেছি। তারপর ডালগুলো ত' বয়েও নিয়ে আসতে হবে। কাজেই লোকজনের দরকার।

ওরা যখন দল বেঁধে চলে গেল······তখন কোনো কথাই মনে আসেনি। এইবার জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যেতে···গা-টা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করতে লাগলো।

দূরে একটা শেয়াল আচম্‌কা ডেকে উঠল। আমরা এ যুগের ছেলে—ভূতকে বিশ্বাস করি না। বলি, চোখের ভুল দেখা।

কিন্তু শ্মশানের মতো জায়গায় এমনভাবে একলা মড়া আগলে ত' কখনো বসে থাকিনি! দশজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বদ্ধ ঘরে ভূতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া চলে। কিন্তু ফাঁকা আর জনমানবহীন অন্ধকার জায়গাগুলোতে ভয় যেন ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে বসে থাকে···মানুষকে একলা পেলেই তার মনের ওপর লাফিয়ে পড়ে। হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে দেখি, আমার আশে-পাশে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। এই সময় সাদা খাতার পাতায় যে অবস্থা দাঁড়ায়, আমার মনের ভেতরে আর বাইরে ঠিক তেমনিভাবে যেন মা কালী তার রাশি রাশি কালো চুল এলো করে দাঁড়ালো।

মাথার ওপরে আবার কিসের শব্দ? তাকিয়ে দেখি, অনেকগুলো বাদুড় ক্রমাগত ডানা ঝটপট করছে।

চারদিক থেকে হাওয়া হু-হু করে ছুটে এলো। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম—ভূত নয়, ঝড় আসছে! ওরা দল বেঁধে এই অন্ধকারের মধ্যে যে কতদূরে কাঠ কাটতে গেছে, তা ঠাহর করাও ত' মুশকিল। ডাকলে যে সাড়া পাওয়া যাবে, তা মনে হয় না। তবু প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলাম "নাড়ু—বিপিন—হরিশ—"

কিন্তু হু-হু করছে শ্মশানের পাগলা হাওয়া! কে সাড়া দেবে? আর শুধু ঝড়ই ত' নয়—তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কাছেই একটা খড়ের চালা ছিল।

হরিদাসী পিসীর শবটা বাঁশের খাটিয়ার সঙ্গে শক্ত করে বঁধা। প্রাণপণে টানতে টানতে সেই চালার ভেতর নিয়ে গিয়ে হাজির করলাম।

কি করে যে আমার অমন অসুরের মতো শক্তি এলো, আজ ভাবতে বসলে অবাক হয়ে যাই। তবু মনের জোর যে আমার চিরদিনই খুব বেশী, সেটা বন্ধু-বান্ধবেরা আড়ালে শুনতে পাই স্বীকার করে।

তারপর আরো ঘণ্টাখানেক ঐভাবে কাটবার পর জল-ঝড়ের মধ্যে যখন নাড়ু আমার নাম ধরে ডাকছে শুনতে পেলাম, তখন মনে হল—প্রেতলোক থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম! সেইদিনকার সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রের কথা জীবনে ভুলতে পারবো না। হরিদাসী পিসী যেমন আমাদের স্নেহ করত···তেমনি জীবনে একটি শিক্ষা দিয়ে গেছে। মানুষ-ভূতের ভয় যদি বা আজও করি—আসল ভূত-প্রেতের আতঙ্ক সেই কাল রাত থেকেই জয় করে নিয়েছি!

ওদিকে ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের বন্ধ হয়েছিল যেমন অন্য সব ইস্কুলের আগে, খুললোও তেমনি সকালে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জ্যৈষ্ঠের শেষা-শেষি আমরা আবার ভালো ছেলে সেজে—সরস্বতীর বরপুত্র 'হবার আশায়'—ইস্কুলে ছুটলুম। গিয়ে দেখি, ইস্কুলের বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের আগেকার হেডমাস্টারমশাই চলে গেছেন বদলি হয়ে, আর তাঁর জায়গা দখল করছেন, মোটা কালো কুচকুচে ভুঁড়িওয়ালা এক বুড়ো মাস্টার। দু'দিনের ব্যবহারেই বেশ বুঝতে পারলুম, হেডমাস্টারমশাই অযথা ভুঁড়িটির ভার বয়ে বেড়ান না। ওটি তাঁর দুষ্ট বুদ্ধি জমিয়ে রাখবার থলি বিশেষ।

* * *

একদিন বিকেলবেলা আমরা ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলে নদীর ধারে বসে বেশ জটলা করছিলাম, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, সাক্ষাৎ যমদূতের মতো হেডমাস্টার মশাই তাঁর মোটা লাঠি হাতে করে—ভুঁড়ি বাগিয়ে কখন থেকে আমাদের পেছনে এসে

দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় তাকাতে দেখে মোটা গলায় বললেন, "এখানে কি কচ্ছ তোমরা?" সকলেই পেছন ফিরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। আমরা কি বেড়াবার অধিকারও হারিয়ে বসলাম তাঁর আমলে?

কথার জবাব দিলে নাড়ু। সে বললে, "নদীর হাওয়া খাচ্ছি স্যার!" হেডমাষ্টার তাঁর ছড়ি ঘুরিয়ে মোটা গলায় বললেন, "না, এখানে এরকম ভাবে আড্ডা দেয়া চলবে না তোমাদের।"—এই বলে আর একদিকে চলে গেলেন।

ভালো রে ভালো! নদীর ধারে বেড়াব—তাতেও মাষ্টারী।

নাড়ু বললে, "হ্যাঁ, শক্তের ভক্ত, নরমের যম—রোসো, বাছাধনকে একটু মজা দেখাতে হচ্ছে।"

পরদিন ইস্কুল ছুটির পর নাড়ু আমাদের চুপিচুপি ডেকে নিয়ে শুধোলে, "কি রে কিছু বুঝতে পারলি?"

আমি বললুম, "কিসের কি?"

নাড়ু বললে, "দূর বোকা! হেডমাষ্টার আমাদের পিছনে চর লাগিয়েছে, তা' জানিস?"

সত্য যেন আকাশ থেকে পড়ে বললে, "চর কি রকম?"

নাড়ু হেসে বললে, "আর কি রকম। টিফিনের ঘণ্টায় হেডমাষ্টারের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘরের ভিতর ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ শুনে জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, দুটো ছেলেকে হেডমাষ্টার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে বলছেন—আর আমরা কখন কি করি, সব সময় পেছন পেছন থেকে তা' জেনে, হেডমাষ্টারকে বলতে হবে।"

আমি বললুম, "তার মানে? আমরা কি চোর না ডাকাত?"

নাড়ু বললে, "চোর হই, আর ডাকাতই হই, মোট কথা, আমাদের পেছনে ফেউ লেগেছে।"

সত্য বললে, "ছেলে দুটো কোন্ ক্লাসের বল্‌তে পারিস?"

নাড়ু চোখ বুজে একটু মাথা চুলকে বললে, "বোধ হয় ফার্ষ্ট ক্লাসের হবে। তবে এটা ঠিক, ওদের শায়েস্তা না করলে চলছে না।"

সত্য বললে, "নিশ্চয়ই।"

নাড়ু বললে, "তোরা খেয়ে-দেয়ে নদীর ধারে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবি। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।" তিনজনে যখন নদীর ধারে মিললুম তখনও একটু বেলা আছে।

নাড়ু বললে, "চল এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।" আমি বললুম, "কোথায়?" নাড়ু বললে, "আয় না আমার সঙ্গে।"

নদীর রাস্তা ছেড়ে পুরোনোবাগের রাস্তা ধরলুম। শহরের শেষটায় একটা পোড়ো জায়গা, লোকের বসতি নেই—জায়গাটা একেবারে জঙ্গলে ভর্তি। প্রবাদ আছে, কোনও কালে নাকি নামকরা এক জমিদার ছিল এইখানটায়। তার অত্যাচারে প্রজারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শেষটা আর টিকতে না পেরে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে রাতারাতি জমিদার-বাড়ি চড়াও করে সবাইকে খুন করে ফেলে। বংশে বাতি দেবারও নাকি কেউ ছিল না। একে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, তার ওপর জায়গাটার এমন একটা ভীষণ কংকালসার মূর্তি দেখে, প্রাণটা আপনিই ছম্‌ছম্‌ করে উঠছিল।

নাড়ু গিয়ে একেবারে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। বলল, "পেছন আয়।"

আমাদের দেখে দুটো শেয়াল গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

আমি বললুম, "জঙ্গলের ভেতর এ সন্ধ্যাবেলা কি হবে?"

নাড়ু শুধু বললে, "দরকার আছে।"

চললুম তার পেছন পেছন। মাথার ওপর দিয়ে একটা কালপ্যাঁচা বিকট শব্দ করে চলে গেল। আরো খানিকটা গিয়ে দেখি, পোড়োবাড়ির একটা ভাঙা সিঁড়ি যেন প্রেতের মতো দাঁত বের করে পাহারা দিচ্ছে।

নাড়ু বললে, "এখানে আমরা বসবো।"

সকলে গিয়ে তার ওপর বসলুম। সিঁড়ির তলা থেকে গোটা কয়েক বাদুড় ঝটপট করে বেরিয়ে আমাদের গায়ে ডানার ঝাপটা মেরে চলে গেল। নাড়ু পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই বের করে বললে, "নে ধরা একটা করে।"

আমি বললুম, "নাড়ু, এসব কি?"

নাড়ু বললে, "আরে বোকা, ফেউ দুটো আমাদের পেছু নিয়েছে। ওদের দেখাতে হবে—আমরা সব বকাটে ছেলে এই রকম জায়গায় আমাদের রোজ আড্ডা বসে তুই তো সত্যি সিগারেট খাচ্ছিস্‌ নে, শুধু ধরিয়ে বসে থাক না।"

আমি বললুম, "ওদের এসব দেখিয়ে লাভ?"

নাড়ু চোখ বুজে বললে, "দরকার আছে।" আর আপত্তি না করে ওর কথামত কাজ করলুম। নাড়ু আপন মনেই বলতে লাগলো, "ছেলে দুটো হেডমাষ্টারকে গিয়ে সব লাগাবে—ভারী মজা হবে কালকে।"

পুরোনো বাগ থেকে যখন ফিরে এসে হোষ্টেলে ঢুকলুম, ঢং ঢং করে তখন ঘড়িতে আটটা বাজল। নাড়ু বললে, "কালকেও যেতে হবে কিন্তু!"

পরদিন বিকালবেলা আবার সকলে পুরোনোবাগের দিকে রওনা হলুম। যাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু নাড়ুর সত্যিকারের ইচ্ছাটা যে কি, তা বুঝতে না পেরে মনটা

সন্দেহের দোলায় দুলছিল। আজকে নাড়ু আরো নিবিড় জঙ্গলে ঢুকতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তারা যে সত্যি আমাদের পেছন এসেছে তা কি করে জানলি ?"

নাড়ু মুচকি হেসে বললে, "আজকে শুধু ফেউ নয়—পেছনে বাঘও আছে।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "সে কি ? হেডমাষ্টার মশাইও সঙ্গে আছেন নাকি ?"

নাড়ু শুধু বললে, "হুঁ।"

নিঃশব্দে সকলে চলতে লাগলুম। আরো খানিকটা গিয়ে দেখলুম, সামনে বেতকাঁটার মস্ত বড় ঝোপ। বললুম, "এর ভেতরেও ঢুকতে হবে নাকি ?"

নাড়ু বললে, "হুঁ।"

ওতো 'হুঁ" বলেই খালাস ! এদিকে আমাদের তো প্রাণ যায় বেতঝোপ থেকে এক একটা ডাঁটার আগা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নাড়ু আমাদের হাতে দিয়ে বললে, "টান্"—

টেনে টেনে জায়গাটা বেশ ফাঁকা হতে দেখলুম, "ভেতরে দিব্যি একটা পরিষ্কার রাস্তা হয়ে গেছে। পকেট থেকে এক বাণ্ডিল সুতো বের করে বললে, "প্রত্যেকটি ডাঁটার আগা পাশের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ।" আমরা নাড়ুর কথামত সেই রকমটি করে তার পেছু নূতন পাওয়া রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। খানিকটা গিয়ে নাড়ু বললে, "চুপ, কথা ক'সনি আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থাক।"

একই বাদেই দেখি দুটো ছেলের সঙ্গে আমাদের হেডমাষ্টার মশাই পা টিপে টিপে এদিকে আসছেন। বেত ঝোপের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে ছেলে দুটো বোধ হয় হেডমাষ্টারকে ফিসফিস করে বললে, "এই পথেই তারা গেছে।" হেডমাষ্টারও মাথা নেড়ে সেই রাস্তায় নেমে পড়'লন।

নাড়ু চুপিচুপি বললে, "দু'পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সুতোগুলো কেটে দাও।" আমরাও তার কথা মতো দু'ভাগে দু'পাশ দিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে কচাকচ সুতো কেটে ফেললুম। আর যাবে কোথা ? বেত কাঁটাগুলো ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ভুঁড়ি সুদ্ধ হেডমাষ্টার আর ছেলে দু'টোকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা ততক্ষণ পগার পার ! পরদিন সকালবেলা শুনলুম হেডমাষ্টারকে নাকি পুরানোবাগের মুখে খ্যাঁকশেয়ালীতে ধরেছিল। শরীরের এমন জায়গা নেই, যেখানে নাকি আঁচড়-কামড়ের দাগ না আছে। কাপড়, জামা-টামা সুদ্ধ নাকি সব ছিঁড়ে গেছে।

আমরা :বললুম, "তবু যে প্রাণে-প্রাণে বেঁচে এসেছেন তাই রক্ষে—নইলে আমাদের দশাটা কি হতো।"

পরদিন ইস্কুলে যেতেই হেডমাষ্টার নাড়ুকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর খাস কামরায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি দপ্তরী একগাছা লিকলিকে বেত এনে হাজির করল। হেডমাষ্টার নাড়ুর দিকে চেয়ে বললেন, "কালকে কোথায় গেছলে শুনি ?"

নাড়ু অবাক হয়ে বললে, "কোথায় স্যার ?"

হেডমাষ্টারমশাই রেগে বললেন, "কোথায় জানো না ? রোসো দেখিয়ে দিচ্ছি, এই বলে সপাং করে নাড়ুর গায়ে এক বেত ! নাড়ু আস্তে, কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে বললে, "মারবেন না স্যার।" "না, মারবো না মাখন খেতে দেবো," বলে যেই আর এক ঘা মারতে গেলেন, অমনি নাড়ু খপ্ করে বেতটা ধরে ফেলে দু'খানা করে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল। হেডমাষ্টার বোধহয় এতটা আশা করেন নি ! চোখ দেখে বুঝলুম ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি। তাঁর হাত থর্থর্ করে কাঁপতে লাগলো। খানিক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "যাও ক্লাসে যাও।" নাড়ু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার ৫।৭ দিন পর, একদিন সকালে উঠে ভূগোলটা ভালো করে তৈরী করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে চেনা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, "মশায়, নীলু বলে কেউ এখানে থাকে ?" দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে দেখি, আমাদের পুরোনো বন্ধু অমর, কুলীর মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে এসে হাজির। আমি বললুম, "অমর কোত্থেকে হে ?" সে বললে, "ভাই, তোদের এখানেই থাকবো !"

আমি বললুম, "তার মানে ?"

অনেক ব্যাখ্যা করে সে যা বললে, তাতে এইটুকু বোঝা গেল যে অমর যেখানটায় পড়ত, স্বাস্থ্য তার সেখানে মোটেই টিঁকছে না—কাজেই তার বাবা নাকি বলেছেন—নীলেরা যেখানে আছে, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা কর।

আমি বললুম, "তা হলে নীলের ওপর তোর বাবার খুব ভালো ধারণা আছে বল ?"

অমর হেসে বললে, "নিশ্চয়।"

অমরের এখানে এসে লাভের চাইতে লোকসানই হল বেশী। বছরের মাঝখানটায় সবগুলো বই বদলে যাওয়ায় বেচারী বেশ একটু মুশকিলে পড়ে গেল। সে অনেক রাত জেগে পড়ত বটে, কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধে করে উঠতে পারতো না। তার ওপর সামনেই হাফ্ইয়ালি এক্জামিন। একজামিনের দিন সাতেক আগে হোষ্টেলের একটা বড় রকমের ফিষ্ট, ছেলেদের উৎসাহের সীমা নেই।

সকাল থেকেই গবেষণা চলছে, কে কত সের মাংস ওড়াবে, কে কত গণ্ডা লেডিকিনি গলাধঃকরণ করবে, আর, কে কত ভাঁড় দৈ সাবড়ে দেবে।

আয়োজনের ত্রুটি নেই, আর অতি উৎসাহী বোর্ডারদেরও অভাব নেই। তখন রেশন কিংবা যুদ্ধের যুগ নয়—কাজেই খাদ্যবস্তু যেমন প্রচুর পাওয়া যেতো, ছেলেরা খেতেও পারতো অসম্ভব রকম।

পাতে ক্রমাগত দিয়ে যাও···কোথায় যে চলে যাচ্ছে, কেউ তার হদিশ দিতে পারবে না! এমনি কয়েকটি মূর্তিমান ছেলে আমাদের বোর্ডি-এ ছিল! অন্যান্য ছাত্ররা তাদের দেখিয়ে রসিকতা করে বলত, ওদের মাথা থেকে পা অবধি রবারের বলের মতো ফাঁপা।

যাই হোক, এই ফাঁপা বলের দল গোপনে ঠিক করে ফেললে যে, তারা আজ 'ফিস্টের' আসরে বসে সব কিছুই সাবড়ে দেবে।

আগেই বলেছি, আয়োজনের কিছুমাত্র কম্‌তি ছিল না। রান্না শুরু হয়েছে বিকেল চারটে থেকে, আর সমাধা হয়েছে রাত দশটায়।

বহু রকম পদ আর তার প্রাচুর্য দেখে মনে হবে, বুঝি এক বড়লোকের বাড়ির বৌ-ভাতের আয়োজন করা হয়েছে। শুধু মাছই রান্না হয়েছে পাঁচ রকমের। এরপর মাংস, নানা রকম তরকারী, মিষ্টি দৈ, রাবড়ী ত আছেই। সন্ধ্যে থেকে হলঘরে বসেছে গানের মজলিস! আবার শুনতে পেলাম যে, সে রবারেরই ফাঁপা দল খিদেটাকে বেশ চাঙা করে নেবার জন্য গোপনে বাটি-বাটি সিদ্ধি খেয়ে নিয়েছে। কথায় বলে—

"একা রামে রক্ষা নেই—
সুগ্রীব দোসর।"

ফাঁপা বলের দলের অবস্থা হয়েছে অনেকটা তাই।

গান-বাজনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। তারা ক্রমাগত রান্নাঘরের আশে-পাশে ঘুর্‌ঘুর্ করছে, আর নজর রাখছে, কখন প্রথম ব্যাচের পাতা পড়ে।

বোর্ডিং-এ সবাইকে খেতে ডাকবার সময় ঘণ্টা দেবার নিয়ম ছিল। সেই ঘণ্টা ধ্বনি হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দু'তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে এমনভাবে খাবার ঘরের দিকে পড়ি কি-মরি করে ছুটতে থাকত যে, বাইরের লোক থাকলে মনে করত নিশ্চয়ই হোস্টেলে আগুন লেগেছে।

যাই হোক, ফিস্টের দিনের তৎপরতা আরো বেশী। কেন না, ছেলেদের ধারণা —প্রথম পংক্তিতেই সব ভালো ভালো খাবার হাওয়ায় উড়ে যাবে!

কথাটা যে একেবারে মিথ্যে নয়, সে কথা ছেলেরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বহু ভোজে। সুতরাং যে করে হোক্ প্রথম ব্যাচের আসনে 'ব্যাঘ্র ঝম্পট' দিয়ে পড়ব, এইটেই সব ছেলের আন্তরিক বাসনা। খাবার প্রথম ঘণ্টা পড়ল—রাত সাড়ে দশটায়। দেখা গেল, সঙ্গীতের আসরে যে গায়ক গান গাইছিলেন, হুড়োহুড়ির

ঠ্যালায় শুধুই দাঁতটাই তার ভাঙেনি···। তবে বহু রকম লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হয়েছে। ছেলেরা যে সঙ্গীতের আদর এত বেশী করে, ভদ্রলোকের তা জানা ছিল না। বাঁয়ার ছাউনি ফেঁসে গেছে। হারমোনিয়ামের গোটা দুয়েক রীড খোয়া গিয়েছে বোধ করি।

যাই হোক, এইভাবে তিনটে পংক্তিতে খাওয়া-পর্ব সমাধা হল। আমি আর নাড়ু কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম। শরীরও পরিশ্রান্ত ছিল নানা কারণে।

কাজেই কে কত ভাঁড় দৈ সাবাড় করলে, কে কয় সের মাংসের হাড় চিবিয়ে ছাতু করে দিলে, তার হিসেব রাখবার উৎসাহ আমাদের মোটেই ছিল না।

বেশ সুনিদ্রাই হচ্ছিল বলতে পারি। হঠাৎ নাড়ুর ঠেলাঠেলিতে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল।

নাড়ু চুপিচুপি বললে, "একবার বাইরে আয় ত', কে যেন ছাতে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ব'লে মনে হল।"

দুজনে পা টিপে টিপে ছাতে এলাম। আকাশভরা জ্যোৎস্নাকে মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে। সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলার মধ্যে দেখলাম, ছাদের কার্নিসের একপ্রান্তে ব'সে সত্যি একটি ছেলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

ব্যাপার কি?

আমরা দুজনে এগিয়ে এলাম। এ কি! এ যে আমাদের বোর্ডিং-এর ছোকরা চাকর ঝণ্টু।

—"কি রে ঝণ্টু, ব্যাপার কি? এত রাত্তিরে ছাতে বসে এমন ভাবে কাঁদছিস কেন?"

ঝণ্টু প্রথমে কিছুতেই কথা বলে না। তারপর অনেক করে প্রশ্ন করতে জবাব দিলে, "ভুখ লাগা!"

বহু চেষ্টায় দীর্ঘ জেরা করে যে কথা জানা গেল, তা হচ্ছে এই, ছেলের দল সব খাবার খেয়ে ফেলেছে। তাই বোর্ডি-এর ঠাকুর-চাকরদের ভাগ্যে কিছুই জোটেনি।

আর সব চাকর আর ঠাকুর রাগ করে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে আছে ঘরে। কিন্তু ঝণ্টু ছেলেমানুষ। সে কিছুতেই খিদে সহ্য করতে পারছে না। তাই ত' একলা ছাদে বসে কাঁদছে! নাড়ু বললে, "দেখলে আমাদের ছেলেদের কাণ্ড! সব চেটে-পুটে খেয়ে চলে গেছে···আর ঠাকুর-চাকর খেলো কি না, সে দিকে কারো দৃষ্টি নেই।" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই সেই 'ফাঁপা বলের' দলের কাণ্ড!" নাড়ু রেগে উঠে বললে, "কিন্তু বোর্ডিং-এর ম্যানেজারেরও ত এটা দেখা উচিত। সারাদিন বেচারারা খেটেছে।···তারা খালি-পেটে শুয়ে থাকবে, এ কেমন যুক্তি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে এত রাত্তিরে ওদের খাবার-দাবার কি ব্যবস্থা করা যায়?"

নাড়ু বললে, "চল, সবাইকার ঘুম ভাঙাই।" আমি শুধোলাম, "ঘুম না হয় ভাঙালে। কিন্তু তারপর?" নাড়ু জবাব দিলে, "তারপর সবাইকার কাছ থেকে আট আনা করে চাঁদা আদায় করে—ঠাকুর-চাকরদের ভরপেট মেঠাই খাওয়াতে হবে।

আমাদের বোর্ডিং-এর পাশেই ত' মেঠাইয়ের দোকান। দরকার হয়, ওদের ডেকে তুলতে হবে। নইলে সারা দিনরাত যাদের অসুরের মতো খাটিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের পেট-উপোসী রাখা তো চলে না।"

কিন্তু ছেলেদের ঘুম ভাঙানোই কি সোজা কাজ? বিশেষ করে সেই ফাঁপা বলের দল।

ঘুমের ঘোরে তারা কোনো কথাই শুনতে চায় না কিন্তু নাড়ুও নাছোড়বান্দা।

ঘটি ঘটি জল মাথায় ঢেলে, তেঁতুলের সরবৎ খাইয়ে তবে ওদের চেতনা ফিরিয়ে আনা হয়।

সব কথা শুনে ছেলেরা বললে, "এ ত' ঠিক কথা। আমাদেরই অন্যায় হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আট আনা করে মাথা পিছু চাঁদা আদায় হয়ে গেল। তারপর সেই মিঠাইওয়ালাকে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলে প্রচুর মিষ্টি নিয়ে আসা বড় সোজা কাজ নয়।

ঝণ্টু এত মিষ্টি জীবনে কখনো খায় নি। এইবার কান্না ভুলে সে বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে ফেললে।

রাত তিনটের সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। আবার হঠাৎ ঘুম ভাঙতে চেয়ে দেখি—অন্ধকার। ঘরের একটা পাশ আলো করে অমরের শিয়রে আলো জ্বলছে, আর বিছানার ওপর বসে অমর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আবার কান্না।

আজ কি বোর্ডিং-এ কান্নার এপিডেমিক্ শুরু হল নাকি?

লাফিয়েউঠে তার হাত দু'টো মুখ থেকে টেনে নিয়ে বললুম, "কি হল?" ধরা পড়ে অমরের লুকোনো কান্না আর চাপা রইল না—সে আরো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কান্না শুনে নাড়ু লাফিয়ে উঠে এসে বললে, "ব্যাপার কি?" নাড়ুর অনেক সাধ্য-সাধনার পর অমর বললে যে, সে কিছুতেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না—আর সে কথা যদি তার বাবার কানে ওঠে তো তিনি তা'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

নাড়ু খিলখিল্ করে হেসে বললে, "তাই শেষ রাত্তিরের ঘুম নষ্ট করতে মরা-কান্না শুরু করে আমাদের চোখের পাতা এক করতে দিবিনে?"

অমর চোখের জল জামার হাতায় মুছে বললে, "ঠাট্টা নয় ভাই—তোকে আমি সত্যি করে বলছি।"

নাড়ু বললে, "আচ্ছা আমি বলছি তোর প্রশ্ন চুরি করে এনে দেবো। হল তো, যা এখন ঘুমোগে।" আমি বললুম, "সে কি? প্রশ্ন তুমি পাবে কোথায়?" নাড়ু বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজে বললে, "সে হবে এক রকম করে। বললুম যখন, তখন আর কিছুর জন্যে আটকা থাকবে না।"

তা জানতুম। নাড়ুর "হাঁ"-কে, "না" করতে পারে এমনতর কেউ জগতে ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার কেমন মন সরছিল না। এই সেদিন হেড-মাষ্টারের সঙ্গে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। তাই আস্তে আস্তে বললুম, "কাজ নেই ভাই ও সবে।"

নাড়ু আমায় ধমক দিয়ে বললে, "তুমিও আবার মরা-কান্না শুরু করলে—আজ কি ঘুমোতে দেবে না নাকি?"

এরপর আর কথা চলে না—কাজেই চুপ করে গেলুম।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে খাটের ওপর বসে নাড়ু হাঁপাতে লাগলো।

জিগ্যেস করলুম, "ব্যাপার কি?"

বললে, "চুপ্—কোশ্চেন এনেছি।"

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম!

অমর হাঁ করে নাড়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নাড়ু বললে, "প্রেস থেকে আজই কোশ্চেন হেডমাষ্টারের কাছে এসে পেঁাচেছে। হাত-বাক্সের ভিতর বন্ধ করে হেডমাষ্টার গেছে, বোনের বাসায় বেড়াতে। তাঁর ভাইপোকে একসের চম্‌চম্ খাইয়ে তবে অনেক কষ্টে রাজী করাই। তারপর সে চুপিচুপি চাবি এনে দিতে প্রশ্নগুলো নিয়ে এলুম। অবশ্য তারো এতে লাভ হয়েছে। তাদের ক্লাসের কোশ্চেনও একখানা করে দিলুম কি না। নিজের নেবার সাহস নেই, অথচ আমাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করলো।"

হেডমাষ্টারের ভাইপো আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ে, তা জানি। বললুম, "হেডমাষ্টার এসে যখন টের পাবে, তখন?"

নাড়ু হেসে বললে, "তা আর জানবার যোটি নেই। প্রত্যেক পেপারের এক-খানা করে কোশ্চেন নিয়ে আবার যেমনটি খামে মোড়া ছিল, তেমন করে রেখে এসেছি। তা ছাড়া হেডমাষ্টার নিজে তো আর খাম খুলবে না। মাষ্টারদের হাতে দিয়ে দেবে। দু'চার খানা বেশী ছাপা কি আর থাকে না?" সেই প্রশ্ন নিয়ে অমর দুটো দিন, দুটো রাত প্রায় ঠায় বসে কাটিয়ে দিলো। ইংরেজী পরীক্ষার পর নাড়ু অমরকে জিজ্ঞেস করলে, "কেমন এক্‌জামিন্ দিলি রে?" একগাল হেসে অমর বললে, "দিয়েছি বেশ ভালো।"

এর দিন সাতেক পর একদিন সন্ধ্যাবেলা হেডমাষ্টার মশায়ের ভাইপোকে সঙ্গে করে অমর গুটি গুটি এসে হোস্টেলে হাজির হল।

আমি আলো জ্বালিয়ে বাড়িতে একখানা চিঠি লিখছিলাম। নাড়ু খেলার মাঠ থেকে তখনো ফেরেনি। আমি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে অমর, আবার এই সন্ধ্যেবেলা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিস্ কেন? হেডমাষ্টার মশাই জানতে পারলে তোকে আর আস্তো রাখবেন না।"

অমর গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে, "যা ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, তাতে মাথা আস্তো থাকা শক্ত হবে।"

"কেন রে, তোর মাথা ভাঙলো কে?" এই কথা বলতে বলতে নাড়ু এসে ঘরে ঢুকলো।

অমর যেন হাতে স্বর্গ খুঁজে পেল। বললে, "এই যে, নাড়ু এসেছিস্। এদিকে, আমার সমূহ বিপদ্।"

নাড়ু রসিকতা করে জবাব দিলে, "আরে ভাই জীবনটাইতো একটা **obstacle race.** বিপদ কাটিয়ে কাটিয়ে এগুতে পারলে তবে শেষকালে প্রতিযোগিতায় পুরস্কার মিলবে।"

অমর বললে, "না ভাই, ঠাট্টা নয়।"

নাড়ু গাল দুটো একবার ফুলিয়ে নিয়ে বললে, "আচ্ছা, না হয় গম্ভীর হয়েই তোর কথা শুনছি। এইবার ধাঁধার সুতো ছাড় দেখি।" হেডমাষ্টার মশায়ের ভাইপো এতক্ষণ খাটের এক পাশে চুপচাপ বসে ছিল। এইবার সে মাথা চুলকে বললে, "ভাই তোমার বুদ্ধিমত প্রশ্ন যোগাড় করে পরীক্ষা দিলাম। ভাবলাম, মোটা নম্বর পেয়ে সবাইকে হক্‌চকিয়ে দেবো। এখন যে হিতে বিপরীত হল।" নাড়ুর চোখ দুটো যেন আনন্দে জ্বলে উঠল। বললে, "আরে হিতেন নাকি? তুই এসেছিস ত' অন্ধকারের মধ্যে বসে আছিস কেন? ভালো পরীক্ষা দিয়েছিস্! আমার যে একটা ভালো খাওয়া পাওনা আছে।"

হতাশার সুরে হিতেন জবাব দিলে, "আর খাওয়া!" **The cat is out of the bag.**

নাড়ু চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, "ব্যাপার কি? তুই যে আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস।" হিতেন বললে, "অবশ্য বেড়াল এখনো থলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেনি। তবে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করেছে! ঘটনাটা তোকে খুলেই বলি। কাল সকালবেলা ভাইদের সঙ্গে লুডো খেলছি…এমন সময় কাকাবাবু— মানে তোদের হেডমাষ্টার মশাই ডেকে বললেন—হ্যাঁরে হিতেন, তুই পরীক্ষায় এত ভালো নম্বর পেলি কি করে? আমি ত' ভাই সে কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।"

তবু ভয়ে ভয়ে বললাম, "এ বছর পরীক্ষার পড়াটা খুব ভালো করে তৈরী করেছিলাম কিনা কাকাবাবু!"

কাকাবাবু গোঁফটা একবার পাকিয়ে নিয়ে বললেন, "দরকার হলে আবার পরীক্ষা দিতে পারবি ত' ?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হুঁ।

বললাম বটে. কিন্তু তোকে কি বলবো, বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

আজ টিফিনের ঘণ্টায় অমরকে সব কথা খুলে বলতে ও ত' আরও হক্‌চকিয়ে গেল। যদি ঘুণাক্ষরে কাকাবাবু টের পায় যে, কি ক্যারামতি করে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি, তবে বাড়ি থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবেন। অমরই ত' বললে—তুই একটা ফন্দি-ফিকির বের করতে পারবি···তাই আমরা দুজনে চলে এলাম সোজা এখানে। তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি কিলবিল করে, আমায় তুই বাঁচা ভাই।

ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে নাড়ু বললে, "ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু খরচ-খরচা আছে।"

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেন করলে, "আচ্ছা হিতেন, তুই ভূত বিশ্বাস করিস ?"

হিতেন অবাক্ হয়ে বললে, "ভূত ?"

—"হ্যাঁরে হ্যাঁ ভূত।" বিজ্ঞের মতো নাড়ু জবাব দেয়। "অমাবস্যার রাত্রে সারা-দিন উপোসী থেকে ভূত পূজো করতে হবে। তাতে যদি সিদ্ধকাম হতে পারিস, তবে তার কাছে প্রার্থনা জানাবি, যাতে আবার পরীক্ষা করবার কথা হেডমাষ্টারের মন থেকে একেবারে মুছে যায়। যদি রাজী থাকিস্ ত' বল।"

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে নাড়ুর কথা গিলছিলাম। এইবার একটু আপত্তি করে বললাম, "কি আবোল-তাবোল বক্‌ছিস ? ভূত পূজো আবার কি কাণ্ড ?"

নাড়ু, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ওই ত' তোদের দোষ। বিশ্বাস করতে চাইবিনে।" তারপর হিতেনের দিকে তাকিয়ে বললে, "তাহলে আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকল না।"

কিন্তু হিতেন তখন স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। বাঁচার জন্যে খড়কুটোও সে আঁকড়ে ধরতে রাজী। বললে, "ভূত সন্তুষ্ট হলে আমার কার্য সিদ্ধি হবে ত' ?"

নাড়ু জবাব দিলে, "নিশ্চয়। পূজোয় সন্তুষ্ট হলে ভূত তোর দেয়া ভোগ নিজে হাতে গ্রহণ করবে। বুঝবি তখন যে, সিদ্ধকাম হতে আর বেশী দেরী নেই। কামাখ্যার এক সাধুর কাছে আমি ভূতসিদ্ধির এই পূজোটা শিখেছিলাম। যদি অবিশ্বাস থাকে, তা হলে কিন্তু এর মধ্যে আসিস্‌নে হিতেন,—সে আমি আগে থেকে বলে রাখছি।"

প্রাণের দায় বড় দায়।

হিতেন ততক্ষণে ভক্তি গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে। তবু ভয়ে ভয়ে শুধোলে, "আচ্ছা ভাই নাড়ু, এই ভূতসিদ্ধির ব্যাপারে কত টাকা খরচ হবে ?" নির্বিকার ভাবে নাড়ু জবাব দিলে, "লাগে ত' অনুপান অনেক কিছু। আচ্ছা, তুই কুড়িটা টাকা নিয়ে আসিস।"

হিতেন বললে, "তা আনতে পারবো। আমার নিজের কাছেই জমানো আছে।"

পাঁজি দেখে নাড়ু বললে, "আসছে শনিবারই অমাবস্যা, সেইদিনই ভূতসিদ্ধির পূজা সাঙ্গ করতে হবে।"

হিতেন সে রাত্রে খুশী হয়ে চলে গেল। আমি নাড়ুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ সব আবার কি হাঙ্গামা বাধালি বল ত' ?"

নাড়ু সবগুলো দাঁত একসঙ্গে বের করে বললে, "ওদের অনেক টাকা। কিছু মিষ্টি খাওয়া যাবে'খন। জানিস ত' 'বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্' ।"

আজ এতদিন বাদে গোপন কথাটা ফাঁস করে দিই। সেই শনিবারের রাত্রে একটা কালো পর্দার আড়ালে আমিই ভূত সেজে দাঁড়িয়েছিলাম এবং মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোতে হাত বের করে ভোগ গ্রহণ করেছিলাম।

হিতেন 'সিদ্ধকাম' হয়ে বাসায় ফিরে যেতে আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা যে বিশেষ উপাদেয় হয়েছিল, সেটা পরিষ্কার করে না বললেও কারো বোঝবার অসুবিধে হবে না।

হিতেন যে ভূতপূজোর ব্যাপারে সিদ্ধকাম হয়েছিল, সে বিষয়ে অন্ততঃ তার মনে কোনো সংশয় ছিল না; কেননা, হেডমাষ্টারমশাই আর তাকে পরীক্ষা দেবার আহ্বান করেন নি।

এর দিনকয়েক পর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনলাম কোথেকে খুব নাম করা এক যাত্রার দল এসেছে। ফি বছরই এই সময়টায় স্থানীয় বাজারে খুব ধুমধাম করে কালীপূজো হয়, আর সেই সঙ্গে নানা রকম আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকে। গত বছর এই উপলক্ষে খুব বড় একদল সার্কাস এসে নানারকম খেলা দেখিয়ে গেছে। ছেলের দল আজও সেই কথায় লাফিয়ে ওঠে। এ বছরও পর পর তিনদিন যাত্রা হবে শুনে ছেলের দল খুব মেতে উঠল। হোষ্টেলের ছেলেদের উৎসাহই সব চাইতে বেশী। কারণ, বাড়ি থেকে যারা পড়াশুনা করে, সব দিন দেখবার অনুমতি তারা পায় না। কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে সে অনুমতির হাত থেকে রেহাই পায়।

ফি বছরের মতো হোষ্টেলের ছেলেদেরও নেমতন্ন ছিল যাত্রা শোনবার।

প্রথম দিন আমরা সব পালিয়ে গেলুম। যাত্রা যে খুব খারাপ লাগছিল তা

বলতে পারিনে। কিন্তু মাঝখানে ঐ যে মোক্তারের পোশাক পরে জুরির দল গালে হাত দিয়ে মরাকান্না শুরু করে দিলে—সে শুনে একেবারে কান ঝালাপালা! এখনকার মতো তখনো থিয়েটারী ঢং-এ যাত্রা শুরু হয়নি। জুরির দল আবার নাছোড়-বান্দা। শুধু একবার গেয়েই ওদের মনের আশা মেটে না—প্রত্যেকে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইবে—তবে নিস্তার। এ যেন কে কতটা হাঁ করতে পারে, তার একটা রীতিমত প্রতিযোগিতা।

নাড়ু বললে, "না, এ মোক্তারের দল তো বড় জ্বালাতন করলে!" পাশে আর একটি ছেলে বললে, "এরা আমাদের না তাড়িয়ে ছাড়বে না দেখছি।"

নাড়ু বললে, "আমাদের তাড়াবে? রোসো মজা দেখাচ্ছি।"

পাশেই ছিল একটা গ্যাসলাইট, তাতে নানারকম পোকা এসে উড়ে পড়ছিল। নাড়ু করলে কি, সেই থেকে না পোকা ধরে তাল পাকিয়ে জুরিদের মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। বেচারী হয়তো মনের আবেগে চোখ বুজে কানে হাত দিয়ে, মস্ত বড় এক হাঁ করে সবে গান শুরু করেছে, হঠাৎ নাড়ুর অব্যর্থ গুলী গিয়ে পড়ল তার মুখের মধ্যে—পোকাগুলো ততক্ষণে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে। বেচারী তখন গান থামিয়ে সাজঘরের দিকে দে ছুট্।

এই রকম খানিকক্ষণ করতে দেখি, সত্যি সত্যিই মোক্তাররা সব ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে! তারপর বেশ আরামে গান শোনা গেল। শেষরাত্রে গান শেষ হতেই সব হোষ্টেলে ফিরে এসে লম্বা ঘুম।—এক ঘুমে বিকেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শুনি, আজকের পালা নাকি আরো ভালো। সকলেরই মন উড়ু উড়ু করতে লাগলো। কিন্তু হেডমাষ্টারের কড়া হুকুম—হোষ্টেলের ছেলেরা একদিনের বেশী রাত জাগতে পারবে না।

নাড়ু বললে, "রেখে দে তোর হেডমাষ্টারের হুকুম। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ পালিয়ে যাওয়া যাবে'খন।"

সত্য বললে, "ভালো। শুনছি আজকে নাকি পালাটা একটু দেরীতে শুরু হবে!" রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে বসে গল্প করছি, সত্য এসে খবর দিলে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন।

জামা গায়ে দিয়ে আমরা গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লুম।

সেখানে গিয়ে পৌঁছতে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। পালাটা বোধহয় ছিল মহিষাসুর বধ। খুব মজা করে যুদ্ধ দেখছি—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে পেছন ফিরে দেখি, আমাদের হোষ্টেলেরই একটি ছেলের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বচসা হচ্ছে।

নাড়ু বললে, "চল্ দেখি, কি হচ্ছে ওখানে?" মহিষাসুরের যুদ্ধ দেখতে তখন এত

ব্যস্ত যে, ওঠবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। বললুম, "কি আবার হবে, গোলমাল-টোলমাল হয়েছে বোধ হয়—এক্ষুণি মিটে যাবে'খন।"

আমার হাত ধরে টেনে তুলে নাড়ু বললে, "না—না চল্"—

নিতান্ত অনিচ্ছায় সেখানে পৌঁছে দেখি শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছে।

ব্যাপার এই—বাজারের কর্তার জনকয়েক কর্মচারী এসেছেন যাত্রা শুনতে---তাই আমাদের উঠে নাকি তাদের জন্য জায়গা করে দিতে হবে।

ছেলেটা নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তাদের এইখানেই বসতে দেওয়া হয়েছে, কর্মচারীদের অন্য কোথাও জায়গা করে দেয়া ভালো।

কিন্তু যে ভদ্রলোক জায়গা করতে এসেছিলেন, তিনি সে কথাটা যে কিছু বুঝেছেন, এরকম কোনই ভাব দেখা গেল না। বরং হঠাৎ যেন পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠে ছেলেটার হাত ধরে টান দিয়ে বললেন, "না, তোমরা এখানে বসতে পারবে না।"

আর যাবে কোথা---নাড়ু ছিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে---সে এগিয়ে গিয়ে ভদ্র-লোকের ঠিক নাকের ডগার ওপর এক ঘুষি মেরে বললে, "মশাই, নেমন্তন করে এনেছেন---সেটা খেয়াল আছে?"

আচমকা এই রকম একটা ঘটনায় আসরে ভীষণ হৈ-চৈ চীৎকার উঠল। কর্মচারীদের দল এসে নাড়ুর ওপর রুখে দাঁড়ালো---হোস্টেলের ছেলের দলও নেহাত কম নয়। আসরের চারিদিকে যে সব বাঁশ পোঁতা ছিল, তাই তুলে নিয়ে তারাও নূতন করে মহিষাসুরের পালা শুরু করে দিল।

সত্য আমার কানে ফিসফিস করে বললে, "শিগ্‌গীর ছুটে গিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের খবর দে।"

ততক্ষণে চারদিকে মার মার রব উঠে গেছে।

পাঁচিল টপকে গিয়ে হোস্টেলে খবর দিতেই---টেনিস্ র‍্যাকেট, হকিষ্টিক, লাঠি, মুগুর যে যা পেলে, নিয়ে ছুট্ ছুট্।

প্রথমে আমাদের দলটা ছিল নেহাতই কম, এইবার নতুন দল আসছে দেখে তারা যেন দ্বিগুণ বল পেল। তার ওপর নাড়ু আর সত্যের জীম্‌নাষ্টিক করা শরীর---ওরা দুজনেই প্রায় একশো। শুধু মার মার চীৎকার। খানিক পরে বাজারের লোক যে কে কোথা দিকে সট্‌কে পড়লো, তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে বড় বড় সব ঝাড়-লণ্ঠন গুঁড়িয়ে একসা হয়ে গেল। শেষটায় দেখা গেল, মারামারির ফলে আমাদের দলের একটি ছেলের পা ভেঙে গেছে! তাকে কাঁধে তুলে আমরা তক্ষুণি হোস্টেলে ফিরে এলুম।

পরদিন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের হুমকিতে মারামারির সব খবর বেরিয়ে পড়ল এবং এও জানতে বাকি রইল না যে, এ মারামারির নেতা আমাদেরই নাড়ু!

পরদিন ক্লাসে যেতে হেডমাষ্টার মশাই ইস্কুল ছুটি দিয়ে আমাদের মতো সব দাগী আসামীদের ডেকে পাঠালেন।

কড়া বিচারে সক্কলকার পাঁচটাকা করে জরিমানা হল। সব শেষে তিনি নাড়ুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি জানি তুমিই এ দুষ্কর্মের নেতা। একমাস তুমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না—আর সক্কলকার সামনে নাকে খৎ দিতে হবে—যাতে আর এমনটি না হয়।"

নাড়ু মাথা উঁচু করে বললে, "তা আমি পারবো না স্যার!" হেড মাষ্টার ফোঁস্ করে উঠে জবাব দিলেন, "সাত দিন তোমায় সময় দিলুম—এর মধ্যে ভেবে ঠিক কর। হয় আমার কথামত কাজ করতে হবে—নইলে ডিরেক্টর আপিসে জানিয়ে তোমায় আমি রাষ্টিকেট্ করবো।"

নাড়ুকে নিয়ে আমরা সবাই চলে এলুম। সক্কলকার মনেই যেন কি অনিশ্চিত আশঙ্কা কাঁটার মতো খচ্-খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। এই সাতটা দিন নাড়ুর সঙ্গে যেন আমার দেখাই হচ্ছে না। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যে ও যে কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, কিছুই কেউ টের পাইনে। এক এক দিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি, নাড়ু আলো জ্বালিয়ে কি সব লিখছে। বুক ঠেলে অনেক কথা এক সঙ্গে বেরুতে চায়···কিন্তু পাছে ও লজ্জা পায়, সেই জন্যে আমি যে জেগেছি, সে কথা ওকে জানতে দিই নে! এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেল। সে দিন অতি সকালে ঘুম ভেঙে গেল, হঠাৎ নাড়ুর বিছানার দিকে তাকাতেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, একি, খাট খালি যে! দু'পা এগোতেই বিছানায় একটা চিঠির ওপর নজর পড়ল। চিঠিটা এই—

ভাই নিলু,

এতদিনের মেলামেশার ফলে যদি আমায় চিনে থাকিস্ ত' এটা হয়ত বেশ ভালো করেই বুঝেছিস যে, আমার এই বেপরোয়া জীবনে কারো কাছে মাথা নীচু আমি করিনি—করবো না, আমি এদেশ ছেড়ে চললুম। আব্দুলের কথা বোধহয় মনে আছে। যার সাহায্যে আমরা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা।

তার কাকা জাহাজে কাজ করেন। তারই আন্তরিক চেষ্টায় আমি একটা জাহাজে খালাসীর কাজ যোগাড় করেছি। এরপর আমার পথ যে পরিষ্কার হয়ে গেছে আশা করি তা বুঝতে পারছিস্। অকূলে ভেলা ভাসিয়ে দিচ্ছি, দেখি কোথায় গিয়ে কূল পাই।

আমেরিকা যাওয়ার একটা হঠাৎ পাওয়া সুযোগ আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। কেন যাচ্ছি, তা তোর সঙ্গে দেখা করে বললুম না—কারণ জানি, তা

হ'লে তুই আমার যাওয়ার পথে বাধা হবি। যদি কখনো মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই তোদের সঙ্গে জীবনে আবার সাক্ষাৎ হ'বে নইলে এই শেষ।

তোদের নাড়ু

ঝুপ করে বিছানার ওপর বসে পড়লুম। নাড়ুর বালিশটা সরাতেই আর একখানা চিঠি বেরিয়ে এলো।

খামের চিঠি খুলে দেখি, মাসিমার হাতের লেখা।

একটা জায়গায় চোখ পড়তে দেখি, লেখা রয়েছে—"তুমি এমন করে যে আমাদের মাথা হেঁট করবে তা কোনো দিনের তরেই বুঝতে পারিনি। হেডমাষ্টার মশাই চিঠি লিখেছেন, তুমি সমস্ত হোষ্টেলের ছেলেদের নষ্ট করছ—লেখাপড়া ছেড়ে সবাই দল বেঁধে তোমার কথায় মারামারি করে বেড়াচ্ছে। তুমি একা নষ্ট হয়ে যাও সেইটেই আমি সইতে পারছিনে—তার ওপর এতগুলি ছেলে যদি তোমার কথায় অধঃপাতের পথে চলে যায় ত' তাদের বাপ-মায়ের দেয়া অভিশাপে আমার চোখের জল আর সারা জীবনে শুকুবে না।

হেডমাষ্টার মশাই আরো জানিয়েছেন—"তোমার কথা শুনে ছেলেরা কেউ আর তাঁর কথা শুনছে না"—এত বড় একটা দুষ্কৃতির জন্যেই কি আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় মানুষ করেছিলাম?

পড়াশুনোয় যদি তোমার আর মতি না থাকে—পত্রপাঠ বাড়ি চলে এসো—এমন করে দশের সর্বনাশ আমি তোমায় কিছুতেই করতে দিতে পারবো না।...

চিঠি দু'খানা পড়ে নির্বাক্ হয়ে বসে রইলুম। নাড়ুর দেশত্যাগের কারণ আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘুরে ফিরে শুধু এই কথাটাই মনে হতে লাগলো, হেডমাষ্টার এত বড় একটা মহৎ প্রাণের মূল্য যাচাই করতে পারলেন না, তাই না তার ওপর এতটা অবিচার করে বসলেন! শুধু বাইরেটা দিয়েই ত মানুষ, চেনা যায় না!

আজ শুধু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে এই কথাটাই বলতে লাগলুম,—জগদীশ, যারা ওকে দেশছাড়া করল—ওকে চিনতে না পেরে—ওর ওপর অবিচার করে নিজের পাপের বোঝা ভারী করে তুললে, তাদের একদিন তুমি জানিয়ে দিও যে, মানুষ হিসেবে সে কারো থেকে ছোট নয়।

চোখের জলে চিঠির কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে এলো।

আজ জীবনের চলার পথে অনেক দূর এসে পড়েছি। বছর দুই আগে এক আমেরিকা-ফেরত ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, নাড়ু এখন সেখানকার রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক। তার বেপরোয়া জীবনে সে পরশমণির সন্ধান পেয়েছে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং

প্রথম খণ্ড

(কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাস)

গল্পের আগের গল্প

আমরা দু'ভাই যখন খুব ছোট, সেই সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি-চর্ম সার হয়ে পড়ি। তাই স্বাস্থ্যলাভের জন্য পাবনার ভেতর ম্যাছরা নামক জায়গায় যাই। সেখানে আমাদের এক ভাইপো থাকতেন—বয়সে আমাদের চাইতে অনেক বড়। তখন তিনি রাজশাহী কলেজের ছাত্র।

সেই নদীবহুল জায়গায় আমরা একবার নৌকা করে বেড়াতে যাই। আমার সেই ভাইপো এক নদীর চরে নেমে ভারতের ম্যাপ এঁকে দেখান,—আর 'বন্দেমাতরম্' কথাটি শিখিয়ে দেন।

পরে বড় হয়ে শুনেছি,—উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে যত স্বদেশী ডাকাতি হ'ত তিনি ছিলেন তার ভাণ্ডারী। প্রথমে তার মুখেই স্বদেশী যুগের ছাত্রদের আত্মোৎসর্গের কথা শুনি। এক একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রদের অনুশীলন চলত। আমার এই ভাইপোটির বিষয়—কথা-প্রসঙ্গে আমি "স্বপনবুড়োর শৈশব" বইখানিতে উল্লেখ করেছি।

"বাবুইবাসা বোর্ডিং" আমার ছেলেবেলায় শোনা সেই সব স্বদেশী যুগের কাহিনীকে ভিত্তি করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত হয়েছে।

সেই ভুলে যাওয়া স্বদেশী যুগে ছাত্রদের যে শিক্ষা, নিষ্ঠা, দেশভক্তি ও আত্মত্যাগের কাহিনী টুক্‌রো টুক্‌রোভাবে শুনেছি—তারই থেকে প্রেরণা লাভ করে আমি "বাবুইবাসা বোর্ডিং" রচনা করেছি। ছেলেবেলার শোনা গল্প, আর আমার পরিকল্পনার কাহিনী মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে,—যেমন নাকি পাহাড়ের সঙ্গে মেঘ মিশে একাকার হয়ে যায়।

তবু একথা বলব—সমগ্র উপন্যাসটি আমার নিজেরই পরিকল্পনা। কিশোর-জীবনে স্বদেশ সেবার আর দেশভক্তির যে প্লাবন মনে জাগে তাকে কেন্দ্র করেই এই কৌতূহলোদ্দীপক কিশোর উপন্যাসটি রূপ লাভ করেছে।

তরুণ মনে এমন একটা সময় আসে,—যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দে বলা চলে—

—"এসেছে সে এক দিন—
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে
না রাখে কাহারো ঋণ!
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত-ভাবনা হীন।"

"বাবুইবাসা বোর্ডিং" কিশোর মনের সেই সব-হারাবার, সব খোয়াবার—স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত কয়েকটি আপন ভোলা দেশ সেবকের কাহিনী নিয়ে রচিত।

এই কিশোর-উপন্যাসটি যদি কিশোর মনে ক্ষণেকের জন্যেও দোলা দেয়—তবে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

বইটি "শিশুসাথী"-তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ কালে বহু অঞ্চল থেকে উৎসাহবাণী পেয়েছি, পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে সেই সব কাছের আর দূরের বন্ধুদের আকুল আগ্রহের কথা আমার মনে পড়েছে। সবাইকে জানাই স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা।

—**স্বপনবুড়ো**

বাবুইবাসা বোর্ডিং

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

ইস্কুল বিল্ডিংটা একেবারে নদীর পারেই।

তাই যে কেউ নতুন ছাত্র এসে বোর্ডিং-এ ভর্তি হোক না কেন, সনাতনবাবুর ছিল সনাতন প্রশ্ন—'বেডিং-বাক্স নিয়ে ত বোর্ডিং-এ এসে উঠলে, কিন্তু সাঁতার জানো ত' ? এ বোর্ডিং-এ থাকতে হলে ঠিক হাঁসের মতো সাঁতার জানা চাই।'

যে ছেলে সাঁতার জানে, সে বুক উঁচিয়ে জবাব দেয়—'জানি স্যার। সেবার আমাদের জেলার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায়—'

—'ব্যস্, ব্যস্! আর বলতে হবে না।'···মাঝপথেই ছেলেটিকে থামিয়ে দেন সনাতনবাবু,—'আমি শুধু জানতে চাই সাঁতারটা জানা আছে কিনা! তারপর নদীর সঙ্গে মিতালি পাতালে আর সব কিছুই ধীরে ধীরে হবে। ভাবনার কিছু নেই।'

আপন মনে গড়গড়াটা টানতে থাকেন সনাতনবাবু।

সনাতনবাবুর বয়েস কত কেউ ভালো করে বলতে পারে না। বছরের পর বছর চলে যায়—এই সনাতনবাবু আদি অকৃত্রিম চিরকেলে সনাতন। তাঁর বয়েস বাড়ে কি কমে কেউ বুঝতে পারে না। সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। ছেলেরা আড়ালে নতুন নামকরণ করেছে—'সুপারী-লণ্ঠন'। কেউ যদি তার মানে জানতে চায়—যে কেউ একজন এগিয়ে এসে হাত উঁচিয়ে বলে—'এই সোজা মানেটা বুঝতে পারলে না ? সুপারীর মতোই তিনি শক্ত। আর অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো ফেলে, সকলের দোষ-ত্রুটি এক মুহূর্তে বের করে দিতে পারেন। এই ত' আমাদের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট—তার মানেই 'সুপারী-লণ্ঠন' !'

সনাতনবাবুর বয়েস ঠিক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কিসের জোরে—এ নিয়েও ছেলেদের মধ্যে গবেষণার অন্ত নেই।

শিক্‌কাবাব বলে—'অতি সোজা কথা। তোমরা রোজ রুই মাছ খাও। কিন্তু সেই রুই মাছের যে মুড়ো থাকে—সে হদিস রাখো কি কেউ ?'

ট্যামটেমী ফোড়ন কাটলে—'বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুড়ো খাবার নিয়ম নেই। কেন না, তাই নিয়ে কলহ শুরু হতে পারে।'

শিক্‌কাবাব বললে—'অতি ঠিক কথা। কিন্তু মাছের ত' মুড়ো থাকে। সেগুলো তারা জলে জমা রেখে আসে না। সেই মুড়ো আর মুড়োর ভেতরকার ঘীলু যদি প্রত্যহ পেটে যায়, তবে বয়েস বাড়বার সুযোগ পায় কি ?'

শিক্‌কাবাবের সুন্দর ব্যাখ্যায় খুশী হয়ে সবাই এক বাক্যে চীৎকার করে ওঠে—'সাবাস! সাবাস!!'

বোর্ডিংটির নাম কিন্তু এখনো বলা হয় নি।

বোর্ডাররাই ওর একটি সুন্দর নামকরণ করেছে—

"বাবুইবাসা বোর্ডিং!"

সামনে অজস্র ঝাউগাছে বাবুইপাখী বাসা বেঁধেছে। আর বাবুইবাসা বলা হয়েছে এই জন্য যে ছেলেরা এ-বছর আসছে, ও-বছর চলে যাচ্ছে—কেউ এখানে স্থায়ী বাসিন্দা নয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। আর আনন্দের কথা—সকলেই খুশীমনে এই নামটি মেনে নিয়েছে।

বোর্ডি-এর সামনেই এক ঝাঁক ঝাউগাছ। তার কোল ঘেঁষে লম্বা রাস্তা নদীর পাশ দিয়ে চলে গেছে একেবারে দিগন্তের দিকে। এই রাস্তার পরেই নদী। সন্ধ্যের পরে ছেলেদের জটলা বসে এখানে ওখানে, ঘাসের গালিচার ওপর কিংবা একেবারে নদীর কোল ঘেঁষে—যেখানে ছলাৎ-ছল করে নদীর জল কেবলই পারের ওপর মাথা খুঁড়ে মরছে।

পল্লী অঞ্চল, কিন্তু এই নদীই ওদের প্রাণবন্যা। বোর্ডারদের বিলাস হচ্ছে দুই বেলা এই নদীর জলে সাঁতার কাটা।

অনেকে রটিয়ে বেড়ায় এই নদীতে মাঝে মাঝে কুমীর আসে। কিন্তু দস্যিছেলের দল সে-কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনা; বলে—'অমনিতেই আমাদের গায়ে হলুদ মাখা আছে। কুমীর আমাদের কি করবে ?'

শিক্‌কাবাব হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটে—'একবার আমার হাতের আওতায় আসুক না! একেবারে শিক্‌কাবাব করে ছেড়ে দেবো।'

নদীতে বাঁধা থাকে ছোট ছোট কতকগুলো ডিঙি আর বাচের নৌকো। তাই নিয়ে বিকেলবেলা একদল ছেলে নদীর এপার-ওপার পাড়ি জমায়। সেই সঙ্গে কণ্ঠে তাদের গান জেগে ওঠে—

"আমি ভয় করবো না—
দু' বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না!
তরীখানি বাইতে গেলে—
মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে—কান্নাকাটি করবো না!"

আকাশে তখন অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভায় এখানে-ওখানে-ছিটানো মেঘদল নানা রঙের পোশাক পরে যেন ছেলেদের সেই গানের আসরে যোগ দিতে ধেয়ে আসে। নীড়ের পানে ফেরা পাখীর দলও যেন খানিকক্ষণ নীল আকাশে থমকে থাকে—এই জলসার সুরে সুর মেলাতে। সবার রঙে রঙ মিশিয়ে রঙীন আকাশ যে মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, তারই ছায়া যেন টল্‌টলে নদীর জলে স্নান করতে নেমে আসে। ওপারের নারকেল গাছগুলো মাথা দুলিয়ে তাল দিতে থাকে। আরো কিছুক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে, তখন কোনো দূরের পল্লী থেকে মঙ্গল-শঙ্খের শব্দ শোনা যায়। কোনো কোনো কুটিরে জ্বলে ওঠে মাটির প্রদীপ। ছেলের দল এই সময়ে নৌকোর মুখ বোর্ডিং-এর দিকে ঘুরিয়ে নেয়। ওদের গলায় তখন নতুন গান জেগে ওঠে—

"ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে—
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়!"

এই নৌকোভ্রমণ যেদিন বাদ পড়ে যায় সেদিন সন্ধ্যেবেলা বোর্ডিং-এর ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে ওরা পড়তে বসে বটে, কিন্তু পড়াশোনায় কারো মন লাগে না, সবাই উসখুস করতে থাকে।

বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সনাতনবাবু তাই ঢালাও আদেশ দিয়েছেন—বিকেলের দিকে নৌকো করে বেড়ানো খুব ভালো। এতে শরীর আর মন দুই-ই আনন্দে থাকে। তাই পড়াশোনাতেও মন বসে।

সেদিন একটি নতুন ছেলে এসে হাজির হল, এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে।

একটি অচেনা ছেলে ভর্তি হতে এলে বোর্ডারদের মধ্যে পুলকের প্রবাহ বয়ে যায়।

নয়া খোরাক কিছু মিলবে, তাই উৎসাহের আধিক্যে তারা বোকা-বোকা নতুন মানুষটিকে একেবারে সুপারী-লণ্ঠন সনাতনবাবুর কামরায় এনে হাজির করলে।

সনাতনবাবু সন্ধ্যেবেলা টেবিলের ওপর ল্যাম্পটি জ্বালিয়ে সেই দিনের কাগজটি খুলে নানা জাতীয় সংবাদ সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, এমন সময় ছেলের দল গিয়ে সেখানে হাজির হল।

নিকেলের চশমাটা কপালের ওপর তুলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কি নাম?'

মাথা চুল্‌কে, মুখ কাঁচুমাচু করে নতুন ছেলেটি জবাব দিলে—'আমার নাম গঙ্গারাম।'

ছেলেরা সবাই নাম শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। সনাতনবাবুও কাগজ পড়ায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়েছিলেন। তাই ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করলেন—'একেবারে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো যে এসে হাজির হলে, তা সাঁতার জানো ত' ?'

গঙ্গারাম এবার সত্যি হক্‌চকিয়ে গেল। বোর্ডিং-এ ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করবে, তার সঙ্গে সাঁতারের কি সম্পর্ক ?

আসল কারণটা না বুঝলেও ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলে নতুন ছেলেটি—'আজ্ঞে না, সাঁতার ত' জানি নে—'

চোখের সামনে যেন একটা বড় বেলুন ফেটে গেল! সনাতনবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'হুঁ, সাঁতার জানো না! আমাকে একেবারে কৃতার্থ করেছ আর কি। তবে বেছে বেছে এই বোর্ডিং-এ নাম লেখাতে এসেছ কেন ?'

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন সনাতনবাবু। তারপর চীৎকার করে উঠলেন—'শিক্‌কাবাব—'

—'আজ্ঞে ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো শিক্‌কাবাবের শান-দেওয়া গলা থেকে।

—'কালকেই নদীতে নিয়ে ওকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।'

শিক্‌কাবাব ত তাই চায়। উত্তর দিলে—'আচ্ছা স্যার, কালকেই ভ্যাবা গঙ্গারামকে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।'

গম্ভীর গলায় নতুন ছেলেটি উত্তর দিলে—'আমার নাম ভ্যাবা গঙ্গারাম নয়, শুধু গঙ্গারাম গায়েন।'

সনাতনবাবু আবার ফোঁস্ করে উঠলেন—'ওই হল—ওই হল। আগে সাঁতারটা শিখে নাও। তখন 'ভ্যাবাকে' বাতিল করে দিলেই হবে।'

সনাতনবাবু আবার খবরের কাগজটা চোখের ওপর তুলে ধরলেন। নিকেলের চশমাটাও আপনা থেকেই কপালের ওপরটা ছেড়ে চোখের ওপর নেমে এলো।

সবাই যে যার ঘরে এলো। সে-রাতে কিন্তু গঙ্গারামের চোখে আর ঘুম নেই।

এত বিপদেও মানুষে পড়ে! শিখতে এসেছে লেখাপড়া—তা বলে কিনা নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটতে হবে! মানুষটা পাগল নাকি ?

ওর দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ত' তাকে বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে নাকি কোন আত্মীয়-বাড়ি আছে। সেইখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা দেশে ফিরে যাবেন। এদিকে গঙ্গারামের যে গলাজল, সে খবর আর কে রাখছে ?

সারারাত ধরে গঙ্গারাম গোলমেলে সব স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠতে লাগল!

একবার দেখলে নদীর জল সব উথাল-পাথাল করছে, আর একটা হাঙর এসে

তার ডান পা-টা কামড়ে ধরেছে। তাকিয়ে দেখলে হাঙরের মুখটা ঠিক বোর্ডিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সনাতনবাবুর মুখের মতো!

আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে যেতে গঙ্গারাম বিছানার ওপর উঠে বসলো। দেখলো, ঘামে তার গা একেবারে ভিজে যাচ্ছে! গেঞ্জিটা খুলে ফেলে দিয়ে ক্রমাগত হাত-পাখাটা চালাতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

আর একবার সে স্বপ্ন দেখলে, এক ঝাঁক কৈ মাছ তাকে তাড়া করেছে। এই কৈ মাছগুলো একেবারে মানুষের মতো লম্বা হয়ে গেছে।

গঙ্গারাম যত হাত-পা ছুঁড়ে পালাতে যাচ্ছে ততই সে জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে জল ঢুকছে—তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে কৈ মাছগুলো আরো অনেকটা এগিয়ে আসছে, প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে! আরো অবাক কাণ্ড, কৈ মাছের মুখগুলো এই বোর্ডিং-এর ছেলেদের মুখের মতো।

গঙ্গারামের হাত-পা আর কিছুতেই চলছে না। এইবার সে সত্যি ডুবে যাবে অগাধ জলে—

এমন সময় আর এক বিপত্তি!

ঝাউগাছের ডালে যে বাবুইপাখীর বাসাগুলো এতক্ষণ হাওয়ায় দুলছিল, এইবার সেগুলো বোমা হয়ে শাঁ-শাঁ করে তার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

আতঙ্কে গঙ্গারাম দুই চোখ বন্ধ করে ফেললো! কিন্তু বোমার শব্দ আরো জোরালো হয়ে উঠলো।

মনে হল, তার পিঠের ওপর এসে বোমাগুলো সব ফেটে যাচ্ছে! আর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

গঙ্গারাম প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না।

হঠাৎ একটা কৈ মাছের কাঁটার ধাক্কা খেয়ে সে অনেক দূর ছিট্‌কে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলে, সে তক্তপোষ থেকে নীচে পড়ে গেছে। প্রাণপণে নিজের বালিশটা শুধু আঁকড়ে ধরেছে।

ভাগ্যিস্ তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় নি। নইলে গোটা বোর্ডিং-এর ছেলেরা এসে সেখানে জুটতো। লজ্জা ঢাকবার আর ঠাঁই থাকতো না।

শিক্‌কাবাব কিন্তু তার দায়িত্ব ভোলে নি। সকাল সকাল তেল মেখে, কোমরে গামছা জড়িয়ে একেবারে গঙ্গারামের ঘরে এসে হাজির।

গঙ্গারাম তখন মন দিয়ে অঙ্ক কষছে।

শিক্কাবাব বললে—'অঙ্ক এখন রাখো। সনাতনবাবুর হুকুম মনে নেই ? আজ তোমায় সাঁতার শেখাতে হবে।'

গঙ্গারাম অত্যন্ত বিরক্তভাবে শিক্কাবাবের মুখের দিকে তাকালো।

রাত্তিরের সেই এলোমেলো স্বপ্নগুলো তখনো তার মগজে কিলবিল করছে।

সেই কৈ মাছের কাঁটা নিয়ে তেড়ে আসা!

গঙ্গারাম কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে বললে—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। আজ থাক্—'

কিন্তু শিক্কাবাব শোনবার পাত্রই নয়। হ্যাঁচ্কা টানে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিলে। উত্তর দিলে—'সে সব আপিল পরে করবে। সুপারী-লণ্ঠনের কড়া হুকুম, সাঁতার তোমায় শেখাতেই হবে। তারপর যদি শরীর খারাপ হয়, তবে আমাদের বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর স্বাস্থ্যের জন্য রয়েছে ডাক্তারবাবু। দু'টো পিল খেলে গায়ের ব্যথা আর থাকবে না!'

গঙ্গারাম মনে মনে বললে—

"পড়েছি শয়তানের হাতে,
চলে যেতে হবে সাথে॥"

গামছাটা কাঁধের ওপর ফেলবারও ফুরসৎ দিতে চায় না শিক্কাবাব। হাত ধরে টানতে টানতে ওকে নিয়ে হাজির করলে নদীর ধারে।

গঙ্গারামের মনে হল—রাশি রাশি কাঁটাওয়ালা মাছ লুকিয়ে আছে নদীর জলের তলায় ; আমাদের তাড়া করতে কতক্ষণ ? আর তা ছাড়া ঝক্‌ঝকে দাঁতওয়ালা হাঙর আছে। যে হাঙরের মুখটা ঠিক সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখের মতো।

রাত্তিরের সেই বিভীষিকাময় স্বপ্ন আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

॥ দুই ॥

শিক্কাবাবের হ্যাঁচ্কা টানে গঙ্গারাম একেবারে নদীর ঘাটে এসে হাজির হল।

হাজির ত হল। কিন্তু জলে নামতেই রাজ্যের ভয় ওর মগজে এসে বাসা বাঁধলে।

শিক্‌কাবাব আড়চোখে ওর কাণ্ড-কারখানা দেখছিল ; এইবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবৃত্তি করলে—

"জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার—
হাঁটিতে শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড় !"

তারপর মুখ টিপে টিপে সে হাসতে লাগল।

কবিতাটা কি গঙ্গারাম জানে না ? না কি, সে ভালোভাবে আবৃত্তি করতে পারে না ? সবই গঙ্গারামের জানা আছে। কিন্তু সে ভাবছে, মানুষ বেমক্কা এমন বেরসিক হয় কেন ? এই সুন্দর সকালবেলা, নদীর ধার,...ঝিরঝির করে দিব্যি হাওয়া বইছে। কেউ হয়ত এসে এই নদীর ধারে বসে সুন্দর গান ধরলে, শুনতে কি মধুরই না লাগবে ! তা নয়, কি না বলে—ওই নদীর জলে নেমে সাঁতার কাটতে হবে ! নদীর তলায় কি আছে কে জানে ? হাঙর থাকতে পারে, কুমীর থাকতে পারে, আরো কত কাঁটাওয়ালা মাছ থাকতে পারে ! হুট করে নামো বললেই কি নামা যায় ? তার চাইতে নদীর ধারে বসে নানারকম মজার মজার দৃশ্য দেখা কত আরামের ! ওই ত' সুন্দর একটি ডিঙি নৌকো হেলতে-দুলতে এই দিকেই আসছে। নদীর ঢেউয়ের মাথায় চেপে ছোট্টো ডিঙি-নৌকোটাও মাথা দোলাচ্ছে। ছইয়ের ভেতর থেকে একটি রাঙা টুকটুকে মুখের ছোট্ট দু'টি হরিণ-চোখ নদীর দু'ধার দেখে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই বিয়ের কনে। শ্বশুরবাড়ী চলেছে, কত দূরে কে জানে !

হঠাৎ এ কি কাণ্ড !

একটি লঞ্চ যেন তীরবেগে ওই ডিঙি-নৌকোটার পাশ দিয়ে চলে গেল। ঢেউ উথাল-পাথাল হয়ে উঠলো।

একটা 'গেল-গেল' চীৎকার উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সেই ডিঙি-নৌকোটা মুহূর্তের মধ্যে উল্টে গেছে ! কনে-বৌটা যে জলের মধ্যে ডুবে গেল !

চারদিকে একটা 'হায়-হায়' শব্দ শোনা গেল !

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সুপারী-লণ্ঠনবাবুর আর এক মূর্তি দেখা গেল।

তিনি কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে ক্রমাগত বাঁশী বাজিয়ে নদীর ধারের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছেন।

এক মুহূর্তে সিনেমার দ্রুতগতি ছবির মতো দৃশ্যপটের পরিবর্তন হল। বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলের দল চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে সাঁতারের পোশাক পরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কে আগে সাঁতার কেটে গিয়ে ওই ডুবন্ত ডিঙি-নৌকোর মানুষগুলোকে উদ্ধার করবে, তারই যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে !

গঙ্গারাম রাত্তিরে যে কৈ মাছের সাঁতার কাটার স্বপ্ন দেখেছিল, তাই যেন নতুন করে সকালবেলা জীবন্ত হয়ে উঠেছে! তর্‌তর্‌ করে জল কেটে এগিয়ে চলেছে ছেলের দল, আর তীরে দাঁড়িয়ে সুপারী-লণ্ঠনবাবু বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন।

অবশেষে ছেলেদের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হল। শিক্‌কাবাব ত' গঙ্গারামের পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করছিল। সে যে কখন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গোটা দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে গঙ্গারাম সেদিকে আদৌ খেয়াল করে নি।

সেই শিক্‌কাবাবই বৌটিকে বাঁচিয়েছে।

আর একটি নৌকো ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সবাই ধরাধরি করে সেই নৌকোর ওপর কনে-বৌটিকে তুলে দিয়েছে।

ততক্ষণে আর সব ছেলে গিয়ে নৌকোর অন্যান্য লোককে জল থেকে টেনে তুলেছে!

একটি বুড়ো নৌকোর ওপরে বসে তামাক টানছিল। সে বোধকরি কনে-বৌয়ের শ্বশুর। সেই বুড়ো অনেকটা জল খেয়েছিল। প্রাণ যাক্‌ সেও ভালো, তবু সে নাকি হাতের হুঁকোটি ছেড়ে দেবে না! ছেলেরা জোর করে সেটি ফেলে দিতে তবে বুড়োর জীবন রক্ষা হয়।

ততক্ষণে নৌকোটাকে ঘিরে ছেলের দল একেবারে ঘাটের কিনারায় এসে পৌঁছেছে। আর সুপারী-লণ্ঠনবাবু তাঁর বাঁশী বাজানো থামিয়ে দিয়ে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গঙ্গারাম শ্বাস বন্ধ করে পরম বিস্ময়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল, আর মনে মনে বুঝতে পারছিল, কেন এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবু সাঁতার জানার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

নিজেকে ভারী ছোট মনে হতে লাগল গঙ্গারামের। তাই ত'! সে যে এখানে একেবারে অকেজো মানুষ তা একটু আগেও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি!

নৌকো থেকে ঘাটে নামানো হয়েছে কনে-বৌটিকে। সুপারী-লণ্ঠনবাবু—মানে সনাতনবাবু এগিয়ে এসে ওকে একবার বসিয়ে আবার শুইয়ে দিয়ে এই ভাবে খানিকক্ষণ কসরৎ চালিয়ে ওর পেটের জল সব বের করে ফেললেন।

তারপরেই মজার কাণ্ড!

জ্ঞান ফিরেই পেয়ে বৌটি চারদিকে পাগলের মতো তাকাতে লাগল।

সনাতনবাবু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন—'ভয় নেই মা! ছেলেরা তোমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে তুলেছে। এইবার চলো আমাদের বোর্ডিং-এ। একটু গরম দুধ খেলেই বেশ খানিকটা বল পাবে।'

কিন্তু কনে-বৌটি নড়বার নাম করে না, শুধু তাঁর দিকে তাকায়।

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'কিছু বলতে চাও মা ? বলো না, লজ্জা কি ? আমরা সব ব্যবস্থা করে দেবো। বোর্ডিং-এ শুকনো কাপড় আছে। ভিজে শাড়ী ছেড়ে ফেলে তাই এখন পরবে চলো'—

হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে কনে-বৌটি। বুকফাটা চীৎকার করে উঠলো— 'আমার গয়নার বাক্স !'

ওকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিক্‌কাবাব ফোড়ন কাটলে—'হুঁ ! প্রাণটাই ত' চলে যাচ্ছিল ! সেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে কিনা, তাই সকলের আগে গয়নার বাক্সের খোঁজ পড়েছে। আমরা যে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্ দিয়ে দিচ্ছিলুম সেটা বুঝি কিছু নয় ?'

সনাতনবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'ওরে চুপ কর্। গয়নার বাক্স যে মেয়েদের কতখানি তা তোরা বুঝবি কি করে ?'

তারপর বৌটির দিকে তাকিয়ে বললেন—'আগে তোমরা একটু সুস্থ হও। তারপর ওরা আবার খোঁজ-খবর করে দেখবে'খন।'

শিক্‌কাবাব এক অদ্ভুত ধরনের ছেলে। এক মুহূর্ত আগে যে নিজের জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এখন সে বৌটির গয়নার লোভ দেখে রসিকতা করতে ছাড়লে না ! বললে—'সে গয়না পরে এতক্ষণ জলদেবী নদীর অতল জলে বসে মুক্তোর আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।'

ছেলের দল এই টিপ্পনী শুনে ভারী খুশী হয়ে উঠলো। অতি পরিশ্রমের পরও তারা সবাই প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগল।

সবাই দল বেঁধে বোর্ডিং-এ ফেরবার সময় শিক্‌কাবাব এক সময় গঙ্গারামকে একান্তে পেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—'বেমক্কা নৌকোডুবি হল বলে আজ খুব বেঁচে গেলি কিন্তু কাল তোকে কে বাঁচাবে শুনি ?'

গঙ্গারাম উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—'আমি সাঁতার শিখবো। তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

শিক্‌কাবাব ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—'ব্যস্ ব্যস্ ! এই ত' মরদের মতো কথা !'

হাতি কা দাঁত—
মরদ কা বাত্ !

সেদিন গভীর রাতে গঙ্গারাম আবার স্বপ্ন দেখলে। এ আবার অন্য রকম স্বপ্ন !

গঙ্গারাম যেন বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে নিরালা নদীর তীরে বেড়াতে এসেছে।

একটা মিঠে ঝিরঝিরে হাওয়া দেহ-মনকে দোল দিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা।

আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নিজেদের বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের বুকে রঙের খেলা। মনে হল—অদেখা বিধাতাপুরুষ অনেকগুলো রঙের বাটী নিয়ে ছবি আঁকতে বসেছিলেন। হঠাৎ হাত লেগে সেই রঙের বাটীগুলো সব উল্টে পড়ে গেছে। তাই মেঘের বুকে নানা রঙের মাখামাখি। আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রঙের সুষমা সব পাল্‌টে যাচ্ছে।

গঙ্গারাম অবাক হয়ে এই রঙের খেলা দেখছিল। আস্তে আস্তে সব রঙ মিলিয়ে গেল আকাশে। একটা বাদুড় তার কালো ডানা মেলে আকাশটাকে যেন ক্ষণকালের জন্য ঢেকে ফেললে।

আবার একটু বাদেই দেখা গেল—চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়। সেই চাঁদের আলো খেলা করছে নদীর জলের ঢেউয়ের সঙ্গে।

অবাক হয়ে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখছে গঙ্গারাম। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো—একটি শিশু নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে। শিশুটি দু' হাত তুলে যেন গঙ্গারামকে ডাকলে, তাকে নদীর জল থেকে তুলে নেবার জন্য। গঙ্গারামের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সে একবারও চিন্তা করে দেখলে না যে, সে সাঁতার জানে না। এক মুহূর্তও ভাববার সময় নেই তার। চাঁদের আলোতে সে পরিষ্কার দেখতে পেলে—সেই শিশুটি একবার ভাসছে, আবার পরক্ষণেই ঢেউয়ের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। কোমরের কাপড় ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গঙ্গারাম নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দিব্যি তর্‌তর্‌ করে ঢেউ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল, তাই ত'! সে ত' একটুও সাঁতার জানে না! নদীর ঢেউয়ের ওপর দিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে কি করে?···এই কথা মগজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গারামের সাঁতার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তার হাত-পা আর ওঠে না। সে নদীর জলে তলিয়ে যেতে লাগল, প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলো,—'কে আছ, আমাকে বাঁচাও!'

কেউ জানতে পারলে না, কেউ বুঝতে পারলে না যে, গঙ্গারাম এইভাবে নদীর তলায় তলিয়ে যাচ্ছে! ডুবতে ডুবতেও সে একবার চোখ তুলে দেখলে, শিশুটি ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক দূর ভেসে চলে গেছে। এখনো তার সেই কচি কচি হাতের মুঠি চকিতে চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে স্বপ্নটাও গেল ছিঁড়ে।

যাক—বাঁচা গেল!

তা'হলে সত্যি সে নদীর জলে ডুবে যাচ্ছিল না। কিন্তু নদীতে ডুবে যাওয়ার যে আতঙ্ক, তাতে সে তখনো শিউরে শিউরে উঠছিল।

কুল-কুল করে ঘাম বইছে তার সারা শরীরে। বিছানাটা ঘামে একেবারে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই বাচ্চা ছেলেটা? সেও তা'হলে স্বপ্ন? গঙ্গারামের মনে হল, তেষ্টায় তার গলা কাঠ হয়ে গেছে। জলের জন্য সে চীৎকার করে উঠলো! কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না।

হঠাৎ চোখ কচ্‌লে তাকিয়ে দেখে, ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে শিক্‌কাবাব। ঘরে কোনো আলো নেই, কিন্তু জানালা দিয়ে যে ক্ষীণ চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে—তাতেই চেনা গেল দাঁড়ানো লোকটি শিক্‌কাবাব।

নাঃ, শিক্‌কাবাব—স্বপ্ন নয়। ও ঠিক গঙ্গারামের বিছানার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠলো—টিক্—টিক্—টিক্! শিক্‌কাবাব যেন এরই প্রতীক্ষা করছিল।

সে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—'এ—ই, উঠে আয় শীগ্‌গির!'

গঙ্গারামের যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। যদি বা স্বপ্নটা কোনো রকমে ভেঙেছে—আবার শেষ-রাত্তিরে শিক্‌কাবাবের এ কি অজানা খেলা? এই অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে নদীতে সাঁতার শিখতে হবে নাকি?

শিক্‌কাবাব আবার ওকে সচেতন করে দিয়ে বললে—'এই, উঠে আয় তাড়াতাড়ি, সনাতনবাবু ডাকছেন।'

একে ত' অজানা জায়গা, তার ওপর অজানা আশঙ্কায় ওর বুক এখনো কাঁপছে! তবু সনাতনবাবুর নাম শুনে ওকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল।

কোনো রকমে চোখে-মুখে জল দিয়ে একটা অবাক-করা কৌতূহল নিয়ে সে শিক্‌কাবাবের পেছন পেছন রওনা হল। শিক্‌কাবাব চলেছে আগে আগে, আর গঙ্গারাম চলেছে তার পেছন পেছন—একেবারে গাধাবোটের মতো। দু'জনের কারো মুখে কোনো কথা নেই।

একটা ছোট প্রদীপ রয়েছে শিক্‌কাবাবের হাতে, তাতে কতটুকু আলো দেয়? যত না আলো দেয়, তার চাইতে বেশী ছড়ায় ধোঁয়া। সেই কাঁপা-কাঁপা আলোর কাঁপা-কাঁপা ছায়া ফেলে দু'জনে লম্বা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলে। গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং একেবারে নিঝুম অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো মায়াদানব যেন তাকে যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। দূরে অন্ধকারে নদীর কলকল্লোল

শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। মনে হচ্ছে, সেই মায়াদানবটা সবাইকে অজ্ঞান করে রেখে এখন নিজে মনের আনন্দে ঘুম লাগিয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা নদীর ফোঁস্-ফোঁসানি যেন সেই দানবটারই নাকের ডাক।

ততক্ষণে সামনের বারান্দাটা ছেড়ে ওরা পেছনের আরো নির্জন অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছুলো।

যে ঘরের সামনে গিয়ে শিক্‌কাবাব দাঁড়ালো—সেখানে কেউ থাকে বলে গঙ্গারামের কোনো ধারণা ছিল না। ওদিকটায় কেউ বড় একটা আসেও না।

এদিকে কেন নিয়ে এলো ওকে ?

গঙ্গারামের বিস্ময় আরো বেড়ে যেতে লাগল।

শিক্‌কাবাব এগিয়ে গিয়ে একটা বন্ধ ঘরের দরজায় শব্দ করলে, ঠক্—ঠক্—ঠক্ !

ঠিক সেই রকম শব্দ শোনা গেল—ঘরের ভেতর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে ভেজানো দরজাটা একটুখানি খুলে গেল।

কোনো কথা না বলে শিক্‌কাবাব গঙ্গারামকে টেনে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা আবার ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

কামরাটায় ঢুকে গঙ্গারামের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো না। ঘরের মধ্যে মা কালীর মূর্তি। মূর্তির দুই পাশে দু'টি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। সেই মূর্তির সামনে ওদের দিকে পেছন দিয়ে বসে আছেন একটি পুরোহিত—তাঁর মুখেও কোনো কথা নেই !

কিন্তু ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি যখন মুখ ফিরালেন তখন গঙ্গারামের আরো অবাক হবার পালা !

কী আশ্চর্য ! সনাতনবাবু লাল চেলি পরে মা কালীর সামনে পুরোহিত হয়ে বসে আছেন।

গঙ্গারাম হঠাৎ নিজের গায়ে একটা চিম্‌টি কেটে বসলো। সে এখনো স্বপ্ন দেখছে না ত' ?

উঁহুঁ ! চিম্‌টিতে বেশ লাগে ! তা'হলে এ ত' আর স্বপ্ন নয় ! গঙ্গারামের চোখ দু'টি বড় হয়ে উঠলো।

আবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলে—এ যেন তাদের সেই সুপারী-লণ্ঠনবাবু নয়—যেন আর কোনো মানুষ।

হ্যাঁ, সনাতনবাবু। চিরকাল যেন তিনি এই আসনে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন ! মা কালীর সামনে তপস্যা করা ছাড়া জীবনে আর তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই !

একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল—"মাকে প্রণাম করো !"

গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে মা কালীর মূর্তির সামনে টিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল।

সনাতনবাবু আবার কথা বললেন—'আজ অমাবস্যা রাত্রি ; বড় সুসময়। আজ মায়ের সামনে তোমাকে আমি দীক্ষা দেবো।'

গঙ্গারামের আবার যেন সব গুলিয়ে যায়।

সে এসেছে এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করবার জন্য। দীক্ষার ব্যাপার সে ত' কিছুই বুঝতে পারছে না।

গঙ্গারাম জেগে আছে—না আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না!

সনাতনবাবুর গম্ভীর গলা আবার শোনা গেল—'আজ তোমায় দীক্ষা দিচ্ছি। তোমার কপালে পরিয়ে দিচ্ছি রক্ততিলক। দেশের সেবা ছাড়া তোমার আর কোনো ব্রত থাকবে না। তুমি আজ থেকে মায়ের নির্মাল্য হয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকলে। আর কেউ যেন জানতে না পারে। বাইরে তুমি থাকবে হাসিখুশী বালক, খেলাধূলায় মত্ত। আনন্দের ফল্গুধারা। এই বোর্ডিং-এ প্রত্যেকটি ছেলের একটি করে হাল্‌কা নাম আছে। এই যেমন ধরো—শিক্‌কাবাব। আজ তোমার নাম হল, দরবেশ। কিন্তু অন্তরে তুমি থাকবে নির্মাল্যের মতোই পবিত্র। মায়ের ডাক যখন আসবে, তখন তুমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই নাও লেখনী, আর এই নাও ছুরি। বুকের রক্ত দিয়ে এইখানে তোমার নাম স্বাক্ষর করো।'

গঙ্গারাম কি বুঝলে, কিছুই জানা গেল না। শুধু সম্মোহিত প্রাণীর মতো সে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর করে দিলে।

॥ **তিন** ॥

তারপর দু'মাস কেটে গেছে।

গঙ্গারাম এখন বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে। এই বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তার মিতালি।

যে গঙ্গারাম একদিন জলকে ভয় পেতো, সে-ই এখন জলের পোকা হয়ে উঠেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে যে সে এত ভালো সাঁতার শিখলো সেইটেই সকলের

বিস্ময়। গঙ্গারাম যখন কোমরে শক্ত করে গামছা জড়িয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ছেলের দল তাকে 'পাকাল মাছ' বলে ডাকে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ওর এখন তিনটে নাম চলতি হয়েছে। একটা হচ্ছে বাপ-মার দেওয়া নাম—গঙ্গারাম, দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুপারী-লণ্ঠনের দেওয়া নাম—দরবেশ, আর তৃতীয়টি ছেলেদের আদরের ডাকনাম—পাকাল মাছ। স্নানের ঘাটে প্রতিদিন যে হুল্লোড় শুরু হয়, সেখানে সে পাকাল মাছ নামেই বিশেষ পরিচিত। তর্‌তর্ করে সে জল কেটে যখন অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়, তখন তাকে জলের মাছ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সত্যি শক্ত।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সর্বত্রই একটা আলাদা আবহাওয়া। সুপারী-লণ্ঠনবাবুর মুখে একটি কথা সব সময়ই শোনা যায়—

"One thing at a time
And that done well,
Is a very good rule
As many can tell."

সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর ছেলেরা যখন যে কাজটি করে, একেবারে সারা মন ঢেলে দিয়ে সেই কাজ সম্পাদন করে থাকে।

এখানে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার নিয়ম। হাত-মুখ ধুয়েই নদীর ধারে বেড়াতে হবে। অধিকাংশ ছেলেই হাফ্‌প্যাণ্ট পরে এই সময় সোজা রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে। সনাতনবাবুও ওদের সঙ্গে ছোটেন। ফিরে এসেই সকলকে এক কাপ করে গরম দুধ খেতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো আপত্তিই টিকবে না। ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই দুধ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি থাকে। কেউ কেউ বলে—'এখনও কি আমরা ছোট আছি নাকি, যে মায়ের কোলে বসে ঝিনুক-বাটি করে দুধ খাবো ?'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে উত্তর দেন—'রোজ দুধ না খেলে সব কাজে লড়বি কি করে রে ?'

যারা আপত্তি জানায় কিংবা দুধের বাটি সরিয়ে রাখে তাদের কিন্তু সমূহ বিপদ!

সনাতনবাবু নিজে গিয়ে নাক টিপে ধরে সেই ছেলেটিকে দুধ গিলিয়ে দেন। পরদিন থেকে সে একেবারে শায়েস্তা হয়ে যায়।

পড়াশোনার সময় কিন্তু কেউ কোনো কথা নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি বালকেরা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যেভাবে বিদ্যা অর্জন করতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টির সামনে ছেলের দলকে তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের নিজের পড়া তৈরী করতে হতো। সেইজন্য এই বোর্ডিং-এর কোনো

ছেলে পরীক্ষায় ফেল করতো না। যে ঘরের একটি ছেলে পরীক্ষার ফল খারাপ করতো, সনাতনবাবু সেই ঘরের প্রত্যেকটি ছেলেকে শাস্তি দিতেন। তাই সব ঘরে সব বোর্ডার কড়া দৃষ্টি রাখতো যাতে কারো পড়াশোনায় এতটুকু ফাঁকি না থাকে! যদি কেউ কোনো বিষয়ে কাঁচা থাকতো, তাহলে সবাই মিলে দিন-রাত পরিশ্রম করে তাকে ভালো রকম তৈরী করে দিত।

অথচ মজা এই যে, প্রতিদিন নদীতে স্নানের সময়ে ছেলের দল যেভাবে মেতে উঠতো, তা দেখলে মনে হতো না যে, এই ছাত্রদলই আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতে পারে!

ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টা যে যার ক্লাসে ছড়িয়ে থাকতো। তারপর আবার বিকেলে বোর্ডিং-এ ফিরে জলখাবার খেয়ে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে জমা হতো। সেখানে দেশী-বিদেশী সব রকম খেলারই ব্যবস্থা ছিল। কেউ খেলতো হাড়ু-ডু-ডু, কেউ গোল্লাছুট, কেউ দাঁড়ি বাঁধা আবার কেউ বা খেলতো গাদি।

কিন্তু সব চাইতে বেশী উত্তেজনা দেখা যেতো ফুটবল খেলায়। হেড্ করে কে গোল দিতে পারে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। আবার সন্ধ্যার পরে হাত-মুখ ধুয়ে, সমবেতভাবে প্রার্থনা করে যে যার পাঠ্য-পুঁথি নিয়ে পড়া তৈরী করতে বসে যেতো। ওরা দুলে দুলে পাঠ মুখস্থ করতো, আর দেয়ালে ওদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দুলতো।

তারপর গভীর রাতে বোর্ডিং-এর বড় ছেলেদের সঙ্গে সুপারী-লণ্ঠনবাবুর গোপন ঘরে যে কি আলোচনা হতো, বাইরের লোকেরা তার কিছুমাত্র সন্ধান পেতো না। তবু অভিভাবকদের দল এই ভেবে খুশী ছিলেন যে, বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের ছেলেরা সব সময় হুল্লোড়ে মেতে থাকে বটে, কিন্তু আসল কাজ তারা কেউই ভোলে না। পড়াশোনায় সবাই তারা চৌকস। আর বিদ্যালয়ের সবগুলো পুরস্কার তারা ঝেঁটিয়ে বোর্ডিং-এ নিয়ে আসতো—তা সে পড়া-শোনার পারিতোষিকই হোক, আর খেলাধূলার শীল্ডই হোক।

সব দিকেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর জয় জয়কার। আশে-পাশের গাঁয়ের ছেলেরা কখনো ভয়ে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর টিমকে খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করতো না।

কিছুদিন বাদেই সনাতনবাবু এই বোর্ডিং-এর পক্ষ থেকে এক সন্তরণ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বসলেন। ঘোষণায় এই কথা পরিষ্কারভাবে জানানো হল—যে কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রদল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে।

প্রতিযোগীদের দুইটি বিভাগে ভাগ করা হবে। আট বছর থেকে বার বছরের ছেলেদের একটি বিভাগ, আর তের বছর থেকে ষোল বছর পর্যন্ত আর একটি বিভাগ। এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রচুর পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এই খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের ইস্কুলে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল।

বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যে যেখানে আছে এমনভাবে সাঁতার অভ্যাস করতে লাগল যে, অনেকের অসময়ে জ্বরই হয়ে গেল। এ ব্যাপারে সনাতনবাবুর প্রখর দৃষ্টি। তিনি হুঙ্কার দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন—'সাঁতারে জিততে গেলে দমই হচ্ছে আসল মূলধন। ঝোঁকের মাথায় খানিকটা বেশ এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সাঁতার দিতে গিয়ে যার দম ফুরিয়ে যায়, সে প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করবে কি করে?'

তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেদের নদীর ধার দিয়ে দু-তিন মাইল ছুটতে হতো। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাদের আবার নদীর জলে সাঁতার কাটতে হতো। সনাতনবাবু সর্বদা একটি বাঁশী নিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন আর সবাইকার ক্ষিপ্রগতি লক্ষ্য করতেন।

এইভাবে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার উদ্যোগ-পর্ব সমাধা হল।

যথাসময়ে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি এসে গেল। ছেলের দলের মনে হল, সেদিনকার সূর্য বোধকরি তাদের মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করবার জন্যই একটু আগে আগে পূব আকাশে উদিত হয়েছে।

আসল আয়োজন সনাতনবাবু ভেতরে ভেতরে সমাধা করে রেখেছেন।

সকাল থেকেই নদীর ধারে যেন মেলা বসে গেল। ছোট ছোট নৌকো প্রতিযোগিতার সময় পাশে পাশে থাকবে—ছোটদের পাহারা দেবার জন্য। কি জানি হঠাৎ কেউ যদি জলে ডুবে যায়! অভিজ্ঞ সাঁতারুরা তখনি লাফিয়ে পড়ে তাদের জল থেকে টেনে তুলবে।

কয়েকজন ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছেন সনাতনবাবু। তাঁরাও ছোট ছোট নৌকোতে প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরী হয়ে থাকবেন। কি জানি, বিপদ-আপদের কথা ত' বলা যায় না। দরকার হলেই তাঁরা কাজে লেগে পড়বেন!

যত বেলা বাড়তে লাগল, ততই নানা গ্রাম থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাতে লাগল। অনেকে দলবল মিলে একেবারে সোজা নৌকো করেই এসেছে। নৌকোতে বসেই সাঁতারের খেলা দেখবে। তারপর সব কিছু শেষ হয়ে গেলে সেই নৌকোতে করেই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাবে। এরা মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখে নি। নৌকোতেই রান্না-বাড়া চলতে থাকবে। যথাসময়ে খাওয়া-

দাওয়া চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু দৃষ্টি থাকবে তাদের নদীর দিকে। ছেলের দল কি ভাবে সাঁতার কাটে সেটা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে হবে বৈ কি!

আর একদল আছে, যারা এই সাঁতারকে উপলক্ষ করে কিছু কামিয়ে নিতে চায়। তারাও মাথায় করে জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে যথাসময়ে। নদীর ধারে তারা দোকান বসাবে।

কেউ বসিয়েছে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান, কেউ সাজিয়ে নিয়েছে মিঠা পানি—মানে, সোডা আর লেমনেডের দোকান। পান-বিড়ি-সিগারেটের অবশ্য বিক্রি সব চাইতে বেশী। সময় কাটাতে হলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই চাই। নৌকোতে বসে আছেন যে সব বুড়ো, তাঁদের হাতে হাতে থেলো হুঁকো সব সময়েই ধোঁয়া ছাড়ছে।

নদীর পাড়ে তেলে-ভাজার দোকানেরও অভাব নেই। গরম গরম ভাজা হচ্ছে, আর লোকের হাতে হাতে উড়ে যাচ্ছে। তেলে-ভাজার মতো মুখরোচক খাবার আর কিছু নেই। আবার তেলে-ভাজার দোকানের পাশেই গরম মুড়ির দোকান। বুড়ীরা ভেজে শেষ করতে পারছে না। আজ একদিনের মরসুমে তারা বেশ কিছু কামাই করে নিতে চায়। জিলিপির দোকানও বসেছে এখানে-ওখানে। গাঁয়ের লোকের কাছে এ পদার্থটিও উপেক্ষার নয়। তা ছাড়া বসেছে ফলের দোকান। কচি শশা, তরমুজ, ফুটি, বেল, কালোজাম—যার গাছে যা ফলেছে ঝুড়ি করে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হবে। মনোহারী দোকানও এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। কাঁচের চুড়ি, মেয়েদের চুলের ফিতে, তরল আলতা, ঝুটো মুক্তোর মালা, আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার—সব কিছুই সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। কিছু কিছু রঙীন জামা-কাপড়ের ছিট্ও আছে বৈ কি সঙ্গে। কে কি পছন্দ করবে, আগে থেকে ত' কিছু বলা যায় না। গাঁয়ের মানুষ, চট্ করে মন ভোলে।

এই মরসুমে জেলের দলও তৎপর হয়ে উঠেছে। নদীর ধারের মানুষ, নদীকে নিয়েই যখন কাজ-কারবার—তখন ওরাই পা পেছিয়ে থাকবে কেন? তা ছাড়া বাড়ি ফেরবার মুখে মাছ সবাইকারই চাই। যারা সাঁতারে জয়লাভ করে পুরস্কার পাবে, তাদের দল ফিরে গিয়ে বিরাট ভোজ লাগাবে। কাজেই বড় বড় রুই-কাতলা চিতোল-বোয়াল চাই বৈ কি! আগে থেকে জাল ফেলে মাছ না ধরলে চাহিদা মেটানো কি চারটিখানি কথা?

বড় বড় গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে আবার একদল বসে গেছে এক কোণে। সাঁতারের ব্যাপারে গুড় কোন্ কাজে লাগবে?

কিছুই বলা যায় না! কোনো দল সাঁতারে জিতে যদি পরমান্ন পরিবেশন করতে চায়, তবে ওই গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে টানাটানি হবে বৈ কি!

এতক্ষণে বিচারকের দল এসে পড়েছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক ও সাঁতারুর দল এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতার বিচারকার্য সমাধা করবেন।

এইবার নদীর ধারে যে দিকে তাকানো যায়, শুধু কালো কালো মাথা। কত লোকে যে গাছের ওপর উঠে বাদুড়ের মতো ঝুলছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই!

দূর থেকে কিন্তু চমৎকার লাগছে দেখতে। একেবারে ছবি তুলে নেবার মতো। তবু এখনো নানা গ্রাম থেকে মানুষের মিছিল আসছে। বোর্ডিং-এর ছাদে উঠে দেখলে মনে হবে, দূর দূর অঞ্চলের মাঠ দিয়ে যেন পিঁপড়ের সারি নদীর দিকে রওনা হয়েছে।

প্রতিযোগীদের যিনি রওনা করিয়ে দেবেন, তাঁকে বলা হয় 'ষ্টার্টার'। তিনি বাঁশী নিয়ে এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছেন। অনেক সময় বন্দুকের শব্দ করেও প্রতি-যোগিতা শুরু করা হয়।

প্রতিযোগীরা কেউ হাফ্‌প্যাণ্ট পরে, কেউ মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়ে নিয়েছে। সারা গায়ে ভালো করে সরষের তেল মালিশ করে নিয়েছে সবাই। বড় ছেলেরা এই কাজের দারিত্ব গ্রহণ করেছিল।

প্রথমে ছোটদের দলের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রদল। তার ভেতর আমাদের পাকাল মাছও দিব্যি বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেজে উঠলো বাঁশী। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

মেয়েরা তীরে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করে উঠলো। একদল বৌ-ঝি নানা রঙের ফুল ছিটিয়ে দিলে নদীর জলে। সেগুলো ভেসে যেতে লাগল ঢেউয়ের ধাক্কায়। আবার আর একদল ছেলে নদীর জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে মজা দেখতে লাগল। সেই কাগজের নৌকোগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীদের নাম লেখা! তাই নিয়ে সবাইকার উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

ক্ষুদে প্রতিযোগীরা এরই সঙ্গে জলের মধ্যে হাত টেনে টেনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কখনো তাদের মাথা দেখা যাচ্ছে, কখনো তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলে।

প্রতিযোগীদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডিঙি-নৌকোগুলো। ডাক্তারেরা তটস্থ হয়ে নৌকোর ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনরক্ষী-বাহিনী দলের কারো চোখের পলক পড়ে না। কোন্ মুহূর্তে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বৈ কি!

যেখানটায় সন্তরণের সমাপ্তি-রেখা, সেই জায়গাটা দড়ি দিয়ে ভালো করে ঘিরে রাখা আছে। আর একদল বিচারক সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তাঁদের হাতে কি সব খাতা-পত্র রয়েছে।

মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করে কয়েকটি ছেলে অবসন্ন হয়ে পড়লো। আর তাদের হাত চলে না। হয়ত ওরা ডুবেই যেতো। ওদের তাড়াতাড়ি নৌকোতে তুলে নিলে জীবনরক্ষী-বাহিনী।

চূড়ান্ত উত্তেজনা শেষ হবার মুখে। কয়েকটি ছেলে টর্পেডোর মতো দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। উল্লাসধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গেল নদীর তীর। আবার এখানেও ধ্বনিত হয়ে উঠলো মঙ্গল-শঙ্খ।

হঠাৎ চোখের নিমেষে পাকাল মাছ সবাইকে অতিক্রম করে তীরবেগে ছুটে এসে নির্দিষ্ট দড়ি স্পর্শ করলো।

আবার জয়ধ্বনি উঠলো চারদিক থেকে। সনাতনবাবু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছুটে এসে পাকাল মাছের গলায় একটি সুন্দর ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলেন।

॥ চার ॥

সবাই বললে—'পাকাল মাছ জলে পালিয়ে যায়। কিন্তু ডাঙায় ?'

সেখানে আর ছাড়ান নেই।

পাকাল—মানে, গঙ্গারাম ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়—'কেন ? কি হল ? আমার পালিয়ে যাবার কি দেখলে তোমরা ?'

—'পালিয়ে যাবার মতলব নয় ? এত বড় একটা যুদ্ধ জেতা! সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া, মানেই ত' একটা বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করা। সেই সম্মুখ-সমরে সাফল্য লাভ করে খাওয়ানোর নামগন্ধ নেই ?'

—'খাওয়ানো মানে ?'

—'খাওয়ানো মানে খ্যাঁট্! যাকে শুদ্ধু ভাষায় বলে, ভুরি-ভোজন।'

পাকাল মাছ যেমন জলে কিল্‌বিল্ করে ওঠে! তারপর ফোড়ন কাটে—"আমি এত কষ্ট করে প্রথম হয়েছি, সেজন্য তোমাদেরই উচিত আমায় খাইয়ে দেওয়া। তা নয় কিনা, একেবারে উল্টো চাপ! আমি কেন মিছিমিছি ভূত-ভোজন করাতে যাবো ?'

গঙ্গারামের এই ফোড়নে সবাই যেন তপ্ত বালিতে খৈয়ের মতো লাফাতে থাকে—

"কী! আমরা ভূত? আমাদের খাওয়ানো মানে, ভূত-ভোজন? বেশ! তুই যদি না খাওয়াস ত' আমরাই চাঁদা করে তোকে খাইয়ে দেবো।'

গঙ্গারাম যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে; বলে—'এই ত' সত্যিকারের 'মানুষের' মতো কথা! আচ্ছা, তোমরাই ভেবে দেখ,—আমি কত দিন ধরে কসরৎ করে সাঁতার শিখেছি! তারপর দিনের পর দিন অনুশীলন করে আমার গতি বাড়িয়েছি। রোজ সকালে ছুটে ছুটে দম বাড়িয়েছি। জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাঁতারের কলা-কৌশল আয়ত্ত করেছি। এই সাঁতার শেখার ব্যাপারে কত জল খেয়েছি, সে সব কথা তোমরা হিসেব করে দেখেছ কেউ? আজ বেড়ালের ভাগ্যে যখন শিকে ছিঁড়েছে, তখন তোমরাই ত' ডেকে নিয়ে গিয়ে আমায় ভরপেট খাইয়ে দেবে! আমি মুক্তকণ্ঠে তোমাদের সবাইকার জয়ধ্বনি দেবো।'

—'খুব যে বক্তৃতা দিচ্ছিস্ পাকাল মাছ!' একজন দাঁড়িয়ে উঠে ওকে ধমক দেয়।

—'এই ত' সেদিন এলি এই বোর্ডিং-এ। তখন মুখ দিয়ে কথাও বেরুতো না! এরই মধ্যে তোর ডানা গজিয়েছে, একেবারে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে উড়তে শিখেছিস্!'

পাকাল মাছের মুখে আর হাসি ধরে না! উত্তর দিলে, 'আরে এই জন্যেই তোদের উচিত চাঁদা করে আমাকে ভালো করে খাইয়ে দেওয়া।'

সকলে বললে, 'সাবাস্! সাবাস্! তাই হবে। তোর মনোবাসনাই পূর্ণ করবো আমরা। কিন্তু কি খাবি তুই? মাংস? মাছ? না—নিরামিষ?'

গঙ্গারাম শুধু একবার ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো মুখ করে বললে, 'কোনো রান্নাতেই আমার আপত্তি নেই, শুধু দেখতে হবে ঝালটা বেশী না হয়। তা হলেই কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবো।'

ছেলের দল হুল্লোড় করে ওঠে, 'আচ্ছা তোকে তাই খাওয়াবো। জলের নৌকো, আর আকাশের ঘুড়ি—এ ছাড়া যে তুই সব খাস তা কি করে জানবো?'

এমন সময় সনাতনবাবু এসে হাজির হলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'খাওয়া-দাওয়ার কথা এখানে কি হচ্ছে শুনি?'

ছেলেরা উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, 'একটি ভূতকে ভোজন করাতে হবে।'

সনাতনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'সেজন্যে তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, বাবুইবাসা বোর্ডিং-এই 'ফিষ্টী' লাগিয়ে দিচ্ছি। একেবারে যাকে বলে—দিয়তাং ভুজ্যতাং! আনো, ঢালো আর খাও। তোমরা সব জলের পোকা হয়ে উঠছ, তাই নানা রকম মাছের রান্নাই খাওয়াবো তোমাদের।'

এই মধুর সন্দেশে ছেলের দলের মধ্যে একটা হুল্লোড় জেগে উঠলো—সেই ভালো, সেই ভালো।

সবার তরেই জমবে ভোজ,
কেই বা রাখে কাহার খোঁজ ॥

পরদিন থেকে বোর্ডিং-এর ছেলেরা এক নতুন আনন্দে মেতে উঠলো।

কি কি মাছ জালে ধরা পড়বে, কোন্ মাছ দিয়ে ঝোল, কোন্ মাছ দিয়ে পাতুড়ী, কোন্ মাছ দিয়ে ঝাল-হলুদ, আর কি মাছ দিয়ে মালাইকারী তৈরী হবে ছেলে-মহলে শুধু তারই আলোচনা চললো।

সনাতনবাবু রসিক মানুষ। মাঝে মাঝে সব কিছু দিয়েই রসান দিতে লাগলেন। বললেন, 'সাঁতারের ব্যাপার' বলেই কি শুধু মাছের কথা ভাবতে হবে? বড় বড় রসগোল্লার কথা ভাবো, চিনিপাতা দৈয়ের কথা চিন্তা করো, আর খাম্‌চা মেরে নেবার ক্ষীরের কথাও আন্দাজ করতে থাকো সবাই'—

পাকাল বলে, 'অমন করে বলবেন না স্যার! আমার জিবে একেবারে জল এসে যাচ্ছে!'

এমনি আনন্দের হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে যখন সারা বোর্ডিং-এর ছেলের দল, তখন একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে সনাতনবাবু মৃদুপায়ে গঙ্গারামের ঘরে গিয়ে হাজির হলেন; চাপা গলায় ডাক দিলেন, 'দরবেশ!'

গঙ্গারাম তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে! সনাতনবাবুর চাপা গলার ডাক তার কানে পৌঁছুলো না।

পাকাল মাছ তখন স্বপ্ন দেখছে—সে যেন ক্ষীর-সমুদ্রে সাঁতার কাটছে আর এক দল কৈ মাছ আবার তাকে তাড়া করেছে। সে যতই প্রাণপণে এগুতে যাচ্ছে ততই যেন ক্ষীরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই সনাতনবাবুর গম্ভীর গলার ডাকও সে শুনতে পেলে না!

সনাতনবাবু ওর খাটের কাছে এসে আর একটু চীৎকার করে ডাকলেন, 'পাকাল মাছ!'

এইবার গঙ্গারামের ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা স্বপ্নটা ভেঙে যেতে সে ধড়মড় করে খাটের ওপর উঠে বসলো।

—'অ্যাঁ! আপনি স্যার! এত রাত্তিরে?'···

গঙ্গারাম বুঝতে পারলো না—সে এখনো স্বপ্ন দেখছে, না জেগে উঠছে!

সনাতনবাবু তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি। ওঠো দরবেশ। তোমার ডাক পড়েছে। তোমায় আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে; কখন আহ্বান আসবে কেউ জানে না।'

গঙ্গারামের ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বললে, 'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে স্যার! কি আমায় করতে হবে বলুন—'

সনাতনবাবু চুপি চুপি বললেন, 'এখন আর তুমি গঙ্গারাম নও, পাকাল মাছও নও, তুমি দীক্ষা লাভ করে হয়েছো দরবেশ ! দেশ-জননীর আহ্বানে এই তোমার প্রথম কাজ। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।'

গঙ্গারামের দু'চোখের পাতা থেকে তখন ঘুম পালিয়ে গেছে ; বললে, 'গুরুদেব, আপনি আদেশ করুন কি আমায় করতে হবে। আমি প্রস্তুত। আমার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই।'

সনাতনবাবু ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস্ ! এই ত' কর্মীর মতো কথা। এইবার মন দিয়ে শোনো তোমার কাজের কথা !'

—'বলুন।'

—'একটি পুঁটলী আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। তার ভেতর কি আছে—সে কথা জানবার জন্য যেন তোমার মনে কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'জাগবে না গুরুদেব !'

—'এই পুঁটলী নিয়ে তুমি নিঃশব্দে নদী সাঁতরে ওপারের খেয়াঘাটে গিয়ে উঠবে। সেই খেয়াঘাটের কাছেই একটা বিরাট বটগাছ আছে। সেই বটগাছের তলায় একটি পাগল আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে ঢেকে শুয়ে থাকবে।'

—'কে সে পাগল প্রভু ?'

—'কিচ্ছু জিজ্ঞেস কোরো না। আগেই বলেছি, তোমার মনে যেন কোনো কৌতূহল না জাগে।'

—'বুঝেছি প্রভু ! এইবার বলুন আমায় কি করতে হবে।'

—'সেই পাগলের শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু তিনবার উচ্চারণ করবে—নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য ! অমনি দেখবে সেই পাগল উঠে বসেছে। তাব মুখ দেখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করো না। পাগলও তার মুখ সেই সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখবে। তুমি শুধু সেই পাগলটার হাতে এই পুঁটলীটা তুলে দিয়ে আবার নিঃশব্দে চলে আসবে। আসবার সময় খেয়া নৌকোয় পার হয়ে আসবে। কিন্তু যাবার সময় সাঁতরে নদী পার হবে। সব মনে থাকবে ত ?'

—'সব মনে থাকবে গুরুদেব ! দিন আপনি পুঁটলী।'

—'তার আগে তুমি একটি হাফ্‌প্যান্ট পরে নাও। সুইমিং কষ্টিউম্ হলে আরো ভালো। সঙ্গে ধুতি নিতে ভুলো না। আসবার সময় সেই ধুতি পরে আসবে। এক হাতে সাঁতরে যেতে পারবে না ?'

দরবেশ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললে, 'পারবো, এক মিনিটের মধ্যে আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।'

পাছে ঘুম-ঘুম ভাবটা আবার ফিরে আসে, এজন্য মুখ-চোখ ভালো করে ধুয়ে

ফেললো দরবেশ। হাফ্‌প্যাণ্টটা পরে নিলে। ইচ্ছে করেই গায়ে কোনো জামা রাখলো না! সঁাতার দেবার পক্ষে সুবিধে হবে।

এইবার এগিয়ে এলেন সনাতনবাবু। দরবেশের মাথায় হাত রেখে—বিড়-বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লেন। তারপর সে পুঁটলীটা ওর হাতে তুলে দিলেন।

দরবেশ বেশ বুঝতে পারলো যে, পুঁটলীটা ভারী। কিন্তু জলে নামলে এ ভার আর থাকবে না,—সে খবর সে রাখে।

সনাতনবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে আর একটি কথাও না বলে সে সোজা বাইরে বেরিয়ে এলো।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ—অজস্র তারার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আছে।

দরবেশ নদীর ঘাটের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। যেখান থেকে ওরা রোজ সঁাতার দিতে শুরু করে ঠিক সেইখানে গিয়ে সে হাজির হল।

ওপারের খেয়াঘাটের মৃদু আলো চোখে পড়লো। মাথার ওপর সে আর একবার তাকালো।

কৃষ্ণপক্ষের ঘন কালো আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমেছে।

কিন্তু দরবেশ তাতে ভয় পাবে না। গামছা দিয়ে পুঁটলীটা ভালো করে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে নিলে। তাতে সঁাতার দেবার কোনো অসুবিধে হবে না।

একটু বাদেই 'জয় মা কালী' বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

সে শুধু একবার পেছন ফিরে দেখলে, গোটা বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসটা ঘুমের অতল তলে তলিয়ে আছে। শুধু সনাতনবাবুর ঘরে একটি মৃদু আলো জ্বলছে। ঠিক সেই সময় সনাতনবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরবীনের ভেতর দিয়ে মসী-কালো নদীর জলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদী তার পরিচিত।

এই ত' কয়েক দিন আগেই এই নদীতে সঁাতার কেটে সে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। নদীকে তার আদৌ ভয় নেই। তার ভয় হচ্ছে মসী-কৃষ্ণ অন্ধকারকে।

এই আঁধারের ভেতর সঁাতার কাটতে গিয়ে কোনো রকমে দিক-ভ্রম না হয়!

নদীর ওপারের খেয়াঘাটে যে মৃদু দীপটি জ্বলছিল, দরবেশ তাকে ধ্রুবতারার মতো মনে করে জোরে জোরে হাত চালাতে লাগল।

সনাতনবাবু তখনো তাঁর জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দরবেশ। নদীর মাঝামাঝি এসে যে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু ওদিক থেকে ওটা আসছে কে ? এই অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে একটি ছোট্ট লঞ্চ ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে আসছে।

দরবেশ দুই চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলো।

হুঁ! আর ভুল নয়। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে!

ওটা জল-পুলিশের লঞ্চ। দরবেশ আরও সাবধান হয়। তাহলে গুরুদেব ওর হাতে এমন জিনিস তুলে দিয়েছেন—যার সন্ধান করে ফিরছে জল-পুলিশের দল!

পরাধীন ভারতে যে একদল তরুণ—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য মনে করে বিপদ-সঙ্কুল পথে এগিয়ে চলেছে, সে খবর দরবেশ রাখে।

আর সেই পথে পা বাড়াবার জন্যই ত' সেদিন গভীর রজনীতে মা কালীর সামনে দীক্ষা দিয়েছেন গুরুদেব।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! সে কিছুতেই কর্তব্যচ্যুত হবে না।

জল-পুলিশের দল কি তাকে দেখতে পেয়েছে ?

পুলিশের লঞ্চ এত আস্তে আস্তে আসছে যে, তার কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। লঞ্চ থেকে কোনো ভেঁপুও বাজছে না।

এক মুহূর্তে দরবেশ তার কর্তব্য স্থির করে ফেললে। তার পাশেই যাচ্ছিল একটি খড়-বোঝাই নৌকো।

দরবেশ দ্রুতবেগে হাত চালিয়ে সেই খড়ের নৌকোর আড়ালে আত্মগোপন করলো।

জল-পুলিশের লঞ্চ আর তাকে দেখতে পাবে না!

ওর ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। খড়ের নৌকোটা ওপারের খেয়াঘাটের দিকেই চলেছে। এতে ওর ভালোই হল। কষ্ট করে সাঁতার কাটতে কিংবা হাত-পা চালনা করতে হল না। সে নৌকের একটা আংটা ধরে চুপচাপ নিজেকে ভাসিয়ে রাখলো। নৌকোর সঙ্গে সঙ্গেই সে এগিয়ে চলতে লাগল খেয়াঘাটের দিকে।

খড়ের নৌকো ওর সহায়, বাতাসও তার অনুকূল। বিশেষ আর কোনো কষ্টই করতে হল না তাকে।

নৌকো যখন এসে খেয়াঘাটের কাছে নোঙর করলো, তখন সে অতি সহজেই পারের দিকে উঠে গেল। পেছনে তাকিয়ে দেখলে, জল-পুলিশের লঞ্চটা মাঝ-নদীতেই কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

দরবেশের পা দু'টো উত্তেজনায় কেমন যেন কাঁপছিল। তবু সে এতটুকু বিশ্রাম করলেনা। নদীর ধারের কাদা ভেঙে এক রকম ছুট্ লাগল—সেই বটগাছের উদ্দেশে।

হ্যাঁ, তাই ত'! একটা লোক আপাদ-মস্তক নিজেকে ঢেকে শুয়ে আছে!

সে মন্ত্র উচ্চারণের মতো মৃদু কণ্ঠে কইলো···নির্মাল্য—নির্মাল্য—নির্মাল্য !!!

॥ পাঁচ ॥

সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রের মতোই কাজ হল। পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা দেওয়া সেই পাগলটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তারপর ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল দরবেশের দিকে।

সনাতনবাবুর কথা বেশ মনে ছিল—কোনো কৌতূহল যেন মনে না জাগে।

তাই দরবেশ সেই অচেনা পাগলটার মুখের দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। অবশ্য চাইলেই কিছু দেখা যেতো না! কেননা পাগলটা উঠে দাঁড়িয়েও চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল।

দরবেশও তাড়াতাড়ি তার কাজটা শেষ করে যেতে চায়। এতক্ষণ ধরে জলে সাঁতার কেটে আর খড়ের নৌকোর সঙ্গে ভেসে এসে ওর রীতিমত কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। কাজটা হয়ে গেলেই বোর্ডিং-এ ফিরে যেতে পারে।

তাই কোনো রকম কথা না বলে সে কোমর থেকে পুঁটলীটা খুলে নিয়ে পাগলের হাত দিয়ে দিলে। পাগল এরই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। পুঁটলীটা নিয়ে দ্রুতপদে দূরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুঁটলীটা বেশ ভারীই ছিল। ওর ভেতর কি আছে কে জানে!

কিন্তু সনাতনবাবুর আদেশ—দরবেশ সেকথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

সে এখন যা নিয়ে মাথা ঘামাবে—তা হচ্ছে ভিজে প্যান্টটা ছেড়ে ফেলে শুক্‌নো ধুতিটা পরা। শুক্‌নো ধুতিটা সে বরাবর তার মাথায় পাগড়ীর মতো বেঁধে রেখেছিল। কাজেই একটু-আধটু জলের ছিঁটে লাগা ছাড়া সেটা ভিজতে পারে নি।

বটগাছটার আড়ালে গিয়ে সে শুক্‌নো ধুতিটা পরে নিলে। তারপর ধীরে ধীরে খেয়াঘাটের দিকে রওনা হল।

এবার আর নদী সাঁতার নয়, খেয়া পার হয়েই সে বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির হতে পারবে।

পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভোর হয়ে এসেছে—এখুনি সূর্যোদয় হবে। একটা মিষ্টি ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছে। সারারাত হৈ-চৈ করার পর ওর ভালোই লাগছিল।

যদিও ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল, তবু নদীর ধারের এই সুন্দর ভোর, এই শীতল সমীরণ, এই জবাফুলের মতো টকটকে লাল তরুণ তপনের আবির্ভাব—নতুন করে যেন তার মনে বিস্ময় জাগালো।

সে যুক্ত করে নবোদিত সূর্যকে নমস্কার করলো।

খেয়ার মাঝি তখনো খেয়া নৌকোয় গিয়ে ওঠে নি—নদীর ধারের একটি ছোট্ট খড়ো ঘরে বসে হুঁকোতে সুখটান দিচ্ছে। নৌকো ছাড়বার আগে ভালো করে একটু তামাক টেনে না নিলে দেহে মনে জোর পাবে কেন ?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন ওপারের যাত্রী এসে খেয়াঘাটে জড় হয়েছে। তাদের এতটুকু সবুর সইছে না। ওরা মাঝিকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

মাঝি এইবার হুঁকোতে শেষ টান দিয়ে ছোট ছেলেটার হাতে ওটা চালান করে দুর্গা-দুর্গা বলে নৌকো ছেড়ে দিলে।

সত্যি, সকালবেলাকার এই সুন্দর পরিবেশটি দরবেশকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। নদীর এই চলমান স্রোতোধারা আর তার ওপর সকালবেলার রবির কিরণ এসে খেলা করছে…অবাক হয়ে সেই দিকেই সে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি এর তুলনা নেই।

হঠাৎ তাদের খেয়া নৌকোর পাশেই একটি ষ্টীম লঞ্চের ভোঁ শুনে ওর মধুর স্বপ্নটা যেন আচমকা ভেঙে গেল।

চেয়ে দেখলে সেই জল-পুলিশের লঞ্চ। লঞ্চের ভেতর থেকেই একজন পুলিশের লোক মাঝিকে জিজ্ঞেস করলে, 'ওগো মাঝির পো, একটি লোককে পুঁটলী নিয়ে নদী সাঁতরে পার হতে দেখেছ ?'

মাঝি ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, 'না দারোগা সাহেব, দেখি নি ত'! কেন, ডাকাতি-টাকাতি হয়েছে নাকি কোথায়ও ?'

পুলিশের লোক বললে, 'হয় নি। তবে হতে কতক্ষণ ? এ আবার যে-সে ডাকাত নয়, একেবারে স্বদেশী ডাকাত।'

শুনে দরবেশ চুপচাপ 'ষ্ট্যাচুর' মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো ; জল-পুলিশের দিকে তাকালো না পর্যন্ত।

লঞ্চ নিয়ে পুলিশের দল চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ ফিরে এসে হুমকি দিলে, 'মাঝি, তোমার নৌকো থামাও। আমরা খানাতল্লাসী করবো।'

মাঝি ভয়ে ভয়ে নৌকো থামিয়ে হাত জোড় করে বললে—এ আপনাদেরই রাজত্ব হুজুর। যা খুশী তাই করুন, আমি নৌকো থামিয়ে দিয়েছি।

একটি পুলিশ লাফিয়ে নৌকোর ওপর উঠে এলো। সে সবাইকার জামা-পকেট সব খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগল।

নৌকোর ওপর যারা ছিল অনেকেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল। কেউ কেউ আবার পুলিশের ভয়ে ভ্যাক করে কেঁদেই ফেললো। এক বুড়ো বামুন ভিন্ গাঁয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ের জন্যে পাত্র দেখতে। তিনি চোখ দু'টি কপালের উপর তুলে

ক্রমাগত দুর্গানাম জপ করছিলেন ; বিড়-বিড় করে একবার শুধু বললেন, 'আজ না জানি কার মুখ দেখে সকালবেলা যাত্রা করেছিলাম। শেষকালে পুলিশের হাতে পড়ে হাজতবাস হবে নাকি ? ব্রাহ্মণের জাত-ধর্ম কিছুই আর রইলো না দেখছি।'

পুলিশের লোকটি রসিকতা করে টিপ্পনী কেটে বললে, 'ঠাকুর, তোমার, কানো ভয় নেই। তুমি মিছামিছি কেঁদে মরছো কেন ? চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাকো।

আরো খানিকক্ষণ খানাতল্লাসী করে, নৌকোর পাটাতনের তলাটা ভালো করে দেখে নিয়ে পুলিশের লোক লঞ্চ নিয়ে দূরে চলে গেল।

এবার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিক্রম দেখে কে! তিনি সতেজে দাঁড়িয়ে উঠে হুমকি দিয়ে বললেন, 'হুঁ! বিপদ অমনি হলেই হল! আমি সব সময় গায়ত্রী জপ করছিলাম না ? এই ব্রাহ্মণ থাকতে কারো কোনো ডর-ভয়ের কারণ নেই!'

ব্রাহ্মণের আস্ফালন দেখে নৌকোসুদ্ধু লোক হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন পৈতে বের করে সবাইকে অভিশাপ দিলেন, 'উচ্ছন্ন যাও সব—উচ্ছন্ন যাও! কোথায় আমি সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম, তা এতটুকু কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই!'

আবার আর এক পালা হাসির শব্দ শোনা গেল।

অবশেষে নৌকো এসে ঘাটে ভিড়লো।

দরবেশ তাকিয়ে দেখলে, সনাতনবাবু এসে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওখান থেকে বাবুইবাসা বোর্ডিং অবশ্য বেশী দূর নয়।

নিঃশব্দে দরবেশ গিয়ে ঘাটে নামলো।

সনাতনবাবুর পেছন পেছন দরবেশ বোর্ডিং-এর দিকে রওনা হল।

পথে সনাতনবাবু কোনো কথাই জিজ্ঞেস করলেন না। এমন কি ওর মুখের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলেন না। তবে ওইটুকু বুঝতে পারলেন, ওর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল—সে কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছে।

সনাতনবাবু চুপচাপ গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। দরবেশও নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করলো।

এইবার সনাতনবাবু বললেন, 'দুশ্চিন্তায় সারারাত ঘুমুতে পারি নি। কোনো বিপদ হয় নি ত' পথে ?'

দরবেশ যাওয়া-আসার সব কিছু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। শুনে সনাতনবাবু খুব খুশী হলেন ; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও এইবার কিছু খেয়ে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম লাগাও গে। আজ আর ইস্কুলে যেতে হবে না। আমি তোমার ক্লাসে খবর দিয়ে দেবো'খন।'

তারপর হঠাৎ কি ভেবে বললেন, 'দাঁড়াও এক মিনিট, কাল সারারাত জলে কেটেছে—এই ওষুধটা এক ডোজ খেয়ে নাও।

ওষুধ খেয়ে দরবেশ নিজের ঘরে এসে লম্বা ঘুম লাগাল।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতেই উঠে দেখে, তার শরীরটা বেশ ঝর্‌ঝরে লাগছে। রাত্রি জাগরণের আর দীর্ঘকাল সাঁতার কাটার কোনো গ্লানি নেই।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সে রাত্রে যেমন ঝড়-বৃষ্টি, তেমনি মেঘ-গর্জন।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসের বোর্ডাররা মনে করেছিল—বুঝি গোটা আকাশটাই ফুটো হয়ে তোড়ে জল পড়ছে। সারা পৃথিবীটাকে বুঝি একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাঁচবার আর কোনো আশা নেই!

এই দুর্যোগ মাথায় করে একটি মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে বোর্ডিং হাউসের সদর গিয়ে দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ছিল।

প্রথমে সবাই মনে করেছিল, বুঝি ঝড়ের দাপাদাপি। কিন্তু একই ভাবে যখন দীর্ঘকাল ধরে কড়া নাড়ার শব্দ সবাইকে সচকিত করে তুললো তখন একটি ছেলে দরজা খুলে দিলে।

ঝড়ের ঝাপটা ও বৃষ্টির তোড়ের সঙ্গে একটি মানুষ হুম্‌ড়ি খেয়ে ভেতরে এসে পড়লো।

সবাই শিউরে উঠে দেখলে, মানুষটি রক্তে একেবারে মাখামাখি!

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে। একটি ছেলে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি সনাতনবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো।

সনাতনবাবু এসেই সবাইকে সরিয়ে দিলেন। ওঁর নিজের শরীরে অসীম শক্তি। তাড়াতাড়ি আহত মানুষটিকে পাঁজাকোলে করে নিজের ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে গেলেন। ছেলেদের ডেকে বললেন, 'তোমরা যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। বোর্ডিং-এর সব আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর একটু থেমে খাটো গলায় বললেন, 'এই রাত্তিরে পুলিশ আসতে পারে। আমি না ডাকলে তোমরা কেউ ঘর থেকে বেরিও না।'

ছেলেরা যুদ্ধের সৈনিকের মতো যে যার ঘরের ভেতর ঢুকে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু মন তাদের আতঙ্কে ও উত্তেজনায় ঘন ঘন আন্দোলিত হতে থাকলো।

ঝড়ের দাপট তখনো সমভাবেই চলেছে। মনে হচ্ছে, বীর প্রভঞ্জন বুঝি গোটা বোর্ডিং হাউসটাকে দু'হাতে তুলে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!

সনাতনবাবুর আদেশে সবাই বিছানায় শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু প্রবল উত্তেজনায় তাদের কারো চোখে ঘুম আসছিল না। ওরা কেবল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিল। মনে হচ্ছিল, বুঝি তাদের সবাইকার শয্যাকণ্টক হয়েছে।

ইতিমধ্যে দরবেশও জেগে উঠেছিল। সে এই অশান্ত রাত্রে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই দাপাদাপিতে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সনাতনবাবু ডেকে না পাঠালে ত' সে নিজে থেকে যেতে পারে না। তাই নিজের ঘরে অসহিষ্ণু হয়ে কেবলি পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল।

এমন সময় টক্-টক্ করে তার ঘরের দরজায় একটা শব্দ হল।

দরবেশ বুঝি এরই জন্যে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে।

ওর অনুমান সত্যি।

স্বয়ং সনাতনবাবুই ওর দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ব্যস্তভাবে বললেন, 'সেবা করার অভ্যেস আছে? তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে একবার এসো ত' দরবেশ।'

কোন কথা না বলে সে সনাতনবাবুর পেছনে পেছনে চলে গেল।

দরবেশ সনাতনবাবুর ঘরে ঢুকে দেখলে, শিক্‌কাবাব ইতিমধ্যেই সেখানে হাজির আছে। সেই মানুষটি রক্তে মাখামাখি হয়ে একটা খাটের ওপর পড়ে আছে।

সনাতনবাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল।

দরবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'শোনো দরবেশ, তুমি আর শিক্‌কাবাব আমাকে সাহায্য করবে। এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। ওঁর পায়ে পুলিশের গুলী লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি নদী সাঁতরে পালিয়ে এসেছেন, আশ্রয়ের জন্য।, বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় মিলবে, সে-কথা ওঁর অজানা নয়। কিন্তু শুধু আশ্রয় দিলেই ত' হবে না। পা থেকে ওই গুলী বের করে ওঁর প্রাণ বাঁচাতে হবে। তারপর ওঁর নিরাপত্তার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। শিকারী কুকুরের মতো পুলিশ ওঁর পিছু নিয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের নষ্ট করবার উপায় নেই।

ক্ষিপ্রগতিতে সনাতনবাবু আলমারী থেকে অপারেশনের যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন।

তবে কি সনাতনবাবু আসলে ডাক্তার! বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য সুপারিন্-টেণ্ডেন্টের মুখোশ পরে এইখানে সজাগ প্রহারীর মতো দিন যাপন করছেন।

দরবেশের মনে এই কথাগুলো জাগলো। শিক্‌কাবাবকে দেখেও মনে হল— এই জাতীয় কাজ সে এর আগে বহুবার করেছে। সে শিক্ষিত নার্সের মতো সনাতনবাবুকে সাহায্য করতে লাগলো।

লোকটির ডান পা থেকে দু'টি গুলী অতি কৌশলে সনাতনবাবু বের করে ফেললেন। এই কাটা-ছেঁড়ার সময় মানুষটি এতটুকু উঃ-আঃ শব্দ করলেন না! শুধু চোখ বুঁজে মরার মতো পড়ে রইলেন।

অপারেশন হয়ে গেলে শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আমার বুক-পকেটে কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র আছে, আর কোমরে বাধা আছে 'বন্ধু'। দু'টোই শীগ্‌গির সরিয়ে ফেলো'—

সনাতনবাবু পকেট থেকে কাগজ-পত্র আর কোমর থেকে একটি রিভলভার বের করে চোখের নিমেষে কোথায় যেন লুকিয়ে ফেললেন।

একটু পরেই সদর দরজায় সোরগোল ও করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ইতিমধ্যে সনাতনবাবু নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছেন।

শিক্‌কাবাব ও দরবেশের দিকে তাকিয়ে তিনি খাটো গলায় বললেন, 'হুঁশিয়ার!—দরজায় পুলিশ!'

॥ ছয় ॥

কোনো বিপদের সম্ভাবনা হলে সনাতনবাবু একেবারে ক্ষিপ্রগতি। তখন দেখে মনেও হয় না—এই মানুষটি আবার আরাম করে চক্ষু মুদে গড়গড়ায় সুখটান দিতে থাকেন!

এক পলকের মধ্যে তিনি চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন; তারপর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলেকে ডেকে কাজ ভাগ করে দিলেন।

একজন মেঝেতে-পড়া ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত মুছে ফেলবে। একজন অপারেশনের যন্ত্রপাতি লুকিয়ে ফেলবে, আর চারজন তাঁকে সাহায্য করবে—আহত সেই ভদ্রলোককে চট্‌ করে কোনো জায়গায় লুকিয়ে ফেলবে।

এই কাজটি বড় সহজসাধ্য ছিল না। একটি জলজ্যান্ত মানুষকে কি করে লুকিয়ে ফেলা যায়? তাছাড়া এটি হচ্ছে ছেলেদের বোর্ডিং।

একটি বয়স্ক মানুষকে কিরূপে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রাখা যায়? তাছাড়া এই মাত্র সেই ভদ্রলোকের অপারেশন হয়ে গেল। পুলিশ যখন এসে পৌঁচেছে তখন খানাতল্লাসী নিশ্চয়ই হবে। মানুষটিকে দেখলে তার অপারেশনও চোখে পড়বে। তখন উপায়?

সনাতনবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'হুঁ! উপায় একটা বের করেছি। তোমরা খুব সাবধানে ওঁকে তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

দরবেশরা সবাই দুরু-দুরু বক্ষে আহত ভদ্রলোককে নিয়ে নিঃশব্দে সনাতনবাবুর অনুসরণ করলো।

কি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছেন, সে-কথা ছেলেরা কেউ বুঝতে পারলো না; তাই হতচকিত হয়ে ওরই মধ্যে বিভ্রান্তভাবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

অবশেষে সনাতনবাবু সবাইকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন বোর্ডিং হাউসের একেবারে পেছন দিকে। সেখানে একটি গোয়ালঘর আছে। কয়েকটি গাই সেই গোয়ালঘরে আশ্রয় লাভ করে দিব্যি জাবর কাটছিল। এরাই ছেলেদের খাঁটি দুধ সরবরাহ করে স্বাস্থ্যলাভে সাহায্য করে।

সেই গোয়ালঘরের মাথার ওপরে দেড়তলা মত একটি মাচান আছে। সেখানে গাদা করে খড় রাখা হয়। পাছে গরুর খাদ্য এই খড়গুলো বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যায়—তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেড়তলাতে ওঠার জন্য একটি বাঁশের মই ছিল। সনাতনবাবু নিজেই আগে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ছেলেদের সাহায্যে আহত মানুষটিকে সেই মাচানের ওপর তুলে—খড় দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা দিয়ে দিলেন যে, বাইরে থেকে বিন্দুমাত্র টের পাওয়া না যায়। ওখানে একটি ঘুলঘুলি ছিল। তাই হাওয়া চলাচলেরও কিছুমাত্র অসুবিধে ছিল না। কিছু খড় এমনভাবে ভদ্রলোকের মুখের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল—যাতে তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো কষ্ট না হয়।

খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করে সনাতনবাবু মই দিয়ে নীচে নেমে এলেন। তারপর শিক্কাবাবকে বললেন, 'তুই এক কাজ কর। গোয়ালঘরের পেছনেই মানকচুর জঙ্গল আছে। এই মইটা সেখানে লুকিয়ে রেখে, চট্‌পট্‌ সবাইকে নিয়ে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। ওদিকটা আমি দেখছি।

এই বলে সনাতনবাবু সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে রাতের অনাহুত অতিথি পুলিশের করাঘাত তখনো শোনা যাচ্ছিল।

সদর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একদল পুলিশ আর তার পেছনে দারোগা সাহেব হুড়মুড় করে বোর্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়লেন।

দারোগা সাহেব চটে আগুন।

সনাতনবাবুকে সামনে দেখতে পেয়ে চোখ গরম করে বললেন, 'আপনার ত' মশাই আচ্ছা ঘুম! এত দরজা ধাক্কাচ্ছি আর হাঁকডাক করছি। আপনি কি কিছুই শুনতে পান নি?'

সনাতনবাবু যেন এই মাত্র আরামের ঘুম থেকে উঠেছেন—সেই রকম ভাব দেখিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে, চোখ দু'টো কচলে, উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে মশাই, সেইটেই ত স্বাভাবিক। সারাদিন খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়লে আমায় ডেকে তোলাও যা আর ওই আপনাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করাও তা!'

দারোগা সাহেব ঠিক আগের মতোই গরম মেজাজে জবাব দিলেন, 'দেখুন মশাই, দুপুর রাতে আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে আসি নি।'

সনাতনবাবু যেন বোকা মানুষ—ঠিক এমনভাবে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে, আর একটা লম্বা হাই তুলে বললেন, 'আজ্ঞে আপনি যে আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ নন, তা' ত আপনার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি! রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে রসিকতা করতে পারে একমাত্র শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই।'

'থামুন!' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দারোগা সাহেব, 'এই বোর্ডিং এক্ষুণি খানাতল্লাসী করা হবে।'

সামনে যেন বাঘ দেখেছেন—ঠিক এমনিভাবে লাফিয়ে উঠলেন বোর্ডিং হাউসের সুপারী-লণ্ঠনবাবু, 'কি ব্যাপার বলুন ত'! ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে। এই সময়ে তাদের ডেকে তোলা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক সন্দেহ নেই।'

একান্ত অসহায়ের মতো মুখভঙ্গী করে নিতান্ত নিরুপায় ছেলেদের অভিভাবক সনাতনবাবু বললেন, 'আচ্ছা, সকাল হলে খানাতল্লাসী করা চলে না?'

দারোগা সাহেব আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'না না, এক্ষুণি খানাতল্লাসী করতে হবে। আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে। দেখতে চান?'

সনাতনবাবু আবার অসহায়ের ভঙ্গী করে উত্তর দিলেন, 'না না, দেখে আর কি হবে? আপনি মুখে যখন বলছেন, সেই কথাই যথেষ্ট।'

তারপর হঠাৎ হাঁকডাক দিতে শুরু করলেন, 'ওরে লেণ্ডী—ভেণ্ডী—গেণ্ডী—তোরা সব ওঠ, আজ বোর্ডিং-এ কুটুম এসে গেছে! কত ঘুমুবি তোরা?'

দারোগা সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন, 'থামুন! ওই রকম ষাঁড়ের মতো চীৎকার করে সবাইকে আপনি সাবধান করে দিচ্ছেন! এইটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার ঘটে আছে। একটি কথাও কইবেন না। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আগে কোনো ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।'

দারোগা সাহেব ভারী বুটের শব্দ করে সদলবলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। তারপর যেভাবে খানাতল্লাসী শুরু করলেন, তা দেখে মনে হল না যে, ওঁর নিজের বাড়িতে কোনো ছেলেপুলে বাস করে—তারা লেখাপড়া করে কিংবা নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখে।

বই-পত্তর ছড়িয়ে, জামাকাপড় লাট করে, তোষক বালিশ ছিঁড়ে যেন মুহূর্ত মধ্যে

এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার শুরু হয়ে গেল ! কিন্তু কোনো ঘরেই আপত্তিজনক কিছু পাওয়া গেল না। কোনো হদিসই মিললো না সেই ভদ্রলোকের।

দারোগা সাহেব সব কিছু অনুসন্ধান করে একবার গোয়াল-ঘরেও ঢুকেছিলেন ; কিন্তু মই নেই—তাই ওপরে ওঠার কথা মনে জাগে নি। তাছাড়া হয়ত ভাবলেন, একগাদা গরুর খাদ্য খড় ঠাসা। ওখানে আর কি থাকতে পারে ?

দারোগা সাহেব যখন গোয়ালঘরে ঢুকলেন, তখন ছেলেদের বুক দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু সনাতনবাবু একেবারে নির্বিকার। তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল—তিনি আশেপাশের কথা কিছুই ভাবছেন না !

গম্ভীর গলায় দারোগা সাহেব মন্তব্য করলেন, 'নাঃ, এখানে দেখবার কিছু নেই।'

তখন ছেলের দল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

অবশেষে রান্নাঘর, খাবার ঘর, পায়খানা দেখার পর্বও মিটলো। তাতেও খুশী হলেন না দারোগা সাহেব। দু'টি পাহারাওলাকে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিলেন। সেখানে যদি কেউ ঘাপটি মেরে থাকে !

নাঃ, ওখানেও কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল না।

তখন হতাশ হৃদয়ে দারোগা সাহেব দলবল নিয়ে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। যাবার আগে একটু থমকে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'আমি আবার আসবো।'

সনাতনবাবু ঘাড় কাত করে, হাত দু'টি কচলে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। তবে আগে থেকে একটু খবর দিয়ে এলে ভালো হয়।'

দারোগা সাহেব চটে উঠে বললেন, 'কেন ? কেন ?' 'খবর দিয়ে আসবো কেন ?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে সনাতনবাবু উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে, সময়মতো সংবাদ পেলে হুজুরের জন্য ঠিকমতো জলখাবারের ব্যবস্থা করে রাখতে পারি। দুপুর রাতে সে জিনিসটি কোথায় পাওয়া যাবে বলুন ?'

'হুম !'

বাঘের মতো একটা শব্দ করে দারোগা সাহেব বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গের দলও তাঁকে অনুসরণ করল।

এইবার সনাতনবাবু নিজের দেহটা একটা চেয়ারের ওপর এলিয়ে দিয়ে পুলকিতকণ্ঠে বললেন, 'ওরে দরবেশ, ওরে শিক্‌কাবাব, এই সময় কয়েক কাপ চা তৈরী কর দেখি। শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডা আমেজে গরম চা বেশ ভালোই লাগবে। কি বলিস্ তোরা ?'

আরাম করে সকলের চা খাওয়ার পর সেই আহত মানুষটির কথা মনে পড়লো সবাইকার।

সনাতনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে করেই আমি এতক্ষণ ওদিক পানে তাকাই নি। কি জানি কিছু ত' বলা যায় না! নন্দী-ভৃঙ্গীর দলের কেউ উঁকি মেরে দেখছে কি না! দরবেশ, তুই একবার বাইরেটা ঘুরে দেখে আয়। আমাদের কুটুমদের কেউ ঘাপটি মেরে নেই ত' কোথাও? তারপর নিশ্চিন্তমনে মানকচুর জঙ্গল থেকে মইটা উদ্ধার করা যাবে।'

সেই আহত মানুষটি দুই দিনের মধ্যেই সারা বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর অন্তর জয় করে নিলেন। তাঁর আসল নাম জানবার উপায় ছিল না। সনাতনবাবু আসল নাম জানান নি। কারো জিজ্ঞেস করবার কিংবা কৌতূহলী হবার নিয়ম নয়। কিন্তু তিনি হয়ে উঠলেন সবারকার 'জীবনদা'।মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন বলেই হয়ত তাঁর নতুন নামকরণ হল 'জীবন'।

এই জীবনদার মধ্যেই বোর্ডিং-এর ছেলেরা যেন জীবনের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পেলো!

এত কঠোর···কিন্তু এত কোমল! কয়েকজন বাছাই-করা ছেলের ওপর সেবা-শুশ্রূষার ভার পড়েছিল। তার ভেতর শিক্‌কাবাব আর দরবেশও ছিল। বয়েসে খুব ছোট বলে দরবেশ জীবনদার খুব প্রিয়পাত্র হতে পেরেছিল।

সবাইকার জন্য সন্ধ্যেবেলাটা জীবনদার ঘর একেবারে অবারিত ছিল। এই সময় প্রতিদিন ছেলেদের কাছে তিনি নানা গল্প বলতেন। সেই গল্প বলার ধরণ ছিল একেবারে আলাদা।

কথকের সঙ্গে এতগুলো শিশুচিত্ত যেন সারা দুনিয়ায় ভ্রমণ করে বেড়াতো।

ছেলেদের কাছে জীবনদা ছিলেন একটি জ্যান্ত-বিশ্বকোষ অথবা 'এন্‌সাইক্লো-পিডিয়া'।কত বিষয়ে যে তিনি গল্প করতেন, তার কোনো বাঁধাধরা'হিসেব ছিল না। কখনো দেশ-বিদেশের ইতিহাস, কখনো আবিষ্কারের গল্প, কখনো স্বাধীনতার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, আবার ভূতের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প, শিকারের গল্প, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কাহিনী—জীবনদা যেন এতগুলো ছেলের মন নিয়ে একেবারে ছিনিমিনি খেলতেন!

কখনো তাদের নিয়ে উধাও হতেন অসীম আকাশে—কখনো চলে যেতেন একেবারে সমুদ্রের তলায়! আবার কখনো গভীর জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের পেছনে পেছনে চলতো নৈশ অভিযান! নানা দেশের পতন ও অভ্যুত্থানের কাহিনী, বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কার, আবার নানা রকম লোক-সঙ্গীত সব যেন ছিল তাঁর একেবারে কণ্ঠস্থ।

ছেলেদের মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগতো—একটি মানুষ এত কথা জানলেন কি

করে? ছোটদের পরীক্ষার পড়া তিনি মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। যে যে বিষয়ে কাঁচা তাকে সেই সম্পর্কে তালিম দিয়ে এমনভাবে তৈরী করে দিতেন যে, সেরা নম্বর পেয়ে সে সকলকে অবাক করে দিত!

এরই মধ্যে ছেলেদের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষায় জীবনদা একেবারে ভালো হয়ে গেলেন।

ছেলেদের মধ্যে কানাকানি শোনা গেল যে, জীবনদা এইবার বাবুইবাসা বোর্ডিং থেকে ছুটি নিয়ে অনির্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দেবেন।

শুনে সবাইকার মন খারাপ হয়ে গেল। জীবনদা না হলে তাদের সন্ধ্যেবেলাটা কাটবে কি করে?

সেদিন গল্পের আসরে তখনো কেউ এসে হাজির হয় নি। এক পা, দু' পা করে দরবেশ শুকনো মুখে এসে জীবনদার ঘরে উপস্থিত হল।

দরবেশ কাঁদো-কাদো মুখে বললে, 'জীবনদা, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? এ জানলে তোমাকে এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই ভালো করে তুলতাম না।'

শুনে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন, 'শোন দরবেশ, আমি যা'বার আগে তোকে একটি জিনিস শিখিয়ে দেবো। সনাতনদার অনুমতি পাওয়া গেছে।'

আকুল আগ্রহ দরবেশের মুখে-চোখে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি আমায় শেখাবে জীবনদা?'

জীবনদা তার কানে কানে বললেন, 'কাউকে বলিস্ নি যেন। কাল জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তোকে রিভলবার ছোড়া শিখিয়ে দেবো।'

—'অ্যাঁ! রিভলবার!'

দরবেশের সমস্ত দেহে-মনে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। যা একবার সাঁতরে বয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ হয়েছিল তার, সেই রিভলবার হাতে তুলে নিতে পারবে। কি করে ছুঁড়তে হয় শিখিয়ে দেবেন জীবনদা!

দরবেশের মনে হল—সে যেন এক নতুন জীবনের সন্ধান পাচ্ছে! জিজ্ঞেস করলে, 'কাল কখন শেখাবে জীবনদা?'

দেখা গেল জীবনদা মিটিমিটি হাসছেন। চুপিচুপি বললেন, 'কাউকে আবার বলে ফেলিস্ নি যেন। কাল তুই ইস্কুলে যাসনে। দুপুরবেলা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শিখিয়ে দেবো।'

সেই রাত্রে দরবেশের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না—তারা-ভরা আকাশের দিকে কেবলি তাকিয়ে থাকে।'

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে স্বপ্ন দেখছে, মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র যেন সে হাতে পেয়েছে।

সে এখন বিশ্বজয় করতে পারে।

॥ সাত ॥

দরবেশ নদীর ধারে ঘাসের গালিচার ওপর বসে গালে হাত রেখে চুপচাপ্ কত কি ভাবছিল।

আজ কয়েক মাস হয়ে গেল, জীবনদা তাকে ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান দিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছিল, আর তাঁর কোনো খোঁজ-খবর নেই।

যাঁরা মাতৃভূমির মুক্তির কথা ভেবে নিজের আরামের শয্যা ছেড়েছেন, তাঁরা বুঝি এমনিই হন। স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে তাঁরা নিজেকে কোথাও বেঁধে রাখতে পারেন না। দেশের কোন অঞ্চলে জীবনদা আত্মগোপন করে আছেন, তা তাদের জানবার কোনো উপায় নেই।

জীবনদা এখান থেকে গিয়ে অবধি তাদের কাছে কোনো চিঠি-পত্রও লেখেন নি। হয়ত এই-ই নিয়ম। চিঠি-পত্র লেখা একেবারে বারণ। পাছে এই চিঠির সূত্র ধরে পুলিশ কোনো সন্ধান পায়—তাই বোধকরি সকল দিক ভেবে-চিন্তে এই সাবধানতা!

যাবার আগে জীবনদা দরবেশকে আগ্নেয়াস্ত্রে দীক্ষা দেবার সময় বলেছিলেন, একটি বিদ্যা তেকে শিক্ষা দিয়ে গেলাম ; কিন্তু অকারণে যেন কোনো মতেই এর ব্যবহার না হয়। যখন সত্যিকারের নেতার কাছ থেকে নির্দেশ আসবে, তখনই এর প্রয়োজন হবে। আমি কামনা করি, তোর জীবনে তার প্রয়োজন যেন কোনো দিনই না হয়।'

নদীর জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল দরবেশ। জলধারা কেবলি বয়ে চলেছিল। তার যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি দরবেশের ছোট্ট মগজে নানা রকম ভাবনার ঢেউ কেবলি ওঠা-পড়া করছিল।

হঠাৎ তার সামনে একটি ভিখারীকে দাঁড়াতে দেখে সে মুখ ফেরালে। পকেটে কি আছে তাই খুঁজতে যাচ্ছিল। তারপর আচম্কা ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আর আনন্দে সে চীৎকার করে উঠলো, 'এ কি! জীবনদা?'

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা তাঁর ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বললেন, 'চুপ! আয় আমার সঙ্গে।'

দু'জনে নিরিবিলি একটা গাছতলায় গিয়ে বসলো। সেখানে লোকজন কেউ নেই।

দরবেশের মনভরা রাশি রাশি কথা। কোন্‌টা আগে আর কোন্‌টা পরে জিজ্ঞেস করবে—সে ভেবে ঠাহর করতে পারে না। শুধু মৃদুস্বরে শুধোলে, 'এতদিন কোথায় ছিলে জীবনদা ?'

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'এক জায়গায় কি আর ছিলাম রে বোকচন্দর ! সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হয় আমাদের। আজকে একটা খুব জরুরী কাজে তোর কাছে এসেছি। ভেবে-চিন্তে জবাব দিস্‌। তুই যদি রাজী থাকিস্‌, তবেই সনাতনদার কাছে অনুমতি নেবো।'

দরবেশ এইবার হেসে ফেললে ; বললে, 'আচ্ছা জীবনদা, তোমার কি মনে হয় আমি সত্যি কাজের লোক ? আমার কথা তোমার মনে ছিল ? এই খানিকক্ষণ আগেই আমি ভাবছিলাম, তুমি হয়ত আমাদের কথা একেবারে ভুলেই গেছ।'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে উত্তর করলেন, 'না রে, কিছুই আমি ভুলি নি। কারো মুখ আমার মন থেকে মুছে যায় না। নইলে এতদিন বাদে আবার ভিখিরী সেজে তোর কাছে আসবো কেন ? দরবেশকে কি কেউ কখনো ভুলতে পারে ? ভারী মজার খাবার এই দরবেশ।'

জীবনদার কথা শুনে দরবেশ যেন একেবারে গলে গেল। তা'হলে সেও একটা কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে ! তারই জন্য জীবনদা ছদ্মবেশে এতদূর ছুটে এসেছেন ?

জীবনদা দরবেশের মাথায় একবার শুধু হাতটা বুলিয়ে দিলেন।

দরবেশ একটুখানি চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, কাজটা কি, এখনো ত' তুমি বললে না ?'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'কাজটা সত্যিই একটু শক্ত। তাই বলতে আমি ইতস্ততঃ করছি।'

দরবেশ বললে, 'তোমার কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। সত্যিকারের দেশের স্বাধীনতার জন্য যে কাজ, তা যত শক্তই হোক—আমি করবো।'

জীবনদার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি দরবেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোর কাছ থেকে আমি এই জাতীয় উত্তরই আশা করছিলাম রে দরবেশ !'

তারপর গলা আর একটু খাটো করে বললেন, 'দেখ, তুই ছোট্টটি আছিস্‌। তোকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

এক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে তোকে ছোক্‌রা চাকর হয়ে থাকতে হবে ! তারপর সুযোগ বুঝে কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র সরিয়ে নিয়ে পালাতে হবে। সে সব আমি তোকে সময় মতো শিখিয়ে দেবো। এখন আগে বল, তুই এই কাজটা করতে পারবি কি না ?'

লাফিয়ে উঠে দরবেশ বললে, 'পারবো না মানে ? ছোটবেলায় ত' আমি যাত্রা-

দলে কেষ্ট সেজেছি। আর এই সহজ কাজটা পারবো না? যে কেষ্ট সাজতে পারে, চাকর সাজতেও তার আটকায় না।'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'সাবাস্! আমি জানতাম তুই রাজী হবি। তাই ভিখারী সেজে এতদূর চলে এসেছি। এখন তুই বোর্ডিং-এ চলে যা। আমার কথা কিছু বলিস্ না। আমি একটু বেশী রাত্তিরে গিয়ে সনাতনদার অনুমতি চেয়ে নেবো।'

জীবনদার কথা শুনে দরবেশ মহা খুশী। সে হাসিমুখে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ চলে এলো।

অনেক রাত্তিরে দরজার খটখট আওয়াজ পেয়ে দরবেশের ঘুম ভেঙে গেল।

শোনা গেল, সবাইকে সনাতনবাবু তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন।

চোখে মুখে জল দিয়ে সব ছাত্র গিয়ে চুপিচুপি সনাতনবাবুর ঘরে হাজির হল। এ রকম ডাক তাদের হামেসাই পড়ে। তাই কেউ অবাক হল না। কিন্তু দরবেশের মনে নানা চিন্তা। সনাতনবাবু সবাইকে ডাকছেন কেন? তবে কি তাকে তিনি অনুমতি দেন নি? জীবনদার কাছে বড় গলায় সে বলে এসেছিল যে, চাকর হয়ে থাকতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই! তা'হলে কি সব ভেস্তে গেল?

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেও এক কোণে গিয়ে বসে পড়লো।

জীবনদাকে দেখে বোর্ডিংসুদ্ধ ছাত্র খুশী হয়ে উঠলো। কিন্তু উল্লাস প্রকাশ করবার সুযোগ তারা পেলে না। সোজা দাঁড়িয়ে উঠে সনাতনবাবু বললেন, 'কেউ একটা কথাও বলবে না। এখন আমাদের জরুরী আলোচনা আছে।'

ছেলেদের মুখগুলো প্রদীপের মতোই জ্বলে উঠেছিল। কে যেন ফুঁ দিয়ে সেই আলোগুলো নিবিয়ে দিলে!

সনাতনবাবু বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছ হাত তোলো।

সবগুলো হাত একসঙ্গে উঠে এলো।

তারপর সনাতনবাবু আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, 'কে চাকর হয়ে একটা বাড়ির কাজ করতে রাজী আছ? দরকার হলে লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হবে।'

এইবার কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকায়।

ডানপিটে ছেলে এখানে অনেক আছে। আবার ভালো অভিনয় করতে পারে এমন ছেলেরও অভাব নেই। কিন্তু বোর্ডিং ছেড়ে অন্য জাগয়ায় গিয়ে চাকর হয়ে থাকতে হবে—এ কাজটা মোটেই সুবিধের নয়। একদিনের অভিনয় হলে অনেকেই আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে যেত। কিন্তু একেবারে চাকর হয়ে থাকা,—কত দিনের জন্য কে জানে। তা ছাড়া বাড়ির ভয় সকলেরই আছে!

সনাতনবাবু তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তোমরা কেউ রাজী নও? তোমাদের জীবনদা বড় মুখ করে এসেছেন। তাঁকে কি তোমরা ফিরিয়ে দেবে?'

এইবার দরবেশ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে, 'আমি রাজী আছি।'

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি অনেক দিন চাকর হয়ে থাকিতে হয়—তা হলে?'

দরবেশ বললে, 'তাতেও আমার কোনোরকম আপত্তি নেই।'

সব চাইতে মজার ব্যাপার জীবনদা আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। দরবেশের হাত ধরে সেই নিশীথ রাত্রে—সূচীভেদ্য অন্ধকারে বোর্ডিং থেকে যেন হারিয়ে গেলেন। দরবেশ তার ঘরে গিয়ে আর একটি জিনিসও গুছিয়ে আনবার সুযোগ পেলে না।

নীরবে জীবনদা ওর হাত ধরে পথ চলতে লাগলেন। মনে হল—সারা পৃথিবীতে কেউ কোথায়ও জেগে নেই। মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশ, আর নীচে ঘন কালো অন্ধকার! এ-পথেরও বুঝি আর শেষ নেই!

জীবনদা শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে?'

দরবেশ তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'না না, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তার আবার কষ্ট কি?'

আরো অনেকটা পথ চলবার পর, জীবনদা ওর হাত ধরে ঢালু নদীর পথে নেমে গেলেন। সেখানে একটি ঝোপের ভেতর একটি ছৈ-ওয়ালা নৌকো অপেক্ষা করছে।

জীবনদা দরবেশের হাত ধরে চুপিচুপি সেই নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

নৌকোর মাঝি বললে, 'কর্তা, আপনার কথামতো সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

নৌকোর ভেতর গরম গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা তৈরী। দরবেশ তাই খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো, তারপর একবারে অঘোরে ঘুমোতে লাগলো।

যখন ওর ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু নৌকো চলার এতটুকু বিরাম নেই। চোখ কচলে উঠে বসলো দরবেশ।

কিন্তু জীবনদা কোথায়? তার বদলে ওর শিয়রের কাছে বসে একটি হিন্দুস্থানী লোক হাতের তালুতে খৈনী টিপছে। লোকটি বললে, 'উঠ গিয়া বেটা? আভি তোম্‌কো কাম্‌মে লৌটা দেঙ্গে'—

দরবেশ অবাক হয়ে দেখলে জীবনদা ভিখিরীর কাপড় ছেড়ে হিন্দুস্থানীর ভেক্ ধরে বসে আছেন!

একটু বাদেই নৌকো গিয়ে একটি ঘাটে ভিড়লো। জীবনদা তাকে সরাসরি

একটি বাড়িতে নিয়ে হাঁক দিলেন, 'মাইজি, আপ্‌কা একঠো বাঙালী লেড়কাকো জরুরৎ থা, হাম উস্‌কো লে আয়া !'

হাঁক শুনে একটি মহিলা উঠোনে বেরিয়ে এলেন ; বললেন, 'এনেছিস্‌ বাবা ? বাঁচিয়েছিস্‌। তা ওর নাম কি রে ?'

মহিলার কথা শুনে, দরবেশ হকচকিয়ে হিন্দুস্থানী-রূপী জীবনদার মুখের দিকে তাকালো।

জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠে জবাব দিলেন, 'মাইজি, উস্‌কো নাম হ্যায় রতন।'

॥ আট ॥

বাড়ির গিন্নী আদর করেই রতনকে ঘরে ডেকে নিলেন। বললেন, 'মন লাগিয়ে যদি থাকিস্‌ তবে সব পাবি। নতুন ধুতি কিনে দেবো, গেঞ্জি দেবো, গামছা পাবি। চুল ছাঁটাইয়ের পয়সা পাবি। তা ছাড়া চাকরের শোবার আলাদা কম্বল বালিশ ত' আমাদের রয়েছেই। খেতে দেবো সমানে-সমানে। আমরা যা খাবো, তোকেও তাই খেতে দেবো। কোনো তফাৎ করবো না আমি। তবে একটা কথা আছে রতন'—

এই বলে গিন্নিমা একটু থামলেন। চারিদিকে তাকিয়ে বেশ একটু খাটো গলায় বললেন, 'আমাদের কর্তা একটু রাগী মানুষ কি না, চড়-চাপড়টা হয়ত দিয়ে বসবেন কখনো কখনো। তা কিছু মনে করিস্‌ নে বাবা রতন। মনে করিস্‌ তোর বাবা যেন একটু শাসন করছে।'

তারপর আর একটা ঢোক গিলে গিন্নী বললেন, 'সেজন্য তুই দুঃখ করিস্‌ নে রতন। আমি তোকে ঠিক পুষিয়ে দেবো।'

গিন্নীর কথা শুনে রতন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরো একটু গলাটাকে খাটো করে গিন্নীমা ওর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'যেদিন চড়-চাপড় মারবে, আমি তোকে একটি আধুলি দেবো। আর যেদিন তোর দিকে কাপ কি গেলাস ছুঁড়ে মেরে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে, আমি পুরো একটা টাকাই তোর হাতে তুলে দেবো। আমি তোর মায়ের মতো। এই আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি—একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে সয়ে যাস্‌ রতন। নইলে আমার আর কোনো উপায় নেই।'

অসহায়ের মতো বাড়ির গিন্নী রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ীর গিন্নীর মুখে মনিবের বিবরণী শুনে রতন হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না। এই যদি তার রোজকার কাজের নমুনা হয়, তা'হলে সে কত দিন ধৈর্য ধরে এখানে টিকে থাকতে পারবে সে-কথা জোর করে বলা শক্ত!

কিন্তু জীবনদাকে সে কথা দিয়ে এসেছে। চট্ করে চলে যেতেও ত' পারবে না। সে উদ্দেশ্যে জীবনদা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সেই কাজ হাঁসিল না করতে পারলে যে জীবনদার কাছে, সনাতনবাবুর কাছে, আর বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেদের কাছে একেবারে ছোট হয়ে যাবে।

তাই কষ্ট স্বীকার করেও তাকে লেগে থাকতে হবে। একবার এগিয়ে এসে পেছু হটলে চলবে না।'

সে শুধু গিন্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না না, আমি কাজ করতেই এসেছি। লেগে থাকতেই চাই। আপনি শুধু আমায় কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিন।'

এইবার গিন্নীর দুই চোখ জলে ভরে এলো। রতনের হাতটা ধরে বললেন, 'তুই আমায় বাঁচালি রতন, বাঁচালি।'

চাকরদের থাকবার জন্য একটা আলাদা ছোট ঘর। সেখানে কম্বল আর একটা ময়লা বালিশ পড়ে রয়েছে। ঐ বিছানা যে কত লোকের ব্যবহার করা বিছানা, 'কে জানে।

রতন মনে মনে ঠিক করলে, 'ওই নোংরা বিছানায় সে কিছুতেই শোবে না। তার চাইতে একটা বারান্দায় খাটিয়াতে পড়ে থাকবে, সেও ভালো।'

গিন্নীমা বললেন, 'এতটা দূর থেকে নৌকো করে এসেছিস্। নিশ্চয়ই তোর খিদে পেয়েছে। আগে জলখাবার খেয়ে নে। তারপর আমি তোর সব কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

গরম মুড়ি, জিলিপি আর চা—খিদের মুখে বেশ ভালোই লাগলো।

গিন্নী বললেন, 'এক-এক দিন এক-এক রকম জলখাবার খেতে দেবো তোকে। সেজন্য কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু তুই কর্তার কাজগুলো হাতে হাতে করে তাঁকে ঠাণ্ডা রাখবি।

রতন জবাব দিলে, 'তা আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু বেশী যদি মার-ধর করেন—'

এইবার আঁতকে উঠলেন গিন্নীমা, 'না না, সব সময়ই কি আর মার-ধর করবে? মন খুশী থাকলে বকশিসও পাবি। এমনি মানুষটা দিল্‌দরিয়া, কিন্তু হঠাৎ রেগে গেলে একেবারে বাপের কুপুত্তুর!'

রতন মুচকি হেসে বললে, 'কিন্তু কি কি ব্যাপারে তিনি রাগ করেন, সেটা

আমায় আগে থাকতে জানিয়ে রাখবেন। একটু তা' থেকে আমি দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করবো। নইলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে আর কি!'

গিন্নীর মুখেও এইবার হাসি ফুটলো ; জবাব দিলেন, 'না রে, না! রাগ চণ্ডাল, সেটা ত' আমি জানি। সব সময় আমি তোকে আড়াল করে রাখবো। তা' ছাড়া দু' দিনেই ওর ধাতটা তুই বুঝে নিবি। তখন আর অত ভয় থাকবে না।'

রতনও এইবার দু'পাটি দাঁত বিকশিত করে ফেললো। বললে, 'আমারও ক্রিকেট খেলা অভ্যেস আছে। বলগুলো ঠিক ক্যাচ্ করে নিতে পারবো। তা'হলেই এই প্রাণটা বেঁচে যাবে।'

গিন্নীমাও অব.ক হয়ে গেলেন ওর কথা শুনে। বললেন, 'তুই আবার ক্রিকেট খেলা শিখলি কোথায়? ভদ্রলোকের ছেলে নাকি তুই? বাড়ি থেকে কি পালিয়ে এসেছিস্।'

এই বলে সন্দেহের চোখে তাকালেন গিন্নীমা।

রতন তাড়াতাড়ি গিন্নীর কথার উত্তর দিলে, 'না মা, না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে হলে চাকরের কাজ করতে আসবো কেন? আগে যে বাড়িতে ছিলাম সেখানকার ছেলেরা ক্রিকেট খেলতো কি না! তাই তাদের সঙ্গে খেলে খেলে একটু-আধটু শিখে নিয়েছি।'

ওর কথা শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো গিন্নীর। বললেন, 'তাই বল! আমার কিন্তু তোর চেহারাটা দেখেই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল।'

রতন গিন্নীমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, 'না না, বড়লোকের বাড়ি ছিলাম কি না। বেশ ভাল-মন্দ খেতে দিত। তাই আমার চেহারায় একটু চেকনাই দিয়েছে। নইলে চিরকাল ত' খেটেই খেতে হবে আমাকে।'

রতনের কথা শুনে গিন্নী এইবার বেশ খুশী হলেন।

কাজ যা কিছু বাড়ির কর্তাকে ঘিরেই। আলবোলায় তামাক টানা চলে সর্বক্ষণ। তাই ঘন ঘন কল্‌কে পাল্‌টে দিতে হবে।

কর্তা পুলিশের অফিসার। তাই তাঁর ভুঁড়িটা একটু প্রয়োজনের চাইতে বড়— হাঁটবার সময় সর্বদা আগে আগে চলে। সারা গায়—বিশেষ করে এই ভুঁড়িতে, খুব ভালো করে তেল মালিশ করতে হবে।

তেল মালিশ কাজটি বড় সহজসাধ্য নয়। জোয়ান হিন্দুস্থানী চাকরেরাও এই তেল মালিশ করতে গিয়ে হিমসিম খায়। কত চাকর এই তেল মালিশ করার ভয়েই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে বাড়ির গিন্নী বেশ খাইয়ে-দাইয়ে চাকরকে খুব তোয়াজে রাখতে চান!

কিন্তু কর্তা যেন একেবারে গন্‌গনে আগুন। কখন যে অগ্নিকাণ্ড বাঁধিয়ে বসেন তার কিছু ঠিক নেই।

কর্তা সেদিন বাড়িতে ছিলেন না, তাই বাঁচোয়া। সরকারী কাজে খানাতল্লাসী করতে কোথায় যেন বাইরে গেছেন।

সেদিন সারাটা দিন রতনকে ফাইফরমাস খাটতে হল। এটা আনো, ওটা আনো, কয়লার দোকানে খবর দাও, ঘরে কয় মণ চাল পাঠাতে হবে, সে-খবর পাড়ার মুদীকে জানিয়ে এসো—এই সব।

কর্তা-গিন্নীর একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দু'জনেই ছোট। তাদের প্রতিদিন বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনতে হবে। কিন্তু নদীর দিকে যাওয়া চলবে না। গিন্নী পই-পই করে বারণ করে দিয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রতন, ছেলে আর মেয়েটির দিব্যি খেলার সাথী হয়ে উঠলো। রতনকে না হলে নাকি ওদের বিকেলবেলার খেলা কিছুতেই জমবে না।

সেদিন হাল্‌কা কাজের ওপর দিয়েই দিনটা বেশ কেটে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রতনের ভাগ্যেও চা আর হালুয়া জুটলো।

সন্ধ্যের পর রতন বসে বসে কানু আর বিনুকে গল্প শোনাচ্ছিল। বাড়ির গিন্নী ছিলেন রান্নাঘরে। নিজের হাতে কিছু তৈরী করতে না পারলে কর্তার নাকি মন ওঠে না। কর্তা বাড়ি নেই, তাই গিন্নী মনোমত খাবার করে রাখছেন।

আঁধার ঘনিয়ে আসবার বেশ কিছুক্ষণ বাদে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো। গুরু-গুরু মেঘের ডাক শোনা যেতে লাগলো। আরো খানিকটা বাদে ইন্দ্রের ঐরাবত যেন তার শুঁড় দিয়ে তোড়ে জল ঢালতে শুরু করে দিলে। সারা দেশ জলে ভেসে যেতে লাগলো। উঠোনে হাঁটু অবধি জল জমে গেল।

সেই জল কল্‌-কল্‌ শব্দে জলপ্রপাতের মতো নদীর পথে ছুটতে শুরু করলো। গৃহপালিত জীবজন্তুগুলো বৃষ্টিতে ভিজে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো শীতে।

রতনের গল্পও ঘরের ভেতর বেশ জমে উঠেছে।

আজ কানু-বিনুর চোখে ঘুম নেই। ঘুমের মাসি-পিসি আর কাছে ঘেঁষতে পারছে না! ওরা দু'টি ভাই-বোন চোখ বড় বড় করে বলছে—তারপর রতনদা—তারপর?

রতনও একটির পর একটি গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে ওদের সেই সব গল্প একদিন বোর্ডিং-এ বসে ওরা জীবনদার মুখে শুনেছিল!

এমন সময় বৃষ্টির ভেতর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল, 'বাড়ির সবাই কি সব মরেছে? কেউ একটা আলো ধররতে পারে না?'

বাড়ির কর্তা ফিরে এসেছেন।

এই জল-ঝড়ের রাত্রে একেবারে কাক-ভেজা হয়ে প্রাণটি হাতে নিয়ে কোনো রকমে এসে পৌঁছুলেন তিনি।

তাঁর হুঙ্কার শুনেই কানু আর বিনু এক লাফে উঠে বিছানায় গিয়ে একেবারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লো।

ওদের দিকে তাকিয়ে কে বলবে যে, খানিক্ষণ আগেই ওরা চোখ বড় বড় করে রতনের গল্প গিলছিল!

বাড়ির গিন্নী তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর একটি লণ্ঠন।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, 'ওরে রতন, শীগ্‌গির ছুটে আয়। কর্তা ফিরে এসেছেন। আগে শুক্‌নো তোয়ালে নিয়ে আয়। লুঙ্গিটা এই দড়ির ওপরেই ঝোলানো আছে।'

গিন্নীর ডাক শুনে রতনও তিন লাফে বারান্দায় বেরিয়ে এল। তারপর যে দৃশ্য সে চোখের সামনে দেখতে পেলো, তাতে মনে হল—এইমাত্র কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। কর্তার সেই বিকট দেহ—পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, মাথা আর সেই কিম্ভূতকিমাকার পোশাক থেকে অঝোরে জল ঝরে পড়ছে। উঠোনের জমা জলে হাঁটু অবধি তলিয়ে গেছে। পোশাক জলে ভিজে একেবারে ঢোল হয়েছে। তারই ভারে তিনি আর কিছুতেই এগুতে পারছেন না।

তোয়ালে হাতে বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে রতন।

হাঁটু অবধি ডোবা অবস্থায় কর্তা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'এ ছোকরাকে আবার কোথা থেকে জোটালে?'

গিন্নী ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এর নাম রতন। আজই কাজে লেগেছে।'

কর্তা বললেন, 'হুঁম!...তারপর রতনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধর আমাকে শক্ত করে। তারপর টেনে তোল বারান্দার ওপর।'

কর্তার কাছে রতন যেন একটা বাচ্চা নেংটি ইঁদুর। কর্তার হাতের টানে রতন একেবারে জলের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে উঠলো।

তারপর কিভাবে রতন জল থেকে উঠে পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মতো কর্তার পোশাক খুলে নিয়ে তাঁর হাত-পা-মাথা মুছে দিলে, সে এক বিরাট ইতিহাস!

ততক্ষণে দারুণ পরিশ্রমে কর্তাও হাঁসফাঁস করতে লাগলেন! কোনো রকমে ঢেকুর তোলার মতো একটা হুঙ্কার দিলেন, 'তামাক দে!'

রতন ছুটলো তামাক সাজার জন্য। কিন্তু তামাক কি করে সাজতে হয় সে রহস্য ওর আদপেই জানা নেই।

বাড়ির গিন্নী ছুটে এলেন তাকে হাতে হাতে শিখিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের গুণপনাও বেশী আছে বলে মনে হল না।

ফলে যেভাবে কল্‌কেতে তামাক সাজা হল, তাতে একটা টান মেরেই কর্তা সেই কল্‌কে খুলে সোজা রতনের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

রতন কিন্তু এই রকম একটা ব্যাপার ঘটবে আঁচ করে একেবারে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল।

কল্‌কে তাক্ করতেই সে একটু সরে দাঁড়ালো। ফলে সেই আগুন-ভর্তি কল্‌কেটা দেয়ালের গায় একটি আয়নায় লেগে খান খান হয়ে গেল।

বাড়ির গিন্নী ব্যাপার দেখে একেবারে থ।

আরো ক্রুদ্ধ হয়ে কর্তা উঠতে যাবেন, কিন্তু কোমরের ব্যথায় তাঁকে একেবারে নেতিয়ে পড়তে হল।

সেই রাত্তিরে কর্তা গরম খিচুড়ি খেয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন, আর রতনকে সরষের তেল গরম করে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের তলায় মালিশ করতে হল।

রতন ভেবেছিল, রাগ করে রাত্তিরে আর কিছুই খাবে না। কিন্তু গিন্নীর আন্তরিকতায় সেটি হবার জো ছিল না। তিনি বললেন, 'রাতে উপোসী থাকলে হাতীও কাহিল হয়ে পড়ে'।

তাই বেশী কথা না বলে তিনি সোজা হাত ধরে টেনে এনে ওকে একথালা গরম খিচুড়ির সামনে বসিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে গরম প্যাঁজ-ফুলুরীও বাদ গেল না।

একে মনের দুঃখ, তার উপর খিচুড়ির গরম, রতনের দু'চোখ বেয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দু'হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে কোনো মতে সেই চোখের জল বন্ধ করতে পারে না!

গভীর রাত।

রতন উঠোনের এক ধারের একটি বারান্দায় একটি খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে।

চাকরদের জন্য যে আলাদা ঘর, তাতে সে ঢোকে নি। সে ঘরে তামাক, টিকে সব চারদিকে ছড়ানো। তা ছাড়া বিছানায় যে কত কালের ময়লা জমে আছে সে-কথা বলা শক্ত।

রতন খাটিয়ায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। খাটিয়া ভর্তি ছারপোকা। দু'চোখ বোজবার জো নেই। দূরে থানার ঘণ্টা বেজে চলেছে, কিন্তু রতন বিনিদ্র রজনী যাপন করছে।

আকাশের তারাগুলোর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এই তারাগুলোই ত' বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ওপর অপলক নেত্রে চেয়ে আছে! কিন্তু সে আজ ওদের ওখান থেকে কত দূরে!

হঠাৎ বাইরের দরজায় টক্-টক্ করে শব্দ হল।

চোর-টোর আসেনি ত'?

আবার সেই সাবধানী শব্দ!

রতন পা টিপে টিপে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দিলে।

এ কি! ওর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনদা।

জীবনদা ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—চুপ! কথাটি নয়। দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আয়।

॥ নয় ॥

ঝিম্‌ঝিমে রাত।

রাস্তার তুই পাশে যে জল জমেছিল, সেখান থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। পথ চলতে গিয়েও প্রচুর কাদা।

জীবনদা শুধু বললেন—ভয় পাস্ নে। আয় আমার সঙ্গে।

পথের দু'পাশে যে ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, সেখানে জোনাকি পোকা পিদিম জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষীণ আলোকে পথ চলছেন জীবনদা। ডান হাত দিয়ে রতনের একটা হাত শক্ত করে ধরেছেন যাতে রতন পা পিছনে পড়ে না যায়।

এতক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই খুব পিছল হয়েছে রাস্তাটা।

রতনও পা টিপে টিপে সাবধানে এগিয়ে চলেছে।

অবশেষে ওরা দু'জনে গিয়ে নদীর ধারে হাজির হল। একটা ঝাপড়া বটগাছের তলায় কাঠের একটা গুঁড়ি। সেইখানেই জীবনদা ওকে টেনে নিয়ে গেলেন; বললেন—বোস্, কথা আছে।

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—ওরা আবার জেগে উঠে আমার খোঁজ করবে না ত'?

জীবনদা এইবার হেসে ফেললেন; বললেন, 'না রে, সে ভয় নেই। বাড়ির কর্তা ঠিক কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোয়। তার ওপর আজ আবার বৃষ্টিতে কাক-ভেজা ভিজে এসেছে। আজ কানের কাছে ক্যানেস্ত্রা পিটলেও ওর ঘুম ভাঙবে না।

রতন তখন নিশ্চিন্ত হয়ে জীবনদার পাশে ভাল হয়ে বসল।

জীবনদা বললেন—এখন তুই রতন। কাজেই সব সময় তোকে রতন বলেই ডাকব। ডাক শুনতে শুনতে ওই নামটাই তোর রপ্ত হয়ে যাবে।

এতক্ষণ ছারপোকার কামড়ে রতনের ঘুম হচ্ছিল না। খাটিয়াতে পড়ে এপাশ-ওপাশ করছিল। তার চাইতে নদীর ধারে বসে জীনদার সঙ্গে গল্প করা অনেক ভাল।

জীবনদা কিন্তু গল্প করার জন্য ওকে ডেকে আনেন নি। শুধু বললেন, 'জরুরী কথা আছে রে, শোন্।

রতন উৎসুক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জীবনদা বললেন—আজ আমাদের একটা চমৎকার সুযোগ এসেছে। এই দুর্যোগের রাত্তিরেই কাজ হাসিল করতে হবে।

রতন শুধালে কি কাজ, বল না জীবনদা!

জীবনদা বললেন—ঠিক সেই কথা বলবার জন্যই ত তোকে ডেকে এনেছি রে। মন দিয়ে আমার সব কথা শুনে নে।

জীবনদা একটু চুপচাপ থাকলেন; তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তোকে সব কিছু খুলে বলাই ভালো। দেখ, আমাদের দলের দু'টি নামকরা বিপ্লবী গা ঢাকা দিয়ে এক জঙ্গলের মধ্যে ঘর বেঁধে বাস করছে। কেউ তাদের সন্ধান রাখে না। পুলিশ ত নয়ই। কিন্তু এই পুলিশ অফিসার আমাদের একটা লোককে ঘুষ দিয়ে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। আর লোকটাও বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

রতন যেন অন্ধকারের মধ্যেও আঁতকে উঠলো! জিজ্ঞেস করলো—ওই বিপ্লবী দু'জন কোথায় থাকেন—সে-কথা পুলিশ অফিসারকে বলে দিয়েছে বুঝি?

জীবনদা বললেন, 'অনেকটা তাই। সেই বিশ্বাসঘাতক একটা নক্সা এঁকে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে দিয়েছে।' আসছে কাল এই পুলিশ অফিসারটি আরো লোকজন নিয়ে ওই নক্সার অনুসরণ করে বিপ্লবী দু'জনকে ধরে ফেলবে—এই মতলব এঁটেছে। পুলিশের মধ্যেও ত আমাদের গুপ্তচর থাকে। তেমনি একটি কর্মীর কাছে আমি খবর পেয়েছি। আজই সেই নক্সাটা তোর নতুন মনিবের হাতে পড়েছে।

রতন আবেগে যেন থর্‌থর্ করে কাঁপছে; জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে আমায় কি করতে হবে জীবনদা?

জীবনদা জবাব দিলেন—মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনে রাখ। তোর মনিব যে রকম ভাবে বৃষ্টিতে ভিজে এসেছে, তাতে মনে হয়—ওই নক্সাও ভিজে গেছে। রাত্তিরে শোবার আগে সেই নক্সা নিশ্চয়ই ঘরের কোথাও-না-কোথাও শুকোতে দিয়েছে।

রতন মাথা নেড়ে বললে, 'সম্ভব।'

জীবনদা বললেন, 'সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই। আজ রাত্রেই ওই নক্সা তোকে চুরি করতে হবে। তারপর সিধে চলে আসবি বাইরে! তখন কি করতে হবে আমি বলে দেবো।

রতনের মনে তখনও দ্বিধা,' তাই খাটো গলায় বললে—কিন্তু কুম্ভকর্ণ যদি জেগে ওঠে?

এইবার জীবনদা হেসে ফেললেন; বললেন—আরে বোকা, কুম্ভকর্ণ কখনো নিজে থেকে জাগে? তার ঘুম না ভাঙালে সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। ভগবান আজ রাত্তিরে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। এই সুযোগ হাতছাড়া করা কখনই উচিত হবে না। ভয় নেই। চল, আমি তোকে দোর-গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি—

নিঃশব্দে দুইজনে আবার রওনা হল।

সেই নিশুতি রাত। গোটা অঞ্চলে কেউ জেগে নেই। শুধু একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক আর জোনাকির চক্‌মকি। সাবধানে পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে এলো।

কাদাভরা পথ তেমনি পিছল। কোনো রকমে পা ফস্‌কালে আর রক্ষা নেই।

সদর দরজা থেকেই জীবনদা চলে এলেন, ওদের উঠোনে আর ঢুকলেন না।

রতন একবার পিছন ফিরে দেখলো। বাইরে দারুণ অন্ধকার। কিছুই আর চোখে পড়ে না। মনে হয় কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। সব কালোয় কালো—একাকার।

খুব সাবধানে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে টিপে রতন উঠোন পেরিয়ে টানা-বারান্দার ওপর গিয়ে উঠলো।

কর্তার পা ধোয়ার জন্য গরম জল করা হয়েছিল। তার খানিকটা তখনো পড়ে ছিল বালতিতে। রতন সেই জল নিয়ে ধীরে ধীরে তার কাদামাখা পা দু'টি ধুয়ে ফেললো।

এখন খুঁজে দেখতে হবে—কোথায় সেই ভিজে নক্সা শুকোতে দেওয়া হয়েছে।

আর কোথায় হবে?—নিশ্চয়ই কর্তার ঘরে।

অন্ধকার রাত্তিরে চলা বেড়ালের মতো এক পা-দু'পা করে এগিয়ে গেল রতন।

কর্তা আর গিন্নির ঘর পাশাপাশি। কর্তার ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। তারই মৃদু আলোতে জানালা দিয়ে দেখা গেল, বিরাট দেহ নিয়ে কর্তা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। নিঃশ্বাসের তালে তালে ভুঁড়িটা একবার উঠছে আবার পড়ছে। সত্যি, একটা দেখবার মতো দৃশ্য।

সিনেমায় এই জাতীয় দৃশ্য দেখলে লোকে হেসে পাশের দর্শকের গায়ে গড়িয়ে পড়তো।

কিন্তু রতনের হাতে অত সময় কোথায় যে দাঁড়িয়ে দেখবে? তা ছাড়া ভয়ে আর আতঙ্কে ওর দেহটা থর্‌থর্‌ করে বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল।

আসলে কাজটা চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো রকমে জানা-জানি হয়ে যায়, তা'হলে মার-ধর ত' খেতে হবেই—জেলে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

পুলিশের বাড়িতে চুরি! যাকে বলে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

হুটোপুটি করতে, খেলাধুলায় যোগ দিতে আর সাঁতার কাটতে রতন ওস্তাদ। কিন্তু রাতদুপুরে এমন ভাবে চুরি করা! এতে চরণও কাঁপে—পরাণও কাঁপে! তবু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। জীবনদা সাহস দিয়েছেন। যেমন করে হোক, কাজ হাসিল করতেই হবে।

রতন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে আবার দেখলো। নাঃ, এখন কর্তার জাগবার কোনো লক্ষণ নেই।

ঘরের দরজাটা ও একবার ঠেলে দেখলো। ওটা ভেতর থেকে বন্ধ।

একটা সুবিধে এই যে, জানালায় শিক বসানো নেই। ওটা আগাগোড়াই খোলা।

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। নিজের ওপর বোধ করি অগাধ বিশ্বাস। তাই লোহার শিক লাগাবার কথা আদৌ মনে হয় নি।

রতনের হাল্কা শরীর। অতি সহজেই সে নিজেকে ভেতরে গলিয়ে দিলে।

একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলো। বাঘের গুহার মধ্যে সে ঢুকেছে। এখন প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে হয়।

যে পোষাক পরে কাক-ভেজা হয়ে কর্তা ফিরেছেন, তার কিছুই এ ঘরে নেই। কোথায় সে সব শুকুতে দেওয়া হয়েছে—এই মিশকালো রাত্তিরে সেগুলো খুঁজে বের করা সত্যি শক্ত।

তবু চেষ্টা করতে বাধা কি? রতন আবার ঘরের চারদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। নাঃ, ভিজে জামা-পোষাকের সন্ধান মিললো না। শুধু ভিজে জুতো জোড়া আমসত্ত্বের মতো খাটের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে!

রতন এইবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল; দেখলো একটা ভিজে কাগজ খুলে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। তার ওপর একটা চামচ চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশ্চয়ই এইটে নক্সা।

রতন ভয়ে ভয়ে হাতে তুলে নিয়ে দেখলো।

নক্সা যে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ দিকে রাস্তা গেছে, কোথায় নদী পড়েছে, কোন্ অঞ্চলে বন—সব পেন্সিল দিয়ে এঁকে দেখানো হয়েছে! কিন্তু কাজটা তখনো একেবারে শুকিয়ে যায় নি, একটু একটু ভিজে আছে।

রতন সাবধানে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের হাতে তুলে নিলো; তারপর অতি আনন্দে যেমন তাড়াতড়ি এগিয়ে জানলার দিকে যাবে—অমনি ওর পা একটা টুলের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। সেই টুলটার ওপর একটা কাচের গেলাসে খাবার জল ঢাকা দেওয়া ছিল।

পড়বি ত পড়-হুড়মুড় করে সেই কাচের গেলাস নিয়ে রতন মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। কাচের গেলাস ছটকে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে গেল!

তাতে এমন একটা শব্দ হল যে ওর মনিব 'কে কে' বলে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

রতনের আর এক মুহূর্ত ভাববার সময় নেই। সে বেশ বুঝতে পারছে যে, ভাঙা কাচে লেগে ওর কপালের খানিকটা কেটে গেছে—রক্তও বেরুচ্ছে! কিন্তু দাঁড়ালেই মরণ!

তাই সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে, কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা গলিয়ে একেবারে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ওর মনিবও কোমরের লুঙ্গীটা সামলে নিয়ে ওর পেছন পেছন ধাওয়া করলেন!

হাজার হোক রতন হচ্ছে ছেলেমানুষ, আর ছোটবার ক্ষমতাও তার অনেক বেশী। তাই এক ছুটে উঠোনে পেরিয়ে, সদর দরজা খুলে সে পাগলের মতো দৌড়ুতে আরম্ভ করল।

একে অন্ধকার রাস্তা-তাতে আবার পিছল। দু'পা এগোয় ত তিন পা পেছোয়।

রতন ভেবেছিল—অতি সহজেই জীবনদার সন্ধান পাবে।

কিন্তু কোথায় জীবনদা? আশে-পাশে কোথায়ও তাঁকে দেখতে পেলে না। চীৎকার করে যে ডাকবে তারও কোনো উপায় নেই। তা হলেই পেছনকার ছুটে-আসা কুম্ভকর্ণটা ওর হদিস পাবে।

আন্দাজে রাস্তাটা ধরে নিয়ে সে নদীর দিকে দৌড়ুতে শুরু করে দিলে। মনে মনে এইটুকু শুধু আশা যে, নদীর ধারে যদি জীবনদার দেখা মেলে।

আরো খানিকটা ছোটবার পর ওর আশা সফল হল।

জীবনদা সেই কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসে রয়েছেন; রতনকে ছুটে আসতে দেখেই অসীম আগ্রহে এগিয়ে এলেন।

রতন ওঁর হাতে নক্সাটা গুঁজে দিয়ে বললে—জীবনদা, শীগগির পালান—পেছনে কুম্ভকর্ণ আমায় ধরতে আসছে।

সেই কথা শুনে জীবনদা আঁতকে উঠলেন—অ্যাঁ! বলিস্ কিরে? দানবটা জানতে পেরেছে বুঝি? তা'হলে ত তোকেও ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। দানবটা তোকে দু'টুকরো করে ফেলবে।

এই বলে জীবনদা শক্ত করে রতনের হাতটা চেপে ধরলেন; তারপর ওকে সঙ্গে নিয়েই পাগলের মতো ছুটতে শুরু করে দিলেন!

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—এই ভাবে আর কতদূর ছুটবে জীবনদা? কুম্ভকর্ণ লম্বা লম্বা পা ফেলে ঠিক তোমায় ধরে ফেলবে।

সে কথা শুনে এত ছুটোছুটির মধ্যেও জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন, 'আরে, পাগল হয়েছিস্ তুই! ওই থপথপে দানব কখনো বিপ্লবীর সঙ্গে ছুটে পারে? ওরা প্রচুর ঘী-দুধ-মাছ-মাংস খেয়ে ভারী হয়ে গেছে। আর আমরা না খেতে পেয়ে শোলায় মতো হাল্কা আছি। ওর শক্তি নেই আমাদের ধরে।

তারপর গলা খাটো করে কৌতুকের সুরে জীবনদা বললেন, 'আরে আসল কথাটাই ত তোকে বলি নি!' নদীর দেশে আমাদের সহায় হচ্ছে নৌকো। সেই নৌকো তৈরী হয়ে আছে নদীর ধারের এক ঝোপের আড়ালে। আয় শীগ্গির আমার সঙ্গে—দানবটার চোখে ধূলো দিতেই হবে।

জীবনদার হাত ধরে রতন আবার প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিলো।

অবশেষে ঝোপের আড়ালে সেই নৌকোর দেখা মিললো। মাঝি তৈরী হয়েই ছিল। নৌকোর সামনের গলুইটা সে এগিয়ে ধরলো তাড়াতাড়ি।

জীবনদা রতনকে চেপে ধরে সেই নৌকোর ওপর লাফিয়ে উঠলেন।

একবার ডাইনে-বাঁয়ে দুলে উঠে নৌকোটা তীরবেগে এগিয়ে চললো মাঝ-দরিয়ার দিকে।

তখনো চারদিকে ঘন আঁধার। কাজেই কে যে কোন দিক থেকে ছুটে আসছে কিছুই বোঝবার জো রইলো না।

ইতিমধ্যে জীবনদাও কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে দাঁড় টানতে শুরু করে দিয়েছেন।

দুই জনের চেষ্টায় নৌকো শাঁ-শাঁ শব্দে এগিয়ে চললো।

উভয়ের কথাবার্তা শুনে রতন বুঝতে পারলে,—এরা দুজনেই বিপ্লবী। সেদিনের নৈশ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বেশ খানিকক্ষণ নৌকো এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। তারপর পূব দিক আলো করে জবাফুলের রঙের নতুন সূর্যোদয় দেখে ওরা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে। তিনজনে নবোদিত অরুণকে প্রণাম জানালে।

জীবনদার মুখে হাসি আর ধরে না; বললেন—ওরে শ্যামচাঁদ, নৌকাতে চিড়ে-মুড়ি কি আছে দেখ। আমাদের রতনচাঁদ সারারাত বড্ড দৌড়-ঝাঁপ করছে। তার ওপর আবার কুম্ভকর্ণের বাড়ির মানুষ। তাড়াতাড়ি ওকে খেতে দে, নইলে আমাদের দু'জনকেই চিবিয়ে খাবে!

॥ দশ ॥

নৌকো আবার চললো তীরের কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে, ঝোপ-জঙ্গলের পাশে পাশে —মাঝ-দরিয়া থেকে একেবারে দূরে দূরে।

জীবনদার সতর্ক দৃষ্টি চারদিকে সার্চ লাইটের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো!

অনেক রকম বিপদ আছে দিনের বেলার। জল-পুলিশের নজর আছে, গুপ্তচরদের নৌকো আছে, তা ছাড়া ইতিমধ্যে খবরটা কি ভাবে চারদিকে চালু হয়েছে —কিছু ই জানা নেই।

যে করেই হোক—তাড়াতাড়ি সেই দুটি অসহায় বিপ্লবীকে বনের গোপন আস্তানা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তখনকার দিনে পুলিশ চোর-ডাকাত ধরুক আর না-ই ধরুক, বিপ্লবীদের পেছনে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াতো।

কাজেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের এগিয়ে চলতে হবে।

ইতিমধ্যে জীবনদার ব্যবস্থায় তারা তিনজনেই নৌকোর মাঝির বেশ ধরে ফেলেছে, আর জীবনদা ছোট্ট থেলো হুঁকোয় গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন; চার-দিকে নিজের চোখ দুটিকে শুধু ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ একটা নৌকো এসে পাশে দাঁড়ালো। গলা খাকারি দিয়ে ভেতর থেকে একটা মোটা আওয়াজ এলো—এ নৌকো কোথায় যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা জবাব দিলেন—সাবুল্যার হাটে যাবো গো কর্তা। গরুর জন্যে খড় আর ভূষি আনতে হবে।

তিনজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোটা লোকটি নৌকা ছেড়ে দিতে বললে। নৌকোটা চক্ষের পলকে দাঁড় টেনে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লো।

জীবনদা তখন হুঁকোটা হাতে করে হি-হি করে হাসছেন।

একবার চোখ পিট-পিট করে বললেন, 'বুঝতে পারলি নে কিছু? জল-পুলিশ গো! ওরা ছদ্মবেশে বেরিয়েছে। এদিকে আমরাও যে রাতারাতি ভেক নিয়ে বসে আছি—সে খবর ত ওরা রাখে না। দেখলি ত চাষীর পার্টে কেমন উৎরে গেলাম।

তারপরই জীবনদা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠে বললেন—হুঁ! অনেক মস্করা করা হয়েছে। এইবার দেহটাকে একটু চাঙা করতে হবে। ধর দেখি—একটা ভাটিয়ালী গান! ডান হাতটা কানের পিঠে রেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা গান ধরে ফেললেন—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না!"

স্বীকার করতেই হবে,—জীবনদার গলাটা ভারী দরাজ। নদীর জলের ওপর দিয়ে সেই সুর যেন অনেক দূর অবধি তর্-তর্ করে এগিয়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের ঠেলা দিয়ে বললেন, 'আরে বোক্চন্দর হাঁদারাম, তোরা চুপ-চাপ বসে রইলি কেন? আমার সঙ্গে গাইতে শুরু করে দে।'

রতন বললে, 'আমি যে ভালো করে গাইতে পারি না জীবনদা!'

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন—দূর বোকা! চাষা-ভূষোর গলায় যে গান আসে তাই গা না। আমার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যা দু'জনে।

তখন তিনজনে মিলে আবার ভাটিয়ালী গান শুরু করে দিলে।

ইতিমধ্যে নৌকো কখন যে ঘাটে এসে পৌঁছেছে—রতন চোখ বুজে গাইতে গাইতে টেরই পায় নি।

বেলা তখন প্রায় দুপুর। জীবনদা নৌকোর দড়িটা একটা যজ্ঞডুমুর গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে তড়াক করে নিজে লাফিয়ে পড়লেন আর ওদের বললেন, 'ওরে দুই অকাল-কুষ্মাণ্ড, নেমে আয় শীগগির।'

রতন জিজ্ঞেস করলে, 'এ আবার কোথায় নামলে জীবনদা! সেই জঙ্গলে যাবে না?'

জীবনদার মুখে রহস্যের হাসি। উত্তর দিলেন—যাবো রে যাবো। এখানে আমার এক বোনের বাড়ি। তার সঙ্গে দেখাও হবে, আর এই তিনটে পেটের খোল ভর্তি করতে হবে না?

এই বলে রতন আর গোবিন্দকে দেখিয়ে তারপর নিজের খালি পেট বাজাতে শুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাসি!

জীবনদার হাসিকে নকল করবার জো নেই। সেই হাসির শব্দ শুনে একটি সুন্দরী বৌ এসে যে ঘাটের কিনারায় দাঁড়িয়েছে তা কেউ লক্ষ্যই করে নি।

বৌ নয়, ঠিক একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা! বৌটী বললে, 'এতদিনে বুঝি পাতানো বোনকে মনে পড়লো দাদা?'

জীবনদার মুখটা যেন এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। ওর কাছে গিয়ে বললেন, 'পাতানো বোন কেন বলছিস্? আমার মায়ের পেটের বোন নেই।' তোদের মত কত বোন আমার সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। যখনই সময় পাই তোদের সঙ্গে দেখা করে যাই।

তারপর আবার সহজ সুরে কৌতুক করে বললেন, 'আর বোন না হলে আমাদের এই খালি পেটের গর্ত কে ভরাট করবে শুনি?'

বৌটির চোখ দুটি ছল-ছল করে উঠলো; বললে, 'জানি জীবনদা, কত দিন তোমার খাওয়া হয় না। তখন আমাদের মড়াইভরা ধানের ভাত আর গোয়ালভরা গরুর দুধ যেন তেতো মনে হয়। মুখে তুললে গলা আটকে আসে।'

জীবনদার চোখেও কি জল ? কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য তিনি বললেন, 'ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে, তোর আর একটি দাদা আর একটি ছোট ভাই যে খিদেয় কাঁপছে —সেদিকে নজর দিবি ত একটু !' এই দেখ্, তোর আর এক দাদা গোবিন্দ, আর এই দস্যি ভাই রতন।

এক মুহূর্তে বৌটি একেবারে দিদি হয়ে গেল। রতনকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'আমারও কোনো ভাই নেই জীবনদা। রতনকে আমার কাছে রেখে যাও। আমি বলছি, দিদির সংসারে ওর কোনো অভাব হবে না।'

জীবনদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—থাকবে রে থাকবে ; কিন্তু এখন ত থাকতে পারবে না। আমাদের আজ রাতে একটা জরুরী কাজ আছে। সেই কাজ শেষ করে তারপর দিদির কাছে ছোট ভাইকে পৌঁছে দেবো।

রতনের নতুন-পাওয়া দিদি আর কিছু বললে না, শুধু বাঁধভাঙা চোখের জলকে গোপন করবার জন্য চট্ করে ওদের ভেতরে আসবার ইঙ্গিত করে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

এই মেয়েটি এক মুহূর্তে যেন একেবারে দশভূজা হয়ে গেল। দশ হাতে কাজ শুরু করে দিলে—ভাইদের একটু মাছ-ভাত খাওয়াবার জন্য।

স্বামী বিদেশে থাকে, বুড়ী শাশুড়ীকে নিয়ে সংসার। শাশুড়ী লাঠি ঠুক-ঠুক করে এসে বললেন, 'ভালো করে খাইয়ে দাও বৌমা। কুটুম্বরা বাড়িতে এসেছে, আর আমার খোকা নেই বাড়িতে। দেখো যেন নিন্দে না হয়।'

মেয়েটি বললে, 'সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মা !'

রতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, একেবারে বাড়বাড়ন্ত সংসার। গোবর-নিকানো উঠোন। সারি সারি সব ধানের গোলা। একদিকে পূজোর ফুলের জন্য সুন্দর একটি বাগান। তাতে বাছাই-করা সব ফুল ফুটে আছে। উঠোনের আর এক প্রান্তে গোয়ালঘর ; তাতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধোলো সব গাই।

মেয়েটি এক ফাঁকে এসে রতনকে বললে, 'বাড়িতে এত দুধ, কিন্তু খাবার মানুষ নেই। আজ ভাইদের জন্যে পায়েস করবো।'

জীবনদা তাই শুনে বললেন, 'ওরে পাগলী মেয়ে, অত ঝামেলায় যাস নে। তাড়াতাড়ি ভাতে-ভাত করে দে, আমরা আবার এক্ষুণি পালাবো।'

বৌটি মিষ্টি হেসে উত্তর দিলে—তা বৈ কি ! মনে নেই ভাইফোঁটার দিনে আসবে বলে কথা দিয়েছিলে। আমি পায়েস রেঁধে সারাদিন বসে ছিলাম। তারপর সেই পায়েস খালের জলে ঢেলে দিলাম।

জীবনদা তার বোনের কথা শুনে যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন—সব মনে থাকে রে, সব মনে আছে। তবে জানিস ত বোন, আমাদের

দয়ামায়া, প্রীতি, স্নেহ কিচ্ছু থাকতে নেই। যে আশা করে সে তোর মতো চোখের জল ফেলে, আর যে দিতে চায়, তার বঞ্চিত আত্মা শুকিয়ে কুঁকড়ে ওঠে।

তারপর গলাটাকে একটু খাটো করে জীবনদা বললেন—সেদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে এক মুসলমান বন্ধুর মাচার ওপর শুয়ে তোর ভাইফোঁটার পায়েসের কথাই ভেবেছি শুধু। নীচে নেমে যে একটু পান্তা ভাত খাবো—তারও জো ছিল না।

জীবনদার বোন বললে—থাক থাক, আর বলতে হবে না। আমি শুনতে চাইনে।

চট্ করে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সে যেন কাকে বললে—আমার ভাই আর দাদারা এসেছে। ' বিষণ, তোমাকে কিন্তু পুকুরে জাল ফেলে একটা বড় রুই মাছ ধরতেই হবে।

জীবনদা শুধু অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আজ অনেকদিন পর পাগলীর পাল্লায় পড়েছি, কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি।

রতন উত্তর দিলে—একে আপনি দুঃখ বলছেন জীবনদা? পুকুর থেকে লাফিয়ে উঠেছে টাটকা রুইমাছ, আর আমার দিদি নিজে হাতে রান্না করছে পায়েস।

গোবিন্দ এতক্ষণ ধরে বরাবর চুপচাপ ছিল। এইবার উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—তা'হলে জীবনদা' প্রাণ যদি,যায় তবে পুলিশের গুলিতে না গিয়ে আজ বোনের বাড়ির এই ফলারেই যাক।

তিনজনেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে তারা দেখলে কখন তাদের বোনটি এসে তাদের পাশেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার সরষের তেলের বাটি, আর তিনখানি গামছা। বোনটি বললে—আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। তিনজনে ভালো করে সারা গায়ে তেল মালিশ করে স্নান করে নাও। আমাদের বিষণের মা ইন্দারা থেকে জল তুলে দেবে।

জীবনদা শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ! তুই বলছিস কি বোন? তোলা জলে স্নান? তাও আবার বিষণের মায়ের তোলা? কেন খালের জল কি সব শুকিয়ে গেছে? আমার আবার তোলা জলে স্নান করলে গায়ে জ্বর আসে।... চলরে তোরা সব, খালে যাই। আমাদের নিয়ম কি জানিস ত?

স্নানং খালের জলে,
ভোজনং যত্র তত্র,
শয়নং হট্টমন্দিরে।

বোনটি বললে, 'বাইরে কি হয় আমি ত' আর দেখতে যাইনে। কিন্তু বোনের বাড়ি এসে ওসব নিয়ম বাতিল। এখন আমার হুকুমমত' তোমাদের চলতে হবে।

গোবিন্দ বললে, 'আজ বড় বড় শক্ত হাতে পড়েছ দাদা! পুলিশের চাইতেও কড়া।

জীবনদা বললেন, 'তাই ত' ভাবছি। কপালে যে কী আছে কে জানে!'

বোনটি এইবার ফোড়ন কাটলে—কপালে আজ তোমাদের অনেক দুঃখ লেখা আছে।

রতন এতক্ষণ অবাক হয়ে সব দেখছিল, সবাইকার কথা শুনছিল। কাছে টেনে নেবার ওরও ত' সংসারে কেউ নেই। এমনি যদি একটি দিদি পাওয়া যায় ত' আর কিচ্ছু সে চায় না। রতন বড় স্নেহের কাঙাল।

হঠাৎ রতন জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা দিদি, তোমায় আমি কি বলে ডাকবো?'

দিদি একটু থমকে দাঁড়ালো, তারপর দুই চোখে স্নেহের আমেজ এনে বললে, 'তোমাদের ত' কখনই ধরে রাখতে পারবো না ভাই, তাই আমাকে পথের দিদি বলেই ডেকো।'

পথের দিদি আর দাঁড়ালো না, ওর হাতে আজ অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেল।

জীবনদা বললে, 'চল রে তোরা, ভালো করে আগে তেল মেখে খালের জলে কাল রাত্তিরের কাদাগুলো ধুয়ে আসি।'

তিনজনে নিঃশব্দ খালের দিকে এগিয়ে চলে। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এমনি সব বোন প্রীতির-প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রত্যহ তাদের মঙ্গল কামনা করছে। নইলে বিপ্লবী দল সাপে ভরা পিছল পথে রাতের অন্ধকারে পথ চলতো কি করে?

সত্যি পায়ের কাদাগুলো শুকিয়ে সিমেন্টের মতো লেগে রয়েছে। এগুলো তোলা কম হ্যাঙ্গাম নয়।

গোবিন্দ বললে, 'আজ রাত্তিরের মধ্যেই ওদের দু'জনকে জঙ্গল থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। নইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

রতন বললে, 'কিন্তু দিদি কি আজ ছেড়ে দেবে?'

জীবনদা এইবার হো-হো করে হেসে উঠলেন, টিপ্পনী কেটে বললেন—কুম্ভকর্ণের বাড়ির খানা আমাদের রতনচাঁদের ভালো লাগে নি। তাই যেই টাট্‌কা রুইমাছ আর পরমান্নের গন্ধ পেয়েছে অমনি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে চাইছে।

পরক্ষণেই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'রতন, বয়েস তোমার খুবই কম, সেটি আমি জানি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা করে একদিন পথে বেরিয়েছিলে মনে নেই?'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিলেন—

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে সন্ধ্যার দীপালোক—
নহে ভগিনীর অশ্রুচোখ!

রতনের মনটা সত্যি ভারী খারাপ হয়ে গেল। অনাথ বালকের মতো স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। পড়াশোনা তার সত্যি ভালো লাগে। কিন্তু এই পথে পা দেবার আগে যদি তার সঙ্গে পথের দিদির পরিচয় হতো তবে তারই স্নেহচ্ছায়ায় সে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এখন সে জীবনদার হাত ধরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এখন মঙ্গল-শঙ্খের ডাকে পেছনে ফেরবার উপায় নেই।

দুপুরবেলা খেতে বসে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠে বললেন—আমাদের দেশে অনেক রকম প্রতিযোগিতা আছে। এই যেমন ধরো, রতন সাঁতারে ফার্স্ট হয়েছিল। কিন্তু মাছভাজা খাবার প্রতিযোগিতা বোধ করি এর আগে আর কোথাও হয় নি। রতন, একবার চেষ্টা করে দেখবি নাকি ?

এই বলে জীবনদা নিজেই একটি বড় পেটিতে কামড় দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ বোনটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠলো—পুলিশ—

খালের দিকে একটা জানলা ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে দেখা গেল দূরে একটি পুলিশের নৌকো। মুহূর্ত মধ্যে জীবনদা লাফিয়ে উঠলেন; বললেন, 'গোবিন্দ, রতন—শীগগির। এবার আর নৌকোয় নয়। পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওরা আসবার আগেই পালাতে হবে !

পড়ে রইল বোনের সাজানো পরমান্নের থালা, পড়ে রইলো সারাদিন ধরে তৈরী করা বুভুক্ষু আত্মার প্রীতির পসরা। জীবনদা দুইজনকে দুই হাতে চেপে ধরে উঠোনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লেন পাগলের মতো।

পথের দিদি ছুটে এসে রতনের হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে বললেন—মা মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য। সব সময় কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখিস ! তোর পথের দিদির আশীর্বাদে অমঙ্গল কখনো তোকে স্পর্শ করতে পাররে না।

তিনজনে যখন উঠোন পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলেছে।

পথের দিদির চোখে তখন আর জল নয়—যেন আগুন জ্বলছে !

॥ এগারো ॥

জীবনদার দেহে যেন হাজার হাতীর বল। একদিকে গোবিন্দ আর একদিকে রতনকে ধরে জীবনদা দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন।

ওরা দু'জনেও কম যায় না। সবাইকারই ব্যায়াম করার অভ্যাস আছে। লোকালয় ছেড়ে ওরা বনের পথ ধরে তীরবেগে এগুতে লাগলো।

জঙ্গলের পথ তত সমতল, নয়, এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নীচু। কোথাও-কোথাও কাঁটাগাছ। এখানে-ওখানে গাছের ডাল তাদের হাত মেলে পথ বন্ধ করে রেখেছে। সেইগুলোকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে চলা বড় সহজ নয়!

গা ছড়ে যেতে পারে, মোটা গাছের ডালের সঙ্গে মাথার ঠোকা লাগতে পারে; কাঁটাগাছের টানে কাপড় আটকে যেতে পারে। সব দিকে দৃষ্টি রেখে, নিজেদের বাঁচিয়ে দ্রুতবেগে পথ চলতে হবে।

মাইল দু'য়েক এইভাবে চলবার পর রতন হঠাৎ বলে বসলো, 'যাই বলুন জীবনদা, বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু।

জীবনদা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন—আমরা হচ্ছি এখন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া। আমাদের কি আর খিদে-তেষ্টা থাকতে আছে রে?

গোবিন্দ ফোড়ন কেটে মন্তব্য করলে—তা যাই কেন না বলো জীবনদা, রতন কিছু মন্দ কথা বলে নি। আহা, এমন বড় বড় মাছের পেটি! সেইগুলো পাতের ওপর ফেলে কিনা পালিয়ে আসতে হল!

রতন চোখ দু'টোকে ওপরে তুলে ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীর মতো কইলে—এই পুলিশের দল কিন্তু ভারী বেরসিক। আগে মাছগুলো খাই, তারপর পায়েসের বাটি সাবাড় করি। ততক্ষণে তোরা না হয় ধীরে-সুস্থে আয়,—গোঁফে চাড়া দে; আর না হয় পেতলে-বাঁধানো লাঠিগুলোতে তেল মালিশ কর। তা নয় কি না—এমন গুরুতর পরিস্থিতিতে—হুট্ করে চলে আসা! সত্যি বলছি জীবনদা, রস-কস-জ্ঞান যদি ওদের বিন্দুমাত্র থাকে!

গোবিন্দ বললে—আমাদের সেই পাতে ফেলে আসা মাছ-গুলো এতক্ষণ ধরে পুলিশের পেটে গেল কিনা তাই বা কে জানে!

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই প্রাণ-খোলা হাসির শব্দ শুনলে মানুষ দু'দণ্ডে দুঃখ-বেদনা সব ভুলে যায়।

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—আমার বোনটিকে তোরা এখনো চিনিস

নি। ও বড় দৈস্যি মেয়ে! পুলিশের পেটে যাবার আগে—সব মাছ সে খালের জলে ফেলে দেবে। প্রাণে ধরে কাউকে এক টুকরো খাওয়াতে পারবে না। তবে কি জানিস?—এতক্ষণে সব খাবার সে লুকিয়ে ফেলেছে। পাছে পুলিশ এত খাবারের আয়োজন দেখে আমাদের প্রবেশ ও প্রস্থান কিছু টের পায়—সেইজন্য বোনটি ঝট্‌পট্‌ সব শিকেয় তুলে ফেলেছে। ভারী চটপটে মেয়েটি। বিদ্যুতের মতো ওর চাল-চলন। বিয়ের আগে ত বোনটি আমাদের দলেই ছিল। কত অসাধ্য সাধন যে ও করেছে—তা ভেবে আমিই অবাক হয়ে যাই।

আরো কিছু দূর এগুবার পর জীবনদা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন; বললেন—দেখ, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সবাই এক সঙ্গে একদিকে যাবো না। তা'হলে ধরা পড়লে তিন জনেই জালে আটকে যাবো। আমাদের কাজ তাতে কিছুই হবে না। সব পণ্ড হবে।

রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে কি করতে হবে বলো না! আমি একা একা আবার কোন্ দিকে ছুটবো? রাস্তাঘাট কিন্তু আমি কিছুই জানি নে।

জীবনদা ততক্ষণে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়েছেন। দর-দর করে তাঁর গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। রতন ছেলে মানুষ, তাই সে তখনো ততটা কাহিল হয়ে পড়ে নি।

গোবিন্দ কুকুরের মতো জিব বের করে কেবলি হাঁপাচ্ছে! ওর আবার ঘামটা কম হয়।

জীবনদা বললেন—গোবিন্দ, তুই আমাদের কেন্দ্রে ফিরে যা। ওখানেই সবাইকে সাবধান হতে বলবি। কখন যে পুলিশ হামলা করে ঠিক নেই। জরুরী কাগজ-পত্র সব যেন সরিয়ে ফেলে।

ভয় পেয়ে রতন জিজ্ঞেস করলে—আর আমি? আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো ত'?

নির্বিকার ভাবে জীবনদা জবাব দিলেন—না।

তবে? প্রশ্ন করলে রতন। তার চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

জীবনদা বললেন—রতন, শোন্, তুই এক কাজ কর। তুই সোজা চলে যা আমাদের বোনের বাড়ি। পুলিশ ব্যাটারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পালিয়ে গেছে। আর আমার বোনটি শুধু আতঙ্কে ঘর-বার করছে। তোকে পেলে ও অনেকটা ঠাণ্ডা হবে।

গোবিন্দ জিজ্ঞেস করলে—আর তুমি জীবনদা?

জীবনদা জবাব দিলেন—আমাকে সেই জঙ্গলে ঢুকে বিপ্লবী ভাই দু'টিকে এক্ষুণি সরিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। নইলে পুলিশ যে রকম হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে ওদের ধরা পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সবাই মিলে ধরা পড়ার

চাইতে তিন জনে আমরা তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ি। আমাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে কাজ হাসিল করতেই হবে।

দুইজনের মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। ওরা দুইজনে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তুমি একা যাবে জীবনদা ? পুলিশ যদি পেছন থেকে হঠাৎ তোমায় ঘেরাও করে ফেলে ?

মৃদু হেসে জীবনদা বললেন—না রে! সে ভয় নেই। পুলিশের সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। সেই জঙ্গলে যাবার একটা সোজা পথ আমার জানা আছে। ঘন বনের ভেতর দিয়ে সেই রাস্তায় এগিয়ে যাবো।

এর পরেই তিন জনের পথ তিনমুখো হলো। জীবনদা ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! গোবিন্দ নদীর তীর ধরে উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে দিলে। আর রতন ?

রতনের মনে তখন দারুণ উৎসাহ। সে ফিরে চললো তার পথের দিদির স্নেহ-মাখানো গোবর-নিকানো বাগান-সাজানো মনোরম বাড়িখানির দিকে।

রতন যেন এবার উড়ে চললো। তাই ত! এত আনন্দও তার মনের কোণে জমা হয়ে ছিল! সে ত মোটেই জানতে পারে নি!

শিষ দিতে দিতে আপন মনে পথ চলতে লাগলো রতন। কিছুক্ষণ বাদেই ঘন বনপথ পেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হল।

রতন ভাবতে লাগলো, হঠাৎ যদি তার পিঠে দু'টি পাখা গজিয়ে যায়, তবে সে উড়ে উড়ে একেবারে পরীর মতো পথের দিদির উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হয়। ওকে দেখে পথের দিদির তখন এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল দেখা যাবে।

আর রতন শুধু দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসবে। কোনো কথাই সে বলবে না।

আরো কিছু দূর এগুবার পর নদীর দিকে একটা শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, বিপদ সত্যি পদে পদে! একটু দূরে নদীর কিনারে একটা নৌকো থেকে নামছে একদল পুলিশ। আর তাদের সঙ্গে সেই'মোটা কুম্ভকর্ণ।

নামতে গিয়ে কুম্ভকর্ণের আর এক বিপত্তি। এত বড় বিরাট দেহ—যেমনি ঝপাৎ করে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জুতো একেবারে কাদার মধ্যে বসে গিয়েছে। সে কী করুণ দৃশ্য!

রতন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কুম্ভকর্ণের দুর্গতি লক্ষ্য করতে লাগলো।

সেই মোটা জাঁদরেল লোকটা ক্রমাগত চীৎকার করছে আর পুলিশদের হুকুম করছে—ও রে টেনে আমায় কাদার থেকে তুলে নে! আমি যে সেঁধিয়ে গেলাম—

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরাও তৎপর হয়ে উঠল। কর্তা গর্তে পড়েছে, যে করেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে।

হেঁইও জোয়ান···

এই মারো টান•••

সামাল পরাণ···

উদর বাঁচান···

এই গেল জান···হাফিজ !!!

পুলিশদের গা দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরতে লাগল। পুলিশের দল যত টানে—তত কুম্ভকর্ণ কাদার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় !

এখন উপায় ? এ যে হাতীর গর্তে পড়ার অবস্থা হল !

রতন কোনো রকমে হাসি চেপে মনে মনে ভাবলে, এমন একটা রগড়ের দৃশ্য একেবারে সবাইকার চোখের আড়ালে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গেল !

জীবনদা থাকলে নিশ্চয়ই হো-হো করে হেসে উঠতেন।

সিনেমা কোম্পানীর ক্যামেরাম্যানরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তার ঠিক নেই ! নইলে বহু টাকা খরচ করে যে দৃশ্য তুলতে হতো—তা এমন করে সবাই মিলে হেলায় হারালে !

এ দুঃখ রতনের হয়তো কোনো দিনই যাবে না !

কুম্ভকর্ণের যখন এই প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছিল তখন নৌকো থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে নেমে এলো। সবাইকে হাঁক দিয়ে বললে—এমন করে কিছুতেই হবে না। আমি একটা রশি দিচ্ছি। তার একটা দিক থাক বড়বাবুর হাতে, আর একটা দিক ধরে পুলিশের দল কষে টান মারতে শুরু করুক—যেমন করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি টেনে তোলে নদীর ধার থেকে।

ছোকরার পরামর্শ মতো সেই ব্যবস্থাই করা হল। আবার শুরু হল টানাটানি আর লড়ালড়ি !

কর্তা তখন হাঁসফাঁস করে গোদা পা তুলে তুলে পুলিশ দলের সমবেত আকর্ষণে অনেক কষ্টে কাদার রাজ্যি পেরিয়ে শুক্‌নো ডাঙ্গায় এসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে রতন সচকিত হল।

ওরা যে দল বেঁধে এই দিকেই এগিয়ে আসছে !

রতন যেখানে লুকিয়েছিল সে জায়গাটা অনেকটা ফাঁকা।

একটা গাছকে আড়াল করেই সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দল বেঁধে ওরা যদি কুম্ভকর্ণ সহ এই পথেই এগিয়ে আসে, তবে আড়ালের আর কিছুই থাকবে না।

কুম্ভকর্ণটা ওকে বিলক্ষণ চেনে। তা ছাড়া লোকটা ওর ওপর যে রকম চটে আছে, তাতে ধরা পড়লে আর কোনো মতেই রক্ষা নেই। কুম্ভকর্ণটা ওকে আস্ত গিলে খেতেই চাইবে।

মুহূর্তের মধ্যে সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল।

পলায়নের আর কোনো উপায় নেই। সামনে কিংবা পেছনে—যে দিকেই ছুটতে যাক না কেন, ওদের চোখে পড়ে যাবেই।

পুলিশ ব্যাটাদের হাতে আবার বন্দুক আছে। ওরা যদি রতনকে ছুটতে দেখে বেমক্কা গুলি চালিয়ে বসে তা'হলে আর রক্ষা নেই!

রতন লক্ষ্য করলে—একটু দূরেই একটা পাতকুয়া। ছুটে সেইখানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে—পাতকুয়াটা একেবারে শুক্‌নো। ভেতরে জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

সে ভালো করে মালকোঁচা মেরে তর-তর করে সেই শুক্‌নো পাতকুয়ার মধ্যে নেমে গেল।

ততক্ষণে পুলিশের দল নীচেকার ঢালু জমি ছেড়ে ওপরের দিকে অনেকটা উঠে এসেছে।

একটু বাদেই তাদের পায়ের জুতোর খস্‌খস্‌ শব্দ স্পস্ট শোনা যেতে লাগল।

ওদিকে জীবনদা একা উল্কার বেগে ছুটে চলেছেন।

যে করেই হোক বিপ্লবী দু'জনকে আজ সন্ধ্যের মধ্যে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

যে বিপদের বেড়াজাল চারিদিক থেকে টেনে আনা হচ্ছে—ওরা দু'জন তার কোনো খবরই রাখে না। ওরা দু'টিতে জানে—এই জঙ্গলের মধ্যে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে।

জীবনদাকে যথাসময়ে পৌঁছে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে; নইলে পুলিশের হাতে দু'টি মূল্যবান জীবন একেবারে বিপন্ন হবে। প্রাণ থাকতে জীবনদা কখনই তা হতে দিতে পারেন না।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত' সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। তবু জীবনদার মনোবল এতটুকু নষ্ট হয় নি। তিনি পাগলের মতো আবার সেই আলো-আঁধারে ঢাকা বনপথ ধরে এগিয়ে চললেন। কাঁটা গাছে লেগে পা ছিড়ে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছেন কতবার! খন্দ-খানায় পড়তে পড়তে—কোনো রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিচ্ছেন।

তবু তিনি প্রাণপণে ছুটে চলেছেন। কারণ দু'টি বিপ্লবী ভাইএর মরণ-বাঁচন আজ তাঁর হাতে।

* * * *

পুলিশের দল বহু অনুসন্ধান করে যখন সেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলো, তখন খাঁচা থেকে পাখী পালিয়ে গেছে!

জীবনদা এরই মধ্যে অসাধ্য সাধন করেছেন। পুলিশ এসেছে নৌকো-পথে।

কিন্তু জীবনদা হাঁটা পথে তার বহু আগে এসে বিপ্লবী দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

যে খড়ের ঘরে তারা দু'টিতে বাস করতো সেটা আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে।

কোনো রকমের সন্ধান—এমন কি একটু কাগজ-পত্রও আর খুঁজে পাবার কিছুমাত্র উপায় রইলো না।

ঠিক এই সময় রতন হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রান্ত-ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বেশে পথের দিদির উঠোনে ঢুকে হাঁক দিলে—দিদি, পায়েসের লোভেই আবার ফিরে আসতে হল। বাটির তলায় কিছু পড়ে আছে নাকি?

দিদি ছুটে এসে অর্দ্ধ মৃত ভাইটিকে জড়িয়ে ধরে আপন মনে বললে—ভাগ্যিস্ মা মাঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য তোর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, তাই ত' আবার তোকে ফিরে পেলাম।

॥ বারো ॥

রতন দু'টো দিন একেবারে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলো।

ওর শরীরের ওপর দিয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম গেছে। তারপর অনাহারে, অনিদ্রায় এমনিতেই ছেলেটা খুব কাবু হয়েছিল।

ওর কচি মনটা কখনো আনন্দে, কখনো বেদনায় দোল খেয়েছে। তাই বুঝি ছোট মগজের ওপর সব কিছু চাপ সইতে পারে নি!

তিন দিনের দিন রতন চীৎকার করতে শুরু করলো—মাথা গেল—মাথা গেল!

পথের দিদি ভারী ভয় পেয়ে গেল, ওর শরীরের অবস্থা দেখে।

বাড়িতে কোনো ব্যাটা ছেলে নেই, হঠাৎ যদি সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটে বসে, তা'হলে লজ্জা লুকোবার আর ঠাঁই থাকবে না।

পথের দিদি আতঙ্কিত মনে কেবলই ঘর-বার করতে লাগলো।

গ্রামে একজন প্রবীণ আর বিচক্ষণ কব্‌রেজমশাই আছেন। দিদি মনে মনে ঠিক করলে তাঁর কাছেই লোক পাঠাতে হবে।

দিদির বুড়ি শাশুড়ীরও মনে একটু স্বস্তি নেই।

তিনি কেবলই হাঁক দিচ্ছেন—অ বৌমা, এই দুধের বাছা আমার বাড়িতে এসে বেঘোরে প্রাণ দেবে ? তা'হলে আমার আর পাপের সীমা থাকবে না। আমি যে চোখে আঁধার দেখছি ! ছেলেটা আমার বাড়িতে থাকে না। আমি কি করি বল ত' বৌমা ? ভয়ে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

পথের দিদি তার শাশুড়ীকে ঘরের কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনি কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন মা ? আপনার ছেলে বাড়িতে নেই, আমি ত' রয়েছি। আপনি সুস্থির হয়ে দু'দণ্ড বসুন দেখি। আমি এক্ষুণি কব্‌রেজমশাইকে ডেকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি।

পাশের বাড়ির চঞ্চল ছিপ নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

দিদি ডাকলে—ও চঞ্চল, শুনে যা দেখি এদিকে।

চঞ্চল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আবার পিছু ডাকছ কেন বৌদি ? দেখছ আমি মাছ ধরতে রওনা হয়েছি। হাতে আমার এতটুকু সময় নেই।

দিদি ফোড়ন দিয়ে উত্তর দিলে—হুঁ ! ভারী রাজ্যি জয় করতে ছুটছে ছেলে ! এতটুকু দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই ! ভালোয় ভালোয় আয় বলছি। নইলে তোর দাদা বাড়িতে ফিরে এলে এমন মার খাওয়াবো—

এ বাড়ির দাদাকে চঞ্চলের ভারী ভয়। তা ছাড়া বৌদির ফাইফরমাস খাটার জন্য দাদার কাছ থেকে নানারকম উপহারও তার লাভ হয়।

তাই মুখ গোমড়া করে চঞ্চল বৌদির পাশে এসে দাঁড়াল।

পথের দিদি রোগ-শয্যায় শায়িত রতনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ওই,দেখ তোরই বয়সী একটি ছেলে—জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে।' তুই কি না কব্‌রেজ-মশাইকে ডেকে না দিয়েই মাছ ধরতে ছুটেছিস ?

এইবার চঞ্চল লজ্জা পেয়ে ; বললে—বাঃ রে ! আমি সে-কথা জানবো কেমন করে ? তারপর গলাটা খাটো করে আবদারের সুরে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বৌদি, ও ছেলেটা তোমার কে হয় ?

পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ছোট ভাই হয় রে ! দেখবি, জ্বর ছেড়ে গেলে —তোর সাথে আলাপ করিয়ে দেবো। তোর একেবারে বন্ধু হয়ে যাবে।

চঞ্চল ছিপ হাতেই একেবারে লাফিয়ে উঠল। বললে, 'সে কথা আগে বলতে হয় বৌদি। আমি এক ছুটে কব্‌রেজমশাইকে ডেকে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, ওর নামটা কি বৌদি ?

মুচকি হেসে পথের দিদি উত্তর দিলে—আমার ভাইয়ের নাম রতন রে, রতন।

চঞ্চল যেন নামটাকে লুফে নিলে, অ্যাঁ রতন ! চমৎকার নাম ত' ! আমার নামটা কিন্তু অত ভাল নয়।

পথের দিদি বললে, 'কেন রে ? চঞ্চল নামটাও ত' বেশ ভালো। তুই যেমন সব সময় ছটফটে, তেমনি তোর নামটাও হয়েছে চঞ্চল।

চঞ্চল বললে—তোমার ভাই ভালো হয়ে উঠলে আমরা কিন্তু বন্ধু হবো। এক-সঙ্গে মাছ ধরতে যাবো। বুঝলে বৌদি ?

পথের দিদি তখন খিল-খিল করে হেসে উঠল ; তারপর বললে—অত মাছ কিন্তু আমি রান্না করে দিতে পারবো না।

রসিকতায় চঞ্চলও কম নয়। সেও কৌতুক করে উত্তর দিলে—তা বৈ কি। তখন দেখবো, আমায় লুকিয়ে নিজের ভাইটিকে রান্নাঘরের কোণে বসিয়ে রাশি রাশি মাছভাজা খাওয়াচ্ছ!

দিদি ওর কথা শুনে তেড়ে মারতে গেল—তবে রে হিংসুটে! তোকে বুঝি কখনো থালাভর্তি মাছভাজা খাওয়াই নি ?

চঞ্চল হাসতে হাসতে এক ছুটে পালিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—একে-বারে কব্‌রেজমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি। তাঁর সামনে ত' আর তুমি আমায় কিছু বলতে পারবে না!

তারপর একমাস রতনকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি!

এদিকে মৃত্যু-দূত, আর একদিকে পথের দিদি ও চঞ্চল।

সত্যিকারের রোগীর সেবা কাকে বলে—বৌদি আর দেওর তাই দেখিয়ে দিলে।

খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আলস্য নেই, জগতের আর কোনো দিকে চোখ মেলে তাকানো নেই, শুধু মানুষটিকে কি ভাবে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, সেই জন্য দু'টি অনির্বাণ দীপ-শিখা যেন রতনের শিয়রে জেগে ছিল।

মৃত্যু-দূত সেই শিখার তীব্র জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গেল।

যেদিন রতন অন্ন-পথ্য করলে—তিন গাঁয়ের বৌ-ঝিরা বাড়িতে ভেঙে পড়ল।

সবাই বৌয়ের সেবার ধন্যি-ধন্যি করতে লাগল। চঞ্চল বাঁকা চোখে ফোড়ন কাটলে—সব প্রশংসাই বুঝি বৌদির একার প্রাপ্য ? আমার ভাগ্যে ছিটে-ফোঁটা কিছু রইলো না ?

বাড়ির প্রবীণা গৃহিণী ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলেন। বললেন—হ্যাঁ, সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। চঞ্চল ছিল বলে আমার বৌমার পরাণটা বেঁচেছে। নইলে ভাইয়ের সেবা করতে গিয়ে নিজেকেই শয্যা নিতে হতো।

সেদিন বুড়ি ট্যাঁকের টাকা খরচ করে সবাইকে মিষ্টিমুখ করালেন।

নতুন জীবন পাবার সঙ্গে সঙ্গে রতন একটি নতুন বন্ধুও লাভ করলো। সে বন্ধুটি চঞ্চল। পথের দিদিকে কেন্দ্র করে ওদের দুই বন্ধুর খুনসুটি লেগেই আছে।

কে বেশী আদর কেড়ে নিচ্ছে—তাই নিয়ে দুই বন্ধুর কপট-কলহ! রতন আর চঞ্চল নতুন করে বাড়ি সাজাতে বসলো।

পথের দিদি ঝুমকোলতা ভালোবাসে, তাই দুই বন্ধু গিয়ে অনেক খুঁজে পেতে কোত্থেকে ঝুমকোলতার চারা নিয়ে এসে বাড়ির সামনে বাঁশের ফটকে লাগিয়ে দিলে।

পথের দিদি রসিকতা করে বলে—ওই ঝুমকোলতাটা যেন রতনের প্রাণ। বড় অসুখের পর রতনের শরীরটা যেন ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠছে, ঠিক তেমনি ঝুমকোলতাটাও ফন্ ফন্ করে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর কয়েক দিন পরই ফুল ফুটবে।

চঞ্চল ব্যস্ত হয়ে শুধোলে—আর আমার প্রাণ কিসে বৌদি?

বৌদি চোখ টিপে উত্তর দিলে—আমার দেওরের প্রাণ রয়েছে ধানীলঙ্কা গাছে। ও ঠিক ধানীলঙ্কার মতোই ঝাল আর চঞ্চল কিনা!

চঞ্চল মুখ ভার করে উত্তর দেয়—হুঁ! বুঝতে আর বাকি নেই আমার! নিজের ভাইটিকেই শুধু আদর করা! আমি দাদার ভাই কিনা, তাই যেন বানের জলে ভেসে এসেছি!

রতন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—না না, চঞ্চল, বানের জলে ভেসে আসবে কেন? চঞ্চল শুধু বানের জলে মাছ ধরে বেড়াবে!

তিন জনে মিলে হো-হো করে হেসে উঠলো।

সত্যি, এটা মাছেরই দেশ। নদী-নালা-খাল-বিলে পোকার মতো মাছ কিল-বিল করছে।

একদিন দিদি বললে—হ্যাঁরে, তোরা তো দিন-রাত বন বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস। একটা ময়না পাখী ধরতে পারিস নে? ময়না কিন্তু চমৎকার কথা বলে।

তখন দুই বন্ধু উঠে-পড়ে লাগলো—কি করে একটি ময়না ধরা যায়।

চঞ্চলের মাথার অনেক ফন্দী-ফিকির আসে। ও চটপট একটি জাল তৈরী করে ফেললে। তাই নিয়ে দুই জনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—বনে-জঙ্গলে, এখানে-ওখানে।

অবশেষে ছোলা-ক্ষেতে মিললো একটি ময়না। সবাই বললে, ছোলা খেতে এসেছিল।

ময়না দেখে দিদি ভারী খুশী।

রতন বাঁশ কেটে সুন্দর একটি খাঁচা তৈরী করে ফেললে। এখন ময়নাকে নিয়েই তিনজনের অর্ধেক দিন কাটে। কে আগে ওকে কথা শেখাবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে।

দিদি বলে—পড়ো ময়না,—রা—ধা—কে—ষ্ট !

চঞ্চল বলে—Twinkle—twinkle—little star !

রতন শেখায়—

আমি দাঁড়ের ময়না—
খিদে আমার সয় না !!

ময়না চুপ করে বসে শুধু মাথা নাড়ে, আর কুটুস্-কুটুস্ করে ছোলা ঠুকরে খায় !

দিন আসে—দিন যায় ।

আস্তে আস্তে সেই ময়না শিস্ দেয়—নানা রকম বোল বলতে শেখে ।

পাড়ার বৌ-ঝিরা এসে ময়নাকে ঘিরে ধরে । ওর মুখের শিস্ শুনে সবাই হেসে কুটি-কুটি !

সেদিন রাত্তিরে যেমন ঝড়, তেমনি জল !

রতন বললে, 'পড়াশোনায় আজ আর মন লাগছে না ।'

দিদি এগিয়ে এসে বললে—অনেক বিদ্যে হয়েছে । খিচুড়ি রান্না করেছি ; গরম-গরম মাছ ভাজা দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড় ।

সেদিন ওরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়লো ।

গভীর রাত্রে যেমন ঝড়ের মাতামাতি, তেমনি অবিশ্রাম জল পড়ার শব্দ !

দু'ই ভাই-বোন দু'ই খাটে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করে—ঘুম আর কিছুতেই আসে না ।

হঠাৎ শোনা গেল—দরজায় টক-টক শব্দ ! দু'ই জনে কান খাড়া করে শুনলে । কিন্তু কেউ কাউকে ডাকলে না ।

আবার সেই টক-টক শব্দ !

পথের দিদি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে । সারা গা জলে ভেজা জীবনদা এসে মূর্তিমান ধূমকেতুর মতো ঘরে ঢুকলেন ।

দু'ই ভাই-বোন আনন্দে আর বেদনায় চীৎকার করে উঠলো—জীবনদা, তুমি !

জীবনদা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, আমি । ভূত নই । রতন, এক্ষুণি আমার সঙ্গে তোকে বেরুতে হবে । চটপট তৈরী হয়ে নে ।

পথের দিদি যেন সহসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো—না না, ওকে নিয়ে যেও না জীবনদা । শক্ত অসুখ থেকে ও উঠেছে ।

গম্ভীর গলায় জীবনদা জবাব দিলেন—সব জানি । গেলাস-গেলাস দুধ খেয়ে এখন

ওর শরীর বেশ সবল হয়েছে। আমার চাইতেও ও এখন সুস্থ আছে—ওকে আজ আমার সঙ্গে বেরুতেই হবে !

রতন আর্তনাদ করে উঠলো।

দিদির এই প্রাণঢালা স্নেহ, এমন সাজানো-গোছানো সংসার, ওদের ঝুমকোলতায় সবে ফুল ফুটেছে, ময়নাটা খাঁচায় বসে কত কথা বলে !

রতন বললে, 'না না, আমি পথের দিদিকে ছেড়ে, ময়নাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

সহসা যেন আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে এলো জীবনদার গলা থেকে—কী বললে ! ময়না ?

এক ছুঠে গিয়ে জীবনদা খাঁচা খুলে ময়নাটাকে উড়িয়ে দিলেন। জানালা গলিয়ে মিশকালো আঁধারের মধ্যে ময়নাটা যে কোথায় হারিয়ে গেল—কিছু বোঝা গেল না।

জীবনদা রতনের হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'চল শীগ্‌গির আমার সঙ্গে।'

পথের দিদি করুণ কণ্ঠে শুধোলে, 'জীবনদা, এই জল-ঝড়ের মধ্যে আবার এক্ষুণি ওকে নিয়ে বেরুবে ? কিছু খেয়ে যাবে না ?'

জীবনদা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'ওকে তুই ভালো শিক্ষা দিস নি বোন।' তাই আজ তোর এখানে আমি জল গ্রহণ করবো না। যেদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবি—সেইদিন আবার ফিরে এসে চেয়ে নিয়ে তোর হাতের মাছ-ভাত খাবো। জেনে রাখ বোন, ঝুমকোলতার ফুল, আর খাঁচার পোষা ময়না—বিপ্লবী ভাইদের জন্য নয় !

কখন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে কেউ জানে না।

ওরা অনেকগুলো নৌকো করে নিঃশব্দে এসে পৌঁছলো এক মহাজনের বাড়ির খিড়কির ঘাটে।

বাড়িতে সানাই বাজছে। বহু আত্মীয়-স্বজন এসেছে উৎসব উপলক্ষে।

পিল-পিল করে বিপ্লবী মানুষগুলো বেরিয়ে বাড়িটাকে ঘেরাও করে ফেললো।

জীবনদাকে দেখা গেল বাড়ির চিলে-কুঠুরীর ছাদের কার্নিশে। হাতে তাঁর উদ্যত রিভলভার।

হুঙ্কার দিয়ে জীবনদা বললেন, 'কেউ এতটুকু নড়বার চেষ্টা করেছেন কি—গুলীতে মারা পড়বেন। মহাজন মশাই, লোক ঠকিয়ে সারা জীবন অনেক অর্থ জমিয়েছেন। এখন লোহার সিন্ধুকের চাবি বের করে দিতে হবে।

তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় কইলেন, 'মায়েদের কোনো ভয়

নেই। তাঁদের সম্মান এতটুকু নষ্ট হবে না। সবাইকে আমি বলছি—নিজের নিজের গায়ের গয়না খুলে পায়ের কাছে রাখুন। আমার লোক গিয়ে সব কুড়িয়ে নেবে। কেউ তাপনদের গায়ে হাতও দেবে না।

জীবনদার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ করে সব সোনার গহনা হরির লুটের মতো মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো!

বাড়ির মালিক—মহাজন পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলেন—হাম দেখ্‌ লেঙ্গে! দারোগা সায়েব হামারা দোস্ত হ্যায়! এ কি মগ-কা মুল্লুক হ্যায়!

তাঁর সেই চীৎকার কান্নার মতো শোনাতে লাগলো।

॥ তেরো ॥

খাঁচা থেকে যে পাখী একবার পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়, সে আর লোহার শেকলে পা বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে না।

মানুষও ঠিক তাই। স্নেহের শৃঙ্খল মানুষ বড় ভালোবাসে।

যার কাছ থেকে সে এতটুকু স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা পেয়েছে, বারে বারে তারই বন্ধনে সে ধরা দিতে চায়।

এ বাঁধন বড় মধুর—বড় কামনার ধন।

রতনের মনে এই মধুর আশা বাসা বেঁধেছিল যে, জীবনদা আবার হয়ত তাকে পথের দিদির শান্তির নীড়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

কিন্তু রতন বলি-বলি করেও মুখ ফুটে সে-কথা প্রকাশ করতে পারে নি।

রতনের মনের মাঝখানে একান্ত বাসনা—জীবনদাই সে-কথা আপনা থেকে বলুন তাকে। আগেকার মতো মুখে সেই জ্যোছ্‌না-ধোয়া হাসি এনে বলুন—ওকে রতনা, চল তোকে তোর পথের দিদির কাছেই পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার মাথায় এখন কত কাজের বোঝা! তার ওপর তোর বোঝা আর বইতে পারবো না বাপু।

কিন্তু মানুষ যা চায়, ঠিক তার উল্টোটি ঘটে বসে থাকে।

নৌকো চলেছে ফিরতি মুখে। জীবনদা বুদ্ধি করে দল-বল সবাইকে একসঙ্গে রওনা হতে দেন দি।

একদল গেছে হাঁটা পথে—এদিক-ওদিক ছড়িয়ে—গঞ্জে-হাটে-বাজারে গাঁয়ের চেনা আস্তানায়। কয়েকটি দল রওনা হয়েছে নৌকোতে। কিন্তু বিভিন্ন দিকে তারা নৌকো চালিয়ে গভীর রাতেই রওনা হয়ে গেছে।

জীবনদা রতনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট্ট নৌকোয় উঠেছেন। এবার জীবনদা সেজেছেন এক মুসলমান কৃষক আর রতনকে সাজিয়েছেন তার ছেলে। নৌকো শেষরাত্তিরের আলো-আঁধারী ক্ষীণ চাঁদের জ্যোছনায় এগিয়ে চলেছে—বোধকরি নিরুদ্দেশের পথে।

কোন্ দিক থেকে ওরা এলো—এখন কোন্ দিক পানে চলেছে—রতন কিছুই ঠাহর করতে পারে না।

ছোট্ট নৌকো দুলছে আর সেই সঙ্গে দুলছে রতনের ছোট্ট মনটা।

একটা লণ্ঠন বাঁধা রয়েছে নৌকোর ডানদিকের ছইয়ের বাঁকা বাঁশের সঙ্গে। সেটা যত না আলো দিচ্ছে—কালো-কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী।

ছইয়ের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ চোখে পড়ে—রতন সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশের গায়ে রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিবছে। মাথার ওপরকার কালপুরুষ একদিকে হেলে পড়েছে। দু-একটি নিশাচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—দূর দিগন্ত থেকে।

রতন অপলক-নেত্রে তাকিয়ে থাকে মিশকালো আঁধারের দিকে। কানে ভেসে আসে নদীর ছল্-ছল্ শব্দ। পাটাতনে মাথা রেখে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখের দু'টি পাতা থেকে ঘুম একেবারে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে।

কখনো রতনের মনে হচ্ছে—অন্য একটি নৌকো থেকে ক্ষীণ বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে। চঞ্চল নদীর জল সেই সুরটাকে যেন কুলকুচো করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছে।

রাত তখন কত, সেটাও ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ভোর হতে তখনো কিছুটা বাকি আছে। নিঃশব্দে আর চারটি মানুষ কেবলি দাঁড় টেনে চলেছে। তাদের মুখে এতটুকু কথা নেই। পরণে তাদের মাঝির মতোই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা।

ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে।

ওই চারজন মানুষ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুধু দাঁড় টেনে চলেছে। দেখে মনে হয়, একমাত্র দাঁড় টানা ছাড়া বিশ্ব-সংসারে ওরা যেন আর কিছুই জানে না! কিন্তু রতন ভালো করেই জানে, ওরা এক একজন নামকরা বিপ্লবী, ওইভাবে আত্মগোপন করে আছে। সব রকম কাজে ওরা দক্ষ। সংসারের সুখ-শান্তি, আনন্দ আর উচ্চাকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র ভারত-ভূমির মুক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তপস্যা করে চলেছে।

কবে এরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবে, আর ভারতের স্বাধীনতা উজ্জ্বল অরুণের

মতোই পূবের আকাশকে রঙ্গীন করে তুলবে—দেশের ভাগ্য-বিধাতাই বুঝি তা বলতে পারেন!

অতটুকু ছেলে রতন—কিন্তু সে এখন অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু একটু বাদেই ওর ভাবনার সূতো হঠাৎ একটা আচমকা হাঁক-ডাকে ছিঁড়ে গেল!

জীবনদা ততক্ষণে পাটাতনের ওপর একটা কীল মেরে বললেন, 'ওরে আবদুল, ঘুমুচ্ছিস—না জেগে আছিস?'

রতন প্রথমটা ঠিকবুঝতে পারে নি—আবদুল আবার কে?

আবার জীবনদার হুমকি শোনা গেল—কি রে আবদুল, মুখে যে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে বসে আছিস! কথাটা তোর কানে গেল?

ততক্ষণে রতন বুঝে নিয়েছে, নৌকোর ওপর ওর নতুন নামকরণ হয়েছে আবদুল।

বিপ্লবীদের যে প্রতি মুহূর্তে নাম পাল্টে যায়, সে কথা ওর ভোলা উচিত হয় নি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে রতম—কি বলছেন জীবনদা?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন হুঁ! জীবনদা! কেন বাপজান বলতে কি হয়? নৌকোয় ওঠবার সময় এত যে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলাম, সব ভস্মে ঘী ঢালা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি! দিদির বাড়ীতে মাছের মুড়ো আর দুধ খেয়ে খেয়ে তোর মগজে আর কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছি। দিন কয়েক আমার সঙ্গে থাক—শুক্‌নো চিড়ে-মুড়ি খেয়ে দিন কাটা, তবে তো আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগবে!

রতন তাকিয়ে দেখে—জীবনদা ওর দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন!

তাই তো! সব কিছু গুলিয়ে গেল নাকি রতনের? সে তো এখন মুসলমান চাষীর ছেলে। যাকে সে জীবনদা বলে ডাকছে, তারই ছেলে সেজেছে সে। এখন 'বাপজান' বলে না ডাকলে, সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে! তাই মাথাটাকে গুড়ের কলসীর মতো ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি বলছ বাপজান?

ওর বাপজান হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তবু ভাগ্যি যে, আমার পোলার চ্যাতন হয়েছে! গলাটা যে কাঠ হয়ে গেল রে আবদুল! ভালো করে এক ছিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজ তো দেখি! দু'টো সুখ-টান দিয়ে একটু আমেজ করে নেই।

আবদুল হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক সাজতে বসলো!

বেশ করে তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে তাকে টানবার মতো তৈরী করে

জীবনদা রতনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট্ট নৌকোয় উঠেছেন। এবার জীবনদা সেজেছেন এক মুসলমান কৃষক আর রতনকে সাজিয়েছেন তার ছেলে। নৌকো শেষরাত্তিরের আলো-আঁধারী ক্ষীণ চাঁদের জ্যোছনায় এগিয়ে চলেছে—বোধকরি নিরুদ্দেশের পথে।

কোন্ দিক থেকে ওরা এলো—এখন কোন্ দিক পানে চলেছে—রতন কিছুই ঠাহর করতে পারে না।

ছোট্ট নৌকো দুলছে আর সেই সঙ্গে দুলছে রতনের ছোট্ট মনটা।

একটা লণ্ঠন বাঁধা রয়েছে নৌকোর ডানদিকের ছইয়ের বাঁকা বাঁশের সঙ্গে। সেটা যত না আলো দিচ্ছে—কালো-কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী।

ছইয়ের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ চোখে পড়ে—রতন সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশের গায়ে রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিবছে। মাথার ওপরকার কালপুরুষ একদিকে হেলে পড়েছে। দু-একটি নিশাচর পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—দূর দিগন্ত থেকে।

রতন অপলক-নেত্রে তাকিয়ে থাকে মিশকালো আঁধারের দিকে। কানে ভেসে আসে নদীর ছল্-ছল্ শব্দ। পাটাতনে মাথা রেখে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখের দু'টি পাতা থেকে ঘুম একেবারে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে।

কখনো রতনের মনে হচ্ছে—অন্য একটি নৌকো থেকে ক্ষীণ বাঁশীর শব্দ ভেসে আসছে। চঞ্চল নদীর জল সেই সুরটাকে যেন কুলকুচো করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মজা পাচ্ছে।

রাত তখন কত, সেটাও ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। ভোর হতে তখনো কিছুটা বাকি আছে। নিঃশব্দে আর চারটি মানুষ কেবলি দাঁড় টেনে চলেছে। তাদের মুখে এতটুকু কথা নেই। পরণে তাদের মাঝির মতোই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা।

ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছে।

ওই চারজন মানুষ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুধু দাঁড় টেনে চলেছে। দেখে মনে হয়, একমাত্র দাঁড় টানা ছাড়া বিশ্ব-সংসারে ওরা যেন আর কিছুই জানে না! কিন্তু রতন ভালো করেই জানে, ওরা এক একজন নামকরা বিপ্লবী, ওইভাবে আত্মগোপন করে আছে। সব রকম কাজে ওরা দক্ষ। সংসারের সুখ-শান্তি, আনন্দ আর উচ্চাকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র ভারত-ভূমির মুক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তপস্যা করে চলেছে।

কবে এরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবে, আর ভারতের স্বাধীনতা উজ্জ্বল অরুণের

মতোই পূবের আকাশকে রঙ্গীন করে তুলবে—দেশের ভাগ্য-বিধাতাই বুঝি তা বলতে পারেন।

অতটুকু ছেলে রতন—কিন্তু সে এখন অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করে কিন্তু একটু বাদেই ওর ভাবনার সুতো হঠাৎ একটা আচমকা হাঁক-ডাকে ছিঁড়ে গেল!

জীবনদা ততক্ষণে পাটাতনের ওপর একটা কীল মেরে বললেন, 'ওরে আবদুল, ঘুমুচ্ছিস—না জেগে আছিস?'

রতন প্রথমটা ঠিকবুঝতে পারে নি—আবদুল আবার কে?

আবার জীবনদার হুমকি শোনা গেল—কি রে আবদুল, মুখে যে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে বসে আছিস! কথাটা তোর কানে গেল?

ততক্ষণে রতন বুঝে নিয়েছে, নৌকোর ওপর ওর নতুন নামকরণ হয়েছে আবদুল।

বিপ্লবীদের যে প্রতি মুহূর্তে নাম পাল্‌টে যায়, সে কথা ওর ভোলা উচিত হয় নি।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে রতম—কি বলছেন জীবনদা?

সঙ্গে সঙ্গে জীবনদা একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন হুঁ! জীবনদা! কেন বাপজান বলতে কি হয়? নৌকোয় ওঠবার সময় এত যে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলাম, সব ভস্মে ঘী ঢালা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি! দিদির বাড়ীতে মাছের মুড়ো আর দুধ খেয়ে খেয়ে তোর মগজে আর কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছি। দিন কয়েক আমার সঙ্গে থাক—শুক্‌নো চিড়ে-মুড়ি খেয়ে দিন কাটা, তবে তো আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগবে!

রতন তাকিয়ে দেখে—জীবনদা ওর দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসছেন!

তাই তো! সব কিছু গুলিয়ে গেল নাকি রতনের? সে তো এখন মুসলমান চাষীর ছেলে। যাকে সে জীবনদা বলে ডাকছে, তারই ছেলে সেজেছে সে। এখন 'বাপজান' বলে না ডাকলে, সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবে! তাই মাথাটাকে গুড়ের কলসীর মতো ভালো করে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি বলছ বাপজান?

ওর বাপজান হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তবু ভাগ্যি যে, আমার পোলার চ্যাতন হয়েছে! গলাটা যে কাঠ হয়ে গেল রে আবদুল! ভালো করে এক ছিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজ তো দেখি! দু'টো সুখ-টান দিয়ে একটু আমেজ করে নেই।

আবদুল হুঁকোটা টেনে নিয়ে তামাক সাজতে বসলো!

বেশ করে তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিয়ে তাকে টানবার মতো তৈরী করে

আবদুল বাপজানের হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে—কি যেন বলবার আশায় তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

আবদুলের বাপজানের তখন অন্য দিকে তাকাবার বিন্দুমাত্র ফুরসৎ নেই। হুঁকোটা হাতে নিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টেনে চলছে তো টেনেই চলেছে। মাঝে মাঝে মাথাটা একটু নাড়ছে তৃপ্তির আনন্দে।

এইবার মনে একটু সাহস যোগালো আবদুলের। আরো একটু এগিয়ে এসে তারপর জিব দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে একটু ভিজিয়ে নিয়ে শুধোলে,আচ্ছা বাপজান, এখন কোথায় চলেছি আমরা ? আমি কি আর দিদির বাড়ি ফিরে যাবো না ?

বাপজান সঙ্গে সঙ্গে হুঁকোটা নামিয়ে নিয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো ; বললে —হুঁ ! বেশ বুঝতে পারছি যে, দিদির বাড়ির খাওয়া-দাওয়ায় শরীরে বেশ চেকনাই হয়েছে। জিবে স্বাদ লেগেছে—তাও মালুম দিচ্ছে আমার। তবু বলি আবদুল, ওখানে এখন তোমার যাওয়া হবে না।

তাই তো ! দিদির বাড়ি যাওয়া এখন হবে না ! তা'হলে কোথায় চলেছে এখন আবদুল ?

আবদুলের দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইলো। কিন্তু কাউকে তো সেই চোখের জল দেখানো চলবে না। সে ভারী লজ্জার বিষয়।

ভাগ্যিস নৌকোর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। আলোর চাইতে ধোঁয়া বেশী। হাতের চেটো দিয়ে আবদুল উদগত অশ্রুকে আটকে দিলে ; তারপর ভয়ে ভয়ে আবার বাপজানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

বাপজান আড়চোখে ওর মুখের অবস্থা দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো ; বললে —অমনি আমার পোলার মুখ ভার হল।

একটু বাদে আবদুলকে কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বাপজান বললে—ওরে বোকা ছেলে, দিদির বাড়িতেই কি তোর দিন কাটবে ? বাবুইবাসা বোর্ডিংকে কি তুই একেবারেই ভুলে গেলি ?

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর নাম শুনে এক মুহূর্তে আবদুল যেন একেবারে রতন হয়ে গেল।

হ্যাঁ, সত্যি কথাই তো !

বাবুইবাসা বোর্ডিংকে সে যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সেখানকার ছেলের দলের মধুর সাহচর্য্য, সেখানকার নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতের টানে অবিরাম সাঁতার কাটা, সেখানকার নদীর ধারে ঝাউগাছের ছায়ায় শীতল সোজা একটানা

আনন্দের পথ। সেখানকার পাখী-ডাকা রঙীন সকাল, আর হলদে বিকেল—সব একে একে যেন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আর সব চাইতে আশ্চর্য মানুষ হচ্ছেন সনাতনবাবু! এমনি দেখতে দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু কাজের সময় এলে সেই ঢিলে-ঢালা আমুদে লোকটি এক মুহূর্তে যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে যান। তখন আর তাঁকে টলানো বা গলানো যায় না!

সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ তাকে এতদিন পর ফিরে যেতে হবে?

সত্যি, আনন্দে যেন তার নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সেই সনাতনবাবুর পায়ের ধূলো সে এতদিন বাদে নিতে পারবে! তাঁর একান্ত কাছে বসে—বোর্ডিং-এর এত দিনকার জমা গল্পগুলো ঝুড়ি ঝেড়ে যোগাড় করতে পারবে!

কি করে এতদিন সে সনাতনবাবুকে ভুলে ছিল? এর মধ্যে একবারও তো সেই সদাশিব মানুষটির কথা তার মনে হয় নি!

সনাতনবাবু কুশলে আছেন তো?

জীবনদা বোধকরি রতনের মনের কথাগুলো মন দিয়ে পড়ছিলেন।

তিনি এইবার তার মাথায় হাত রেখে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—না রে, আমাদের সনাতনদার শরীর ভালো নেই। ওঁকে ভালো করে সেবা করার মানুষও নেই। আর সেই জন্যই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি সোজা তাঁর কাছে আমার মাথায় এখন হাজার কাজের বোঝা। আমি তো ওখানে থাকতে পারবো না। তোকে পৌঁছে দিয়েই আমায় আর এক পথে পালাতে হবে।

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর জীবনদা আপন মনেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"যে শুনেছে কানে—তাঁহার আহ্বান-গীত
ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে—
দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন—
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ॥"

একটু চুপ করে থেকে জীবনদা বললেন,না রে, সনাতনদা ভালো নেই। একটা দারুণ শক্ত কাজ সমাধা করতে গিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। কিন্তু জানিস তো ভাই, বিপ্লবীদের হাসপাতালে যাওয়া চলে না। সেখানে হাজারো প্রশ্ন, শতেক সন্দেহ! তাই সবাইকার আড়ালে সেবা করে তাঁকে ভালো করে তুলতে হবে। আর সে ভার আমি তোর হাতেই দিতে চাই।

এইবার লজ্জা পেলে রতন। সে শুধু নিজের সুখের উদ্দেশ্যে দিদির বাড়ির নিশ্চিন্ত আরামের জন্য আঁকু-পাঁকু করছিল। কিন্তু যাঁর রোগশয্যার পাশে তার উপস্থিত

থাকার একান্তভাবে প্রয়োজন তাঁর কথাই সে ভুলে বসেছিল! সনাতনবাবুকে ভুলে থাকা কি তার উচিত হয়েছে? কষাঘাতে কষাঘাতে সে নিজের মনকে সচেতন করে তুললো।

না—না—এখন আর কোথায়ও নয়। সনাতনবাবুর রোগশয্যার পাশেই তার স্থান। রতন মনে মনে আবৃত্তি করলে জীবনদার শেখানো কবিতা—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলাম শুধু লজ্জা—
এবার সকল অঙ্গ ঘেরি
পরাও রণ-সজ্জা॥"

নৌকোটি ঠিকমত চলতে পারছে না?

রতনের মনে হলো, ওরা যেন অনেকক্ষণ থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

আরো দাঁড় ফেলতে পারে না বিপ্লবী ভাইরা? শত দাঁড়—সহস্র দাঁড়?

পক্ষিরাজ ঘোড়ার বেগে এই মন-পবনের নৌকো উড়ে যাবে পথের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে?

সূর্যোদয়ের আগেই এরা গিয়ে পৌঁছুবে সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ—নদীর জলের আরশিতে যার ছায়া ভাসে দিনরাত। নৌকো থেকে ছুটে নেমে তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠে—ঝাউগাছের পথটা পেরিয়ে বোর্ডিং-এর ভেতর দ্রুত পা চালিয়ে দেবে!

পৌঁছুবে গিয়ে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পার্শ্বে। তিনি হয়ত তাঁর জানালায় দু'টি আকুল চোখের প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন—কখন রতন আসবে! কখন তার ছোট্ট হাতখানি সনাতনবাবুর উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করবে!

॥ চৌদ্দ ॥

যে আবেগ নিয়ে রতন দ্রুতবেগে সনাতনবাবুর রোগশয্যা-পাশে ছুটে গিয়েছিল, বোধকরি তার চাইতেও আকস্মিক আঘাতে সে একেবারে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হয়ত রতনের চলার শক্তি মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ কী সনাতনবাবুর দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে! একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে রতন সনাতনবাবুব ডান হাতটা চেপে ধরলে। মুখে সে আর কোন কথাই বলতে পারলে না!

অনেকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সে। মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না তার। শুধু ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে সনাতনবাবুর বিরাট বুকটা ভাসিয়ে দিতে লাগলো।

এত দুঃখেও সনাতনবাবুর মুখ থেকে হাসি হারিয়ে যায় নি।

কৌতুক করে তিনি বললেন, 'কি রে রতন, তুই যে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিলি ?'

রতন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আপনি যে আর চোখে দেখতে পারেন না স্যার !'

এত বেদনাতেও হো-হো করে হেসে উঠলেন সনাতনবাবু। বুঝি পাষাণ ভেঙে নির্ঝরের জন্ম হল। বললেন, 'চোখে দেখতে পাবো না তাতে কি হয়েছে রে ? তোর তো দু'টি চোখ আছে। আজ থেকে তোর চোখের ভেতর দিয়ে আমি দেখবো। আর আমার কোনো অসুবিধেই থাকবে না।'

শুনে কিশোর রতন আবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। মনে মনে ভাবলে, কি সে শক্তি যাতে সনাতনবাবু দু'টি চোখ হারিয়েও সমস্ত দুঃখ-কষ্টের ওপরে উঠে প্রাণ খুলে হাসতে পারছেন !

সনাতনবাবু বোধকরি ওর মনের কথাটি শুনতে পেলেন। তাই আপন মনে আবৃত্তি করলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"—মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো,
দহিয়াছে অগ্নি তারে—
বিদ্ধ করিয়াছে শূল—
ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,—
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন—
চিরজন্ম তারই লাগি
জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন॥"

রতন আপন মনে ভাবে, বিপ্লবীরা বুঝি মানুষ নয় ! নইলে নিজের দেহের অসহ্য যাতনাকে কি করে তারা ভুলে থাকতে পারে ? আগুনে হাত দিলেও তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, বুঝি তারা ফুলের বাগান থেকে টাট্‌কা তাজা সুগন্ধ কুসুম তুলে সাজি ভর্তি করছে !

এই যে সনাতনবাবু—রতন তাঁর সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে ! বাইরে থেকে মনে হয় মানুষটা বুঝি ভাঁড় ! কখনো হাসছেন, কখনও রসিকতা করে মানুষকে হাসাচ্ছেন, আবার কখনো বা সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে চীৎকারে বাবুইবাসা বোর্ডিংকে মাথায় করে তুলছেন ; আবার সেই মানুষটি যখন আপন মনে বই পড়েন,

—রতন লুকিয়ে দেখেছে—তখন তিনি একেবারে বিশ্ব-জগৎ ভুলে বসে থাকেন। দেখে মনে হয় না সংসারে তাঁর কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে!

সনাতনবাবুর সংসারে কে আছে রতন তার কোনো খবরই রাখে না। তাঁর কি বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই? কারো স্নেহের বন্ধন কি তাঁকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে না? এই দারুণ দুঃখের দিনে কারো স্নেহ-ছল-ছল আঁখি দু'টি কি তাঁর মনে একবারের জন্যও ভেসে ওঠে না?

মনে আরও প্রশ্ন জাগে রতনের—কি এমন শক্ত কাজ করতে গিয়েছিলেন সনাতন-বাবু, যার জন্য এই চোখ দু'টিকে তাঁর চিরতরে হারাতে হল?

সনাতনবাবু কিন্তু এ সম্বন্ধে ওকে কোন কথাই বললেন না—শুধু ওর ডান হাতটি চেপে ধরে পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

আসল ব্যাপারটা জানা গেল—সেই দিন দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রামের সময়। জীবনদাই ওকে সব কথা ধীরে ধীরে খুলে বললেন।

একটা খুব জরুরী দলিল সরিয়ে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন সনাতনদা সঙ্গে ছিল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এরই একটি ছেলে। ছেলেটা পূর্ব-পরিকল্পনা মতো দোতলার একটি সরকারী দপ্তরে উঠে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়। তারপর সনাতনদা দালানের নল বেয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হন। টর্চ জ্বালিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে দলিলটাও হাত করেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসবার মুখে সঙ্গের ছেলেটা ধরা পড়ে যায়। তাকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সনাতনদা সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করেন।

রক্ষীদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল মাছ মারবার একটা বাঁশের ট্যাঁটা—অনেক-গুলো তার মুখ। উপায়ান্তর না দেখে জান বাঁচাবার জন্য লোকটা সেই ট্যাঁটা সনাতনদার দিকে ছুঁড়ে মারে। তার ফলে সনাতনবাবুর দু'টো চোখই গেঁথে যায়। সেই অবস্থাতেই তিনি ছেলেটাকে বগলদাবা করে পাশের খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওখানেই একটা ডিঙি নৌকো নিয়ে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছিল। তারা তাড়াতাড়ি জল থেকে দু'জনকে উদ্ধার করে নৌকো নিয়ে দ্রুতবেগে পালিয়ে আসে। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে! চিরদিনের মতো সনাতদা তাঁর দু'টি চোখই হারিয়ে ফেলেছেন।

এই জীবন-মরণ সংগ্রামে সনাতনদা কিন্তু হাতের দলিলটা কিছুতেই ছাড়েন নি!

জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে তিনি শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—ওরে, তোরা কেউ এই দলিলটা ধর, নইলে খালের জলে হারিয়ে যাবে।

রতন যেন নিজের চোখের সামনে গোটা দৃশ্যটা দেখতে পায়।

সিনেমাতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি! রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গিয়ে ডিঙি নৌকোটা থামলো সরকারী দপ্তরের পেছন দিককার খালে। ওদের দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে নৌকোটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে রইল।

ওদিকে সনাতনবাবু ছেলেটিকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। ওকে কাঁধে করে তুলে দিলেন জানালার ওপর। ছেলেটি সাপের মতো এঁকেবেঁকে দোতলায় গিয়ে উঠল, তারপর কৌশলে পেছন দিককার দরজাটার ছিটকিনি খুলে দিল।

সনাতনবাবু মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়েই ছিলেন। বৃষ্টির জলে ভেজা নল বেয়ে দোতলায় উঠে অন্ধকার ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

কোমরে লুকানো ছিল টর্চটা। সেইটে জ্বালিয়ে দরকারী দলিলটা খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। কেননা বিপ্লবীরা আগে থেকেই খবরগুলো সংগ্রহ করে রাখে।

হঠাৎ ধূলো-বালি নাকে-মুখে ঢোকায় ছেলেটা খক্‌খক্ করে কেশে উঠলো।

রক্ষীরা সজাগ ছিল। শব্দ শুনেই তারা ছুটে এলো। সনাতনবাবু অবলীলা-ক্রমে পালিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা পেছন দিক থেকে আচমকা ধরে ফেললে।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেকে ফেলে সনাতনবাবু নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসবেন—এ-কথা কোনোক্রমে কল্পনাও করা যায় না!

সিংহ-বিক্রমে রক্ষীদের আক্রমণ করতে গেলেন তিনি। কিন্তু তার আগেই বাঁশের সেই বহুমুখী ট্যাঁটাটা ছুঁড়ে দিয়েছে রক্ষীটি।

সনাতনবাবুর দু'টো চোখে বিঁধে গিয়েছে সেই ট্যাঁটা দু'টির তীক্ষ্ণ মুখ। দর-দর ধারে রক্ত ঝরে পড়ছে তাঁর দু'টি চোখ দিয়ে। ভিজে যাচ্ছে তাঁর মুখ, বুক, সারা দেহ—এমন কি, পরণের ধুতিও। কিন্তু তবু তিনি এতটুকু বিচলিত হন নি! বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেটাকে বগলে জাপটে ধরে তিনি লাফিয়ে পড়েছেন—দোতলা থেকে একেবারে খালের জলে।

রক্তে খালের জলের রঙ রাঙা হয়ে গেছে—তবু তিনি হাতের দলিলটি ছাড়েন নি।

এই ভাবে—একের পর এক গোটা দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে শিউরে উঠলো রতন।

এই হচ্ছে বিপ্লবীর সহনশীলতা! ওরা ভাঙবে, তবু এতটুকু মচকাবে না।

সনাতনবাবুর শুশ্রূষার সব কিছু দায়িত্ব ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিয়েছে কিশোর রতন।

কিশোর রতন মনে মনে কল্পনা করে ওর যদি সনাতনবাবুর মতো একটি দাদা থাকতো, তা'হলে সে তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও এতটুকু পেছপা হতো না।

সকাল থেকে রতনের কাজের অন্ত নেই। ঘুম থেকে উঠেই চোখে-মুখে জল দিয়ে সনাতনবাবুর দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে দিতে হয়। বেডপ্যান ধরতে হয়; তারপর সেই বেডপ্যান যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করে আনতে হয়। গরম দুধ আর প্রয়োজনীয় পথ্য খাওয়াতে হয় সময়মতো। তা ছাড়া ঘড়ি ধরে ডাক্তারের নির্দেশ মতো ওষুধ খাওয়াতে হয়। ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দিতে হয় দুই চোখের ওপর। ব্যাণ্ডেজ বাঁধাটাও সে শিখে নিয়েছে জীবনদার কাছ থেকে।

আরো একটা জরুরী কাজ থাকে তার দুপুরবেলা। রোগীকে রোজকার খবরের কাগজ আর নানা জাতীয় বইপত্তর পড়ে শোনাতে হয়।

এই কাজটা রতনের ভারী মনের মতো। সনাতনবাবুকে শোনাতে গিয়ে তার নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাত্তিরে মাঝে মাঝে উঠে দেখতে হয় রোগী ঠিকমতো ঘুমুচ্ছেন কি না! যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তবে কখনো কখনো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিতে হয়। আবার কোনো সময় মাথায় হাত বুলিয়ে নানা রকম গল্প করতে হয়। রোগীর ইচ্ছামতো রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', সত্যেন দত্তের 'বেণু ও বীণা' কিংবা নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়।

রোগীর সেবা করতে বসে রতনের নিজের যে কত শেখা হয়ে যাচ্ছে তার লেখা-জোখা নেই।

অনেক সময় সনাতনবাবু বলেন, 'ওরে রতন, তুই আমার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বল। বলতে বলতে ইংরেজীটা দিব্যি রপ্ত হয়ে যাবে।'

রতন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি ইংরেজীতে কথা বলতে পারবো?'

শুনে সনাতনবাবু হো-হো করে হেসে উঠেন; তারপর উত্তর দেন, 'ওরে বোকা, অভ্যেসে কি না হয়! মাদ্রাজের বহু কুলি ইংরেজীতে সায়েবদের সঙ্গে কথা বলে। অথচ তারা ABCD পর্যন্ত জানে না! বুঝলি—সবই অভ্যেস!'

সেদিন রাত্তিরে দারুণ গুমোট।

কারো চোখে আর ঘুম আসছে না।

জীবনদা আর রতন রোগীর শিয়রে বসে ধীরে ধীরে মাথায় আর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

রোগীর মুখেও কোনো কথা নেই। শুধু এপাশ আর ওপাশ—শুধু ছটফটানি!

এমন সময় বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে সেই ঘরে ঢুকলো; বললে, 'জীবনদা, রোগীকে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। পুলিশ বোধকরি কোনো রকমে টের পেয়েছে।'

শুনেই জীবনদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন; বললেন, 'আমি মনে মনে সেই

ভয়ই করছিলাম। তা'হলে আর দেরী নয়। সনাতনবাবুকে আজ রাত্রে—এক্ষুণি বোর্ডিং থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

জীবনদার কথা শুনে রতন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলে, 'এক্ষুণি ? এত রাত্রে ?'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি। আমাদের দিন-ক্ষণ দেখবার সময় কোথায় ? তা ছাড়া রাতের অন্ধকার আমাদের পরম বন্ধু। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে হলে এই রাতের অন্ধকার আমাদের একান্ত সুহৃদ। এই আঁধার আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। আঁধার ভেদ করে পুলিশের সদা-জাগ্রত চোখ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু কোথায় যাবো আমরা ?'—রতনের কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ছায়েদ বলে একটি ছেলে থাকতো বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ। সে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার এক নানী থাকে অজপাড়াগাঁয়ে। নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে আমার নানীর বাড়ি। বাড়ি বলতে ভাঙাচোরা একটা দালান—সাপ-খোপের বাসা। লোকে বলে ভূতুড়ে বাড়ি, নানীকে বলে ডাইনী। দিনের বেলাতেও কেউ সেদিকে এগোয় না। যদি নৌকো করে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়'—

জীবনদা যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন ; বললেন, 'ঠিক বলেছিস ছায়েদ।' ওই ভূতুড়ে বাড়িই সনাতনবাবুকে সব বিপদ থেকে আড়াল করে রাখবে। আর তোর নানী বুঝি ডাইনী ? আমাদের ত' ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী আর ডাইনী নিয়েই ঘর করতে হবে। সমুদ্রে যে শয্যা পেতেছে শিশির দেখে তার ভয় পেলে চলবে কেন ?

তারপর হাতে হাতে অতি দ্রুতবেগে সব কিছুর ব্যবস্থা। সনাতনবাবুকে ধরাধরি করে নৌকোয় তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে নৌকো এগিয়ে চললো নদীপথে।

শেষ রাত্তিরে ছায়েদের সাড়া পেয়ে তার নানী একটা কুপি হাতে এগিয়ে এল। তারপর সনাতনবাবুর দিকে চোখ পড়তেই খ্যানখেনে গলায় চীৎকার করে উঠল, 'এ কোন্ ঘাটের মরাকে টেনে নিয়ে এলি রে ছায়েদ ? দু'টো চোখের মাথাই যে খেয়ে বসে আছে !'

॥ পনেরো ॥

ছায়েদের নানীকে সবাই যে ডাইনী বলে কেন—সেটা জানা গেল পরদিন সকাল থেকে।

অতি ভোরেই খ্যানখেনে গলার আওয়াজে সবাইকার ঘুম ভেঙে গেল।

অতি ভোরেই নানী চীৎকার শুরু করে দিলে, 'ওরে ছায়েদ, ওঠ ওঠ। কুকড়ো চারটে আণ্ডা দিয়েছে! এ কিন্তু আমি প্রাণধরে কাউকে দিতে পারবো না। তোকেই কিন্তু এ চারটে আণ্ডা খেতে হবে।'

জীবনদা, রতন সবাই মাত্বর বিছিয়ে দাওয়াতে শুয়ে পড়েছিল। শেষ রাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবাইকার চোখে ঘুম জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাধ্যি কি তু' দণ্ড তারা শুয়ে থাকে ওখানে! বুড়ীর চিকণ গলার চীৎকারে সবাই উঠে বসলো।

জীবনদা চোখ কচলে হাসিমুখে বললে, 'তোমার কোনো ভয় নেই নানী! তুমি তোমার সব আণ্ডা ছায়েদকে খাইয়ে দাও। ওরই ত' এখন বুকে বল হওয়া দরকার। এখন খুব খাটনি যাবে ওর ওপর দিয়ে।'

বুড়ী চোখের ওপর হাতের চেটো রেখে শুধোয়, 'কেন, ওর খাটা-খাটনি হবে কেন? এদ্দিন বাদে ছায়েদ তার নানীর কাছে এলো—একটু আরাম করুক, আয়েস করুক। খাটা-খাটনির জন্যে ত' সারা জীবনটাই পড়ে রইলো।'

জীবনদা তবু রসিকতা করতে ছাড়লেন না; বললেন, 'শুধু কি ছায়েদই তার নানীর কাছে এসেছে? আমরা বুঝি একেবারে গাঙের জলে ভেসে এসেছি?'

এই কথা শুনে নানী এমন তীক্ষ্ণকণ্ঠে খ্যানখেন করে হেসে উঠলো যে, মনে হল বুঝি একটা কাঁসার বাসন কারো হাত থেকে পড়ে খান খান হয়ে ভেঙে গেল!

এই প্রাণ-কাঁপানো হাসির ভেতর দিয়ে বুড়ী হাসলো কি কাঁদলো ঠিক বোঝা গেল না।

রতন ফিস্ফিসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা জীবনদা, বুড়ীটা সত্যিই কি ডাইনী? কি রকম চোখের চাউনী দেখেছেন? যেন ভেতরটা অবধি দেখতে পাচ্ছে! তারপর ওই হাসি দিন কয়েক শুনলেই বুকের রক্ত শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাবে!'

জীবনদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'এত ভয় পাবার কি আছে রে বোকা? আমাদের ছায়েদেরই নানী। কাজেই মানুষ ত' বটেই। আস্তো চিবিয়ে গিলে খেতে ত' আর পারবে না।'

'কিন্তু তা'হলে লোকে ওকে ডাইনী বলে কেন? জানেন ত—যা রটে তা কিছুও বটে।'—বললে রতন।

এমন সময় ঘরের ভেতর সনাতনবাবুর একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল।

রতন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ঘরের ভেতর।

সকালবেলাকার অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

সনাতনবাবুকে বহুক্ষণ দেখাশোনা করা হয় নি।

তাঁর মুখ ধোয়াতে হবে, বেডপ্যান ধরতে হবে, সকালবেলাকার ওষুধ খাওয়াতে হবে। বিছানাটা ঝেড়ে-পুছে ঠিক করে দেওয়া দরকার। তারপর রয়েছে সকাল-বেলাকার পথ্যি খাওয়ানোর পর্ব।

কাজেই রতন ডাইনীর ভীতিপ্রদ আলোচনা ছেড়ে নিজের রোজকার কাজ নিয়ে মেতে উঠলো।

ওদিকে জীবনদা দাওয়া থেকে নেমে সোজা খালধারে চলে গেলেন। ভালো করে মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থির হয়ে ফিরে এলেন উঠোনে।

চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন জীবনদা। গত রাত্তিরের আলো-আঁধারী নিঝুম থমথমে পরিবেশে কোনো দিকেই তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ হয় নি।

ছায়েদের দাদামশাই জোতদার ছিলেন। এককালে তাঁর অবস্থা ভালোই ছিল।

জীবনদার চোখ দু'টি চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলা। ছায়েদের দাদামশাই এই নির্জন খালের ধারে কোঠাবাড়িই তৈরী করেছিলেন। ছোট ছোট ইটের দেওয়াল। দেখে মনে হয় অনেক কালের পুরানো। দেয়ালের গায় কি সব নক্সা আঁকা। ভালো করে ঠাহর করা যায় না।

এককালে নাকি এই বাড়ি মানুষ-জনে গমগম করতো। দু' বেলায় অনেকগুলো পাত পড়তো।

ছায়েদের দাদামশায়ের দান-ধ্যানও ছিল বেশ। কাউকে তিনি নাকি বিমুখ করতেন না।

তারপর কি কাল মড়ক এলো গাঁয়ে। একে একে অমন জলজ্যান্ত স্বাস্থ্যবান ভাইগুলো পট-পট করে মরে গেল। মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জামাইগুলো ছিল অমানুষ। তাই মেয়েরাও বেশীর ভাগ সময় এই বাড়িতে এসে মা-বাবার কাছেই থাকতো।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হল—কেউ হিসেব দিতে পারে না।

ছায়েদের দাদামশাই গফুর সাহেব এই সর্বনাশের বন্যাকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে পারলেন না।

এমন সাজানো বাগান একেবারে যেন ছাগলে মুড়িয়ে রেখে গেল !

যখন চারদিকে ভালো করে তাকাবার অবসর পেলেন, তখন চোখে তাঁর ঘুম নেই। এক রাত্তিরের ভেতর চুল আর দাড়ি পেকে শনের গোছার মতো দেখাতে লাগলো।

আপনার জন যারা ছিল—যাদের জন্য কোঠাবাড়ি তৈরী করা—তারা সবাই ছেড়ে গেছে! বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে। শূন্যপুরীতে বাতি জ্বালাবার জন্য শুধু বুড়ো-বুড়ী বেঁচে আছেন। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারেন না।

বুকটা হু-হু করে জ্বলে যায়—কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা কান্না বেরোয় না।

বুড়ো সারারাত ঘুমুতে পারেন না। শুধু উঠোনে পায়চারি করেন আর বলেন, 'আমার এত বড় বাড়ি, এতগুলো কামরা—এখানে থাকবে না কেউ ?'

এসব বলেন আর দু'হাতের আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলো টানতে থাকেন। দেখতে দেখতে চোখ দুটো করমচার মতো লাল হয়ে ওঠে।

এইভাবে বুড়ো পাগল হয়ে গেলেন। তখন বুড়ীই তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতেন—পাছে পাগল মানুষটা কোনো সময়ে খালের জলে ডুবে মরতে যায়।

সে আজ কতকালের কথা। ছায়েদ তখন শিশু।

ওই মহামারীর সময় ছায়েদ এখানে ছিল না বলেই বেঁচে গিয়েছিল। ছায়েদ তখন তার নিজের বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল।

কিন্তু সে যে কবে তার মাকে হারালে, সে নিজে কখনো তা জানতেও পারে নি। বড় হয়ে এই নানীর কাছেই সে তার মায়ের গল্প শুনেছে!

ছায়েদের জীবনের সব কথাই জীবনদার জানা—কোনো কিছুই অজানা নয়।

তাই ত' তিনি শত অসুবিধার মধ্যেও এক কথায় ছায়েদের সঙ্গে এখানে আসতে রাজী হয়েছিলেন।

তিনি বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই রকম একটি নির্জন-নিরিবিলি পোড়ো বাড়িই সনাতনবাবুকে সত্যিকারের আশ্রয় দিতে পারবে।

পুলিশ সনাতনবাবুর সন্ধান করতে জানা-অজানা বহু জায়গাতেই ঢুঁ মারবে। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ের কথা তাদের গোপন খাতার কোথায়ও লেখা নেই।

আরো একটা সুবিধের কথা ওরই মধ্যে ভেবে নিয়েছেন জীবনদা! সেটি হচ্ছে ছায়েদের নানীর ডাইনী নামটি। এই নামটি রক্ষা-কবচের মতো সনাতনবাবুকে সকল রকম পুলিশী জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

পুলিশ কখনো ধারণাতেই আনতে পারবে না যে, সনাতনবাবুর মতো একজন নামকরা বিপ্লবী—এই ডাইনীর আশ্রয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে!

সবুজ রঙের কীট-পতঙ্গ যেমন গাছের সবুজ পাতার আড়ালে নিজেদের রক্ষা করে—এ ঠিক তেমনি ব্যবস্থা।

'ডাইনী' নামের ভয়ে গ্রামের কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোয় না। বিপ্লবীর নিরাপত্তার দিক থেকে তার মূল্য আছে বৈ কি!

জীবনদা সেই উঠোনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অনেক কথাই ভাবছিলেন। বাড়ির চারদিকে এত জঙ্গল জমে গেছে যে, বাইরে থেকে ভেতরে কি ঘটছে না-ঘটছে, কিছুই নজরে পড়ে না।

ছায়েদ সকলের আগেই উঠে গোয়ালাদের পাড়ায় চলে গেছে—সনাতনবাবুর জন্য দুধ রোজ করতে। এতক্ষণে সে ফিরে এলো এক ঘটি খাঁটি দুধ নিয়ে! ওটার দরকার পড়বে একটু বেলাতে।

ইতিমধ্যে সনাতনবাবু বার্লিজল খান। রতন দেখলে, উঠোনের এক পাশে চমৎকার একটি লেবুগাছ! অনেক লেবু ফলে রয়েছে সেই গাছে।

এ বাড়িতে লেবু তোলার লোক কোথায়? তাই রতন মনের আনন্দে ছুটে গেল গোটা কয়েক লেবু পেড়ে আনতে।

কিন্তু তার আগেই হাঁ-হাঁ করে পথ আটকে দাঁড়ালো সেই ডাইনীটা; বললে, 'খবরদার! এই লেবুগাছে তোমরা কেউ হাত দেবে না। এই লেবুগাছ কে পুঁতেছিল জানো? জানো না কেউ! আমার মেজ মেয়ের হাতে পোঁতা এই লেবুগাছের ফল কাউকে ছুঁতে দিই নে। যক্ষের মতো আগলে আছি আমি। আজ ছায়েদ এসেছে। সে খাবে এই লেবু। হি—হি—হি!'

পাগলের মতো হাসতে লাগলো ডাইনীটা। তার ওই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে রতন ভয়ে দু' পা পেছিয়ে এলো! কি জানি,—বলা ত' যায় না! যদি ডাইনীটা ছুটে এসে তার হাতের আঙুল কামড়ে ধরে?

•

দূর থেকে ছায়েদ কিন্তু সব দেখেছে, সব শুনেছে। সে তার নানীর কাণ্ড দেখে এগিয়ে এসে বললে, 'ওরে রতন, তুই ভয় পাস নে। আমার মায়ের পোঁতা গাছ কিনা—তাই বুড়ী কাউকে ওগাছে হাত দিতে দেয় না। ওর ইচ্ছে, সব লেবু আমি বসে বসে চিবুই—পাগল আর কাকে বলে!'

বুড়ী কিন্তু শনের নুড়ির মতো চুলগুলো উড়িয়ে এগিয়ে এসে বললে, 'কী আমি পাগল? আমি কিন্তু কখনো পাগল হবো না। আমার মাথা সাফ আছে। পাগল হয়েছিল ত' তোর নানা। তাকে নিয়ে সারা জীবন কি আমি কম জ্বলেছি! তারপর মুখপোড়াটা করলো কি জানিস? একদিন পাটের দড়ি পাকিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে গলায় জড়িয়ে একেবারে ঝুলে পড়লো। ডাকাত বলতে চাস বল ডাকাত

—আর পাগল বলতে চাস ত' বল পাগল ! সে লাস টেনে নামালো কে শুনি ? এই ডাইনী ছাড়া আর কেউ নয় !'

ছায়েদ এগিয়ে এসে বুড়ীর পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলো ।

তার ফলে সাপের মাথায় যেন মন্তর-পড়া ধূলো ছিটানো হল । বুড়ী ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে ছায়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললে—যেন পাঁচ বছরের ছোট্ট খুকীটি !

ছায়েদ তখন তাকে নিয়ে দাওয়াতে বসলো । বললে, 'শোন নানী, এরা যে সব আমার সঙ্গে এসেছে, এরা ত' তোর মেহ্‌মান । এদের খাওয়াবি-দাওয়াবি, যত্ন-আত্তি করবি—তবে ত' আমি তোর কাছে কয়েকটা দিন থাকতে পারবো । নইলে যে আমাকেও ওদের সঙ্গে চলে যেতে হবে ।'

ডাইনিটা যেন সেই কথা শুনে শিউরে উঠলো ! বললে, 'কোথায় যাবি তুই আমার কোল খালি করে ? তোকে আর আমি কোথাও যেতে দেবো না । শালিধানের চিড়ে কুটে রেখেছি । পাটালী গুড় রেখেছি কলসী ভর্তি করে । সবরী কলা পেকে রয়েছে গাছে । পুষ্করিণীতে টাটকা মাছ । এসব ফেলে কোথায় যাবি রে ছায়েদ ? এসব কি আমার কবরে ঢেলে দিতে চাস ?'

ছায়েদ তখন আদর করে নানীকে কাছে টেনে নিয়েছে । ছোট্ট খুকীকে সবাই যেমন করে আদর করে ঠিক তেমনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, 'শোন নানী, তোর চিড়ে আমি খাবো । পাটালী গুড়ও ছাড়বো না । গাছের সবরী কলা দুধের সঙ্গে মেখে নেবো । কিন্তু আমায় তুই কথা দে—আমার একটা কথা তুই রাখবি ?'

বুড়ী মাথা দুলিয়ে আবদারের সুরে শুধোলে, 'কি কথা শুনি ?'

ছায়েদ বললে, 'আমার সঙ্গে যারা বাড়িতে এসেছে তাদেরকেও আমার মতন ভালোবাসবি—খাওয়াবি-দাওয়াবি, আদর করে কাছে ডেকে এনে কথা বলবি । ওরা যে আমাদের মেহ্‌মান—অতিথি ।'

বুড়ী আনন্দে মাথা দোলাতে থাকে আর বলে, 'ওরা আমার মেহ্‌মান ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ! ওরা আমার শূন্যি ঘর আবার ভরতি করে তুলবে । ওরে ছায়েদ, গাছে যত পাকা ফল আছে সব পেড়ে নিয়ে আয় । আমি ওদের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াবো ।'

অতি আনন্দে ডাইনী বুঝি দাওয়াতেই নেতিয়ে পড়লো ।

* * * *

সেদিন গভীর রাত্রে রতনরা যখন ঘুমে একেবারে অচৈতন্য, ঠিক সেই সময় গাঁয়ের চৌকিদার লাঠি ঠুক ঠুক করে এসে হাজির । জিজ্ঞেস করলে, 'ও বুড়ী, তোর বাড়িতে কি কেউ এসেছে ? রাত্তিরে আলো জ্বলে কেন ঘরে ?'

বুড়ী পাগলের মতো হি-হি করে হেসে উঠলো। হাসলো অনেকক্ষণ ধরে; তারপর বললে, 'ওরে মুখপোড়া, আমার ঘর ভর্তি ছেলেমেয়ে ছিল। তারা যে রাত্তিরে এসে আমার কাছে খেতে চায়। তাই ওদের খেতে দেবো বলে পিদিম জ্বালি। ডাইনী ছাড়া আর কার কাছে নিশুতি রাতে ওরা খেতে আসবে শুনি? এখানে উঁকি দিতে এলে ধড়ে আর পরাণ থাকবে না! মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবি —হি-হি-হি!'

চৌকিদার ভয়ে ভয়ে নাম জপ করে—রাম-রাম-রাম। তারপর হাতের লণ্ঠনটা ফেলে রেখেই পালাতে পথ পায় না!

॥ ষোল ॥

পৃথিবীতে যে কত অবাক কাণ্ড ঘটে, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।

ডাইনী যে এমন করে মানুষকে আপনার করে নিতে পারে, সে-কথা রতনের জানতে বাকী ছিল। বুড়ী যেন তার দুই ডানা দিয়ে দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ থেকে ওদের আগলে রাখতে চায়।

যে ডাইনীর রকম-সকম দেখে রতন মনে মনে পালাবার সঙ্কল্প করেছিল, আজ সে দাওয়ায় বসে জলভরা চোখ নিয়ে ভাবছে, এই নানীকে সে ছেড়ে যাবে কি করে। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মানুষের হৃদয়ে এমন যে সুধা লুকিয়ে আছে বিপ্লবী দলে যোগ না দিলে কি সে জানতে পারতো!

বাবুইবাসা বোর্ডিংই তাকে সব পাইয়ে দিয়েছে। সনাতনবাবু, জীবনদা, পথের পাওয়া দিদি, আর আজকের এই নানী। এরা সবাই স্নেহ-প্রীতির ফল্গুধারায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কোন্ ঘাটে গিয়ে সে তার ডিঙি বাঁধবে জানে না! এদের যে-কোনো একজনের সঙ্গে সে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার ত' উপায় নেই। বিপ্লবীর জীবনে কখনো শেকড় বসানো চলে না। সে হবে শুধু কদমের ফুল। যখন যেখানে ডাক পড়বে দুরন্ত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। যে ব্রত গ্রহণ করেছে, সেই ব্রত তাকে পালন করতেই হবে।

এখন দিনগুলো কত স্বচ্ছ, কত সুন্দর। তারা যে এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন

করে আছে, কাক-পক্ষীতেও তাদের খবর পায় না ! এ এক চমৎকার লুকোচুরি খেলা।

ওরা যেন পাণ্ডবদের মতো অজ্ঞাতবাস করছে ! কবে যে অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে ভারতের স্বাধীনতার সোনালী রোদ্দুরে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তা ওরা জানে না। যতদিন সেই সঙ্কল্প সার্থক হয়ে না ওঠে, ওরা ধূপের মতো পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিলিয়ে দিয়ে যাবে !

নানীর সজাগ ও সস্নেহ দৃষ্টিতে ওরা সবাই ছায়েদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছে। তিনটি ছায়েদকে যেন নানী একই সঙ্গে স্নেহের ঝর্ণায় অবগাহন করাচ্ছে ! আজ আর ওরা পৃথক নয়। ওরা তিনজনেই এক বুড়ীর নাতির স্থান অধিকার করে বসেছে। কাকে নানী বেশী ভালোবাসে আজ এই নিয়ে তিনজনের কপট কলহ চলে। আর নানী হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হাসে। তার সেই হাসি শুনে গাঁয়ের লোক শিউরে ওঠে ! কেউ আর ভয়ে এদিক পানে পা বাড়ায় না।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যের আঁধারে একটি নতুন লোক জীবনদার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা কৌতূহল প্রকাশ করতে নেই। তাই রতন একবার জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জীবনদার কাছ থেকে ডাক এলো গভীর রাত্রে। সনাতনবাবু ঘরের ভেতর। জীবনদা ও রতন দাওয়ায় ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ কার হাতের ধাক্কায় রতনের ঘুম ভেঙে গেল। সেই লোকটা আর কেউ নয়—জীবনদা।

ফিস্‌ফিস্ করে জীবনদা বললেন, 'শোন, আয় আমার সঙ্গে চুপি চুপি। দেখিস যেন কারো ঘুম না ভাঙে। ও ঘরে ছায়েদ তার নানীর সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। পায়ের এতটুকু শব্দ করবি নে। তাহলেই বুড়ী জেগে উঠে হাঁক ছাড়বে—কে যায় !'

দুরু-দুরু বক্ষে রতন জীবনদার পেছন পেছন খালের ধারে এগিয়ে যায়।

না জানি কি গুরুতর খবর এসেছে। জীবনদা ওকে নিয়ে খালের ধারে একটি গাছের আড়ালে বসলেন।

রতন কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না, অবাক হয়ে জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জীবনদাই ধীরে ধীরে খবরটা ভাঙলেন ; বললেন, 'দেখ রতন, আবার তোর ডাক এসেছে। জানিস ত' ভাই, বিপ্লবীর যখন ডাক আসে, তখন সে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না, কার কাছ থেকে আদেশ এলো জানতে চাইবে না, কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করবে না। সঙ্গে সঙ্গে সটান হয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।'

রতন তখনো চুপ করে বসে।

এই আনন্দের নীড় ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি তার কোথায়ও যাবার বাসনা ছিল না। কিন্তু…

'এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাজ হলো শেষ।'

জীবনদা ওর মনের ভাবটা হয়ত বুঝতে পারলেন। তাই ধীরকণ্ঠে বললেন, 'আর একটা কথা মনে রাখবি রতন, মহাভারত ত' তোর ভালোই পড়া আছে। সেই যে অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপারটা! গুরু দ্রোণাচার্য যখন জিজ্ঞেস করলেন —অর্জুন, তোমার সামনে কি দেখতে পাচ্ছ, আমায় জানাও। অর্জুন উত্তর দিলেন —পাখীটিকে দেখতে পাচ্ছি গুরুদেব। দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—গোটা পাখীটাকে কি দেখেছ অর্জুন? অর্জুন উত্তর দিলেন—না গুরুদেব, শুধু পাখীর চোখটা দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য তখন সোল্লাসে আদেশ দিলেন, তা'হলে বাণ নিক্ষেপ করো অর্জুন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদ! বিপ্লবী-জীবনের মূল কথাটাই তাই। আমাদের গোটা গাছটা দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু যেখানে তাকাতে বলা হবে, আমরা শুধু সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।'

খানিকটা চুপ করে রইলেন জীবনদা।

তারপর ধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, 'তোর ওপর আজ একটি কাজের দায়িত্ব এসেছে। অবশ্য এই কাজের ভার আমার ওপর পড়লে আমি আনন্দের সঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু চিঠিতে নির্দেশ আছে ছোট ছেলের প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে তোর নামই উল্লেখ আছে। কাজেই তোকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

নির্ভীককণ্ঠে রতন উত্তর দিলে, 'আমি প্রস্তুত জীবনদা! কে আদেশ পাঠিয়েছেন তাও আমি জানতে চাইব না। শুধু আমায় বলুন কি আমায় করতে হবে।'

জীবনদা রতনের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর কাঁপা গলায় বললেন, 'দেখ, কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ আমি পেলে খুশী হতাম। কিন্তু দায়িত্ব এসেছে তোর ওপর। কাজেই মনে বল এনে তোকেই এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে।'

রতন মুখে হাসি এনে বললে, 'বলছি ত' জীবনদা, আমি প্রস্তুত। শুধু আমাকে কাজটা ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কোনো রকম কাজেই আমি পেছ-পা হবো না জানবেন।'

জীবনদা আবার ওর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন; তারপর বললেন, 'আচ্ছা, মন দিয়ে শোন। আজ রাত্তিরেই তোকে রওনা হতে হবে। সঙ্গে পথের নিশানা রয়েছে।'

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে জীবনদা সেই কাগজে আঁকা নক্সাটা মেলে ধরলেন।

দেখা গেল, ওরা যে খালটার পাশে বসে আছে, তাই আঁকাবাঁকা পথের একটা নিশানা। খালটা যেখানে রেললাইনের কাছে গিয়ে পড়েছে, সেইখানেই নক্সাটা শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম লিখে নক্সাটার দিক নির্ণয় করা হয়েছে।

রতনের কণ্ঠে বিস্ময়। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, এই নক্সাটা নিয়ে আমি কি করবো, সে-কথা ত' তুমি আমায় বললে না!'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'আ-রে, সেই কথাই ত' বলতে যাচ্ছি। এখন মন দিয়ে শোন।'

আরো একটু চুপচাপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। রতন কিন্তু এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে জীবনদার হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিজেই বলতে ভয় পাচ্ছ জীবনদা!'

জীবনদা বললেন, 'না রে, না। শোন, বলি তবে, ওই যে খালের ওপর ঝোপের আড়ালে একটা ডিঙি নৌকো রয়েছে, ওইটে বেয়ে নিয়ে তোকে রেললাইন পর্যন্ত যেতে হবে। নিশুতি রাত, কেউ কোথাও জেগে নেই। খুব সাবধানে বৈঠে চালিয়ে যাবি, 'কাক পক্ষীতে যেন টের না পায়।'

রতন বললে, 'তা ত' যাবো। কিন্তু ওখানে এইআঁধার রাতে গিয়ে করবো কি শুনি?

'তা'হলে আসল কথাটাই খুলে বলি।' —এই বলে জীবনদা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন; তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আজ শেষরাত্তিরে ওই রেললাইন ধরে পূব থেকে পশ্চিমদিকে একটা গাড়ি যাবে ঠিক চারটে দশ মিনিটে। তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে। ওই গাড়ির একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় থাকবে এমন এক জাঁদরেল সাহেব যে বহু বিপ্লবীকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে, আর ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছে। এই শয়তানটার প্রাণ নেবার মহান দায়িত্ব পড়েছে তোর ওপরে।'

রতন এইবার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে সোল্লাসে বললে, 'হ্যাঁ, এই ত' কাজের মতো কাজ পাওয়া গেছে। কিন্তু কি দিয়ে খতম করবো দুশমনটাকে? বন্দুক, 'না রিভলবার?

এইবার হেসে উঠলেন জীবনদা, 'না রে বোকা, না। বন্দুকও নয়, রিভলবারও নয়। চলন্ত ট্রেনকে খতম করতে চাই বোমা। আর আমি তোকে জঙ্গলের মধ্যে বোমা ছুঁড়তে শিখিয়েছি। আজ সেই বোমা ছুঁড়েই শয়তানটাকে শেষ করতে হবে, বুঝলি?'

আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো রতন; গদগদ কণ্ঠে বললে, 'আমি এক্ষুণি রওনা হবো জীবনদা। কিন্তু বোমা কোথায় মিলবে, সেই কথাটা শুধু বলে দাও।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'এত ব্যস্ত হোস নি। সব মন দিয়ে শোন। এই নৌকো বেয়ে নক্সা অনুযায়ী তুই ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির হবি। ট্রেন আসার ঠিক পনের মিনিট আগে একটি ছেলে আসবে। এসে একসঙ্গে দু'টো শিস দেবে, তারপর বলবে 'সীতারাম'। তুই তাকিয়ে দেখবি, তার মাথায় একটি লাল গামছা বাঁধা আছে। সীতারামের উত্তরে তুই শুধু বলবি 'হরেকেষ্ট'। 'তাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে এসে নিঃশব্দে তোর হাতে দুটো বোমা দিয়ে সোজা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। মনে থাকে যেন তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করবি নে। সে কোথায় যাচ্ছে তাও জানতে চাইবি নে। শুধু বোমা দুটো হাতে নিয়ে তুই প্রস্তুত হবি। একটা বোমা যদি ব্যর্থ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ছুঁড়ে দিবি। একটি কথা শুধু মনে রাখবি যে, প্রথম শ্রেণীর গাড়িগুলো ট্রেনের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। হুঁশিয়ার!

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো রতন জীবনদার কথা শুনছিল। এইবার তাঁর পায়ের ধূলো কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'তুমি আমায় আশীর্বাদ করো জীবনদা, যেন আমি কৃতকার্য হয়ে ফিরতে পারি।'

মৃদু চন্দ্রালোকে হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে জীবনদা বললেন, 'এখন দুটো বেজে দশ মিনিট। যথেষ্ট সময় আছে। তুই নীচে নেমে গিয়ে নৌকোয় উঠে বস। আমিও আর এখানে অপেক্ষা করবো না। Wish you good luck!

যেন একটা আঁধারের সাগরের ভেতর দিয়ে রতনের নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। আকাশে মৃদু চন্দ্রালোক আছে বটে, তবে খালের যে দিকটায় গাছগুলোর ছায়া পড়েছে সে সেই অঞ্চল ধরেই নৌকো বেয়ে এগিয়ে চলেছে।

উঁচু বাঁধের ওপর রেললাইন। টেলিগ্রাফের তারগুলো যেন আঙুল উঁচু করে নিঃশব্দে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। খালের দু'ধারে ব্যাঙগুলো একটানা ডেকে চলেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে ডিঙি নৌকোটা একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, রতন বাঁধের ওপরে উঠে জায়গাটা ভালো করে দেখে নিলে। দু'ধারে অজস্র ফণিমনসা আর বাসক গাছ জায়গাটাকে ছেয়ে রেখেছে। সেদিক দিয়ে লুকিয়ে থাকবার পক্ষে স্থানটি বেশ নিরিবিলি, আর লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

স্থান নির্বাচন দেখে রতন ভারী খুশী হল। হাতের নক্সাটার সঙ্গে আবার ভালো করে মিলিয়ে দেখলে। হ্যাঁ, ফণিমনসা ও বাকসপাতার ঝোপের উল্লেখ আছে তার হাতের নক্সাতে।

রতন এইবার নিশ্চিত হল যে, ঠিক জায়গায় সে পৌঁছুতে পেরেছে।

এখন তীর্থের কাকের মতো তাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। কোন্ ছেলেটি আসবে

মাথায় লাল রঙের গামছা বেঁধে, তার হাতে থাকবে মারণ-অস্ত্র। তাই নিয়ে তাকে যথাসময়ে শত্রু নিধন করতে হবে।

রতন তার মনকে লোহার মতন শক্ত করেছে; আর তার কোনো ভয় নেই।

পেছনে একটা শব্দ হতেই সে সেইদিক পানে তাকালে। না না, কোনো মানুষ নয়! বরং মানুষ দেখে একটা শেয়াল জঙ্গলের দিকে ভোঁ-দৌড় দিলে।

এখন রতনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। দম বন্ধ করে সে প্রতীক্ষা করবে সেই ছেলেটির জন্য—যার আসার সঙ্গে তার ওপরে ন্যস্ত কাজ একেবারে একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে।

রতনের মনে হল আশে-পাশের গাছগুলো যেন সব কিছু জানতে পেরেছে। তারাও যেন এই গুরু দায়িত্বের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

ওই যে একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছ তার মোটা মোটা 'ব'গুলো মাটিতে নামিয়ে অপার কৌতূকে তাকিয়ে আছে; ওই যে টেলিগ্রাফের তারগুলোর ওপর দুটি নাম-না-জানা পাখী অন্ধকারের মধ্যে তাদের পুচ্ছ দুটি নাচাচ্ছে, আবার ওই যে যজ্ঞডুমুরের গাছটা খালের জলে নিজের ছায়াটাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছে—সবাই তাকে নানা ভাবে সাহস দিচ্ছে। শত্রু নিধন করতে নীরবে তার প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করছে। এদের সবাইকেই সঙ্কল্প পালনের শুভ মুহূর্তে তার প্রয়োজন আছে। আশে-পাশে কাউকে বাদ দিলে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, তার প্রতীক্ষা সার্থক।

ছেলেটি আসছে। তার মাথার লাল গামছাটা ঝোপের ওপর দিব্যি দেখা যাচ্ছে। সে কাছে এসে পড়েছে। রতনের বুকে কে যেন ঢেঁকির পার দিচ্ছে।

কানের কাছে দুটো শিস্ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল- -'সীতারাম'। সঙ্গে সঙ্গে রতন বললে, 'হরেকেষ্ট'।

হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ব্রহ্মাস্ত্র। আর কাউকে ভয় করে না রতন।

ইতিমধ্যে সেই ছেলেটি কোন্ দিকে যে মিলিয়ে গেল—রতন তা ঠাহর করতে পারলে না। আর তাকে প্রয়োজন নেই। এইবার তার নিজের কাজ।

প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের মতো সে যেন তপস্যায় বসেছে। কেউ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

হ্যাঁ—ওই যে দূরে ছুটে আসছে লৌহ-দানব। চোখটা তার ভাঁটার মতো জ্বলছে!

রতন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

এই তো ট্রেনের মাঝামাঝি জায়গা। ছুঁড়ে দিল্ সে তার ব্রহ্মাস্ত্র—পর পর দু'টি।

দারুণ শব্দে একটা কামরা অনেক উঁচুতে উঠে খালের জলে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কামরা। আগুন ধরে গেছে গাড়িতে।

রতন সেই তীব্র ঝাপটায় যেন উড়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেল।

তারপর কি ঘটলো সে আর কিছু জানে না।

॥ সতেরো ॥

আবার সেই বাবুইবাসা বোর্ডিং! বিস্ফোরণের ফলে ঝোপের মধ্যে ছট্‌কে পড়ে রতন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বিপ্লবী ভাইদের দল কি ভাবে ওকে তুলে নিয়ে সেই অন্ধকার থাকতে থাকতেই আট দাঁড়ের ছিপ বেয়ে একেবারে সোজা চলে এসেছে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সে খবর রতন কিছুই জানে না।

ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে দু'দিন পর। এই ঘটনার পরই সেই অঞ্চলে পুলিশের অত্যাচার শুরু হবে—সে তো জানা কথাই। তাই জীবনদার পরামর্শে ওকে সরাসরি এইখানে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এসেছে রতনের। এক প্রবীণ কবিরাজ গোপনে ওর চিকিৎসা করছেন। তিনি রাত্তিরের অন্ধকারে এসে ওকে দেখে যান, আর প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও একজন নামকরা বিপ্লবী। এখন বেশ বয়েস হয়েছে, 'তাই প্রত্যক্ষ কাজ থেকে দূরে সরে এসে আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চিকিৎসা আর রোগ-নির্ণয়ে তাঁর সুনাম আছে। রতন তাঁর ব্যবস্থায় তাড়াতাড়ি দেহে-মনে বল পাচ্ছে।

রতন মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে, একটু ভালো হয়ে উঠেই সে নানীর বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে। ওখানে গিয়ে ছায়েদের সঙ্গে লেবুগাছ নিয়ে খুন্‌সুটি করতে না পারলে ওর আদৌ ভালো লাগছিল না। দেহটা পড়ে ছিল বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ, আর ওর মনটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই নিশুতি পুরীতে নানীর সঙ্গে। নানীর মুখ দিয়ে শুনতে চায় যে, ছায়েদের চাইতে, রতনকে নানী বেশী ভালবাসে!

শুধু মুখে বললেই হবে না। নানীর ফোকলা দাঁতের সেই খিল্‌খিল হাসিটিও রতন আর একবার শুনতে চায়। যে হাসিকে নিশুতি রাতে লোকে মনে করে, ডাইনীর হাসি, রতনের কানে সেই হাসিই মধু বর্ষণ করে।

কিন্তু মূলকেন্দ্রে থেকে আদেশ এলো অন্য রকম। জীবনদার মাধ্যমেই অবশ্য খবরটা এসেছে।

রতনকে এখন আর ভাঙার কাজ করতে হবে না। এইবার তার ওপর গড়ার কাজের ভার পড়েছে।

প্রথমটা রতন কিছুই বুঝতে পারে নি। একদিন জীবনদা হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে উপস্থিত। তিনিই ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

আবার ভালো ছেলের মতো ওকে ইস্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। মাইনের জন্য ভাবনা নেই। মাসের পর মাস ওর ইস্কুলের মাইনে চালিয়ে যাবে বিপ্লবীদল।

এখানে থাকার খরচ আর ইস্কুলের দেয় সব কিছু জীবনদার হাত দিয়েই সে প্রতি মাসে পাবে।

এখন ওর কাজটা কি, সেই ব্যাপারটাই জীবনদা একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়ে দিলেন।

তারপর জীবনদা যেমন ধূমকেতুর মতো বোর্ডিং-এ এসেছিলেন, ঠিক তেমনি কাউকে কিছু না জানিয়ে, হঠাৎ কোন আঁধার-পথে মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার দিন সাতেক পর থেকে আরম্ভ হল রতনের সংগঠনের কাজ।

ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক-একটা আসল মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।

"যেখানে দেখব ছাই—
উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।"

প্রথমেই যে তাদের বিপ্লবীদলে গ্রহণ করা হবে তা মোটেই নয়। নানারকম কাজের ভেতর দিয়ে তাদের মনের বল, সাহস, একতা, নিষ্ঠা আর সহনশীলতার পরীক্ষা নিতে হবে। যে সব ছেলে শেষ পর্যন্ত সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবলমাত্র তাদেরকেই বিপ্লবীদলে নাম লেখাতে দেওয়া হবে।

তারপর চলবে তাদের শিক্ষা, মানে ট্রেনিং। এই ট্রেনিং-এর কাজ চলবে খুব গোপনে, যাতে বাইরের লোক কিছুমাত্র খবর না পায়।

প্রথমেই ছেলেদের জন্য একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যেয় ছেলের দল শরীরচর্চা করবে; কুস্তি শিখবে, যুযুৎসু অনুশীলন করবে।

যাতে দমটা খুব বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। সাঁতারের ব্যবস্থাটা আবার চালু করতে হবে। মাঝে মাঝে ছাত্র-সমাজে দৌড়ের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে। দৌড়ে যারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে, তাদের জন্য নতুনভাবে শিক্ষাদানব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

সবাইকার শরীর লোহার মত শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কেননা বিপ্লবীর চলার পথ কুসুমে ঢাকা নয়! কোথায় কোন্ অন্ধকার পথে সাপ লুকিয়ে আছে, বিপ্লবীকে ঝড়-বাদলের মধ্যে সেই বিপদের মাঝখান দিয়ে পথ চলতে হবে।

রতনের শিক্ষাদান-প্রণালীও একটু অন্য পথ ধরে চলে।

অল্প বয়সেই জীবনের অনেকখানি দেখে নিয়েছে সে। সেই উঁচু নীচু পথের অভিজ্ঞতার দাম বড় কম নয়।

যখন গভীর রাত্রে অঝোর ধারায় বর্ষণ চলে, 'ঠিক সেই সময় রতন চুপি চুপি ছেলেদের ডেকে নিয়ে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘরে ঘরে সবাই তখন সুখ-শয্যায় নিদ্রা যায়, আর এই দস্যি ছেলের দল বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণকে মাথায় নিয়ে কেবল নদী পারাপার করতে থাকে।

দুঃখের দহনের ভেতর দিয়েই যে ভারতের স্বাধীনতার-সূর্য উদিত হবে, একথা এই বেপরোয়ার দল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তাই চলে ওদের বিপদসঙ্কুল পথে অভিনব অনুশীলন।

এক একদিন রতন ওদের গভীর জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়। সে অঞ্চলটা লোকালয় থেকে অনেক দূরে।

সেইখানে সবার চোখের আড়ালে রতন ছেলেদের রিভলবার চালানো শিক্ষা দেয়। একটা নির্দিষ্ট গাছের গুঁড়িতে চুন দিয়ে গোল দাগ দিয়ে নেয়। মাঝখানে থাকে একটি ফোঁটা। সেই কেন্দ্রবিন্দুকে যে গুলীবিদ্ধ করতে পারবে, 'তারই হাতের নিশানা ঠিক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।'

অনেক সময় অন্য বন্দুক দিয়ে উড়ন্ত পাখীকে গুলি মেরে মাটিতে ফেলতে হবে। সেই লক্ষ্যভেদে যারা কৃতিত্ব অর্জন করে রতন তাদের সাধুবাদ জানায়।

ব্যায়ামাগারের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে সেইখানে চলে ছেলেদের কুস্তিশিক্ষা। রীতিমত কুস্তি করলে শরীর খুব বলিষ্ঠ হয়! কুস্তির পরে বিশ্রাম করে ওরা ভিজে ছোলা আর গুড় খায়!

অনেক সময় গরু কিংবা মোষের দুধ পানিয়ে গরম গরম ফ্যানাসুদ্ধ তাই পান করে! এতে দেহে শক্তি সঞ্চার হয়।

শরীরকে শক্ত করতে হবে, আর দেহ থেকে রোগ-ব্যাধির বালাইকে দূরে তাড়িয়ে দিতে হবে।

যে সব সময় 'মাথা গেল, পেট কামড়াচ্ছে' কিংবা 'পায়ে ব্যথা হয়েছে' বলে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, মুক্তি সংগ্রামে তার এতটুকু স্থান নেই।

তাই সবার আগে চাই শক্ত দেহ আর সরল মন।

গোটা ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেছে। আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছাত্র এসে ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েছে।

দেহ চর্চার সঙ্গে মনের চর্চাও চলছে।

এদের ভেতর থেকে সব ছেলেকেই যে বিপ্লবীদলে নেওয়া হবে তা কিন্তু মোটেই নয়।

যারা সব কাজে সেরা, দিনের পর দিন তাদের বাছাই করেই আসল কাজের জন্য তালিকাভুক্ত করে নেওয়া হবে।

বিশ্বকর্মার দৃষ্টি নিয়ে রতন সকলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন্ ঘরে যে আগামী দিনের যোদ্ধা তৈরী হচ্ছে তা কেউ জানে না। কাউকে সে হেলা করে না। সকলের মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তাই তো সে সাহসী মানুষ গড়বার ব্রত গ্রহণ করছে। ঘরে ঘরে সবাইকে ডাক দিয়ে যাবে সে। যে ঘুমে একেবারে অচেতন, তার ঘুম হয়তো ভাঙবে না। কিন্তু সজাগ ছেলেরা নিশ্চয় তার ডাকে সাড়া দেবে। এই তার একমাত্র ভরসা!

নানা জাতীয় প্রতিযোগিতা চলছে ছেলেদের মধ্যে। দূর পাল্লার হাঁটা, ডন-বৈঠকের প্রতিযোগিতা, সাঁতারের প্রতিযোগিতা, অন্ধকারে হাঁটার প্রতিযোগিতা, সাহসের প্রতিযোগিতা, ছেলেদের মধ্যে সব কিছুরই অনুশীলন চলছে।

একদিন রতন ঘোষণা করলে, 'তোমাদের মধ্যে সাহসের প্রতিযোগিতা হবে।' প্রতিযোগিতায় কে কে নাম দিতে চাও, 'এগিয়ে এসো!'

ঝোঁকের মাথায় অনেক ছেলেই এসে নাম লিখিয়ে গেল। কিন্তু রতন যখন আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে, তখন বহু ছেলেই পেছু হটতে শুরু করলে।

কেউ বললে, মা রাজী হচ্ছেন না। কেউ ওজর দেখালে, বাড়িতে পিসীমার ভারী ব্যামো। তাঁর সেবা করতে হয়—রাত জেগে। কেউ বললে, সন্ধ্যার পরেই দারুণ ঘুম পায় যে! অত রাত্তিরে ওখানে যাবো কি করে?

রতনের প্রস্তাবটা একটু বিদঘুটে বৈ কি! অমাবস্যার রাত্রে, ঠিক রাত বারোটার সময় একা একা নদীর ধারের শ্মশানে গিয়ে একটি খুঁটি পুঁতে আসতে হবে। সেই খুঁটির মাথায় একটি নিশান বেঁধে দিয়ে আসা চাই। একে একে যেতে হবে। দল বেঁধে যাওয়া চলবে না।

প্রথমে অনেকের নামই তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষকালে কেউ কেউ ওজর-আপত্তি ও অসুবিধার কথা জানিয়ে নাম কাটিয়ে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত তিনটি ছেলে কিছুতেই পেছ-পা হয় নি। তারা অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাবে বলেই স্থির হল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং হল কাজের ঘাঁটি।

সেইখানেই সব ছেলে জমায়েত হল। লটারী করে স্থির হল কে আগে যাবে।

রতন ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলে। সঙ্গে কোন আলো কিংবা টর্চ নেওয়া চলবে না; চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে দশটা পাড়াকে জানিয়ে যাওয়া চলবে না। নিঃশব্দে চলে যেতে হবে।

হাতে থাকবে সেই বাঁশের খুঁটি আর পতাকা। বাঁশের খুঁটিটা ইটের টুকরো দিয়ে ঠুকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে, তার মাথায় নিশানটা বেঁধে দিয়ে আসতে হবে।

প্রথম যার নাম উঠেছে তার নাম জয়ন্ত। জয়ন্তের সত্যি সাহস আছে।

এমনিতেই সে রাত-বিরেতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে চলতেও সে সাপের ভয় করে না। এ ছাড়া সে চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারে।

জয়ন্ত একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, আমি বাঁশী বাজাতে পারব তো?'

রতন উত্তর দিলে, 'মোটেই না। বাঁশী বাজিয়ে তুমি মনটাকে অন্য দিকে ঠেলে দিতে চাও। তার মানে, ওই ভাবে তুমি মনের ভয়টাকে দূর করে দিতে মনস্থ করেছ। তা কিন্তু চলবে না। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো আদৌ গ্রাহ্য হবে না। শুধু নিজের মনের জোরে এগিয়ে যাবে। গান গাওয়া কিংবা বাঁশী বাজানো মানেই তুমি একটি সঙ্গী চাইছ। তার সঙ্গে গল্প বলে তুমি মনের ভয়টাকে আমল দিতে অনিচ্ছুক!'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জয়ন্ত একাই যাবে। বাঁশের খুঁটি আর পতাকা নিয়ে সে রওনা হল। ছেলেরা কেউ কেউ শাঁখ বাজালে, কেউ কেউ উলুধ্বনি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করলো।

ভয়-ডর কাকে বলে জয়ন্ত জানে না। আপন মনেই সে এগিয়ে চললো। নদীর ধার দিয়ে চেনা পথ। না-ই বা থাকলো আকাশে চাঁদ, আকাশভরা তারার আলোতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে পথের রেখা।

ঝাউবন পেরিয়ে শ্মশানের দিকে আঁকা-বাঁকা পথ ধরলো জয়ন্ত।

ওই তো দূরে মরা-পোড়া ঘরটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্মশানের দিকে যেতে—বাঁ দিকে একটা ইটের খোলা পড়ে। জয়ন্ত সেইখান থেকে একটা ভাঙা ইট কুড়িয়ে নিলে। এইটে ঠুকে-ঠুকে বাঁশের খুঁটিটা মাটিতে পুঁততে হবে।

সদর রাস্তা ছেড়ে আরো কিছু দূর চলে যায় জয়ন্ত। তার পাশ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে কি একটা জানোয়ার খুব জোরে ছুটে পালিয়ে গেল।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো জয়ন্ত।

নাঃ, ওটা একটা শেয়াল।

শেয়ালটা হয়তো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আধপোড়া মড়া খাচ্ছিল। বহু লোক কাঠের অভাবে শেষ পর্যন্ত মড়া পোড়ায় না, ফেলে রেখে চলে যায়। এই জাতীয় ঘটনা হামেশাই ঘটে।

জয়ন্ত মনে মনে স্থির করে নিলে, সে এতটুকু ভয় পাবে না। আর ভয় পাবার আছেই বা কী? দিনের বেলা সূর্যের আলো থাকে—এখন তারই অভাব।

অন্ধকার তো আর রাক্ষস নয়। ভয়ের কি আছে? জয়ন্ত এগিয়ে চলে।

একটা জায়গা বেছে নিয়ে দমাদ্দম পিটতে থাকে খুঁটিটাকে। মনে হল বেশ বসে গেছে। তারপর সে নিশানটা টাঙিয়ে দিলে খুঁটিটার মাথায়।

ব্যস্! কাজ খতম।

কিন্তু যেই ফিরতে যাবে—কে যেন জয়ন্তের কোঁচা টেনে ধরেছে? যত টানে খোলে না!

তবে কি মহা শ্মশানে ভূত-প্রেত, দৈত্যি-দানোব কেউ আছে? দর-দর করে ঘাম ঝরতে থাকে জয়ন্তের সারা গা দিয়ে।

গোঁ-গোঁ শব্দ করে জয়ন্ত সেইখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে!

* * *

এক ঘণ্টা বাদেও যখন জয়ন্ত ফিরে এলো না, তখন রতন দলবল নিয়ে সেইখানে এসে হাজির।

টর্চ দিয়ে জয়ন্তের জ্ঞানহীন দেহটা শুধু দেখলে ওরা।

তারপর রতন বললে, 'হুঁ! যা ভেবেছি তাই। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে জয়ন্ত নিজের কোঁচাটাই খুঁটির সঙ্গে পুঁতে ফেলেছিল। তারপর যেই রওনা হতে গেছে—অমনি পিছু টান।'

আসলে মনের ভয়ই মানুষকে কাবু করে ফেলে। সেই দিন জয়ন্তের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে ওদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

॥ আঠারো ॥

বৃটিশের চ্যালা-চামুণ্ডা—যারা তখন আমাদের দেশ শাসন করতো, তারা আমাদের দেশেরই মানুষ। কিন্তু তারা মনে করতো, এই যে বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—এর সমস্ত গর্ব আর গৌরব তাদের। পীড়ন করে হোক, শয়তানী করে হোক, নিজের দেশে মানুষদের কারাগারে পাঠিয়ে হোক—বৃটিশ রাজত্ব এই দেশে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। রাজার জাতের পায়ে যাতে কাঁটাটিও ফুটতে না পারে, তারই খবরদারী করবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। তারা সরকারী চাকরী পেয়েছে সেই মহৎ কাজকে সকল দিক দিয়ে সফল করে তোলবার জন্য।

এই কথা তখনকার দিনের আমলারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো।

এই সব যো-হুকুমের দল জানতে পেরেছিল যে, একদল বিপ্লবী তরুণ তাদের নিজেদের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করেছে। এই বিপ্লবী দল আপন স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করছে না, নিজেদের সংসারের সুখের কথা ভাবছে না, নিজেদের উপার্জনের কথা চিন্তা করছে না, শুধু ভাবছে—মাতৃভূমিকে কি করে স্বাধীন করা যায়! কি উপায়ে বৃটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জাতীয় পতাকা ভারতের বুকে উঁচু করে তুলে ধরা চলে। এই ব্রত উদযাপনের জন্য বিপ্লবীদের কোনো ত্যাগই ত্যাগ নয়।

এই কাজের জন্য সোজা পথে না গিয়ে তারা আঁধার পথে পা বাড়িয়েছে। ঘরের সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করে সর্প-সঙ্কুল পথে অমানিশা রাত্রে নীরবে অভিযান চালিয়েছে।

কবি ত' তাদের উদ্দেশ্য করেই গান বেঁধেছেন—

"আপন জনে ছাড়বে তোরে—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না—
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবে না!
আসবে ঘিরে আঁধার নেমে—
তাই বলে কি রইবি থেমে?
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি—
হয়ত বাতি জ্বলবে না!
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

এই বিপ্লবী দল যে গোপনে গোপনে দেশের মধ্যে নীরবে স্বাধীনতার ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে—সে কথা যো-হুকুমের দল যে করেই হোক জানতে পেরেছিল।

তাই তারাও ঠিক করলে, এই বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। আমলারা আরও খোঁজ পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর ভেতর দিয়েই এই প্রস্তুতি চলছে। দেশের সমস্ত ছেলেমেয়েকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তা'হলে বৃটিশ রাজত্বে ফাটল ধরবে—আর তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এখানে ওখানে স্বদেশী ডাকাতির খবর তারা পেয়েছে; আর অত্যাচারী লালমুখদেরও যে ধ্বংস করবার চেষ্টা চলছে—ট্রেন ধ্বংসের পরিকল্পনা থেকে সে কথাও তারা বেশ জানতে পেরেছে।

তাই ওপর থেকে হুকুম এলো—শিক্ষা-বিভাগের ভেতর দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর ওপর পীড়ন চালাও। ছাত্রদল যাতে কোনো রকম স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করতে না পারে সেজন্য প্রখর দৃষ্টি রাখো।

অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো—এই বাবুইবাসা বোর্ডিং আর তার ইস্কুলের ওপরও কড়া চিঠি এলো। কিন্তু যখন দেখা গেল, কিছুতেই ছাত্রদলকে শায়েস্তা করা যাচ্ছে না, তখন শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক এলেন বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে।

বাবুইবাসা বোর্ডি-এর একটা বদনাম চিরকালই ছিল। তার ওপর যখন ওপর থেকে আদেশ পাওয়া গেল—তখন পুরোনো ঝাল ঝাড়বার একটা সুযোগ পেয়ে যো-হুকুমের দল সত্যি উল্লসিত হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে যে, ধরে নিয়ে আসতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। এখানেও অবস্থাটা দাঁড়ালো ঠিক সেই রকম।

একদিন কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে একদল সরকারী কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক আর সেই সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এসে হাজির হলেন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ।

আগে থাকতেই আট-ঘাঁট বেঁধে কাজ করেন এঁরা। তাই সাবধানের বিনাশ নেই! শেষ রাত্তির থেকে খানাতল্লাসী শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু বিপ্লবী ছাত্রদল যে আরো চালাক সে-কথা যো-হুকুমের দলের জানা ছিল না!

বৃটিশ সরকার তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যেমন গোপনে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকে, তেমনি বিপ্লবী দলের গোপনকর্মী আছে। তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে। এরা তখনকার দিনে ছড়িয়ে ছিল সরকারী দপ্তরখানায়, বিভিন্ন থানাতে, আমলাদের বাড়ির অন্দর-মহলে, এমন কি বড় বড় অফিসারের ছেলে, মেয়ে, ছেলে-বৌদের পর্যন্ত বিপ্লবীদল নিজেদের

সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল—বিপ্লবী কাজের সকল রকম সুবিধের জন্য। আমলার দল তখনো এত ঘটনা ভাল করে জানতে পারে নি।

যে রাত্রে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ খানাতল্লাসী হবে তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় ছেলের দল তাদের মূলকেন্দ্রের গোপন চিঠিতে সব কিছু জানতে পারে। কাজেই রতন সেদিন গভীর রাত্রে বোর্ডিং-এর একটা নিরালা ঘরে বিশ্বাসী বিপ্লবী ছাত্রদের একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করে।

একদল ছাত্র বলে, চলো, আমরা দিন কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দি। তা'হলে দেশের শত্রুরা এসে কোনো কিছুরই হদিস পাবে না।

রতন জবাব দিলে, 'না ভাই, তাতে ওদের সন্দেহ আরো বাড়বে। ওদের মনে এই ধারণা হবে যে, একদল বিপ্লবী এখানে বাসা বেঁধেছে। গুপ্তচরেরা সব সময় দৃষ্টি রাখবে এই বোর্ডি-এর ওপর। ফলে আমাদের সবাইকার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।'

ছেলেরা জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে আমরা এখন কি করবো ? আমাদের এই বোর্ডিং-এর অনেক রিভলবার, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর বোমা-বারুদ লুকোনো আছে। সেগুলোর কি ব্যবস্থা করা যাবে ?'

রতন হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, 'দেখ ভাই, পালিয়ে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তার চাইতে এসো, আমরা ওদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলি। ওরা যদি যায় ডালে ডালে, তবে আমরা যাবো পাতায় পাতায়। দেখি সে খেলায় কে জেতে, আর কে হারে।'

একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'সেই খেলাটা আমরা কি ভাবে খেলবো—আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দাও না। আমাদের যে শিয়রে সংক্রান্তি। সময় আর মোটেই হাতে নেই।'

রতন বললে, 'ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। এক্ষুণি আমি সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজের তালিকা তৈরী হয়ে গেল।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর কাছেই একটা নিবিড় জঙ্গল ছিল। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ ঢোকে না।

একদল ছেলে সেখানে গিয়ে টর্চ ধরবে, আর একদল রাতারাতি গর্ত খুঁড়ে ফেলবে।

এই দুই দল ছাত্রকে রতন পাঠিয়ে দিলে জঙ্গলের ভেতর।

ওরা একটি বড় বটগাছের তলায় জায়গা ঠিক করে—গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে ফেলল।

রতন তখন আর কয়েকজন ছেলের সহায়তায় থলে ভর্তি করে লুকিয়ে রাখা রিভলবার, আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সেই গর্তের ভেতর সেঁধিয়ে দিল। তার ওপর রইলো কিছু খড় আর কাঠের গুঁড়ো। তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে দিব্যি ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দেওয়া হল। তখন কে দেখে বলবে যে, এই জঙ্গলের ভেতর গর্ত খোঁড়া হয়েছে, আর তার তলায় এত মজার ব্যাপার লুকিয়ে আছে!

আর দু'টি ছেলেকে রতন নৌকো করে কাছের গঞ্জে পাঠিয়ে দিলে পরদিন সকালবেলা। সেখানে কিছু জিনিস কেনা-কাটা করতে হবে। ওদের বার বার সাবধান করে দিলে রতন যেন জিনিসগুলো কিনে তাড়াতাড়ি বোর্ডিং-এ ফিরে আসে। কেননা, তার পরও অনেক কাজ সবাই মিলে শেষ করতে হবে।

সারাদিন ধরে এঘরে-ওঘরে খুটখাট কাজ চললো। অন্যান্য ছেলেরা ইস্কুলে চলে গেছে। শুধু কয়েকটি বিশ্বাসী ছাত্রকে রতন যেতে দেয় নি। তারাই ক্ষিপ্রগতিতে সব কাজ সমাধা করে ফেলেছে।

সেদিন বোর্ডিং-এর খাওয়া-দাওয়ার পাট সন্ধ্যের মুখেই সেরে ফেলা হল।

সব ঘরেই ছাত্ররা পড়তে বসেছে। পড়াশোনায় এত মনোযোগ ছেলেদের এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। প্রতিটি কামরায় আলো জ্বলছে। ছেলেরা শান্তশিষ্ট হয়ে বিভিন্ন বিষয় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মুখস্থ করছে। কেউ পড়ছে ইংরেজী, কেউ ইতিহাস, কেউ ভূগোল, কেউ জ্যামিতি, আবার আর একদল ছেলে বাংলা কবিতা মুখস্থ করতে লেগে গেছে।

এ যেন একেবারে শটির বনের পাঠশালা বসে গেছে। সবাই শেয়াল পণ্ডিতের পড়ুয়া ছাত্র। কুমীর খুড়ো এলেই—চালাকির বুদ্ধিতে তাকে বোকা বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সন্ধ্যের বেশ কিছু বাদে একটি নতুন ছেলে, একটি চিঠি নিয়ে রতনের কাছে হাজির হল।

রতন সেই চিঠি পড়ে জানতে পারলে—বোর্ডিং-এ যারা খানাতল্লাসী করবে সেই বীর-বাহিনী নানা সাজে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়েছে। তাদের মনে এ বিশ্বাসও আছে যে, আত্মরক্ষার জন্য বোর্ডিং-এর ছেলেরা বোমা ছুঁড়তে পারে কিংবা রিভলবার ব্যবহার করতে পারে। তাই ওরাও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যেন যুদ্ধযাত্রা করেছে!

চিঠিখানি পড়ে রতন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তারপর প্রদীপের আলোতে ধরে সেই জরুরী পত্রখানি সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেললো।

সেই নতুন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে বললে, "সব ঠিক আছে। আমি আর নতুন কোনো চিঠি দেবো না। তুমি এক্ষুণি মূলকেন্দ্রে ফিরে যাও। এ অঞ্চলে

তোমায় কেউ চেনে না। তুমি একেবারে নতুন মুখ। ওদের গুপ্তচর চারদিকে সব সময় ঘোরাফেরা করছে। তাই তোমার তাড়াতাড়ি এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াই ভাল।

ছেলেটি মাথা নেড়ে তার মুখখানি চাদরে ভাল করে ঢেকে নিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল, আর তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

সারা বোর্ডিং অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দটা টক্‌টক্ করে কানে ভেসে আসছে।

রতনের চোখে ঘুম নেই। সে চুপ করে শুয়ে আছে। আর ঘড়ির শব্দটা সব সময় তাকে সচেতন করে দিচ্ছে।

আজকে রাতের অতিথির জন্য তাকে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতে হবে বৈ কি!

এদের অভ্যর্থনার জন্য রতন অন্যরকম ব্যবস্থাও করতে পারতো।

নৈশ আকাশের নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠে শত্রুকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করতে পারতো। ওদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারতো বোমার প্রচণ্ড আঘাতে!

কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হবে না। শুধু জানিয়ে দেওয়া হবে যে, বিপ্লবী দল এই বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ সত্যি সত্যিই নীড় বেঁধেছে। তার ফলে অকারণে কয়েকটি নিরীহ ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। অমানুষিক পীড়ন করবে তাদের! কারাগারে পাঠিয়ে দেবে এখানে ওখানে।

কিন্তু রতন তা চায় না। চরম আঘাত হানবার সময় এখনো আসে নি।

বিপ্লবীদের ভাল করে প্রস্তুত হতে হবে। তার জন্য আরো কিছু সময় চাই।

আজ বুদ্ধির যুদ্ধে তাদের জিততে হবে।

শেষ রাত্তিরে সত্যি হানাদাররা এসে হাজির হল। ছেলেদের মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল—ওরা কিছুই জানে না!

খানাতল্লাসী শুরু হতে দেখা গেল, প্রতি ঘরে সম্রাটের ছবি শোভা পাচ্ছে। কোনো কোনো ফটোর গায়ে ফুলের মালা দুলছে। 'England's Work in India' থেকে তর্জমা করে আনা বাণী ঝোলানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে। ভাইস্‌রয়দের ফটোর নীচে রাজভক্তির চমৎকার নিদর্শন! বৃটিশের পতাকাও খুঁজে পাওয়া গেল কোনো পড়ার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে!

যে অফিসারের ওপর খানাতল্লাসীর ভার ছিল তিনি স্থানীয় থানার কর্মচারীকে ভৎর্সনা করে বললেন, 'কি খবরাখবর রাখেন আপনারা ? এই রকম এক রাজভক্ত বোর্ডিং সম্পর্কে আপনি আমায় ভুল খবর পাঠিয়েছেন ! আপনার বিরুদ্ধে আমি হেড-কোয়ার্টারে রিপোর্ট করবো ।'

গট্‌গট্‌ করে অফিসার বেরিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে গেল তাঁর বিরাট বাহিনী।

তারপরেই ছেলেদের আনন্দের আতিশয্যে এত ক্ষিদে পেয়ে গেল যে, বোর্ডিং-এর বামুন সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি আর মাংস উনুনে চাপিয়ে দিলে।

———

বাবুইবাসা বোর্ডিং

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

এর মধ্যে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে !

অনেক পুরোনো বোর্ডার চলে গেছে, আর বহু নতুন বোর্ডার এসে বাবুইবাসায় আস্তানা করেছে।

রতন সবাইকে চেনে না। নতুন করে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে।

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ! রতনেরও হয়েছে তাই।

ইতিমধ্যেই নতুন নতুন হাসিমুখের দল তার চার পাশে এসে ভিড় জমিয়েছে !

পুরোনো ছাত্র যারা আছে, তাদের কাছে নতুনের দল খবর পেয়েছে—রতনের মধ্যে কী কী গুণ লুকিয়ে আছে !

তাই সবাই মিলে রতনকে ডাকাডাকির অন্ত নেই।

কেউ বলে রতনদা, 'আমি কিন্তু একেবারে সাঁতার জানি নে। আমাকে তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখিয়ে দিতে হবে।'

কেউ এগিয়ে এসে আবদার জানায়, 'আমায় কিন্তু যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে হবে।'

আবার কেউ কেউ আসে গোপনে—রাত্রে। তারা ফিসফিস করে বলে, 'রতনদা, আমায় কিন্তু সেই জিনিসটি শিখিয়ে দিতে হবে !'

রতন শুনে মিটিমিটি হাসে ; বলে, 'সেই জিনিস কি রে ?'

ছেলেটি একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে উত্তর দেয়, 'ওই যে জঙ্গলে গিয়ে যার লক্ষ্য ঠিক করতে হয়।'

রতন তখন হো-হো করে হেসে ওঠে, বলে, 'হবে রে হবে। আমি যখন আবার বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ফিরে এসেছি, তখন তোদের সব কিছু শিখিয়ে দেবো !

এইভাবে আবার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বিরাট এক দল !

তাদের নিয়ে রতন নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সাঁতারের মতো ভাল ব্যায়াম আর কিছুতে হয় না। দুই হাতের দাঁড়-টানার সঙ্গে, পায়ের জল কাটার সঙ্গে, বুকের সঙ্গে, জলের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে গোটা দেহটা সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে।

রতন তাই বলে দিলে সবাইকে—সকলের আগে সাঁতার শিখতে হবে। সাঁতার শিখলে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব মনের মধ্যে গড়ে ওঠে।

সাঁতারের দৌড়ে কে কাকে আগে 'ছাড়িয়ে যাবে তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলে।

আমি সকলের আগে এগিয়ে যাবো—এই হয় তখন সবাইকার পণ। তরতর করে হাঁসের মতো এগিয়ে চলে ছেলের দল। তখন রতন দেখে আর হাততালি দিয়ে হো-হো করে হাসে।

আস্তে আস্তে রতন ছেলেদের সব কিছুতে সব রকম শিক্ষাই দিতে লাগলো।

নদীর বুকে চললো সাঁতার দেওয়া। তা ছাড়া খালি হাতে ব্যায়াম, রিং করা, কুস্তি লড়া, যুযুৎসু শেখা, দড়ি লাফানো—সব কিছুতে নিজেদের পারদর্শী করে তুলতে হবে।

তারপর এদের থেকে বাছাই করে সকলের অগোচরে গভীর জঙ্গলে গিয়ে মাত্র কয়েকজনকে 'আগ্নেয় অস্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া হয়। বাইরের কাক-পক্ষীও তার বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারে না।

সাঁতার যে শুধু বোর্ডিং-এর ছেলেরাই শেখে তা নয়,—আশে-পাশের গ্রাম থেকেও অনেক ছেলে এসে রতনের কাছে সাঁতার দেবার কৌশল শিখে যায়। এইভাবে বিরাট এক সাঁতারু দল গড়ে উঠলো!

তখন রতন মনে মনে স্থির করলে, এদের নিয়ে একটি 'সন্তরণ-প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করতে হবে। কেননা সে চলে যাবার পর থেকে এই অঞ্চলে আর সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হয় নি! ছাত্রদের মনে যাতে উৎসাহের সঞ্চার হয় তার জন্য মাঝে মাঝে এই জাতীয় সাঁতারের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে।

সেদিন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে রতন ছেলেদের সঙ্গে এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার কথা আলোচনা করছিল। কোথা থেকে সাঁতার শুরু হবে—আর কোন্ পর্যন্ত ছেলেরা সাঁতরে চলে যাবে—সেইটে ঠিক যখন হয়ে গেল তখন রতন অন্যান্য বিষয় ঠিক করবার জন্য নদীর ধারে বসে নতুন করে কথাবার্ত্তা শুরু করে দিলে।

সাঁতারের সময় একদল রক্ষী নৌকো নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সেই নৌকোতে একজন ডাক্তার এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। তা ছাড়া নদীর ধারে মেলা বসবে, নাচের গানের ব্যবস্থা থাকবে ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্য।

আলোচনায় সবাই যখন মেতে উঠলো, তখন হঠাৎ একটি ছোট ছেলে ছুটে এসে রতনের হাতে একটি খাম গুঁজে দিয়ে আবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

রতন খামের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝতে পারলে, চিঠিখানি পাঠিয়েছেন জীবনদা। ওপরে সেই রকম একটি চিহ্ন ছিল—যাতে রতনের বোঝার কোনো অসুবিধে না হয়।

সবাইকে বিদায় দিয়ে রতন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ ফিরে এলো। চিঠিখানা নিরিবিলিতে পড়তে হবে।

জীবনদা লিখেছেন—আজ রাত দুটোর সময় বাবুইবাসা বোর্ডি-এর সামনেকার ঘাটে একটা নৌকো থাকবে। মাঝির সঙ্গে সোজা চলে আসতে হবে। মাঝিই নির্দেশ দেবে—রতনের জন্য কি কাজ ঠিক হয়ে আছে!

চিঠিখানা পড়েই রতন নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললে। এখন তা হলে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা সিকেয় তোলা থাক। এবার—

"—চলো মুসাফের—
বাঁধো গাঁঠোরিয়া—
বহুদূর যানে হোগা—"

এবার তার জীবন-দেবতা কোন্ দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—রতন তা কিছুই বুঝতে পারলে না।

গভীর রাত।

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছাত্রদল নিজ নিজ ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

রতন এক কাপড়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দূরে কোথায় যেন ঢং-ঢং শব্দ হল—দুটো বাজল।

নদীর ধারে একটি ছোট্ট ডিঙি নৌকো ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সাঙ্কেতিক কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে—তার জবাব পাওয়া গেল মাঝির মুখ থেকে।

তখন রতনের আর কোনো সন্দেহ রইলো না। সে নিশ্চিন্তমনে নৌকোয় উঠে সটান শুয়ে পড়লো। রাত দুটো পর্যন্ত তাকে মশা তাড়িয়ে জেগে থাকতে হয়েছে। ঘুমে তার দুটি চোখ বুজে আসছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে সে আবার অসুরের মতো পরিশ্রম করতে পারবে।

ডিঙি নৌকো কখন ছেড়েছে—ঘুমের আমেজে রতন তা জানতেই পারে নি!

ঘণ্টা দুয়েক বাদে মাঝি ওকে ডেকে তুললে; বললে, 'এইবার তুমি তোমার কাজ বুঝে নাও।'

চোখ কচলে উঠে বসে রতন বললে, 'বলো, শুনে নেই।'

মাঝি বললে, 'এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের একটি তালিকা তৈরী করেছে। তাদের কালাপানি-পারে পাঠিয়ে দেবার মতলব। তার বাড়িতে ছোকরা

চাকর হয়ে কাজে লাগতে হবে। তালিকা দেখে সুবিধে মতো বিপ্লবীদের নামগুলো টুকে নিতে হবে। খবরদার তালিকাটি যেন সরিয়ে এনো না। তা'হলে ব্যাটার সন্দেহ হবে। সেই নামগুলো পেয়ে গেলে বিপ্লবীদের আগে থেকেই লুকিয়ে ফেলা হবে। তখন পুলিশ ব্যাটারা খুঁজে মরুক !

—বেশ মজার কাজ ত !

রতন আপন মনেই বললে! তারপর একটু মুচকি হেসে প্রকাশ্যে বললে, "অনেক দিন একটা মনের মতো কাজ না পেয়ে গিঁটে গিঁটে যেন বাত ধরে গেছে ! এইবার মনের সাধে হাত-পা নাড়া-চাড়া করা যাবে।'

মাঝিও মুচকি হেসে উত্তর দিলে, 'হুঁ। এই জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের বাড়িতে অনেক খাটুনি। দু'মিনিট সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। এর আগে আরো দু'জন লোককে আমরা বহাল করেছিলাম, কিন্তু তারা টিকতে পারে নি—বাপ-বাপ করে পালিয়ে এসেছে।'

শুনে ভারী কৌতুকবোধ হল রতনের। উত্তর দিলে, 'ভারী মজার ব্যাপার ত' ! নতুন অভিজ্ঞতার দাম আছে বৈ কি! না হয় কয়েক দিন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের অন্ন ধ্বংস করা যাক।'

অবশেষে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের নৌকো এক শহরের কিনারে এসে উপস্থিত হল।

রতন ইতিমধ্যে এক ছোকরা চাকরের সাজ নিয়ে কোমরে একটা ছেঁড়া গামছা বেঁধে ফেলেছে। নৌকোর মাঝিই তাকে যথাসময়ে সেই সাজ সরবরাহ করেছে। ওদের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই।

পথ চলতে চলতে রতন জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা ভাই নৌকোর মাঝি, এবার আমার নাম কি হবে শুনি ?'

মাঝি মুচকি হেসে উত্তর দিলে, ভোম্বল !

—'অ্যাঁ! ভোম্বল !'

রতন যেন আঁতকে উঠলো।

একটি ভাড়াটে বাড়িতে পুলিশ অফিসারটি থাকেন। অফিসারটি হয়ত টিকটিকি বিভাগের লোক। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। গেটেও কোনো রকম কড়া পাহারা নেই।

ওরা দু'জনে সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। একটি লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক বারান্দার টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিলেন। ওদের দেখতে পেয়ে কাগজ থেকে মুখ তুললেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নাকি তোর ছোকরা চাকর ?'

মাঝি ভক্তিভরে ওর পায়ের ধূলো নিয়ে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা, এমন বিশ্বাসী লোক আপনি ত্রিভুবনে আর দুটি পাবেন না।'

ভদ্রলোক হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন, 'অ্যাঁ! বলিস্ কিরে? ত্রিভুবনে মাত্র একটি! আর কোথাও এর জুড়িদার খুঁজে পাওয়া যাবে না?'

মাঝি মুখ নীচু করে জবাব দিলে, 'সত্যি তাই কর্তা। দু'দিনেই আপনি এর পরিচয় পাবেন।'

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক তখন রতনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁরে কি নাম তোর?

দু'হাত কচলে মাথা নীচু করে বিনয়ের অবতারের মতো রতন উত্তর দিলে, আজ্ঞে আমার নাম ভোম্বল। তবে আমি একটু কানে খাটো। একটু জোরে হুকুম করবেন হুজুর!'

কর্তা মনের আনন্দে আরো জোরে জোরে দালান-কোঠা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর একটু থেমে কর্তা বললেন, 'বেশ ভাল কথা। কানে খাটো লোক বেশ কাজের হয়। টিকে থাকবি ত' অনেক কাল?'

যেন কথাটা শুনতে পায় নি এই ভাবে ভোম্বল বললে, 'আজ্ঞে কর্তা, টিকে দিয়ে তামাক সেজে নিয়ে আসবো?'

কর্তা ওর কথা শুনে ভারী খুশী হলেন; বললেন, 'আচ্ছা, আগে টিকে দিয়ে তামাকই ধরিয়ে নিয়ে আয়। ত্রিভুবনে মাত্র একটি কাজের মানুষ! তার গুণের পরীক্ষাটা হয়েই যাক।'

মাঝি আর একবার কর্তার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, 'আচ্ছা কর্তা, আমি এখন তা'হলে যাই। পরে এসে না হয় খবর নিয়ে যাবো।'

কর্তাকে খুব খুশী বলেই মনে হল। তিনি উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। তোর কাজের মানুষের যাচাই হয়ে যাক্'—

মাঝি ওকে আর একবার মন দিয়ে কাজকর্ম করতে বলে, বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু মন্তব্য করলে, 'কাজ দিয়ে কর্তাকে খুশী কর্—মাইনের জন্যে ভাবতে হবে না। অন্য জায়গায় যা পেতিস তার ডবল টাকা মিলবে।'

—'ঠিক আছে—ঠিক আছে!'

আবার লম্বা-চওড়া মানুষটির অট্টহাস্য শোনা গেল। সেই ফাঁকে মাঝি পালিয়ে গেল।

কর্তা বললেন, 'দেখ, বাড়ির কথা বাইরে যেতে পারবে না। খুব হুঁশিয়ার। তুই যদি বোবা হতিস ভোম্বল, তা'হলে আমার কাজের আরো সুবিধে হতো।'

ভোম্বল মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে কর্তা, কথা বলি বটে, তবে সে কথা বাইরে পর্যন্ত পৌঁছুবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তা।'

কর্তা তখন হাঁক দিলেন, 'ওগো শুনছ, এই যে ছোকরা চাকর এসেছে। ওকে নিয়ে যাও—সব কাজ বুঝিয়ে দাও।'

কর্তার হাঁক শুনে এক অপরূপ সুন্দরী বৌ ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বৌটি কোনো কথা বললে না। শুধু ইঙ্গিতে তাকে সঙ্গে আসতে বলে আবার ঘরের ভেতর চলে গেল।

ভোম্বল মনে মনে ভাবলে, এমন জাঁদরেল জানোয়ারের এমন সুন্দরী বৌ! ওর পাশে একে একেবারেই মানায় না।

মনের ভাব গোপন করে ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, তোমায় আমি দিদি বলে ডাকবো—কেমন ?'

দিদি ডাকের কথা শুনে বৌটি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। ধমক দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'খবরদার, আমায় কাউকে দিদি বলে ডাকতে হবে না। দিদি ?—না—না, আমার কোনো ভাই নেই। সে মরে গেছে—আর আসবে না।'

পর মুহূর্তেই ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলো বৌটি ছুটে গিয়ে একটা তক্তপোশের ওপর নিজের দেহ লুটিয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ভোম্বল এই কাণ্ড দেখে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। না জেনে সে কি বৌটির মনে কষ্ট দিলে ?

বৌটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে আঁচলে চোখ দুটি মুছে ফেললে। তারপর অনেকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাত ইশারা করে ওকে কাছে ডাকলো।

ফিস্‌ফিস্ করে বৌটি বললে, 'আমার একটি ভাই ছিল ঠিক্ তোরই মতো দেখতে। সে আর কখনো আমার পাশে এসে দিদি বলে ডাকবে না। তাই ত' আমি আর 'দিদি' ডাক সইতে পারি না। খবরদার, তুই আমায় কখনো দিদি বলে ডাকবি নে। পুলিশের লোক আমার সেই ভাইটিকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলে, বৌটির দু'চোখ বেয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ছে!

এ বাড়ির বৌটা কি পাগল নাকি ? সে নতুন এলো চাকর হয়ে। তার কাছে নাকি কেউ মনের কথা খুলে বলে!

ভোম্বল আপন মনে এই কথা ভাবতে থাকে। বৌটি হঠাৎ বলে বসে, 'বুঝলি, আমি ঠিক করেছি এর প্রতিশোধ নেবো ; তাই ত' এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছি। তুই আমাকে সাহায্য করবি ত' ?'

ভোম্বল কোনো কথার জবাব দিতে পারে না। অবাক হয়ে বৌটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

বাড়ির কর্তা ডেকে বললেন, ওরে ভোম্বল, এদিকে আগে শুনে যা'—

ভোম্বল দুটো মুড়ি খাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি গামছায় বেঁধে রেখে এসে শুধোলো, আজ্ঞে কর্তা, কি হুকুম করছেন—বলুন।'

কর্তা মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কি করছিলি তাই আগে বল।'

ভোম্বল জবাব দিলে—আজ্ঞে, দিদিমণি দুটো মুড়ি খেতে দিয়েছিলেন, এতক্ষণ ধরে তাই চিবুচ্ছিলাম।

শুনে কর্তার হাসি দেখে কে!

সামনে-পেছনে দুলে দুলে তিনি হাসতে লাগলেন। আর হাসতে সুরু করলেই কর্তার চোখ দুটি আপনা থেকেই ছোট হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে কর্তা বললেন, 'অ্যাঁ! তুই তো খুব তুখোড় ছোঁড়া দেখতে পাচ্ছি! একেবারে দিদিমণি জুটিয়ে বসে আছিস? কিন্তু খুব সাবধান। দিদিমণি ডাক শুনলেই ও একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। মারধোর খাওয়ার সাধ হয়েছে বুঝি? খবরদার, ও নামে ডাকিস নে—তা'হলে সত্যি বিপদে পড়বি।'

কর্তার আবার দুলে-দুলে সেই মজাদার হাসি।

হাসি থামলে তবে ত' কথা!

কর্তা গলা খাটো করে বললেন, 'আরে বোকা ছেলে, তুই মিছিমিছি তোর দিদিমণির কাছ থেকে মুড়ি চিবিয়ে মরছিস কেন? আমার সঙ্গে চল বাজারে। দেখবি, আমি তোকে জিলিপি আর রসগোল্লা খাওয়াবো। তারপর বাজার-টাজার করে ভালো মাছ নিয়ে ফিরে আসা যাবে। কথায় বলে, মাছ-ভাতে বাঙালী। ভালো টাটকা মাছ না হলে খাওয়া হয়? চল আমার সঙ্গে'—

একটা বাজারের থলে নিয়ে ভোম্বল কর্তার সঙ্গে বাজারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

যাবার আগে কর্তা হাঁক দিয়ে বলেন, 'শুনছ, আমি মাছ আনতে চললাম। আগে থাকতেই শাক আর ডাল রান্না করেই উনুনে জল ঢেলে দিয়ে বসে থেকো না। তোমার আবার যে তড়িঘড়ির ব্যাপার!'

সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কাক-চিল-ওড়া হাসি শোনা গেল। না হেসে কর্তা কথা বলতে পারেন না। দেখে মনে হয় একেবারে দিলদরিয়া মানুষ।

পথে আর কোনো কথা হল না।

কর্তা কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ চলেছেন।

বাজারে পৌঁছে আবার সেই দিলদরিয়া ভাব ফিরে এল।

—ওরে ভোম্বল, কি খাবি বল। মিছিমিছি বেনো বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি বল ? দিদিমণিহি ডাকিস, আর পায়ে তেল মালিশ করেই দিস—শুধু জুটবে ওই শুকনো মুড়ি। তার চাইতে আমার কথা মেনে চল—মিলবে এই রকমারি খাবার! নে, যত পারিস চালা—

সত্যি, ওকে এক ঠোঙা খাবার কিনে দিলেন কর্তা।

রতনের খিদেও পেয়েছিল খুব।

কোনো রকম উচ্চ-বাচ্য না করে সে একমনে খাবারগুলো মুখে পুরতে লাগলো। যখন খাবার শেষ হয়ে গেল, ঢকঢক করে দুই গেলাস জল খেয়ে ফেললে সে।

কর্তা শুধোলেন, 'কিরে, আরো চাই ?'

ভোম্বল পেটে হাত বুলিয়ে জবাব দিলে, না কর্তা! পেট একেবারে জয়ঢাক। তার ওপর দুই গেলাস জল। ভরা নদীতে নৌকো চলছে যেন।

কর্তা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্তা আবার বললেন, 'বাজার পরে হবে। চল, আগে এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

বন-জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। সহজে বোঝবার উপায় নেই যে ওটা রাস্তা—কর্তা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চললেন।

আরো কিছু দূর এই ভাবে চলবার পর—দূরে দেখা গেল একটা পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি।

এখানে আবার কে থাকে ?

কর্তার মতলবখানাই বা কি ?

রতন এইবার সত্যি ভাবনায় পড়ে।

ততক্ষণে ওরা একেবারে সেই ভাঙা জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কর্তা বললেন, 'আমার সঙ্গে আয়—

কর্তার দেখানো অন্ধকার পথে ভোম্বল ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়ে।

ভেতরে গিয়ে দেখে একটা ঘরে অনেকগুলো জোয়ান লোক বসে কাগজপত্র নিয়ে কী সব কথাবার্তা বলছে। কর্তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

কর্তা বললেন, 'লগন সিং, এইদিকে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে একটি জোয়ান ছেলে এগিয়ে এলো।

কর্তা আবার বললেন, 'লগন সিং, এই ছেলেটিকে চিনে রাখো। একে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।'

এইবার কর্তা নতুন করে যেন ভোম্বলের দিকে তাকালেন। বললেন, 'শোন ভোম্বল, তোর আসল জরুরী কাজের কথাটা শুনে রাখ। লগন সিং আজ বাজারের মধ্যে তোকে একটি লোককে চিনিয়ে দেবে। তোকে তার সব খবর ধীরে ধীরে নিতে হবে। দরকার হয় তার সঙ্গে আলাপ করবি, ভাব করবি, তার বাড়ি যাবি। লোকটা কোথায় যায়, কি করে—সব খবর আমার জানা দরকার।'

রতন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, কর্তার মুখের সেই দিলখোলা হাসি একেবারে মিলিয়ে গেছে। দুটি চোখের মাঝখানে কী একটা মতলব যেন বাসা বেঁধেছে। ভুরু দুটি কাঁপছে। আর ঠোঁটের মধ্যে লুকোনো রয়েছে—কী একটা চাপা শয়তানি।

তা'হলে এতক্ষণ ধরে কর্তা যে হাসছিলেন—সেটা কি তাঁর আসল রূপ নয়? আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে এই ভাঙাচোরা ঘরের মাঝখানে,—এই আলো-আঁধারি আশঙ্কাজনক আবহাওয়ায়?'

মনে মনে হাসলে রতন।

তাকে পাঠানো হয়েছে একটা লোকের ওপর খবরদারী করতে, আর সেই লোকটা কিনা উল্টো অপর মানুষের পেছনে তাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করছে!

তা'হলে দেখা যাচ্ছে—খেলাটা জমবে ভালো।

লগন সিং-এর দিকে ভোম্বল আর একবার তাকালো। বাঙালীরই ছেলে, দিব্যি ব্যায়াম-করা দেহ। ওর নাম তা'হলে লগন সিং হল কেন?

এরাও কি সব ছদ্মবেশে কাজ হাসিল করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে?

অনেক কিছু আপন মনে ভাবতে লাগলো রতন।

কর্তা তখন ঘরের একটা কোণে গিয়ে ফিস্-ফিস্ করে লগন সিংকে কি সব বোঝাচ্ছেন।

কর্তার কথা শুনে লগন সিং শুধু তার মাথা নাড়ছে আর 'হাঁ-জি, হাঁ-জি করছে।

আরো খানিকক্ষণ বাদে কর্তা ভোম্বলের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এইবার থেকে লগন সিং-এর সঙ্গে বেরুতে হবে। তারপর কি কি করতে হবে—লগন সিং সব বুঝিয়ে দেবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। ঠিক-ঠিক মতো কাজ হাসিল করতে পারলে মাইনে ছাড়াও বকশিশ মিলবে। বুঝলি বোকচন্দর?'

না বুঝে আর উপায় কি? রতন মনে মনে বুঝে নিয়েছিল—পড়েছি মোগলের হাতে, যেতে হবে তার সাথে। এখানে ওজর-আপত্তি তোলা মানেই বিপদে পড়া। তার চাইতে বুদ্ধিমান ছেলের মতো মুখ বুজে কথা শুনে যাওয়াই ভালো।

তবু একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে—বাজারে মাছ কিনতে হবে না কর্তা?

কর্তা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—সেজন্য তোর কোনো ভাবনা নেই। আমি সময়মতো মাছ নিয়ে যাবো। কিন্তু তোর কাজ হাসিল করা চাই।

লগন সিং-এর সঙ্গে ভোম্বল পথ চলতে সুরু করে দিল।

এবার কিন্তু নতুন অাঁকা-বাঁকা পথ। অনেকক্ষণ বাদে ওরা একটি নদীর ধারে গিয়ে হাজির হল। খুব বড় নদী নয়—ছোটখাট নদী।

সেই নদীর ধারে একটি ছোট খড়ের বাড়ি।

লগন সিং পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'ওহে ভোম্বল, এইবার আমাদের এই বাড়ির একেবারে পেছন দিকে যেতে হবে।

ভোম্বল তার কথার কোন প্রতিবাদ করলে না! সে ভালো রকমই জানে, এসব ব্যাপারে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তার চাইতে বাধ্য ছেলের মতো হুঁ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঝোপ-জঙ্গল আর বেত-কাঁটা সরিয়ে ওরা দু'জনে যেখানে গিয়ে উপস্থিত হল—সেটা ওই খড়ো বাড়ির একেবারে পেছন দিকটা।

সেখান থেকে বাড়ির উঠোনটা দিব্যি দেখা যায়। লোকজন আসছে যাচ্ছে, বাড়ির গিন্নী কাজের ফাঁকে এঘরে-ওঘরে আনাগোনা করছে—ওই ঝোপের আড়াল থেবে সব কিছু চোখে পড়ে।

একটু বাদে আঠারো-কুড়ি বছরের একটি সুন্দর ছেলে উঠোনে নেমে এলো। ছেলেটির ভালো স্বাস্থ্য, লম্বা চেহারা! রীতিমতো ব্যায়ামচর্চা না করলে এমন সুন্দর স্বাস্থ্য হতে পারে না।

লগন সিং বললে, 'এই ছেলেটিকে ভালো করে চিনে রাখো ভোম্বল। একে নিয়েই এখন তোমার সব কাজ।

ওরা দু'জনে অবাক হয়ে দেখলে—একটি ফুটফুটে মেয়ে ওর পেছন পেছন উঠোনে নেমে এসে বললে, 'দাদা, তুমি এরই মধ্যেবাজারে চললে, কিন্তু আমার অঙ্ক যে এখনো শেষ হয় নি।'

ছেলেটি উত্তর দিলে—কত অঙ্ক আর করবি বল? এখন বাজারে না গেলে সব মাছ ফুরিয়ে যাবে। জানিস ত'—মাছ না হলে মা একেবারে ভাত খেতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি বাজার করে ফিরে আসছি।

কিন্তু মেয়েটি একেবারে না-ছোড়-বান্দা; বললে, 'হু! তা বৈ কি! বাজারে গেলে তোমার রাজ্যের লোকের সঙ্গে দেখা হবে, আর তাদের সঙ্গে তোমার হাজার কাজ। কাল অঙ্ক না নিয়ে যাবার জন্য আমি বকুনি খেয়েছি। আজও যদি সেই ব্যাপার ঘটে তা'হলে আমি ইস্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দেবো।

ছেলেটি বোনের চুলটা টেনে নিয়ে উত্তর দিলে—পাগলি মেয়ে! আমি বাজারে যাবো আর আসবো। তখন দেখবো, তুই কত অঙ্ক করতে পারিস।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি থলে হাতে বেরিয়ে গেল।

লগন সিং ফিস্‌-ফিস্‌ করে ভোম্বলকে বললে, 'এইবার তোমার কার্জ সুরু হবে। প্রস্তুত হও'—

ভোম্বল জবাব দিলে, 'প্রস্তুত ত' হতে বলছ; কিন্তু কিসের জন্য প্রস্তুত হবো—সে-কথা না বললে কি করে বুঝবো?

লগন সিং ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে সুরু করলো। বললে, 'চলো, যেতে যেতে তোমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।'

শোনো ভোম্বল ভাই, ওই যে ছেলেটিকে এতক্ষণ দেখলে, উঠোনে দাঁড়িয়ে বোনের সঙ্গে খুন্‌সুটি করছিল—ও এখন নদীর ধার দিয়ে বাজারের দিকে যাবে। এখন তোমার একটা জরুরী কাজ আছে।

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'কি কাজ? ওর হাতে কোনো চিঠি দিয়ে আসতে হবে?'

ওর কথা শুনে লগন সিং হেসে উঠল; বললে, 'না না, অত সোজা কাজ নয়। তোমায় খানিকটা কসরৎ দেখাতে হবে।'

—কসরৎ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কসরৎ। তুমি যেন এই নদীর মধ্যে আচমকা পড়ে গেছ। সাঁতার জানো না; বেশ খানিকটা জল খেয়েছ। বাঁচবার জন্য আঁকুপাকু করছ। দু'হাত তুলে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছ—কে কোথায় আছ—আমায় বাঁচাও!

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—সে কি? তার মানেটা কি? আমি যে খুব ভালো সাঁতার জানি!

লগন সিং উত্তর দিলে, 'সে ত' আরো ভালো। প্রাণের ভয় থাকল না। খুব আমেজ করে অ্যাক্‌টিং করতে পারবে। জানো ত, ওই জাতীয় ছেলেরা লোকের উপকার করবার জন্য তৈরী হয়েই থাকে; তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় নদী থেকে তুলে নিয়ে আসবে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'তাতে লাভটা কি হবে?'

লগন সিং জবাব দিলে, 'লাভ যা হবে সেটা পরে জানতে পারবে। এখন ত' কাজে লেগে যাও। আমাদের কর্তার যে হুকুম সেই কাজ। এতটুকু নড়চড় হবার যো নেই। আজ তুমি চাকরি পেয়েছ, আর আজকেই তোমায় পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় ফেল হলে যে পিটুনী জুটবে—তা শিকেয় তোলা আছে। ছেলেটা এতক্ষণ সামনের দিক দিয়ে নদীর ধারে পৌঁছে গেছে। যাও—এইবার ছুট লাগাও!'

ভোম্বল তখন আর কি করে ! পুলিশের দলের পাল্লায় পড়েছে সে ।

একেই বলে, বাঘে ছুলে আঠারো ঘা । পুলিশে যখন বুড়ী ছুঁয়ে দিয়েছে, তখন গায়ে-গতরে ঘা হবে বৈ কি !

ভোম্বলও আর কিছু না ভেবে-চিন্তে ছুট্ লাগালো নদীর ধারের দিকে । তারপর যেন হঠাৎ পা হড়কে জলে পড়ে গেছে—এই ভাবে নদীর মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবু-ডুবু খেতে সুরু করে দিলে ।

—বাঁচাও—বাঁচাও—কে কোথায় আছ আমায় বাঁচাও !

সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারে অনেক লোক জমে গেল !

বাজারের সময় । কেউ বাজার করতে যাচ্ছে, আবার কেউ বাজার নিয়ে ফিরে আসছে ।

ভীড় বাড়তে বিন্দুমাত্র দেরী হল না । কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, কেউ জলে নামতে রাজী নয় ! সবাই পারে দাঁড়িয়ে অপরকে পরামর্শ দেয় । একটা প্রকাণ্ড দড়ি হলে যে সেইটে ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচানো চলে—এমন মন্তব্যও কেউ কেউ করতে লাগলেন ।

এমন সময় কোথা থেকে ছুটে চলে এলো সেই ছেলেটি । বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে হাতের থলেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে ।

রতন খুব ভালো সাঁতার জানে ; কিন্তু এই ছেলেটি জল কাটিয়ে এসে এমন অবলীলাক্রমে তার চুল ধরে তীরের দিকে নিয়ে এলো যে, রতন বুঝতে পারলে—এই ছেলেটি সন্তরণের সব কলা-কৌশলই জানে ।

চারদিকের চ্যাচামেচি শুনে সেই মেয়েটিও বাড়ি থেকে ছুটে এসেছে নদীর ধারে । সে হাঁক-ডাক করে বললে, ‘দাদা আগে দেখ, ও জল খেয়েছে কিনা । পেট থেকে জল বার করে ফেলতে হবে ।’

রতন ইচ্ছে করেই কোনো সাড়া দিল না, চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো । দেখাই যাক না, ভাই-বোন ওকে নিয়ে কী কাণ্ডটা না করে ।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে সেই তরুণ সাঁতারুর সাঙ্গোপাঙ্গ একদল জুটে গেছে। খবর পেয়ে ওরা নানা দিক থেকে ছুটে এসেছে ওদের দলপতিকে সাহায্য করতে।

একজন বললে, 'ওরে শুভ, যে ছেলেটিকে তুই জল থেকে টেনে তুললি—ও বেশ খানিকটা জল খেয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

আর একজন ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মন্তব্য করলে—ঠিক তাই। দেখছিস না, কেমন যেন একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—চোখ দুটো অবধি টেনে খুলতে পারছে না!

তৃতীয় ছেলেটি ফোড়ন কাটলে—আজ ওর একটা ফাঁড়া কাটলো সে-কথা বলতেই হবে।

আর একটা মাথা এগিয়ে এসে বিজ্ঞের মতো ব্যবস্থা দিলে—ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুড়-জল খাইয়ে দে; তা'হলেই শ্রীমান চাঙ্গা হয়ে উঠতে পথ পাবে না।

শুভই হচ্ছে আসল দলপতি—যে ছেলেটিকে জল থেকে টেনে তুলেছে—

শুভ নিজেও কম পরিশ্রান্ত হয় নি। বন্ধুদের এগিয়ে আসতে দেখে ওরও মনের জোর ফিরে এলো।

শুভ বললে, 'আগে ওকে একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া দরকার।'

শুভর বোন শুভা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের নানা রকম টিপ্পনী শুনছিল। এইবার এগিয়ে এসে হাত-মুখ নেড়ে বললে, 'তোমরা ত' আচ্ছা কাজের মানুষ দেখতে পাচ্ছি! আগে ওকে ধরাধরি করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো। তারপর কে গুড়-জল খাওয়াবে, কে গরম দুধ মুখে ঢেলে দেবে—সব কেরামতি দেখা যাবে'খন।

শুভ ছেলেটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এইবার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললে, 'আচ্ছা, তোরা সবাই তাকিয়ে ভালো করে দেখ ত'। ওকে ত' এই অঞ্চলের কেউ বলে মনে হচ্ছে না।'

বন্ধুরা জবাব দিলে—হ্যাঁ, একেবারে অচেনা ছেলে। অন্তত আমাদের জানাশোনা কেউ নয়।

এ অঞ্চলের সব ছেলেকেই ওরা চেনে। তাই ওদের সবার মনে একটা খটকা জাগলো।

দলের সবাই ঝুঁকে পড়ে ছেলেটিকে ভালো করে দেখতে লাগলো।

শুভার কিন্তু এই সব ব্যাপার মোটেই ভালো লাগে নি। সে আবার সবাইকে

তাড়া দিয়ে বললে, 'আচ্ছা, তোমরা সবাই কী বল ত'! আগে ছেলেটিকে সুস্থ করে তোলো। তারপর ওর ঠিকুজী-কোষ্ঠী জেনে নিলেই হবে। পরিচয়ের পালা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে ছেলেটিকে শুভদের বাড়ির উঠোনে নিয়ে এলো।

ভোম্বল তখন চোখ বন্ধ করে আপন মনে শুধু অঙ্ক কষে চলেছে—এর পর ব্যাপারটা কি ঘটে!

শুভ ওকে একটা গাছের তলায় শুইয়ে দিলে। তখনো ওর সারা গা দিয়ে জল ঝরছে।

শুভর নিজের জামা-কাপড়ের অবস্থাও ত ঠিক একই রকম।

শুভা বললে, 'দাদা, এইবার আমি আগে এক কাপ গরম দুধ নিয়ে আসি! ওটা খাইয়ে দিলেই ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শুভ কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওর পেট থেকে জল বের করার জন্য। কিন্তু ভোম্বল জল খেলে তবে ত' মুখ দিয়ে জল বেরুবে! শুভর শুধু ওর শরীরটা নিয়ে কসরৎ করাই সার হল!

ওর কাণ্ড দেখে ভোম্বল আপন মনে শুধু হাসছে, কিন্তু বাইরে ত' সেটা প্রকাশ করতে পারছে না! তা করলেই ত সব মাটি। এখনো ওকে খানিকক্ষণ জলে-ডোবা মানুষ সেজে মজাদার অভিনয় করে চলতে হবে।

অবশ-অসাড় দেহটা পড়ে আছে ভোম্বলের, তাই সবাইকার হা-হুতাশেরও অন্ত নেই।

বাজার ফেরৎ যারা আসছিল, তারা এই মুখরোচক খবর পেয়ে আবার নতুন করে ওইখানে এসে ভীড় জমালো।

—আহা! কার বাছা গো! একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!

—ভালো করে দেখ ত—নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে কি না!

—ভিজে একেবারে জব-জব করছে! তোমরা কেউ একটা শুকনো ধুতি পরিয়ে দাও না ছেলেটিকে।

এই জাতীয় নানা রকম উপদেশ চারদিক থেকে বুলেটের মতো ছুটে আসছিল। কাজের বেলা কেউ এগিয়ে আসে না, শুধু উপদেশ দিতেই ওস্তাদ!

ইতিমধ্যে শুভা এক কাপ গরম দুধ এনে ভোম্বলকে খাইয়ে দিলে।

উপস্থিত জনতা আশ্বস্ত হয়ে বললে—যাক দুধটা খেয়েছে। তা'হলে ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এসেছে!

বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শুভ ওর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে নিজের শুকনো কাপড় আর একটা গেঞ্জি পরিয়ে দিলে। সে নিজেও ধুতি-জামা বদলে এসেছে।

দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে ভোম্বলকে সেইখানে শুইয়ে দিলে।

ভোম্বল ভাবলে, এখন একবার চোখ পিট-পিট করে আশে-পাশের দৃশ্যটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। দিব্যি কসরৎ করে চোখ চাইতে হবে—যেন কেউ না ধরে ফেলে।

একটুখানি চোখ পিট-পিট করতেই সামনের ঝোপের আড়ালে লগন সিং-এর মুখখানা নজরে পড়লো।

তা'হলে লগন সিং এখনো এখান থেকে নড়ে নি! নাটকের শেষ দৃশ্য অবধি না দেখে ও বুঝি এখান থেকে যেতে পারবে না! কর্তাকে গিয়ে আবার সব খবর জানাতে হবে ত'।

লগন সিং যত চালাকই হোক, অভিনয়ের ব্যাপারে কিছুতেই ভোম্বলকে হারিয়ে দিতে পারবে না—এ বিশ্বাস তার মনে মনে আছে!

কাজেই সে এই বেলাটা এই বাড়িতে থাকবার কায়েম ব্যবস্থা করবার জন্য 'উঃ আঃ' শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে আবার চোখ বন্ধ করলো।

বাড়ির কর্তা—শুভ ও শুভার বাবা বললেন, 'এখন ওকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। ওর এখন বিশ্রামের দরকার।'

শুভর বন্ধুরা তখন আবার ধরাধরি করে ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা বিছানাতে ভালো করে শুইয়ে দিলে।

শুভা বললে, 'ওর আরো একটু গরম দুধ খাওয়া দরকার। নইলে শরীরে জোর পাবে কেন?'

বাড়ির কর্তা বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। তোমরা এখন ভীড় বাড়িও না। যে যার বাড়িতে চলে যাও। ছেলেটা বড় চোট পেয়েছে। ওর এখন ঘুমানো দরকার। সারাদিন ঘুমুলেই ছেলেটা একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

ভোম্বল ভাবলে, সব ব্যবস্থাই ত ভালো হলো, শুধু একটা অসুবিধের কথা যে, সারাটা দিন আর ভাত খাবার উপায় রইলো না। শুধু দু'কাপ দুধ খেয়ে কি পেটের ক্ষিদে কমবে? তা ছাড়া জলে ঝাঁপাঝাঁপিতে মেহনতটাও ত' নেহাৎ কম হয় নি।

কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই। কাজেই সে চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলো।

বাড়ির কর্তার নির্দেশমতো শুভা ঘরের জানালা-দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে গেছে—যাতে রোগী নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

আর সত্যি ঘুমিয়েও পড়েছিল ভোম্বল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল, একটা

বিশাল নদীতে সে সাঁতার কাটছে। পেছনে একটা কুমীর দাঁত বের করে তাকে তাড়া করছে। সেই পুরোনো দিনের রতন প্রাণপণ শক্তিতে হাত-পা টানছে, কিন্তু কিছুতেই এগুতে পারছে না। এক্ষুণি বুঝি কুমীরটা তাকে কামড়ে ধরবে। ঠিক এমনি সময় হড়াৎ করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। এক ঝলক রোদ্দুর এসে ওর চোখে-মুখে লাগলো, আর আচমকা স্বপ্নটা গেল ভেঙে।

ঝর্‌ঝর করে ঘাম ঝরছে সারা গা দিয়ে। বালিশ-বিছানা সব একেবারে ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছে। হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে যেতে সে প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলো না—সে কোথায় আছে।

এ যে একেবারে অচেনা জায়গা!

ওর হাব-ভাব দেখে শুভা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে, 'এখনো মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে বুঝি? বাড়ীর কর্তার আদেশ—এখন শুধু দুধ-সাবু।

এক মুহূর্তে রতন ভোম্বল হয়ে গেল। মুখটা তেতোকুইনিন-খাওয়া মুখের মতো করে বললে, 'না—না—ও দুধ-সাবু আমি খাবো না'—

শুভার মুখে আবার সেই হাসি! বললে, 'তবে কি গরম-গরম ভাত আর মাছের ঝোল? হুঁ! সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। তবে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে খেতে হবে। সামনের উঠোনে গাছতলায় বসে বাড়ির কর্তা গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানছেন!

ভোম্বল বললে, 'পেটের ক্ষিদেয় মারা গেলাম শুভাদি। তুমি আমায় বাঁচাও।'

শুভা মিষ্টি হেসে জবাব দিলে, সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। চুপি চুপি আমার সঙ্গে চলে আয়—এই পেছনের দরজা দিয়ে। টাট্‌কা মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত—খেতে ভালোই লাগবে।'

ঠিক এমনি সময় উঠোন থেকে হাঁক শোনা গেল—ওরে, ছোঁড়াটা দুধ-সাবু খেয়েছে?'

শুভা হাসি গোপন করে জবাব দিলে, 'খাচ্ছে বাবা!'

তারপর ভোম্বলকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সুরুৎ করে বেরিয়ে গেল।

ভোম্বল বড় বড় গ্রাস তুলে মুখে পুরছে।

শুভা বেশ বুঝতে পারছে—ওর কি রকম ক্ষিদেটা পেয়েছিল।

পাতের ভাত একবার ফুরিয়ে যেতে ভোম্বল শুধু খাটো গলায় বললে, আর একটু জল—

শুভা উত্তর দিলে, 'থাক আর জল খেয়ে পেট ভর্তি করতে হবে না।'

এই বলে আরো কিছু ভাত আর খানিকটা মাছের ঝোল পাতে ঢেলে দিলে।

এই সময় গুটি-গুটি পায়ে শুভও এসে রান্নাঘরে হাজির হল।

ভোম্বল বেশ বুঝতে পারলে যে, ভাই-বোন যুক্তি করেই ওর ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

শুভ জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যারে তোর নামটা কি? তোকে ত' এ অঞ্চলে আগে দেখি নি।'

ভোম্বল ঢক্-ঢক্ করে আরো খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, নাম আমার ভোম্বল। আমি এ অঞ্চলে নতুন এসেছি। চাকরির খোঁজ করছি।

শুভ বোনের মুখের দিকে একবার বুঝি তাকালে, তারপর বললে, 'তুই আমাদের এখানেই না হয় থেকে যা ভোম্বল। পড়াশোনা করবি, আবার আমার কথামতো কাজও করবি'—

ভোম্বল শুধোলে, 'কি কাজ করতে হবে?'

শুভ উত্তর দিলে, 'সে আমি যখন যে কাজে তোকে লাগিয়ে দেবো সেই কাজই করবি।'

ভোম্বল এক মুহূর্ত কি ভেবে নিলে। ওর নতুন মনিব ত' বলেছে—এই ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে ওর সব খবর জেনে নিতে হবে। এ ভালোই হল। একেবারে যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল।

ইতিমধ্যে শুভ তার বোন শুভার সঙ্গে কি পরামর্শ সুরু করে দিয়েছে।

শুভ বললে, 'এ ভালোই হল। শয়তানটা ত' এই নতুন ছেলেটাকে চিনবে না। একেই লাগিয়ে দিতে হবে—ওই শয়তানটার বাসায়। তারপর ধীরে ধীরে সব খবর বের করে নিয়ে আসতে পারা যাবে।'

শুভা উত্তর দিলে, 'হুঁ! এ ভালোই হল দাদা। যোগাযোগটা ভারি সুন্দর হয়েছে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না।'

ভোম্বল যেন কিছু বুঝতে পারে নি—এই ভাবে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় সাপ?'

ওর কাণ্ড দেখে ভাই-বোনে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'হুঁ! সাপের সন্ধান আস্তে আসতে মিলবে, আর সেজন্য আমাদের সব সময় হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

ভোম্বল যেন অথৈ জলে পড়েছে—ঠিক অমনি মুখের ভাব করে ভাই-বোনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

পরের দিন ভোম্বল যখন একেবারে সুস্থ হয়ে গেল তখন শুভ ওকে নিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে গিয়ে একেবারে সেই তার পুরোনো মনিবের বাসার ধারে হাজির হল।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুভ বললে, 'দেখ ভাই ভোম্বল, আমরা একটা

নতুন খেলা সুরু করেছি। এটা একটা বাজির ব্যাপার। তোকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

ভোম্বল যেন মজা পেয়েছে—এমনি ভাব দেখিয়ে উত্তর দিলে, 'তুমি বলো না শুভদা,' কি করতে হবে ? আমি তোমাদের সব কাজেই রাজী আছি।'

শুভ ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, 'আরে এই রকম খেলোয়াড় ছেলেই ত' আমরা চাই। শোন, তোকে কি করতে হবে।' এই যে সামনের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস্ —ওইখানে গিয়ে তোকে কাজ নিতে হবে। জানবি,—এও একটা খেলা। বাড়ির কর্তার ওপর নজর রাখতে হবে। ও কখন কি করে, কোথায় যায়, আঁধার রাত-বিরেতে কাদের পেছনে ধাওয়া করে, ওর জরুরী কাগজপত্র কোথায় লুকিয়ে রাখে —তলে তলে সব খবর রাখবি। তারপর মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে আমায় খবর দিয়ে যাবি।'

ভোম্বল জবাব দিলে, 'আরে এ ত' একটা সত্যি মজার খেলা! এ কথা তুমি আমায় আগে বলো নি কেন শুভদা ? তুমি দেখে নিও এই লুকোচুরি খেলা আমি দিব্যি জমিয়ে ফেলবো।'

শুভকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে ভোম্বল এক ছুটে তার পুরোনো বাসায় ঢুকে গেল !

সত্যি,—এইবার খেলাও জমবে ভালো। পুরোনো মনিব বলবে—ছেলেটার ওপর কড়া নজর রাখবি ! আর শুভদা বলবে—শয়তানটার সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে আমায় এসে বলবি। ভোম্বল আপন মনেই বলে উঠলো—নারদ নারদ !

ভোম্বল উঠোনে পা দিতেই বাড়ীর গিন্নী হুঙ্কার দিয়ে এসে ওর কান পাকড়ে ধরলেন—সেই যে দু'দিন আগে কাজে লেগে পালালি আর দেখা নেই! আমি ভেবে ভেবে মরি ! কোথায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলি বল্ শীগ্গির।

সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে ছোঁ মেরে ওক সরিয়ে নিয়ে বললেন—আমিই একটা জরুরী কাজে ওকে পাঠিয়েছিলাম।…ওরে ভোম্বল, আয় আমার সঙ্গে।

ভোম্বলের ডান হাতটা ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে কর্তা দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দিলেন।

মাথা চুল্‌কে ভোম্বল আপন মনে ভাবতে লাগলো—এখানে আবার নতুন করে কোন্ আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে হবে !!

।। চার ।।

ঘরের ভেতর ঢুকেই ভোম্বলের নতুন মনিবের চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেল। হাসিখুশীতে ভরে গেল সেই গুরুগম্ভীর মুখখানি।

ভোম্বলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি আনন্দের আতিশয্যে চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। তারপর একটু বাদে তার ডান হাতটা নেড়ে দিয়ে বললেন—হুঁ! খুব এলেমদার বিচ্ছু তুই। তোর কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি দারুণ খুশী হয়েছি। যে ভাবে তুই জলে ডোবার ভান করলি, তাতে আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি! আমার সঙ্গে যদি লেগে থাকতে পারিস্ আর মন দিয়ে আমার কথা শুনিস্—তা'হলে পুলিশ লাইনে তোর উন্নতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হ্যাঁরে ভোম্বল, তোর মতো চৌকস ছেলেই ত আমরা চাই।

ভোম্বল মনে মনে ভাবতে লাগলো—কোন্ পথে এগুলে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না। প্রথম দিকটায় কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

নদীতে নৌকো চালাতে গেলে যেমন আগে বুঝে নিতে হবে কোন্ অঞ্চলে জল গভীর, আর কোথায় চর পড়ছে, এই ঝানু লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গেলে ঠিক তেমনি সাবধানে কথা বলা প্রয়োজন। তাই সে শুধু বোকার মতো কর্তার মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো।

কর্তা ওর মুখের দিকে একবার চেয়েই বললেন, 'ও! আমি বুঝতে পেরেছি। তুই বাড়ীর গিন্নীর ভয় করছিস্? না—না, ওতে তোর কোন ভয় নেই। আরে বোকাচন্দর, বাড়ীর গিন্নীরা অমন একটু-আধটু বকাবকি করেই। তোর কানটা পাকড়ে ধরেছিল—এই ত? তা মনে কর না কেন—তোর নিজের দিদি তোকে শাসন করেছে।

তারপর খানিকটা চুপচাপ থেকে নতুন মনিব বললেন—এই নে, তোকে দুটো টাকা দিচ্ছি, নিজের ইচ্ছেমতো মিষ্টি কিনে খাস। দিদি একটু শাসন করলে কিছু মনে করতে আছে নাকি রে বোকা? ওর জন্য তুই কিচ্ছু মনে করবি না। এখন এই তক্তপোষের ওপর বোস দেখি, কাজের কথা আছে।

এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ভোম্বল। যাক, কোন রকমে একটি ফাঁড়া কাটানো গেছে। এখন নিশ্চিন্তে দু'দণ্ড বসা যাবে। নতুন মনিব কোন্ কাজের হদিস দেন সেটাও তো জানা আবশ্যক।

নতুন মনিব হঠাৎ ঘরের বন্ধ হুড়কোটা খুলে ফেললেন, তারপর চট্ করে বাইরে চলে গেলেন। খানিক বাদেই ফিরে এসে হুড়কোটা আগের মতো বন্ধ করে দিলেন।

ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—দেখে এলাম, তোর দিদি এখন কি করছে! জানিস্ তো,—মেয়েদের কানে সব কথা তুলতে নেই। জরুরী কথা যদি পাঁচ কান হয়ে যায়, তবেই সর্বনাশ। আর এসব জরুরী সরকারী কাজ। সবাইকার জানবার দরকার বা কি?

এই বলে নতুন মনিব খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন।

ভোম্বল এইবার জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তা'হলে এখন কি করতে হবে?

—সবুর—সবুর—সব তোকে বুঝিয়ে বলবো!

মিষ্টি মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন ভোম্বলের নতুন মনিব।

তারপর বললেন—আর সেই সব কাজের কথা নির্ঝঞ্ঝাটে বুঝিয়ে দেবো বলেই দরজায় হুড়কো দিয়ে বসেছি। নইলে তোর দিদি আবার কোন্ ফাঁকে এসে হাতা-খুন্তি নিয়ে হাজির হবে—তার ঠিক কি?

ভোম্বল যেন একেবারে বোকা ছেলে—ঠিক এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলে—আর সংসারের কাজকর্ম? দিদি যদি আমায় ঘর-গেরস্তালির কাজে ডাকে তা'হলে আমি কি জবাব দেবো?

হো-হো করে আবার হেসে ফেটে পড়লেন বাড়ীর কর্তা। বললেন—আরে সে জবাব দেবার জন্য ত আমি রয়েছি। এই ব্যাপারে যদি তোর দিদির হুমকি আসে, তা'হলে আমি রয়েছি কিসের জন্য? আমি সব সামলাবো। যদি কখনো বাড়ির গিন্নীর কাছে থেকে চড়ট-চাপড়টা খেতে হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে পেয়ে যাবি নগদ কড়কড়ে দুটো টাকা। পেট পুরে মিষ্টি খেয়ে নিবি। তখন দেখবি,—মার খাওয়ার কোন ব্যথা আর থাকবে না।

ভোম্বল সব শুনে চুপ করে রইলো; কোন কথার জবাব দিলে না। ও চুপচাপ বসে দেখতে চায়—বাড়ীর কর্তা তাঁর কথার ডিঙি কোন্ শুকনো ডাঙায় টেনে তোলেন।

নতুন মনিবের কিন্তু অদম্য উৎসাহ। সব কথা এই বিচ্ছুটাকে তিনি বুঝিয়ে দিতে চান। বললেন, 'শোন, তবে বলি: ওই যে ছেলেটা'—

ভোম্বল যেন কিচ্ছু বুঝতে পারে নি—এই ভাবে জিজ্ঞেস করলে কোন্ ছেলেটার কথা বলছেন?

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন নতুন মনিব। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিলেন—আরে ওই যে শুভ ছেলেটা—যার বাড়ীতে তোকে ধরাধরি করে ছেলের দল টেনে তুললো—ওই ছেলেটাই ত' দলের সর্দার। ওই যে কথায় বলে না,—সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার পিসি? তোরও হয়েছে তাই! এইবার মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন দেখি—ওই শুভ ছেলেটাই হচ্ছে দলের গোদা!

ভোম্বল বোকার মত শুধোলে, কোন্ দল ?

নতুন মনিব ধমক দিয়ে উত্তর দিলেন—স্বদেশী ডাকাতের দল আর কি ! এখন তুই গিয়ে ওদের দলে ভালো করে মিশে যা। শুভ ছেলেটাকে গিয়ে বল—দাদা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ। তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো। আমি তোমার কেনা হয়ে রইলাম।

ভোম্বল শুধোলে—কিন্তু আমায় যদি ওরা দলে না নেয় ?

—আলবৎ নেবে !

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন নতুন মনিব—ওই ত' ওদের কাজ। নতুন চটপটে আর চালাক-চতুর ছেলে পেলেই নিজেদের দলে ভর্তি করে নেয় ; তারপর স্বদেশী ডাকাত করে তোলে।

ভোম্বল যেন ভয়ে একেবারে শিউরে উঠেছে—ঠিক সেই রকম ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা'হলে আমার গতি কি হবে কর্তা ?

কর্তা এইবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ; বললেন, 'তোর কোনো ভয় নেই। সেজন্য রইলাম আমি। তোর যদি বিপদ হয় ত' আমি তোকে বাঁচিয়ে দেবো। এখন সোজা চলে যা ওদের বাড়ি। শুভর হাতে-পায়ে ধরে দলে ভর্তি হয়ে যা। ওরা কি বলে, কি করে, রাত্তিরের আঁধারে কোথায় যায়—সব ভালো করে দেখবি। তারপর মাঝে মাঝে এসে সব খবর আমায় জানিয়ে যাবি। বুঝলি ?'

ভোম্বল আকুপাকু করে ওঠে—কোথা দিয়ে যাবো ? বাইরে বেরুলেই ত' দিদি খপ্ করে আমায় ধরে ফেলবে।

আবার হো-হো করে হেসে ওঠেন নতুন মনিব ; বললেন, 'দূর বোকা ! পেছনকার দরজা রয়েছে না ! আমি খুট্ করে খুলে দি, তুই ফুট্ করে বেরিয়ে যা।

ভোম্বল মুখ লুকিয়ে হাসি গোপন করে। তারপর চট্ করে পেছনকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ও বাড়ি ফিরে গিয়ে ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না।

শুভ আর শুভা—দুই ভাই-বোন যেন ওৎ পেতে বসেছিল।

ভোম্বল গিয়ে হাজির হতেই শুভ জিজ্ঞেস করলে—কি রে, ওখানে চাকরি জুটলো ?

ভোম্বল জবাব দিলে—হ্যাঁ, চাকরি একটা জুটিয়ে এসেছি।

সাবাস ! আমি বলি নি—ও একটা হীরের টুকরো ?—বললে শুভ।

সঙ্গে সঙ্গে শুভা ফোঁস্ করে উঠলো—বাঃরে দাদা সে-কথা তুমি আবার কখন বললে ? সে-কথা ত বললাম আমি।

—আচ্ছা না হয় তুইই বলেছিস্। এখন ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়।

শুভা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে ভোম্বল আমাদের দলের লোক হবে কি করে ?

শুভ বললে, 'তা'হলে আমি চলি। আমার হাতে এখন অনেক কাজ জমে আছে। সব কিছু বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব তোর ওপর রইলো !

শুভা উত্তর দিলে—সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা !

শুভ চলে যেতে শুভা বললে, 'ওরে ভোম্বল, বোস্ এই দাওয়াটার ওপর।'

ভোম্বল জবাব দিলে—তা না হয় বসছি দিদি। কিন্তু কতকগুলো শক্ত কথা আমার মগজে ঢুকিয়ে দেবার আগে—পেটে কিছু দেবার ব্যবস্থা করো। উদরে যে ইঁদুর ডন দিচ্ছে—

ভোম্বলের কথা বলবার ধরণ দেখে শুভা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো, তারপর চট্ করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

একটু পরে সে ফিরে এলো একটা বাটি গরম মুড়ি আর প্যাঁজের বড়া নিয়ে। তারপর ভোম্বলের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'এখন এগুলো পেটে সেঁধিয়ে দে। তারপর রান্না হয়ে গেলে গরম ভাত, মাছের ঝোল আর দুধ খেতে দেবো।

ভোম্বল উত্তর দিলে—এখন গরম মুড়ি আর প্যাঁজের বড়া। তারপর মাছের ঝোল আর ভাত; তারপর দুধকলা ! ওরে বাব্বা ! এত সুখ কপালে সইলে হয়। দিদি, তুমি আমায় একেবারে পোষা বানরটি করে তুলবে দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগলো।

ভোম্বল খাচ্ছে আর শুভা ফিস্-ফিস্ করে বলে চলেছে,—শোন ভোম্বল, তোকে আমাদের দলে নিয়ে নেবো। ওই যে দুষমনটা—যার বাড়িতে আজ তুই চাকরি নিলি—ও হচ্ছে পুলিশের টিকটিকি। স্বদেশীদের পিছু নিয়ে ওদের ধরিয়ে দেওয়াই ওর কাজ। এই কাজ প্রতি পদে ভণ্ডুল করতে হবে। আর তুই—ভোম্বল ভাই—তুই হবি আমাদের সহায়।

ভোম্বল খুশী হয়ে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—তোমার মতো একটি দিদি যদি আমি পাই, তা'হলে কোনো কাজেই আমি পেছ-পা হবো না—এই কথা তুমি জেনে রাখো। এখন কী আমায় করতে হবে—সব ভালো করে বুঝিয়ে বলো দেখি দিদি !

শুভা বললে, 'আজ রাত্তিরের গোপন আঁধারে দাদারা একটা জরুরী কাজ করতে যাবে। আমরা খবর পেয়েছি, ওই শয়তানটা লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের অনুসরণ করবে। তা'হলেই সব কাজ পণ্ড হবার সম্ভাবনা। তুই ত' ওখানে চাকরি নিয়েছিস্, তোকে শয়তানটা কিছুতেই সন্দেহ করবে না। যে করেই হোক—ওই দুষমনটাকে

ওদের পিছু নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে হবে—ছলে হোক, বলে হোক, আর কৌশলেই হোক! তুই পারবি নে ভাই?

ভোম্বলের মুড়ি খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। সে ঠকাস্ করে বাটিটা দাওয়ার ওপর রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বললে—নিশ্চয়ই পারবো দিদি! এইটুকু মজার কাজ না পারলে, তোমরাই বা আমাকে তোমাদের দলে নেবে কেন?

ভোম্বলের কথা শুনে শুভার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধরা গলায় সে বললে—এই রকম একটি ভাইয়ের জন্য আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল রে ভোম্বল, তা ভগবান তোকে জুটিয়ে দিয়েছেন।

ভোম্বল শুভার পায়ের ধূলো নিয়ে সোজা রওনা হল।

শুভা পেছু ডেকে বললে, 'ওরে পাগল ছেলে, আমার রান্না আর একটু বাদেই হয়ে যাবে, তুই মাছের ঝোল-ভাতটা খেয়ে যা।

ভোম্বল জবাব দিলে, 'কাল হবে দিদি! আজ আগে কাজ হাসিল করি।

ভোম্বল ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

গভীর রাত।

ভোম্বল তার নতুন মনিবের বাইরের ঘরে শুয়ে আছে কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই।

শুভা দিদির কাছে বড়-মুখ করে বলে এসেছে—কাজ সে হাসিল করবেই। কাজেই ঘুমুলে চলবে না।

অসংখ্য মশা তাকে ছেঁকে ধরেছে। এ যেন ওর শাপে বর হয়েছে।

এই আঁধার রাতে মশার দলই ভোম্বলকে জাগিয়ে রাখবে। সে শুধু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে আর নীরবে প্রহর গণনা করছে।

দূরে কোন বনের আড়ালে একদল শেয়াল ডেকে উঠলো। একটা নিশাচর পাখী কর্কশকণ্ঠে ডেকে ঘরের ওপর দিয়ে চলে গেল।

অন্ধকার ঘরে বোধ করি গোটা কয়েক বাদুড় ঢুকেছিল। তাদের ক্রমাগত ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দ শোনা যেতে লাগলো। ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

একটু বাদেই একটা খুট্-খুট্ আওয়াজ শুনে ভোম্বল সচেতন হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, বাড়ির কর্তা এসে সেই আঁধার ঘরে ঢুকলেন।

তাঁর হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলোতে বাড়ির কর্তা বড় একটি কাঠের আলমারী খুলে একটা রিভলবার পকেটে পুরে নিলেন।

ভোম্বল বুঝতে পারলে, তার নতুন মনিব শুভদার দলকে অনুসরণ করতে চলেছে। পেছনকার দরজাটা খুলে আবার ভেজিয়ে দিয়ে কর্তা আঁধারে এগিয়ে যেতেই ভোম্বল লাফিয়ে উঠলো তার বিছানা থেকে।

তারপর সেও আঁধার রাতে শিকারী বেড়ালের মতো ওর পেছু পেছু চললো।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে ভোম্বলের মনে হল—কে যেন তাকে আচমকা রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় মধ্যে ঠেলে দিলে।

এই অন্ধকারের মধ্যে কি করে সে তার নতুন মনিবের পেছু নেবে? তা ছাড়া ওর আরও একটা অসুবিধে যে, সে এ অঞ্চলে একেবারে নতুন। রাস্তা-ঘাট কিছুই তার জানা নেই।

তবে কি সে এই লুকোচুরি খেলায় হেরে যাবে?

না না, তা কখনই হতে পারে না।

শুভা দিদির কাছে সে মাথা উঁচু করে বড়-গলায় বলে এসেছে—যেমন করেই পারে, কাজটা সে হাসিল করবে। আর না করবেই বা কেন?

আসলে যে ওরা এক দলের লোক—দেশকে ভালোবেসেই ওরা ঘরের মায়া ছিঁড়ে দিয়ে পথের টানে বেরিয়ে এসেছে। ওদের আদর্শ এক—উদ্দেশ্য এক।

মহান্ ব্রত নিয়ে একই পথে তাদের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। সার্থক করতে হবে তাদের তপস্যা।

পুলিশের টিকটিকিরা যতই তাদের স্বদেশী ডাকাত বলে গালাগাল দিক, ওরা কখনই সত্যভ্রষ্ট হবে না. আর তাদের আদর্শের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ভোম্বলের নজরে পড়লো যে তার মনিবের টর্চটি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আর তাতেই পথের নিশানা পাওয়া যাচ্ছে।

ভোম্বল মনে মনে বললে, 'যাঁহা মুস্কিল—তাঁহা আসান'।

আর ওর কোন ভয় নেই।

ওর মনিব টর্চ জ্বালাবে—নিজের পথ দেখে নেবার জন্য। আর সেই ক্ষণিক দেখা আলোর সাহায্যেই ভোম্বল ওকে দিব্যি অনুসরণ করতে পারবে।

মনের আনন্দে ভোম্বল গলা খুলে একটা গান গাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু তক্ষুণি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চট্‌পট্ নিজেকে সামলে নিলে।

এক লহমার ভুলে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি !

ধরা দিতে সে তখুনি রাজী—যখন তার আসল কাজ হাসিল হয়ে যাবে !

কাজেই সে শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে আর আলোটাকে অনুসরণ করে ঠিক এগিয়ে যেতে লাগলো।

এই ভাবে বেশ খানিকটা দূর ওরা চলে গেল।

তারপর সুরু হল ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড়।

একটা পুরোনো গাছের একটা শেকড় অাঁকাবাঁকা ভাবে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি চলে গেছে, সেটা ভোম্বল আদপেই টের পায় নি অন্ধকারের জন্য। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিলে।

ওদিকে নতুন মনিব পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলেন, 'কে ?'

ভোম্বল কোন রকম শব্দ না করে—চট্ করে সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি ! নাঃ—গানের সুর মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সাবধানে পথ না চললে বিপদের সম্ভাবনা।

শুভা দিদির কাছে তা'হলে আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না।

তারপর টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলেন মনিব, আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে অনুচর।

এই ভাবে আরো কিছু দূর চলবার পর ঘন বন সুরু হল।

মনিবের কিন্তু চলার বিরাম নেই।

ভোম্বল মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে—আজ রাত্রে নেহাৎই সাপের কামড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি।

এমন সময় অন্ধকার বনের ভেতর থেকে একটা বাঁশী বেজে উঠলো। ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলে বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনিব দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পকেট থেকে একটা বাঁশী তুলে নিয়ে তিনি সেই ডাকের সাড়া দিলেন।

একটু বাদেই কয়েকটি ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল।

নতুন মনিব টর্চটা উঁচু করে ধরলেন। সেই আলোতে দেখা গেল—কয়েকটি ষণ্ডা-গোছের লোক মনিবের সামনে এসে তাঁকে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

তিনি ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব খবর ঠিক ঠিক নিয়েছ ত' ?

একটি লোককে দেখে মনে হল, সে-ই দলের গোদা। আবলুস কাঠের মতো চেহারা তার। তাদের কারো গায়েই পুলিশের পোষাক নেই।

দলের গোদাটা এগিয়ে এসে বললে, 'হুজুর, আমরা সব খবর নিয়েছি। ওরা

ভোম্বল বুঝতে পারলে, তার নতুন মনিব শুভদার দলকে অনুসরণ করতে চলেছে। পেছনকার দরজাটা খুলে আবার ভেজিয়ে দিয়ে কর্তা আঁধারে এগিয়ে যেতেই ভোম্বল লাফিয়ে উঠলো তার বিছানা থেকে।

তারপর সেও আঁধার রাতে শিকারী বেড়ালের মতো ওর পেছু পেছু চললো।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে ভোম্বলের মনে হল—কে যেন তাকে আচমকা রাশি রাশি কালো ধোঁয়ায় মধ্যে ঠেলে দিলে।

এই অন্ধকারের মধ্যে কি করে সে তার নতুন মনিবের পেছু নেবে? তা ছাড়া ওর আরও একটা অসুবিধে যে, সে এ অঞ্চলে একেবারে নতুন। রাস্তা-ঘাট কিছুই তার জানা নেই।

তবে কি সে এই লুকোচুরি খেলায় হেরে যাবে?

না না, তা কখনই হতে পারে না।

শুভা দিদির কাছে সে মাথা উঁচু করে বড়-গলায় বলে এসেছে—যেমন করেই পারে, কাজটা সে হাসিল করবে। আর না করবেই বা কেন?

আসলে যে ওরা এক দলের লোক—দেশকে ভালোবেসেই ওরা ঘরের মায়া ছিঁড়ে দিয়ে পথের টানে বেরিয়ে এসেছে। ওদের আদর্শ এক—উদ্দেশ্য এক।

মহান্ ব্রত নিয়ে একই পথে তাদের হাত ধরাধরি করে চলতে হবে। সার্থক করতে হবে তাদের তপস্যা।

পুলিশের টিকটিকিরা যতই তাদের স্বদেশী ডাকাত বলে গালাগাল দিক, ওরা কখনই সত্যভ্রষ্ট হবে না. আর তাদের আদর্শের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ভোম্বলের নজরে পড়লো যে তার মনিবের টর্চটি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আর তাতেই পথের নিশানা পাওয়া যাচ্ছে।

ভোম্বল মনে মনে বললে, 'যাঁহা মুস্কিল—তাঁহা আসান'।

আর ওর কোন ভয় নেই।

ওর মনিব টর্চ জ্বালাবে—নিজের পথ দেখে নেবার জন্য। আর সেই ক্ষণিক দেখা আলোর সাহায্যেই ভোম্বল ওকে দিব্যি অনুসরণ করতে পারবে।

মনের আনন্দে ভোম্বল গলা খুলে একটা গান গাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু তক্ষুণি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চট্‌পট্ নিজেকে সামলে নিলে।

এক লহমার ভুলে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি!

ধরা দিতে সে তখুনি রাজী—যখন তার আসল কাজ হাসিল হয়ে যাবে!

কাজেই সে শিকারী বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে আর আলোটাকে অনুসরণ করে ঠিক এগিয়ে যেতে লাগলো।

এই ভাবে বেশ খানিকটা দূর ওরা চলে গেল।

তারপর সুরু হল ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড়।

একটা পুরোনো গাছের একটা শেকড় আঁকাবাঁকা ভাবে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি চলে গেছে, সেটা ভোম্বল আদপেই টের পায় নি অন্ধকারের জন্য। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে নিজেকে সামলে নিলে।

ওদিকে নতুন মনিব পায়ের শব্দে চমকে উঠে বলেন, 'কে?'

ভোম্বল কোন রকম শব্দ না করে—চট্ করে সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি! নাঃ—গানের সুর মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সাবধানে পথ না চললে বিপদের সম্ভাবনা।

শুভা দিদির কাছে তা'হলে আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না।

তারপর টর্চ জ্বেলে এগিয়ে চলেন মনিব, আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করে অনুচর।

এই ভাবে আরো কিছু দূর চলবার পর ঘন বন সুরু হল।

মনিবের কিন্তু চলার বিরাম নেই।

ভোম্বল মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে—আজ রাত্রে নেহাৎই সাপের কামড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি।

এমন সময় অন্ধকার বনের ভেতর থেকে একটা বাঁশী বেজে উঠলো। ভোম্বল অবাক হয়ে দেখলে বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনিব দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পকেট থেকে একটা বাঁশী তুলে নিয়ে তিনি সেই ডাকের সাড়া দিলেন।

একটু বাদেই কয়েকটি ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল।

নতুন মনিব টর্চটা উঁচু করে ধরলেন। সেই আলোতে দেখা গেল—কয়েকটি ষণ্ডা-গোছের লোক মনিবের সামনে এসে তাঁকে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

তিনি ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সব খবর ঠিক ঠিক নিয়েছ ত'?

একটি লোককে দেখে মনে হল, সে-ই দলের গোদা। আবলুস কাঠের মতো চেহারা তার। তাদের কারো গায়েই পুলিশের পোষাক নেই।

দলের গোদাটা এগিয়ে এসে বললে, 'হুজুর, আমরা সব খবর নিয়েছি। ওরা

একটা বড় নৌকো ভাড়া করেছে। কয়েকটা বন্দুক আর লাঠি-সোটাও যোগাড় করেছে।'

ওর মনিবকে বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হল। বললেন, 'হুঁ! কিন্তু কোন্ ঘাটে ওরা নৌকো রেখেছে সে খবর নিয়েছিস্ ?'

লোকটি আবার সেলাম করে জবাব দিলে, 'আমার কাজে কোন গাফিলতি পাবেন না হুজুর! সব পাত্তা আমি নিয়ে এসেছি। ওরা আঘাটায় নৌকো লাগিয়ে রেখেছে হুজুর। লোকজন সব এসে পড়ে নি। শুধু মাঝি-মাল্লারা নৌকোর ভেতর রয়েছে হুজুর। এখুনি যদি চড়াও হই হুজুর, তা'হলে বন্দুকগুলো ছিনিয়ে নিতে পারি। আপনি কি হুকুম করেন হুজুর ?'

মনিব সঙ্গে সঙ্গে ওদের সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'না না, এখন নৌকোয় চড়াও হতে হবে না।' আগে ওরা আসুক—সবাই নৌকোয় উঠুক। আমরা আর একটা নৌকো নিয়ে ওদের পেছন পেছন যাব। একেবারে হাতে-নাতে ধরতে হবে শ্রীমানদের। তা'হলে বন্দুক আর মানুষ—সব একসঙ্গেই গ্রেপ্তার করা যাবে।

সেই দুষমনের মতো লোকটা সেলাম করে বললে, 'সেটা খুব সাচ্চা বাৎ হুজুর! আমরা তা'হলে ওদের পিছু পিছু যাবো ?'

মনিব জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা একটা নৌকো যোগাড় করেছিস ? না হলে পিছু পিছু যাবি কি করে ?'

কালো দুষমন লোকটা সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সবগুলো দাঁত বের করে ফেললে। উত্তর দিলে, 'রামলগন কাঁচা কাজ করে না হুজুর! আমি আলাদা নৌকো ভাড়া করে একটা ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রেখেছি হুজুর!

ওর কথা শুনে মনিব খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। এগিয়ে গিয়ে কালো দুষমন- টার পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস!'

তারপর ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। হাতের আঙুল-গুলো দিয়ে কপালে যেন জল-তরঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

হঠাৎ ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'দ্যাখ, আমি ভেবে দেখলাম—সবাইকার এখানে থাকবার দরকার নেই। একা রামলগন আমার সঙ্গে থাক। বেশী লোক নৌকোয় ভীড় করলে ওরা আবার সন্দেহ করতে পারে। আমরা মহাজনের মতো জামা-কাপড় পরে ওদের পেছন পেছন ধাওয়া করবো। তোরা বাদ-বাকি লোক থানায় গিয়ে চুপচাপ পড়ে থাক। ভোরবেলা জল-পুলিশের লঞ্চ নিয়ে—যেখানে বলেছি—ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির থাকবি।

ভদ্রলোকের আদেশ শুনে রামলগন ছাড়া বাদ-বাকি লোক তাঁকে সেলাম জানিয়ে অন্ধকার বনের ভেতর চুপচাপ মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোক এইবার একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ আপনমনে টানলেন।

সেই সিগারেটের ক্ষীণ আলোতে মনে হল তিনি ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। নানা কথা তাঁর মগজে ভীড় জমিয়েছে।

তিনি ওইখানেই পায়চারী শুরু করে দিলেন।

রামলগন প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত নতুন কোনো আদেশের প্রতীক্ষায় ছিল।

হঠাৎ সে বলে বসলো—হুজুর, ওদের সবাইকে চলে যেতে বললেন, আমরা দু'জন ওদের এতগুলো মানুষকে কি করে সামলাবো হুজুর?

ভদ্রলোক একটুখানি হেসে উত্তর দিলেন, 'সেজন্য ভয় নেই রে! সেখানে স্থানীয় লোকদের খবর দেওয়া আছে। আমি গিয়ে বাঁশী বাজালে তারা সবাই এগিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করবে।

কর্তার কথা শুনে রামলগন খুশী হয়েছে বলে মনে হল।

সে খৈনী টিপতে টিপতে ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলো।

খানিক বাদে রামলগন বললে, 'হুজুর, নৌকোটা একবার দেখবেন চলুন। আমাদের নৌকোটা থেকে ওদের নৌকোটাও দেখতে পারবেন। লেকেন—ওরা আমাদের খবর কুছু টের পাবে না।

নতুন মনিব খুশী হয়ে বললেন, 'তাই চল রে রামলগন। এখানে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বনের যত মশা এসে আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরেছে।

রামলগন উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে—চলিয়ে হুজুর।

তখন প্রভু আর ভৃত্য সেই বনপথ ধরে এগিয়ে চললো।

আর ভোম্বলও বাধ্য ছেলের মতো তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হল।

বনের ভেতর গাছের জড়াজড়ি। কোথাকার শেকড় কোন পথে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করেছে—কিচ্ছু বোঝবার যো নেই।

তা ছাড়া ওপরি থেকে আবার বটগাছের বড় বড় ব' রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে মাথার মোলাকাৎ হয়।

এতটুকু 'উঃ' বলবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। একেবারে প্রভুভক্ত কুকুরের মত ভোম্বল মনিবকে অনুসরণ করে চলেছে।

আরও কিছুদূর এই ভাবে চলবার পর ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে উপস্থিত হল। বন-জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে; সামনে একেবারে অবারিত মাঠ—গগন ললাট!

সামনেই ধানের ক্ষেত। ক্ষেতে প্রচুর ফসল ফলেছে।

মাথার ওপর রাশি রাশি নক্ষত্র। সেই নক্ষত্রের আবছা আলোতে দেখা গেল

—ধানগুলো বাতাসে হেলছে দুলছে—শেষ-রাতের হাওয়ার সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলছে।

ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু আলোর পথ। এবার সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে।

ওরা দু'জনে চলেছে আগে আগে আর ভোম্বল মাথা নীচু করে ওদের পেছন পেছন।

বেশ খানিকটা হাঁটবার পর আবার ঝোপ-জঙ্গলের ভীড়।

ঝোপ-জঙ্গলের পাশেই নদী। নদীর খাড়া পাড়—জল অনেক নীচে।

ওরা তাকিয়ে দেখলে, দূরে একটা বড় নৌকো বাঁধা আছে।

টিম্-টিম্ করে আলো জ্বলছে সেই নৌকোতে। মাঝির হাব-ভাব দেখে মনে হল, সে যেন কাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। উঁচু পাড়ের দিকে সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর নৌকোর পাটাতনের ওপর পায়চারী করছে।

এদিকে সামান্য দূরে আর একটি নৌকোর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর নৌকোটা লুকোনোই আছে বলা চলে। আকারে খুবই ছোট—তর্‌তর্ করে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমনি হাল্‌কা নৌকো। ছোট্ট একটা ছইও আছে নৌকোটাতে।

ভোম্বল বড় নৌকোটার দিকে তাকিলে রইলো।

হ্যাঁ, অনেকগুলো মানুষ উঁচু পাড় ধরে এগিয়ে আসছে। তাদের নজর যে বড় নৌকোটার দিকে—সেটা ওদের চলা দেখেই বোঝা গেল।

অতগুলো মানুষকে বড় নৌকোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ভোম্বলের নতুন মনিবও বেশ সচেতন হয়ে উঠলেন। পকেট থেকে একটা বাইনাকুলার বের করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগলেন।

এইবার উঁচু পাড় থেকে ওরা এবড়ো-থেবড়ো পথ ধরে নীচের দিকে নামতে লাগলো।

মানুষগুলোকে নামতে দেখে নৌকোর মাঝি আলোটা তুলে ধরে দোলাতে লাগলো।

দলটা ততক্ষণে নিঃশব্দে বড় নৌকোটার কাছে পৌঁছে গেছে।

সেই আব্‌ছা আলোয় ভোম্বল দেখলে, ওদের দলের প্রথম যে মানুষটি সে শুভদা ছাড়া আর কেউ নয়। দেখে ওর বুকটা টিপ্‌-টিপ্‌ করতে লাগলো।

হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে মনিবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'কর্তা, এক্ষুণি বাড়ি ফিরে চলুন,—আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

কর্তা প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন ; তারপর ওকে চিনতে পেরে বললেন ভোম্বল—তুই ? কিন্তু আমি যে এখানে আছি তুই জানলি কি করে হতভাগা ?'

ভোম্বল বললে, 'থানা থেকে জেনে নিলাম কর্তা। কথা কাটাকাটি পরে হবে কর্ত, শীগ্‌গির চলুন। দিদি ঠাকরুণকে সাপে কামড়েছে। ওঝা ডাকতে হবে।'

॥ ছয় ॥

বাড়ির কর্তাকে বাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে দিয়ে ভোম্বল বললে, 'কর্তা, আপনি দিদিমণিকে ততক্ষণ একটু দেখুন। আমি ওঝা ডেকে নিয়ে আসি। নইলে এ যাত্রায় দিদিমণিকে আর বাঁচানো যাবে না।

কর্তাকে আর কিছু বলবার ফুরসৎ না দিয়ে ভোম্বল বাড়ির দোরগোড়ো থেকেই এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কর্তার একে মোটা শরীর, তার ওপর সাপের কামড়ের খবর পেয়ে গল-গল করে কেবলি ঘামছিলেন। কোথায় একদল স্বদেশী ডাকাতের পেছনে ছুটবেন—তা নয় কি না—গিন্নীকে একেবারে এই অসময়ে সাপে কেটে বসলো।

কর্তা মনে মনে অাঁচ করে বসেছিলেন,—এই ডাকাতদলকে হাতে-নাতে ধরতে পারলে একটা বড় রকম প্রমোশন হবে। মাইনেও প্রায় ডবল হয়ে যাবে। মনে মনে আবার ভারী বিরক্ত হয়েছেন কর্তা। সাপ-ব্যাটাও যেন কামড়াবার আর সময় খুঁজে পেলে না। কামড়াবি—না হয় দু'দিন পরে ধীরে-সুস্থে কামড়া। তা'হলে ত আর এমন করে কর্ম-ভণ্ডুল হয় না।

হন্তদন্ত হয়ে সিধে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন কর্তা।

এ কী! খাটের ওপর যে একেবারে এলিয়ে শুয়ে পড়ে আছে তাঁর গিন্নী!

তবে কি দেহে আর প্রাণ নেই!

কী ফ্যাসাদেই পড়া গেল—এই শেষরাত্তিরে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন এলিয়ে-পড়া দেহটির কাছে। নাকের কাছে আঙুল ধরে কর্তা বোঝবার চেষ্টা করলেন, দেহে প্রাণ আছে কিনা। তারপর কপালের ওপর হাত রাখতেই গিন্নী নড়ে চড়ে উঠে বসলেন!

গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন—এ কি! তুমি আবার কখন ফিরে এলে? এই-না কোন্ জরুরী কাজে বেরিয়ে গেলে খানিকক্ষণ আগে?

গিন্নীকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে কর্তার দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

বিরক্তিভরা গলায় মন্তব্য করলেন—যেতে আর পারলাম কোথায় ? তোমাকে আবার এই সময়ে সাপে কামড়ালো ! তাই ত খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম বাসায়।

এইবার গিন্নীর অবাক হবার পালা। ভুরু কুঁচকে ফোড়ন কেটে তিনি বললেন—কি যা-তা বলছ ? আমায় আবার সাপে কামড়ালো কখন ?

কর্তা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—তা'হলে সাপে কামড়ায় নি তোমাকে ? ওই ভোম্বল ছোঁড়া যে ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো !

গিন্নী এইবার আরো অবাক হলেন ; বললেন, 'কি আশ্চর্য্য ! ওই ভোম্বল গিয়ে তোমায় বললে—আমাকে সাপে কামড়েছে ? কোথায় গেল সে ছোঁড়া ? আমি ঝেঁটিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেবো না ? ডাকো আগে সেই ছোঁড়াকে !'

কর্তা তখন আরো চটে গেছেন ; হুঙ্কার দিয়ে বললেন—হুঁ ! সে ছোঁড়া কি আর আছে ? আমায় বাড়িতে সেঁধিয়ে দিয়েই বললে, আমি তাড়াতাড়ি ওঝা ডেকে নিয়ে আসি, আপনি ততক্ষণ দিদিমণিকে একটু দেখুন।

—কি বিচ্ছু ছেলেরে বাবা ! এ যে মানুষ মেরে একেবারে পোকা ধরিয়ে দিতে পারে !

কর্তা তক্ষুণি ছুটে বেরুলেন রাস্তায়। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু বিচ্ছু ভোম্বলকে আর সে তল্লাটে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আর খুঁজে পাওয়া যাবেই বা কি করে ?

ভোম্বল ততক্ষণে শুভাদির সঙ্গে বসে গল্প করছে আর আপন মনে হাসছে !

কি করে সে জাঁদরেল কর্তাটিকে জব্দ করেছে রসিয়ে রসিয়ে ভোম্বল সেই গল্পই করছিল।

শুভাদি ওর গল্প শুনে হেসে আর বাঁচে না ; বললে—আচ্ছা, তুই কি দুষ্টু ছেলে রে ভোম্বল, একেবারে সরাসরি বলে দিলি যে, বাড়ির গিন্নীকে সাপে কামড়েছে !

ভোম্বল তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—আমি কি ভেবে-চিন্তে কিছু বলেছি নাকি শুভাদি ? আমার মাথায় কেবলি ওই কথাটা ঘুরছে যে, যে করেই হোক—কর্তাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপর চোখের সামনে দেখতে পেলাম,—শুভদারা দল বেধে ওদের নৌকোয় গিয়ে উঠছে। এদিকে কর্তাও ওদের পেছন পেছন রওনা হবার জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে রয়েছে গোলা-গুলী-লাঠি-সোটা বন্দুক। কাজেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে যায় না।

তা ছাড়া শুভদারা এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের স্বাধীনতার জন্য, আর আমার কর্তা যাচ্ছেন ওদের সব রকমে বিপদে ফেলবার জন্য। তাই

মাথায় খেলে গেল,—যে করেই হোক কর্তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। চট্ করে মগজে একটা বুদ্ধি এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম—কর্তা, শীগগির চলুন, দিদি ঠাকুরুণকে সাপে কামড়েছে। ওঝা ডাকতে হবে।

ওর কথা শুনে আর ওর বলবার ধরণ দেখে শুভাদি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো ; বললে, 'সাবাস ভোম্বল, সাবাস। তোর উপস্থিত-বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।'

ভোম্বল বললে, 'শুভাদি, বসে বসে ত' পায়ে বাত ধরে গেল। শুভদা কখন ফিরবে কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

শুভাদি উত্তর দিলে—এই সন্ধ্যের মুখেই ফিরে অসবে। তুই এত উতলা হয়েছিস্ কেন? জলে ত আর পড়িস্ নি! বোস না একটু ভাল করে।

ভোম্বল বললে, 'ভাল করে বসতে ত চাইছি। ও বাড়ীতে ত' আর যাবার যো নেই। গেলেই সোজা থানায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এদিকে যে পেটে ইঁদুর ডন ফেলছে—তার কি করি বলো ?

শুনে খিলখিল্ করে হেসে উঠলো শুভাদি। চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। বললে, 'ও! খিদে পেয়েছে তোর? তাই বল। এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি। একটু আগে বলবি ত!'

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল শুভাদি। খানিক বাদেই এক বাটি দুধ, তার ভেতর খানিকটা মুড়ি-মুড়কি আর একটি মর্তমান কলা নিয়ে এসে হাজির। এসে বললে—বেশ করে মেখে নিয়ে ফলার করে ফেল। তারপর দুপুরবেলা মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে দিব্যি এক লম্বা ঘুম। বিকেলে ঘুম ভাঙলে পাবি একবাটি চা। তারপর বোধ করি তোর শুভদার সঙ্গে দেখা হবে।

ভোম্বল খুশী হয়ে বললে, 'তা প্রোগ্রামটা ত' মন্দ করো নি শুভাদি। ও বাসায় থাকলে এতক্ষণ ঝাঁটা পেটা খেতে হতো! তার পর এক গাদা বাসন মাজতে হতো। হাতে-পায়ে হাজা হয়ে যেতো আর কি!'

শুভাদি ফোড়ন কাটলে—তা যা বলেছিস্!

সারাদিন শুধু খাওয়া আর ঘুমের ভেতর দিয়ে সময়টা মন্দ কাটলো না ভোম্বলের। ভাবলে, এই রকম নিশ্চিন্ত আয়েশে যদি দিনগুলো কেটে যেতো ত' নেহাৎ মন্দ হতো না।

সন্ধ্যের মুখে শুভদা এসে হাজির। দলবল সঙ্গী-সাথী আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই একসঙ্গে ফেরে নি ওরা। তা'হলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

শুভদার হাসি-হাসি মুখ দেখে আর কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল—যে কাজে ওরা সদলবলে রাতের আঁধারে রওনা হয়েছিল, তা সকল দিক থেকেই সফল হয়েছে।

শুভদা যখন শুভাদির কাছে শুনল—কি করে ভোম্বল ওই দুষমনটাকে মাঝরাস্তা থেকে ফিরিয়েছে তখন খুব খুশী হয়ে সে ভোম্বলের পিঠ চাপড়ে দিলে।

তারপর বললে, 'সাবাস—বাহাদুর সাবাস! তুই আমাদের দলে একদিন সত্যি নাম কিনতে পারবি। কিন্তু এই অঞ্চলে তোর আর থাকা হবে না।

—কেন শুভদা?

—বুঝতে পারছিস্ নে,—ওই দুষমনটা কি তোকে সহজে ছাড়বে? ধরে নিয়ে গিয়ে তোকে সোজা হাজতে পুরে দেবে। দুর্জন থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

—তা'হলে আমি কোথায় যাবো শুভদা?

—আজ রাতেই আমাদের একজন বিশ্বাসী দাদা তোকে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে।

—কোথায় নিয়ে যাবে শুভদা?

—সে-কথা আমরা কেউ জানতেও চাইবো না, শুনতেও চাইবো না। এই আমাদের বিপ্লবী দলের নিয়ম।

ভোম্বল তাড়াতাড়ি জবাব দিলে—ঠিক কথা শুভদা! সে নিয়মের কথা আমিও জানি। হঠাৎ কেমন ভুল হয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করে বসলাম।

শুভদা জবাব দিলে, 'এখন থেকে আর জিজ্ঞেস করো না। আমরা শুধু আদেশই পালন করবো। কোনো কারণ জিজ্ঞেস করবো না।

ভোম্বল মাথা নেড়ে বললে, 'ঠিক কথা শুভদা!

শুভদা তখন ওর পিঠ চাপড়ে ওকে উৎসাহ দিলে। তারপর ধীরে ধীরে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'সন্ধ্যে রাতেই খাওয়া দাওয়া সেরে এক ঘুম লাগা। তারপর সময় মতো আমি তোকে ডেকে দেবো।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশীমনে ভোম্বল শুভাদির সঙ্গে গিয়ে গল্প সুরু করে দিলে।

গভীর রাতে শুভদা এসে ভোম্বলকে ডেকে তুললে।

সুটকেস গোছাবার ব্যাপার নেই, বিছানা বাঁধবার তাড়া নেই। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল।

তারপর যে মানুষটির কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো—তাঁকে দেখেই ভোম্বল আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল।

—এ কি! জীবনদা—আপনি!

জীবনদা তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন—হ্যাঁরে আমি। তোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এলাম। আমাদের বেশীদিন এক জায়গায় থাকবার হুকুম নেই। এখন তোর ওপর নতুন কাজের ভার পড়েছে।

ভোম্বল জানে না—কোথা থেকে হুকুম আসে। কার নির্দেশে তাদের দাবার খুঁটির মতো নিঃশব্দে এখান থেকে ওখানে সরে যেতে হয়। তবে এই কথাটুকু শিখে রেখেছে, 'আদেশ পালন করতে হবে : "এসেছে আদেশ বন্দরের বাস হলো শেষ।"

এখন নোঙর তুলতে হবে। নতুন পথে এবার পাড়ি জমাতে হবে। তাই শক্ত হাতে ধরতে হবে হাল। তুলে দিতে হবে পাল।

জীবনদার হাত ধরে সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ভোম্বল।

কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো কৌতূহল নয়, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন করতে হবে।

এবার আর নৌকো-পথে নয়। ট্রেনে যেতে হবে, 'অনেক দূরের পাড়ি।'

জীবনদার ভূমিকা এবার চা-বাগানের আড়কাঠি। ভোম্বলকে জোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছে, 'চা-বাগানে কুলির কাজ করবে বলে।'

পথে যেতে যেতে এক ঝোপের আড়ালে সেই রকম বেশভূষা করে নিল দুইজনে।

ট্রেনে উঠে জীবনদা কেবলি বিড়ি টানছেন আর হিন্দি ভাষায় চা-বাগানের গুনগান করে চলেছেন : ওখানে গেলে যে লোকে কি সুখে থাকবে তার আর সীমা নেই, 'যেন দুধে স্নান আর মধু পান!'

চা-বাগানের মতো স্বর্গপুরী আর নাকি ত্রিভুবনে নেই!

সেখানে যারা থাকে, 'চার বেলা করে খাবার পায়। শুধু সময়মতো একটু একটু গাছের পাতা তুললেই হল। খাও দাও, বেড়াও আর যখন তখন ঘুমিয়ে পড়। বকবার ঝকবার কেউ নেই! একেবারে নাত-জামায়ের আদরে দিন কাটাও।

নানা জায়গা ঘুরে তিনদিন পর ওরা আসাম অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল।

অন্ধকার রাত। একটা নিরালা ষ্টেশনে নেমে ওরা দু'জনে হাঁটতে সুরু করে দিলে। মাইল দুয়েক চলবার পর ওরা চা-বাগানের পাশে একটা পান-বিড়ির দোকানে এসে হাজির হল। দোকানে টিম্‌টিম্ করে আলো জ্বলছে।

জীবনদা ভোম্বলের কানে কানে বললেন, 'এইখানেই তোমায় থাকতে হবে। এটা আমাদের একটা ঘাঁটি।'

ভোম্বল ফিস্‌-ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলে, 'এখানে আমার কাজ কি হবে?

জীবনদা বললেন, 'এই দোকানের পেছন দিকে আমাদের রিভলবার লুকিয়ে রাখবার গোপন ঠাঁই। কেউ যদি এসে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে তেলাকুচ পাওয়া যায়?,

—'তা'হলে বুঝে নিতে হবে সে আমাদের দলের লোক। দোকানী সব তোকে শিখিয়ে দেবে। খুব সাবধানে থাকবি। আমি চললাম।

সেই আঁধার রাতে জীবনদা কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন।

ভোম্বল সেই দোকানটার সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এখন কি করি?

॥ সাত ॥

ভোম্বল যে সেইখানে কতক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিল সেটা তার নিজেরই খেয়াল নেই।

হঠাৎ পেছন থেকে কার কথায় তার চমক ভাঙল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, একটা ছেঁড়া ফতুয়া পরনে, আর ধুতিটাও তেমনি নোংরা আর ময়লা, 'এই রকম অপূর্ব বেশের একটি লোক দাঁত বের করে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পাগল-টাগল নয় ত?

ভোম্বলের নিজেকে বড় একলা একলা মনে হল।

দোকান থেকেও ত' কেউ বেরুচ্ছে না!

সারারাত কি সে এই খানেই অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে?

জীবনদার রহস্যময় ব্যাপারটাও সে ভালো করে বুঝতে পারলে না।

এই রকম অজানা-অচেনা জায়গায় তাকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে জীবনদা যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন সেটাও সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারলে না। শুধু এইটুকু বুঝেছে বিপ্লবের পথ ফুলে ঢাকা পথ নয়। এখানে কোথায় যে কোন্ রহস্য লুকিয়ে থাকে কেউ তার সন্ধান রাখে না।

সে বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে; সংসারের বন্ধন বলতে তার এক রকম কেউ নেই। অপরের দয়ায় পড়তে এলো বাবুইবাসা বোর্ডিংএ। তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতো কোথায় যে ভেসে চলেছে তা সে নিজেই জানে না।

পেছন ফিরে দেখলে, 'সেই লোকটা তখনো পাগলের মতো দাঁত বের করে হাসছে।

এই সময় দোকানীটাও যদি বেরুতো তা'হলে ভোম্বল এই অসহায় অবস্থা থেকে বোধ করি বেঁচে যেতো।

সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটা ততক্ষণে তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল।

ভোম্বল মনে মনে ভাবলে এই নিশুতি রাতে অজানা-অচেনা জায়গায় ত 'ভালো ফ্যাসাদে পড়া গেল!

ভোম্বলের একবার মনে হ'লো, 'এক্ষুণি ছুট লাগাই। পরদিন সকালবেলা এসে না হয় দোকানের মালিকের সন্ধান করা যাবে।

কিন্তু লোকটা হঠাৎ তার পাগলের মতো হাসি থামিয়ে ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে, এখানে তেলকুচ পাওয়া যায়?

এতক্ষণে যেন ভোম্বলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

যাক লোকটি তা'হলে সত্যি পাগল নয়। জীবনদার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

তেলাকুচের কথা যখন জিজ্ঞেস করেছে তখন নিশ্চয়ই বিপ্লবী দলের বিশ্বাসী মানুষ।

ভোম্বল শুধু অতি আনন্দে নিজের ঘাড় নাড়লে। লোকটি আবার পাগলের মত হেসে উঠল, তারপর খপ্ করে ভোম্বলের ডান হাতটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে সেই অন্ধকারে রাত্তিরে ছুট্ লাগাল।

ছুটতে ছুটতে পাগল জিজ্ঞেস করলে, 'ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যি ভোম্বলের ক্ষিদে পেয়েছিল; কিন্তু সে তার কথার কোনো উত্তর দিলে না। ওর এক হাত ধরা। সেই ভাবেই সে নিঃশব্দে ছুটতে লাগল।

পাগল হঠাৎ ছোটা বন্ধ করলে। ওর কোঁচড়ের ভেতর থেকে একটা বান্‌রুটি বের করে ভোম্বলের হাতে দিয়ে বললে, 'নে, খেতে খেতে চল। একে বলে বান্‌রুটি। বেশ মিষ্টি মিষ্টি। চিবুলে খুব আরাম লাগবে।'

ভোম্বল বান্‌রুটি খেতে খেতে পাগলের সঙ্গে পথ চলতে লাগলো।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওরা ছুট্ লাগাল। তারপর দেখা গেল—ওরা একটা চা-বাগানের ভেতরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

পাগল বললে, 'চুপ, এইবার পা টিপে টিপে আয়। এগুলো হচ্ছে সায়েবদের কোয়ার্টার। আমরা যাবো এই চা-বাগানের ম্যানেজারের কোয়ার্টারে।

ভোম্বল কোনো উত্তর দিলে না। চুপচাপ পা টিপে টিপে ওর সঙ্গে এগুতে লাগল।

হঠাৎ পাগল থমকে দাঁড়াল!

ভোম্বলকে টেনে নিয়ে পাগল একটা ঝাপ্‌ড়া গাছের তলায় গিয়ে হাজির হল।

সেখানে অনেকটা অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। পাগল তার কোমর থেকে কি একটা ভারী জিনিস বের করলে—ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান।

ফিস্-ফিস্ করে ওর কানের কাছে বললে, 'খুব হুঁসিয়ার। এর ভেতর তেলাকুচ আছে। ঐ যে ম্যানেজারের বাংলো দেখা যাচ্ছে। তোকে ঐ বাংলোর পেছনকার ছোট দবজায় গিয়ে টক্ টক্ শব্দ করতে হবে। আস্তে দরজাটা খুলে যাবে। একটা লোক বেরিয়ে আসবে। তার হাতে এই তেলাকুচটা তুলে দিতে হবে। তারপর সে যা বলবে, 'বাধ্য ছেলের মত তাই করবি, বুঝলি? আমি এখন পালাই।

পর মুহূর্তেই পাগলটা তার হাত ছেড়ে দিয়ে মিশকালো আঁধার রাতে কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভোম্বল ভাবলে সেই রাতে শুধু কি তার অবাক হবার পালা?

সে এক মুহূর্ত বোকার মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো সেই পাগলের আর চিহ্ন মাত্র নেই!

পাগল যে ছোট দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেই দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলে—ছোট্ট এক টুকরো আলো যেন দরজার ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে উঁকি দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভোম্বল সেই দিকে এগিয়ে গেল!

হঠাৎ যেই নিশুতি রাতে কুকুরের ডকে শোনা গেল। কী সর্বনাশ!

সাহেরের কুকুর! কোন রকমে ছাড়া পেয়ে যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তবে আর উপায় নেই!

ভোম্বল সেই আঁধারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘামতে লাগল।

মনে হল কে যেন গিয়ে কুকুরটাকে শান্ত করলো। কুকুরের ডাক বন্ধ হয়ে গেল।

ভোম্বল ভাবলে, এখন সে কী করবে?

পাগলের কথামতো এখন তাকে গিয়ে ওই ছোট্ট দরজাটায় টক্-টক্ শব্দ করতে হবে।

কিন্তু কোনো মানুষ না বেরিয়ে যদি ওই ডাকাতে কুকুরটাএসে তাকে আক্রমণ করে তা'হলে প্রাণ নিয়ে পালাবার অবসরটুকুও পাওয়া যাবে না।

যা হবার হবে, সে আর এমন করে ভাবতে আর ঘামতে পারে না।

ওর কেবিল মনে হতে লাগলো সে যেন আরব্য উপন্যাসের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর কোনো মানুষ হয়ে গেছে! হঠাৎ যেন কোত্থেকে একটি খোজা প্রহরী বেরিয়ে আসবে। হাতে তার ঝক্‌ঝক্ করছে তলোয়ার। এক্ষুণি ধরে নিয়ে গিয়ে বাদশার কাছে হাজির করবে। বাদশার বিচারে কাল হবে তার প্রাণদণ্ড!

কিন্তু কাজ করতে এসে এভাবে ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকলে ত হবে না। খোজা প্রহরীই আসুক, আর যেই আসুক—তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা সমাধা করতেই হবে।

ভোম্বল সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে পেছনকার দরজায় শব্দ করলো টক্—টক্—টক্।

সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। মৃদু দীপালোকে দেখা গেল—একটি মিশ্‌মিশে কালো হাত বেরিয়ে এসে তাকে ভেতরে টেনে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ আলোটাও নিভে গেল। কার গলা থেকে শোনা গেল, চুপ! একটি কথাও নয়। আমার সঙ্গে পা টিপে টিপে চলে এসো।

কাঠের বাড়ি—কাঠের মেঝে। একটি অপরিচিত হাত ধরে ভোম্বল এগিয়ে চলল। তার মনে হল, সে যেন কোনো দৈত্যপুরীতে প্রবেশ করছে। এই দৈত্য-পুরীর প্রতি কোণে যেন বিপদ আর বিস্ময় ওৎ পেতে বসে আছে, একটু সুযোগ পেলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে!

কিন্তু কিছু ভাববারই কি অবকাশ আছে? সেই দৈত্যের মতো মানুষটি ওর কানে কানে বললে, 'এসো আমার হাত ধরে। এই কোণের ঘরটায় তোমার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ঘুমিয়ে পড় না যেন। আজই শেষ-রাত্তিরে তোমায় একটি অসুর নাশ করতে হবে।

ভোম্বল ঠিক বুঝতে পারে না—সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবলি বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ঢেউ যেন তাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে।

সেই সূচিভেদ্য আঁধার রাতে তাকে কোন্ নাটকে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে—সে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে তার জন্য কি অজানা আতঙ্ক লুকিয়ে আছে—তাও সে ভালো করে জানে না। সেই অপরিচিত ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সে যদি নিজের পার্ট ভুলে যায় তা'হলে তার কি দশা হবে সেটাও সে কল্পনা করে নিতে পারে না!

ইতিমধ্যে সেই দৈত্যের মতো শক্ত হাতটা তাকে কোণের দিকের একটা নিরিবিলি ঘরে নিয়ে এল। বললে, 'এইখানেই তোমায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে হবে।

একটু থেমে লোকটা বললে, 'আজ ঘরে খাবার আর কিছু নেই। খানিকটা পুডিং আছে। তাই খেয়ে ফেল। তারপর তোমায় আমি এক গ্লাস গরম দুধ দিচ্ছি। এই দুধ খেয়ে আরাম পাবে।

লোকটা কথা বললে বটে, কিন্তু আলো জালবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

নীরবেই ভোম্বল তার খাওয়া শেষ করলে। ওর ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। পাগলটা একটা বান্‌রুটি খাইয়েছিল বটে, তবে তাতে কি ক্ষিদে যায়?

এইবার পুডিং আর দুধ খেয়ে ভোম্বল শান্ত হল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। একটা ছোট বিছানাও পাতা ছিল ঘরের এক কোণে।

ভোম্বল ভাবলে, এইখানে বাকী রাতটা সে দিব্যি ঘুমিয়ে নেবে। তারপর কপালে যা থাকে ঘটবে।

কিন্তু দৈতটা তাকে বিছানায় শুতে দিলে না। ওকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজে একটা টুল এনে তার পাশে এসে বসে পড়লো।

কারো মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা নেই। তারপর দৈত্যটাই কথা বলা সুরু করলে।

ধীরে ধীরে ওর কানের কাছে মুখ এনে সে যেন চাপা গলায় গল্প বলতে লাগলো।

চেহারাটা দৈত্যের মতো হলে কি হবে—মুখের কথা ভারী মিষ্টি।

দৈত্য বললে, 'বুঝতে পারছি, এখন ঘুমে তোমার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু উপায় নেই। আর রাত্তিরে আমি তোমায় কিছুতেই ঘুমুতে দেবো না। বলেছি ত' আজ শেষ রাত্রেই একটা অসুর নাশ করতে হবে।

ভোম্বল কিছুই বুঝতে পারলো না। কে অসুর কাকে নাশ করতে হবে—সবই যেন তার হেঁয়ালী বলে মনে হল।

সে বসে বসে ঢুলতে লাগলো। পরিবেশটি ঘুমের পক্ষে ভারী মনোরম।

কোণের ঘরটি নীরব। মিশকালো আঁধার রাত। জানালা দিয়ে অগুন্তি তারা দেখা যাচ্ছে। এই ত' ঘুমিয়ে ঘুমিরে স্বপ্ন দেখার রাত।

কিন্তু দৈত্য তাকে ঘুমুতে দেবে না। রাতটি তার অবাক হবার রাত।

এই ত' খানিকক্ষণ আগে এক পাগলা এসে তাকে খুব খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করালে। এইবার দৈত্যের পাল্লায় পড়ে ঘুমের দফা শেষ।

দৈত্য আবার ওকে ঝঁকুনি দিয়ে সচেতন করে দিলে। বললে, 'মনে করো, আমরা একটা আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। যে কোন মুহূর্তে রাশি রাশি গরম লাভা বেরিয়ে এসে আমাদের ভস্ম করে দিতে পারে। এই মৃত্যুর মুখোমুখি বসে ঘুম কি সত্যি আসে?

দৈত্য খানিকটা চুপ করে রইলো।

ততক্ষণে ভোম্বলের চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গিয়েছে। দৈত্য বললে, 'তা'হলে আসল কথাটাই জেনে রাখো। অত্যাচরী পুলিশ কর্মচারী সারা জীবন ধরে বিপ্লবী ছেলে-মেয়েদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। আঙুলে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়েছে দেহে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বরফ-জলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে—আরো যে কত অত্যাচার করেছে তার লেখাজোখা নেই। সেই সাহেব পুলিশটা এখন প্রাণের ভয়ে চা-বাগানের ম্যানেজার হয়ে লুকিয়ে আছে। তবু বিপ্লবীদের হাতে তার নিস্তার নেই। আমি ওর বিশ্বস্ত ভৃত্য সেজে ওকে আগলে রেখেছি। আজ তোমার হাতে ওর মৃত্যু।'

চমকে উঠলো ভোম্বল ; বললে, 'আমার হাতে ?'

—হ্যাঁ, তোমার হাতে। আজ শেষ রাত্তিরে কাজ হাসিল করতে হবে। সাহেবটা মাতাল হয়ে আজ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আজই ত' অসুর নিধনের উপযুক্ত লগ্ন। তোমার আনা ওই তেলাকুচ দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। তারপর তোমায় শেষ-রাত্তিরেই পাঠিয়ে দেবো দূরে নিরাপদ অঞ্চলে। আর আমি! বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো মৃতদেহ আগলে চোখের জল ফেলতে থাকবো। নইলে বিপ্লবী দলকে সন্দেহ করবে যে!

মনে হল, আঁধারের ভেতর দৈত্যটার সাদা দাঁতগুলো ঝিকৃমিক করে উঠলো।

॥ আট ॥

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেছে—ঠিক ক'টা বেজেছে জানতেও পারে নি ওরা।

হঠাৎ ঢং-ঢং করে দুটো বাজতেই ওরা দুটি প্রাণী নড়ে-চড়ে বসলো—যেন ঘুম ভাঙলো ওদের। এরই মধ্যে এত রাত হয়ে গেছে—এতটুকু টের পায় নি ওরা!

এইবার দৈত্যটা আঁধারের মাঝখান থেকে বললে, 'হুঁ! হুঁ! এখন আমাদের সন্ধি-পূজোর সময় হলো। ঢ্যাং কুড়-কুড় করে ঢাক বাজছে না বটে, তবে লগ্ন হয়েছে। ওরে পুঁচকে ছোঁড়া, তোকে এইবার তৈরী হতে হবে।'

দৈত্যটার কথার নমুনা দেখে মনে হলো—ওর যেন আনন্দ হয়েছে খুব। তাই একেবারে 'তুমি' থেকে 'তুই'তে এসে হাঁকডাক সুরু হয়েছে।

আর আনন্দ হবেই বা না কেন ?

জেলে যেমন কৈ মাছ জিয়িয়ে রাখে, কিংবা মিঞা সাহেব যেমন মুরগীকে খাইয়ে-দাইয়ে বড়-সড় করে তোলে, তারপর একদিন নিজে ছুরি বসিয়ে দেয়—এও যেন অনেকটা সেই মজার খেলা।

সাহেব ম্যানেজারকে দৈত্যটা অনেকদিন ধরে ভালো-মন্দ খাইয়েছে, প্রচুর সেবা-যত্ন করেছে, আর আজ তাকেই শেষ করবার শুভদিন এসেছে।

কার মৃত্যু-বাণ যে কোথায় লুকানো থাকে—ক'জনেই বা তার হদিস রাখে ?

মন্দোদরী জানতো রাবণের মৃত্যু-বাণ কোথায় লুকানো আছে, কিন্তু কোন্ দস্যি এসে সেই মৃত্যু-বাণ বের করে নেবে সে-কথা লঙ্কার মহারাণীর জানা ছিল না!

এই দুর্দান্ত মাতাল সাহেবটা কি জানে—তার মৃত্যু-বাণ নিয়ে কোন্ কাল-রাত্রে কোন্ অচেনা বিদেশী এসে এখানে হাজির হবে ?

ভোম্বল এতক্ষণে সমস্ত ভয়-ডরের কাঁপুনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এখন সে সত্যি মনস্থির করেছে। অসুরটাকে যখন নিধন করতে হবে, তখন মিছিমিছি ভয়ে আর আশঙ্কায় দুলে লাভ কি ?

হৃদয়কে পাষাণের মতো শক্ত করতে হবে। এখানে দয়া-মায়ার কোন স্থান নেই।

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' দায়িত্ব যখন এসে সামনে হাজির হয়, তখন যতই কষ্ট হোক না কেন—সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে। ভোম্বল তাই নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। তাই দৈত্যটাকে জিজ্ঞেস করলে—কি করতে হবে আমায় বলো এইবার।

দৈত্যটারও যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। সে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো ; বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে—বাংলোর এক কোণে একটা বড় ঘর। মৃদু আলো জ্বলছে সেই ঘরে। এইটেই সাহেব ম্যানেজারের নিজের ঘর।

সাহেবটা অনেক রাত্তির অবধি আপন খেয়ালে ঢোলে আর ঢুকু ঢুকু মদ খায়। এতক্ষণ বোধ হয় মদের নেশায় নেতিয়ে পড়েছে।

দৈত্যটা আস্তে আস্তে সাহেবের ঘরের দরজাটা ফাঁক করে ধরলো।

ভোম্বল উঁকি মেরে ভেতরে তাকিয়ে দেখলে। সাহেবের মাথাটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। হাতের গেলাস থেকে খানিকটা মদ নীচে পড়ে গেছে। হয়ত মেঝের কার্পেটের খানিকটা অংশ ভিজে গেছে—সেদিকে সাহেবের ভ্রূক্ষেপ অবধি নেই।

দৈত্যটা ভোম্বলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'এই উপযুক্ত অবসর। তোমার কাজ হাসিল করে ফেল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

ভোম্বল মাতাল সাহেবটার দিকে তাকালো।

এই সাহেবটাই কত বিপ্লবী ছেলেমেয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে—হাতের আঙুলে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে, ইলেক্‌ট্রিক শক্ লাগিয়েছে, শীতের রাত্রে বরফ-জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, সারারাত ঘুমুতে দেয় নি, ওঠ-বোস করিয়েছে। আজ প্রাণের ভয়ে সাহেবটা এসে চা-বাগানে লুকিয়ে রয়েছে !

দেখে ভোম্বলের অন্তর ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো। লোকটা মানুষ না পশু ?

কিন্তু এই অসহায় মানুষটাকে মেরে কি বীরত্ব দেখাবে ভোম্বল ? এই মাতাল সাহেবটা ত' মরেই আছে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা অবধি ওর নেই।

ওকে যদি জাগানো যায়—ওর মুখের সামনে ওর অপকর্মের কথা একে একে বলা

যায়, তারপর জানিয়ে দেওয়া যায় যে, এই সব নীচ কাজের জন্যই আজ তোমায় চরম-দণ্ড দেওয়া হচ্ছে—তা'হলেই সত্যিকারের বিপ্লবীর কাজ হবে। ভোম্বল আপন মনে সেই কথাই ভাবছিল।

তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে দৈত্যটা বললে, 'এ কি ছোক্‌রা, সাহেবকে দেখে তোমার ভাবান্তর হল কেন? গৌর-নিতাইয়ের ভাব মনে জাগলো নাকি?

'মেরেছ কলসীর কানা—
তাই বলে কি প্রেম দেবো না?'

ওসব ভাব মনে জাগলে কিন্তু কাজ হাসিল করতে পারবে না। চট্‌পট্ কাজ করে সরে পড়তে হবে। জানাজানি হয়ে গেলে তোমারও বিপদ, আমারও প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

তবু ভোম্বলের মন সায় দেয় না। একটু আপত্তি করে বললে, 'আচ্ছা দৈত্যভাই, এই মরা মানুষটাকে মেরে হাত কালি করবো?

হঠাৎ মাতাল সাহেবটার দেহ নড়ে উঠলো—ওই ত' সাহেব মাথা তুলেছে।

মাতাল সাহেবটা জড়ানো গলায় বললে, 'এই ইডিয়েট···আমি মরা?···হা-হা-হা! আরো সাত বোতল এখনো খেতে পারি। নিয়ে আয় দেখি কত আনতে পারিস্।

মাতাল সাহেবটার কথা শুনে ভোম্বলের ভারী কৌতুক বোধ হল। শিয়রে যার শমন দাঁড়িয়ে, সে তখনও আস্ফালন করছে!

এমনিই হয়। মানুষের দাম্ভিকতার বুঝি সীমা নেই।

মানুষ যে কত অসহায়—তা বুঝিয়ে দিলেও সে ভালো করে বুঝতে পারে না।

দৈত্যটা কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠলো; বললে, 'আরে পুঁচকে ছোঁড়া, তুই করছিস্ কি? সাহেবটার জ্ঞান যে ফিরে এসেছে। ও মাতাল হলে কি হবে—আসলে মানুষটা ভারী দুর্দ্দান্ত। এক্ষুণি কাজ হাসিল করে ফেল্—নইলে তুই বিষম বিপদে পড়ে যাবি।

ততক্ষণে সাহেবটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। জড়ানো স্বরে বললে, 'ওরে ইডিয়েট, তুই এসেছিস্, আমায় খুন করতে? হা-হা-হা! আমার নাম ডঙ্কিহেড! আমি তোর মতো পুঁচকে শয়তানকে ভয় করি নাকি?

ভোম্বল এইবার নিজের মধ্যে যেন একটা বল ফিরে পেলে।

সে মাথা উঁচু করে জবাব দিলে—হ্যাঁ, শয়তান সাহেব! তোমায় আমি খুন করতে এসেছি। অসহায় পেয়ে তুমি আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করেছ। কিন্তু দেশকে ভালোবাসা ছাড়া তাদের আর কোনো অপরাধ ছিল না। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে এসে তোমরা শুধু টাকা লুটেছ, আর এই দেশের সর্বনাশ করেছ! আজ সুদশুদ্ধু সব শোধ করে দিতে হবে! তুমি প্রস্তুত হও সাহেব!

হা-হা করে হেসে উঠে সাহেবটা বললে, 'আরে ক্ষুদে শয়তান! তুই আমাকে প্রস্তুত হতে বলছিস্? তুই কি মিলিটারী ম্যান নাকি? এই যে আমার জবাব!'

এই বলে মুহূর্ত মধ্যে একটা কাচের গ্লাস তুলে নিয়ে মাতাল সাহেবটা ভোম্বলের দিকে ছুঁড়ে মারলে। গ্লাসটা ভোম্বলের কপালে লাগতেই ঝর্‌ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগলো।

দৈত্যটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। এইবার সে এগিয়ে এসে ভোম্বলকে বললে, 'তুই করছিস্ কি পুঁচকে ছোড়া? তোকে এখানে বক্তৃতা দিতে কে ডেকেছে? তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে ফেল, তারপর পালিয়ে যা! নইলে আমাদের দু'জনেরই মৃত্যু!

টলতে টলতে সাহেবটা বললে, 'হুঁ! এতক্ষণে বুঝতে পারছি—আমার চাকরটাই তোকে ডেকে এনেছে। আজ তোদের দুজনকেই আমি মেরে ফেলবো।'

এই বলে মাতাল সাহেবটা যেই আর একটা কাচের বোতল হাতে তুলে নিয়েছে অমনি ভোম্বলের হাতের সেই অব্যর্থ 'তেলাকুচ' তার আগুনের নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিলে।

সেই নিশীথ রাতে মাতাল সাহেবটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ভোম্বল বললে, 'আমার কাজ ত' হাসিল! এইবার কি করতে হবে বলো!

দৈত্যটা তাড়াতাড়ি ভোম্বলকে ধরে একটা জানালার কাছে নিয়ে গেল। দূরে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ওদিকে কি দেখছ?'

ভোম্বল চোখদুটো কচলে নিয়ে জবাব দিলে—দূরে একটা লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে।

দৈত্যটা বললে, 'ঠিক দেখছিস্। এক্ষুণি ওইখানে ছুটে যা। ওখানে একটি লোক তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর সে যা বলে তাই করবি।

ভোম্বল হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে—কিন্তু ভাই, তোমার গতি কি হবে? একটু বাদেই লোকজনে ভরে যাবে এই ম্যানেজারের বাংলো। তখন তোমায় কে বাঁচাবে তাদের হাত থেকে?

দৈত্যটা মৃদু হেসে উত্তর দিলে—আমার জন্য কোনো ভয় নেই রে! আমি বিপ্লবী। কিন্তু আজ আমি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করবো। পাঁচ বছর আমি এই মাতাল সাহেবকে আগলে আছি। সবাই জানে প্রাণ দিয়েও আমি সাহেবের সব কাজ করি। আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। লোকে ভাববে অন্য —ট এসে সাহেবকে মেরে রেখে গেছে। জানিস্, 'ছেলেবেলা থেকে আমি খুব ভালো রতে পারি। আজ চাকরের পার্ট পেয়ে এমন মরাকান্না সুরু করবো যে

সবাই দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আর দেরী নয়। তুই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যা এখান থেকে।'

এই বলে এক ধাক্কা মেরে দৈত্যটা ভোম্বলকে বাংলোর বের করে দিলে। তারপর সাহেবের মৃতদেহের পাশে বসে মরাকান্না সুরু করে দিলে।

ওদিকে ভোম্বল সেই লাল আলোটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে।

চা-বাগানের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে একটি জীপ। আর ভেতরে বসে আছে এক শিখ ড্রাইভার। ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে, 'শীগ্‌গীর গাড়ীর ভেতর উঠে বোসো। আর সময় নেই!

হঠাৎ ড্রাইভারটা তার মুখের দিকে একটা টর্চের আলো ফেললে, তারপর আঁতকে উঠে বললে, 'এ কি! তোমার কপালটা যে একেবারে কেটে গেছে! মাতাল সাহেবটা মেরেছে বুঝি?'

ভোম্বল উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, সাহেবটা একটা কাচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল! তাতেই কপালটা কেটে গেছে।'

শিখ ড্রাইভার বললে, 'তোমার কোনো ভয় নেই, আমার গাড়ীতে ফার্ষ্ট-এইড্ বক্স আছে।'

এই কথা বলেই শিখ ড্রাইভার দ্রুতবেগে জীপ গাড়ীটা চালিয়ে দিলে।

চা-বাগান পেছনদিককার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল।

শিখ ড্রাইভারের নিপুণ হাতে জীপ গাড়ীটা যেন উড়ে চলল।

আরো খানিকক্ষণ বাদে, একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে গাড়ীটা থামল।

শিখ ড্রাইভার পায়ের কাছ থেকে ফার্ষ্ট-এইড্ বক্স খুঁজে বের করল।

তার ভেতর সব কিছু সাজানো রয়েছে 'তুলো, টিঞ্চার আয়োডিন, নানা রকম ওষুধ, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জড়ানো ন্যাকড়া, সব কিছু।

অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিখ ড্রাইভার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে ভোম্বলের মাথায়।

ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ড্রাইভার একটুখানি হেসে বললে, 'বিপ্লবীকে সব রকম কাজই শিখে রাখতে হয়।'

আবার গর্জ্জে উঠলো জীপ গাড়ীর ইঞ্জিন। সেই নির্জ্জন নিশীথ রাত্রে সেই গাড়ী যে কোন্ পথে উল্কার বেগে ছুটে চলল, 'ভোম্বল তা কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। নিৰ্জ্জীবের মতো সে গাড়ীর ভেতর শুয়ে পড়ল।

॥ নয় ॥

ভোম্বলের মগজের ভেতর এলোমেলো কথার টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল !

সত্যি, স্রোতের শ্যাওলার মতো সে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কোথায়ও তার নীড় বাঁধবার উপায় নেই। এই যে সাহেবটাকে সে এই মুহূর্তে 'তেলাকুচ' দিয়ে খতম করে দিয়ে এলো, 'সে যে কত অপকর্ম করেছিল তার সীমা-সংখ্যা নেই !'

যে সব বিপ্লবী ভাই-বোন ওর হাতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মা আজ শান্তি লাভ করবে। এই কথা ভেবে ভোম্বল নিঃশ্বাস ফেললে।

হয়ত মগজের ভেতর নানা কথার জালে সে জড়িয়ে পড়েছিল। আল্‌তো ভাবে ঘুমের পরশ তাকে শেষরাত্তিরের আরাম দিচ্ছিল। গাড়ীর দোলানিতে সেই ঘুমটা আরো গাঢ় হতে চলেছিল।

এমন সময় আর এক বিপত্তি। সেই আঁধারের ভেতর থেকে একটা গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—'হল্‌ট্' (Halt)।

শিখ ড্রাইভার আচম্‌কা ব্রেক কসতে জীপটা যেন একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।

এই অন্ধকারের ভেতর কে আবার পথের মাঝখানে তাদের গাড়ী থামায় ? পুলিশের লোক নয় ত ?

অজান্তেই ভোম্বলের বুকটা কেঁপে উঠল।

কিন্তু তার সামনেই বসে রয়েছে জবরদস্ত শিখ ড্রাইভার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা সেই করবে। কেননা, 'সেই ত' এখানকার স্থানীয় লোক। ভোম্বল ত' শুধু অন্ধের মত গাড়ী চেপে চলেছে।

রাস্তা আটকে যারা দাঁড়িয়েছিল—গাড়ীর আলোতে দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে উঁচিয়ে রাখা রিভলবার।

কি বিপদ ?

এবার কি ভোম্বলদেরই ধরা পড়ার পালা ?

পুলিশে ধরা মানেই ত' ফাঁসি ! পেছনে রয়েছে সাহেবকে গুলী করে হত্যা করার কাহিনী !

ভোম্বল জীপের পেছনদিককার সিটে বসে কেঁপে উঠল।

কিন্তু ব্যাপারটা ত' মোটেই তা নয়! শিখ ড্রাইভার যে হো-হো করে হেসে উঠল; তারপরই চীৎকার করে উঠল, 'তেলাকুচ'।

পথে দাঁড়ানো রিভলবার-ধরা লোকগুলোও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, 'তেলাকুচ'।

তবে কি ওরাও বিপ্লবী দলের লোক আর 'তেলাকুচ' ওদের কোড ওয়ার্ড?

পথে দাঁড়ানো লোকগুলোও তখন হাসতে সুরু করে দিয়েছে। ওর মধ্যে একজন একটু এগিয়ে এসে একটা ভারী ব্যাগ জীপের ভেতর ফেলে দিলে।

শব্দ শুনে মনে হলো, 'তার ভেতর অনেক টাকাকড়ি আর গয়নাগাটি রয়েছে।

শিখ ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে বৌনিটা তোমাদের ভালোই হয়েছে?

দলের যে নেতা সে ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসেছে।

ভালভাবে গুছিয়ে বসতে বসতে সে জবাব দিলে—হ্যাঁ,যা আশা করে গিয়েছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশী পাওয়া গেছে। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার! বৌ-ঝি আর গিন্নীবান্নিরা সবাই গয়নাগাটিতে ইন্দ্রাণী সেজেই ছিলেন। তেলাকুচের ভয় দেখিয়ে সব সংগ্রহ করতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কী?

—হুঁ হুঁ! বাড়ীর কর্তার সিন্ধুকে বহু নগদ টাকা আর গিনি জমা করা ছিল।

—তা'হলে তোরা সবাই আজ শেয়াল বাঁ-হাতি করে বেরিয়েছিলি বল?

ভোম্বলের ততক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে! বুঝলে এরা সবাই পরস্পরের পরিচিত বিপ্লবী।

বিপদের কালো মেঘ তা'হলে সত্যি কেটে গেছে। এরই মধ্যে একটা টর্চের আলো ওর মুখের ওপর এসে পড়েছে।

দলের নেতা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে, 'একে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?'

শিখ ড্রাইভার হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—ও হচ্ছে আজকের রাতের 'হিরো'। ডঙ্কিহেডকে এইমাত্র খতম করে আসছে!

এই সুখবর শুনে দলের নেতা ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরলে।

ততক্ষণে অন্যান্য বিপ্লবীরাও জীপের ভেতর উঠে এসেছে।

'যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দশজন।' কোনো অসুবিধাই হল না ওদের।

গাড়ীভর্ত্তি মানুষ নিয়ে জীপ আবার যেন উড়ে চলল।

আরো কিছুদূর চলবার পর দলের নেতা বললে, 'বুঝলে ভাই সারথি, আমাদের আজকের রাত্তিরের 'অপারেশন' খুব ভালোভাবে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা মারাত্মক গলদ রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

সারথি শিখ ড্রাইভার চমকে উঠলো। ব্যাকুলকণ্ঠে শুধালো—মারাত্মক গলদ?

ব্যাপারটা কি বল ত' ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো চিহ্ন-টিহ্ন রেখে এসেছ নাকি ?

দলের নেতা মাথা নেড়ে জবাব দিলে—উঁহু! তার চাইতেও গুরুতর। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট ছেলে ছিল। তার নাম শোভন। দিব্যি ফুটফুটে ছেলে। কাজে-কর্মেও ছিল ওস্তাদ। সেই শোভনকেই আমরা রেখে গেলাম!

—রেখে এলে!···সারথি আঁতকে উঠল—কি হয়েছিল তার ?

দলের নেতা গলাটা একটু নীচু করে বললে, 'কোথা থেকে—কি করে যে একটা চোট লাগল ওর মাথায়। ছেলেটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল!

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? ফোটা ফুলটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, আর আসবার সময় তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

সারথি মাথা নাড়লে ; বললে, 'তাই ত' ! সত্যি বড় দুঃখের কথা।'

দলের নেতা ভয়ে ভয়ে বললে, 'কিন্তু আসল বিপদ ত আমাদের সামনে।,

সারথি জিজ্ঞেস করলে, 'আসল বিপদ ? সেটা আবার কি ?'

দলের নেতা জবাব দিলে, 'তা'হলে তোমায় বলি শোনো। আমরা ওই শোভনের বাড়িতেই আস্তানা গেড়েছি। ওর তিন কুলে কেউ নেই। আছে এক বুড়ী মা। নির্জ্জন পোড়ো বাড়ি, তাই সেইখানে আমাদের লুকিয়ে থাকবার ভারী সুবিধে। এই শোভন ছেলেটি বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। বেশ চালাক-চতুর, চট্‌পটে ছেলে। আমার ওকে দিয়ে এমন সব কাজ উদ্ধার করেছি। যে কাজ কেউ পারে না শাভন গিয়েহাসিল করে আসে। এই শোভন ছেলেটিই আমাদের লুকিয়ে রেখেছে ওদের বাড়িতে। ওর মা বুড়ী হলে কি হবে, আমাদের সবাইকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। সকলকে ছেলের মতো দেখে। আজ কোন্ মুখ নিয়ে আমি ওই বুড়ী মার সামনে গিয়ে হাজির হবো ?

শিখ সারথি মাথা নাড়তে লাগলো—সত্যি, ভাবনার কথাই হল।

দলের নেতার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে ধীরে ধীরে বললে—তুমিই ভেবে দেখ সারথি, বুড়ী মা আকুল আগ্রহে তার ঘরের দাওয়ায় একবার উঠছে, একবার বসছে আর একবার বাড়ির ভেতর গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করছে। আমরা গিয়ে সেখানে হাজির হলাম। বুড়ী মা ছুটে বেরিয়ে এলো তার একমাত্র ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। যখন সেই মা একে একে সবাইকে দেখতে পাবে, কিন্তু তার ছেলেকে আমাদের মধ্যে খুঁজে পাবে না, তখন আমি সেই ব্যাকুলা মাকে কী সান্ত্বনা দেবো —তুমি বলো দেখি ভাই সারথি ? লজ্জায় আমার মাথা মাটিতে নুইয়ে পড়ছে। আমি চোখে আঁধার দেখছি। আমার কি মনে হচ্ছে জানো সারথি ?

—কি ?

—মনে হচ্ছে শোভনদের বাড়িতে আমি যেন আর না ঢুকি। সেই ব্যাকুলা মায়ের চোখের সামনে আমি যেন আর না দাঁড়াই! ছুটে চলে যাই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে! কিন্তু বিপ্লবী তার মায়ের সামনে কর্তব্য থেকে এক চুল সরে দাঁড়াবে না। আমাকে সেই মায়ের সামনে গিয়ে হাজির হতেই হবে। তারপর যে অভিশাপ তিনি দেন, আমায় মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে।

সারথি তার বাঁ-হাত দিয়ে দলের নেতার হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ।'

কথা চলছে জীপের ভেতর আর সেই জীপ উল্কার বেগে অন্ধকার পথে এগিয়ে চলেছে।

দলের নেতার কথা শুনে অন্যান্য সবাইও চুপচাপ বসে আছে। তাদের মুখেও কোন কথা নেই।

ভোম্বলের মুখেও কে যেন বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে সে যেন উপন্যাসের কাহিনী শুনছিল। আজকের রাতটা কি আরব্য উপন্যাসের এক হাজার রাত্রির একটি চিহ্নিত রাত ?

সেই দোকানের সামনে দাঁড়ানো থেকে সুরু করে সব ছবি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

সেই অন্ধকারে সাহেবের বাংলোর ভেতর দৈত্যটার কাণ্ডকারখানা। ডঙ্কিহেড সাহেবের মাতলামীর ব্যাপারটাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। লোকটা এমনিতেই ত' দারুণ শয়তান, তার ওপর মদ খেয়ে তার মুখের চেহারা হয়েছি আরো বিশ্রী। লোকটার ওপর কোনো অনুকম্পা কিংবা দয়ার কথা জাগে না—শুধু ঘৃণাই সারা মনটাকে ছেয়ে ফেলে।

তারপর কি ভাবে দৈত্যটার প্ররোচনায় সে ঐ মাতাল সাহেবটাকে খুন করে পালিয়ে এলো এই শিখ সারথির জীপে!

উল্কা-বেগে ছুটে চললো জীপ ; কিন্তু সেইখানেই কি কৌতূহলের শেষ আছে ?

রিভলভারধারী একদল লোক মাঝপথে এসে হাজির হলো···লোকগুলো তাদের রাস্তা আগলে দাঁড়ালো শেষকালে দেখা গেল—ওরা তাদের সহকর্মী আর একদল বিপ্লবী—নিজেদের কাজ সমাধা করে রাতের অন্ধকারে ফিরে আসছে!

দুই দলের মিলন হল মাঝপথে। রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকার ওদের মনে প্রীতির রাখী পরিয়ে দিল।

এখানে আবার ভোম্বল শ্রোতা। উপন্যাসের চাইতে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনলো—ওদের দলের নেতার কাছে।

ভোম্বল এখানে আর কাহিনীর নায়ক নয়। সে শুনে চলেছে এক নতুন আখ্যায়িকা—যে কাহিনীর সঙ্গে তার নিজের কোনো যোগাযোগ নেই।

এখন আবার তাকে শিখ সারথির সঙ্গে কোথায় গিয়ে হাজির হতে হবে ভোম্বল কিছুই জানে না।

চুপচাপ বসে রইলো ভোম্বল। তখন পর্য্যন্ত কোনো কথাই বলে নি সে।

হঠাৎ শিখ সারথি বলে উঠলো—আমরা কিন্তু প্রায় এসে পড়েছি।

এই কথা শুনে সবাই সচকিত হল; গাড়ীর ভেতর একটু নড়ে-চড়ে বসলো।

পায়ের কাছে যে বিরাট থলেটা রাখা ছিল—দলের নেতা সেটা ভালো করে টিপে দেখলো। তারপর বললে—হ্যাঁ, এই দিকটা তা ঠিকই আছে। কিন্তু যা আমরা হারিয়ে এলাম, তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

তখনো পূর্বাকাশ লাল হয়ে ওঠে-নি। জীপ গিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো।

সেই জঙ্গলের ভেতর একটি জীর্ণ বাড়ি। দেখেই মনে হয় অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি। চূণ-বালি খসে পড়েছে—মাঝে মাঝে ইটগুলো দাঁত বের করে রয়েছে!

পূব দিকের আকাশ আরো লাল হয়ে উঠলো। সবাই তাকিয়ে দেখলে, বাড়ির সামনেকার বারান্দায় একটি মূর্তি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দলের নেতা চুপি চুপি শিখ সারথির কানে কানে বললে—ওই যে বুড়ী মা দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা বলো ত' আমি কি করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো?

শিখ সারথি চুপি চুপি উত্তর দিলে—সত্যি ভয়ের কথা। এর চাইতে সম্মুখ-যুদ্ধে গুলী খেয়ে মরা ভালো।

বুড়ী মা এর মধ্যে নীচে নেমে এসেছে। তার দুই চোখের দৃষ্টি-প্রদীপ সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে—সেই চেনা মুখটি কোথায়?

বুড়ী মা দলের নেতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো; বললে—আমার শোভন কোথায়—শোভন? তাকে বুঝি তুমি আবার অন্য কাজে পাঠিয়েছ? কিন্তু তোমাদের সবাইকার যে ক্ষিদে পেয়েছে। শোভনেরও ক্ষিদে পেয়েছে। কখন সে ফিরে আসবে?

দলের নেতার মুখে আর কোনো কথা নেই। সেও যেন ক্ষণকালের জন্য পাথর হয়ে গেছে।

বুড়ী মা আরো এগিয়ে এলো ওর কাছে। ওর হাত দুটি ধরে বললে—আমি যে সারারাত জেগে তোমাদের জন্য ধবলীর দুধের পায়েস রান্না করে রেখেছি। আমি ভাবছি—তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার সামনে বসিয়ে খেতে দেবো।

তবু দলের নেতাদর মুখে কোনো উত্তর আসে না।

মা তখন আকুপাকু করে উঠলো।

কাতর-ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে বলে—তোমরা তাকে কোথায় রেখে এলে ? সে যে আমার ভাঙা ঘরের হারানো মাণিক। সে তোমাদের সবাইকার সঙ্গে ফিরে এলো না কেন ? বাছা আমার সারা'রাত কিচ্ছু খায় নি। যাবার সময় ডেকে বললাম, শোভন, খেয়ে যা ; ও জবাব দিলে, ফিরে এসে খাবো মা ! কোথায় সে ? আমি তাকে কাছে বসে খাওয়াবো।

শিখ সারথি এই মর্মান্তিক দৃশ্য আর সহ্য করতে পারছিল না ; তাড়াতাড়ি এককোণে-দাঁড়িয়ে-থাকা ভোম্বলকে টেনে এনে মায়ের কাছে ঠেলে দিয়ে বললে—এই তোমার শোভন—একে তুমি কাছে টেনে নাও।

বুড়ী মা উন্মাদিনীর মতো দুই হাতে ভোম্বলকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলে।

তার দুই চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে !

॥ দশ ॥

বুড়ী মার স্নেহের বন্যায় ভোম্বল যেন ভেসে যায়। জীবনের শেষ সম্বল শোভনকে হারিয়ে বুড়ী মা যেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ভোম্বলকেই শোভনরূপে কল্পনা করে নিয়েছে। তাই ডাকে ওকে 'শোভন' নামে—এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতে চায় না।

শোভন কি কি খেতে ভালবাসতো—বুড়ি মা রোজ ভাগ ভাগ করে তাই রান্না করবে, পাতের কাছে সাজিয়ে দেবে কলাপাতায় করে—আর ভোম্বলকে সেই সব রান্না অনেকক্ষণ ধরে বসে খেতে হবে।

বুড়ী মা ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে হাসতে বলে—শোভন, তুই ছেলেবেলা থেকে সবুজ রঙের কচি কলাপাতায় খেতে ভারী ভালোবাসিস্। আরো যখন ছোট ছিলি তখন বলতিস্, কচি কলাপাতায় ভাত খেলে মনে হয় যেন নেমন্তন্ন খাচ্ছি। সেই থেকে আমি তোকে সব সময় কচি কলাপাতায় ভাত দি। বাড়ির পেছন দিকে কত কলাগাছ লাগিয়েছি, দেখছিস্ ত- ? সব তোরই জন্য। কলা পাকলে কলা খাবি, আর কলাপাতায় ভাত মেখে রোজ বড় বড় গরাসে ভাত মুখে তুলবি।

ভোম্বল এই সব কথা শোনে, আর তার দুই চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু বুড়ী

মার মনে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারে না। তাই বুড়ী মার এই স্নেহের অত্যাচার সে মুখ বুঁজে সহ্য করে। বুড়ী মা যখন যা বলে সে বাধ্য ছেলের মতো তাই শুনে যায়।

একদিন বুড়ী মা সকালে উঠেই হাঁকডাক সুরু করে দিলে—ওরে শোভন, আজ তোকে একবার জঙ্গলের দিকে যেতে হবে।

—জঙ্গলের দিকে? কেন মা?

—আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম। তুইও ত' একবার মনে করিয়ে দিতে পারিস্।

—কি মনে করিয়ে দেবো না?

—বাঃ রে! তুই যে ঢেঁকিশাক খেতে ভালোবাসিস্! একবারও ত' আমায় সে-কথা মনে করিয়ে দিস্ না। আমিই না হয় বুড়ো হয়ে গেছি; কিন্তু তোর ত' মাঝে মাঝে আবদার করে সে কথা বলা দরকার। কাল রাত্তিরে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল,—তুই ঢেঁকিশাক খেতে কত ভালোবাসিস্!

ভোম্বলের মনে পড়ে গেল, সেও ছেলেবেলা জঙ্গলে গিয়ে ঢেঁকিশাক তুলে এনেছে। ঢেঁকিশাকভাজা খেতে সত্যি ভালো লাগে। কত দিন দল বেঁধে গাঁয়ের কিনারে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে এই শাক ও যোগাড় করেছে। বুড়ী মার ছেলে শোভনও ঢেঁকিশাক খেতে ভালোবাসতো। ছেলে-ছোকরাদের পছন্দও বুঝি একই রকম হয়।

মনে মনে হাসলো ভোম্বল। কিন্তু বুড়ী মা না-ছোড়াবান্দা। বললে, 'টাট্কা, ঢেঁকিশাক তুলে নিয়ে আয়। আমি কবে আছি, কবে নেই! তুই যা-যা ভালেবাসিস্—সব আমি রান্না করে তোকে খাইয়ে যাবো।

বুড়ী মার মন রাখতেই হবে। এক পা ত্ব' পা করে ভোম্বল বাড়ীর পেছনকার জঙ্গলে গিয়ে হাজির হল।

কত রকম গাছ-গাছড়া আর ঝোপ-জঙ্গল—দেখলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছ মেলে না। একটা পাতার সঙ্গে আর একটা পাতার তুলনা হয় না।

গাছের ওপরে ঝোপ-ঝাড়ে কত নমুনার পাখী যে মিষ্টি সুরে ডাকছে, শুনলে ত্ব'কান ভরে যায়। মনে হয় না যে আবার লোকালয়ে ফিরে যাই। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—অলস-মন্থর-মধুময় রাজ্যি।

ঘুরে ঘুরে এক আঁটি ঢেঁকিশাক সংগ্রহ করলে ভোম্বল।

বুড়ী মা দেখলে নিশ্চয়ই খুশী হবে; বলবে—সরষেবাটা দিয়ে চচ্চড়ি করে দিই!

হঠাৎ একটা পাখীর ডাকে ভোম্বল থমকে দাঁড়ালো।

ভারী সুন্দর পাখীটা ত' ! ছোট্ট একটা ডাল থেকে তার রঙ-বাহারি ল্যাজ ঝুলিয়ে দিয়েছে আর চড়া সুরে একটা গান ধরেছে।

সত্যি দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে শোনবার মতো গান। ভোম্বল অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল—ঠিক খেয়াল ছিল না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটা গলার হুঙ্কার শোনা গেল—পাখীর গান শুনলেই কি জীবন কাটবে ?

ভোম্বল অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে, জীবনদা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এক হাতে একটা বোঁচকা, অপর হাতে একটা লম্বা লাঠি।

আনন্দে চীৎকার করে উঠলো ভোম্বল—জীবনদা !

—হ্যাঁ, আমি।

'আজকে যে তোর কাজ করা চাই—
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই—
ওরা যতই জোরে মারবে রে ঘা—
তন্দ্রা ততই ছুটবে।'

ভোম্বল জবাব দিলে, 'সে-কথা ত' বুঝলাম। কিন্তু কোথায় যেতে হবে ?

—এক্ষুণি আমার সঙ্গে চলে আয়। অনেক কাজ জমে আছে। পাখীর গান শোনা হবে পরে।

ভোম্বল উত্তর দিলে—পাখীর গানের ক্ষণিক মোহ আমার কেটে গেছে। কিন্তু এই শাকের আঁটি বুড়ী মাকে পৌঁছে না দিলে সে যে কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।

জীবনদা হেসে বললেন, 'কিন্তু পৌঁছে দিতে গেলে যে আরো বিপদ। বুড়ী মা এই শাক না খাইয়ে কি ছাড়বে ? তখন সমস্ত প্ল্যান যে বানচাল হয়ে যাবে।

ভোম্বল নিজের দুর্বলতার কথা বুঝলে। শাকের আঁটি ছুঁড়ে ফেলে দিলে জঙ্গলের মধ্যে, হাতাহালি দিয়ে রঙ-বেরঙের পাখীগুলেকে দিলে উড়িয়ে ! বললে, ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে মোর তরে—চলুন জীবনদা, কোথায় আমায় যেতে হবে।'

জীবনদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সাবাস ভাই। আমরা সবাই সৈনিক। সব সময় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাক এলেই সোজা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

দুই জনে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। আরো কিছুটা পথ চলবার পর দেখা গেল, একটা জীপ ওদের জন্য ঝোপে-ঝাড়ে মুখ লুকিয়ে অপেক্ষা করছে।

সেই জীপে গিয়ে দুই জনে নিঃশব্দে উঠলো। কোথায় যেতে হবে—বিপ্লবীদের একথা জিজ্ঞেস করা বারণ। তাই ভোম্বল চুপচাপ জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—যদি সেখান থেকে কোনো নির্দেশ আসে।

পর্বতের ওপরকার বরফ ভেঙে যেন জীবনদা কথা বললেন। খুব সংক্ষেপে কইলেন—এবার তোকে কলকাতায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

জীবনদার মুখে এই কথা শুনে ভোম্বল যেন আঁতকে উঠলো ; তারপর বললে, ঝোপে জঙ্গলে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—এবার একেবারে রাজধানী কলকাতায় ? একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বো যে জীবনদা !

জীবনদার মুখে মৃদু হাসি ; বললেন, 'ভয় কিরে ? আমিই ত' সঙ্গে রইলাম।

জীপ চলেছে উল্কা-বেগে। জীবনদা ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন—কলকাতায় আছে এক জাঁদরেল গোয়েন্দা। বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা আর খেতাবের লোভে স্বদেশীওয়ালাদের বিভিন্ন ঘাঁটির একটি মানচিত্র তৈরী করেছে সে। এই মানচিত্র ধরে যদি টিকটিকির দল কাজ শুরু করে তা'হলে বিপ্লবী-দলের বিষম বিপদ ! কাজেই এই মানচিত্রটি চুরি করে আনতে হবে। কোথায় যেতে হবে—কি করে মানচিত্রটা সরিয়ে আনবে—সে সব পন্থা আমি বাতলে দেবো। তবে একটি কথা জেনে রাখ—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'।

শুনে ভোম্বল ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

কলকাতায় পৌঁছুতে ওদের সব রকম যানেরই ব্যবহার করতে হল। সাবধানের মার নেই ! অনেকটা ঘোরা পথ দিয়েই ওরা এসেছে। কি জানি, কখন কার সন্দেহ হয়, ঠিক ত' বলা যায় না !

কলকাতায় গিয়ে জীবনদা ভোম্বলকে একটা তেতলা বাড়ীর ফ্লাটে এনে হাজির করলেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম করে জীবনদা তেতলার একটা জানালার ধারে ভোম্বলকে নিয়ে হাজির করলেন। তারপর বললেন, 'ওই যে দূরে সাদা ফ্ল্যাট বাড়িটা দেখছিস্, ওটা হচ্ছে টিকটিকিদের আস্তানা। টিকটিকিরা যেমন বিপ্লবীদের পেছনে ঘোরে, ঠিক তেমনি বিপ্লবীরাও ওদের পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছে। তাদের কাজই হল ওদের কাজকর্ম আর গতিবিধি লক্ষ্য করা। ওরা যদি ফেরে ডালে ডালে, তবে আমরা ফিরি পাতায় পাতায়। হুঁ হুঁ ! তেতালার এই ফ্ল্যাটটা আমরা রেখেছি—ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে।

বলতে বলতে জীবনদা গিয়ে একটা বাইনাকুলার নিয়ে এলেন। প্রথমে নিজে ভালো করে দেখে নিয়ে ভোম্বলকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছিস্ তেতালার ফ্ল্যাট—ওইখানে তোকে যেতে হবে একটি চিঠি নিয়ে'।

ভোম্বল ভয়ে তয়ে বললে, 'কিন্তু টিকটিকিরা আমায় ওখানে ঢুকতে দেবে কেন ? একেবারে দিন দুপুরের ব্যাপার।

জীবনদার মুখে রহস্যময় মৃদু হাসি! বললেন, 'সব কথা তোকে বুঝিয়ে বলি। একটি চিঠি থাকবে তোর হাতে। নীচে দারোয়ান জিজ্ঞেস করলে বলবি, বড় সাহেবের চিঠি আছে। ভয় কিরে? বড় সাহেবের চিঠি আমরা আগেই যোগাড় করে রেখেছি।

—বড় সাহেবের চিঠি?

ভোম্বলের মুখে চোখে বিস্ময়।

জীবনদা বললেন—হুঁ হুঁ! বড় সাহেবের চিঠি।

এমন সময় একটি লোক জীবনদার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার অল্প বয়েস, কিন্তু তার চোখে মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলছে।

লোকটা এসে হাসতে হাসতে বললে, 'জীবনদা, একেবারে বড় সাহেবের হস্তাক্ষর জাল করে ফেলেছি! এ হস্তাক্ষর তার নিজেরও বোঝাবার উপায় থাকবে না। তার গিন্নী ত' কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

জীবনদা ছেলেটির পিঠ চাপড়ে দিলেন। তারপর ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছিস্ বুঝি? এই ছেলেটির নাম শ্যামল। ও হচ্ছে বড় সাহেবের ষ্টেনো; আসলে কিন্তু আমাদের দলের বিপ্লবী। ভারী করিকর্মা ছেলে। বড় সাহেবের সব খবর এনে ওই ত' আমাদের সরবরাহ করে। এমন কি আমাদের কাজের সুবিধের জন্য বড় সাহেবের হাতের লেখা অবধি জাল করেছে। বাইনাকুলরে দিয়ে দেখ—একটি মহিলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছেন—উনি হচ্ছেন বড় সাহেবের বৌ।

এই চিঠি নিয়ে গিয়ে তোকে ওঁর হাতে দিতে হবে। তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবেন না। বিনা দ্বিধায় তোর হাতে তুলে দেবেন কাগজে মোড়া সেই ম্যাপটি। সেইটে এনে আমার হাতে দিলেই তোর ছুটি। কাজটা খুবই সোজা। এর সব কিছু কৃতিত্ব শ্যামলের। ও চেনা লোক। ওকে ত' আর পাঠাতে পারি না। তাই অচেনা মুখের দরকার। সেই জন্য ধরে নিয়ে এসেছি তোকে। ...বুঝলি ত বোকচন্দর?

ভোম্বল মাথা নেড়ে জানালে যে, সে সব কিছু বুঝে নিয়েছে।

চিঠিখানি নিয়ে ভোম্বলকে তখন এগুতে হল। সেই সাদা বাড়িটা সে ভালো করে চিনে নিয়েছে। গোবেচারী বয়ের ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হবে। জীবনদা তাকে সেই পোষাকেই সাজিয়ে দিয়েছেন।

গেটের দারোয়ান তাকে ঠিকই আটকেছিল। কিন্তু ভোম্বল চিঠি দেখিয়ে বলেছিল, বড় সাহেবের চিঠি আছে। মেম সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

দারোয়ান খোস্ মেজাজে ওর পথ ছেড়ে দিয়েছে। তেতলায় গিয়ে ভোম্বল খট্খট্ করে দরজার কড়া নাড়লে।

ভেতর থেকে সাড়া এলো—কে ?

ভোম্বল বললে, 'বড় সাহেবের চিঠি—

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

মেম সাহেব চিঠি নিয়ে পড়লেন। তারপর একবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,

,তুমি নতুন বয় বুঝি ?

সেলাম ঠুকে ভোম্বল জবাব দিলে—জি—হ্যাঁ !

তখন মেম সাহেব আলমারী খুলে কাগজে মোড়া ম্যাপটি ওর হাতে তুলে দিলেন।

আবার এক লম্বা সেলাম। তারপর জীবনদার ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে ভোম্বলের আর কতক্ষণ সময় লাগে ?

ম্যাপ পেয়ে জীবনদার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

এমন সময় একজন আধ-বয়সী লোক ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ,জীবনদা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

—কেনরে কি হলো ? আসল মাল ত আমরা পেয়ে গেছি !

সেই আধ-বয়সী লোকটি বললে, 'কিন্তু ও যখন ম্যাপ নিয়ে ফিরে আসছিল, আমি তখন উল্টো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম, ওর কোনো বিপদ-আপদ ঘটে কিনা। দরকার হলেই এগিয়ে যাবো।

—তারপর ?

—প্লেন ড্রেস্‌পরা একটা টিকটিকি কি সন্দেহ করে ওর ফটো তুলে নিয়েছে। ও কিন্তু জানতেও পারে নি।

জীবনদা এক মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠলেন ; বললেন' 'আজই ভোম্বলকে সরিয়ে দিতে হবে।

—কোথায় —

—বাবুইবাসা বোর্ডিংএ।

॥ এগারো ॥

জীবনদা বললেন, 'আমার কিন্তু নৌকোতে যেতে ভারী আরাম লাগে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—কেন ?

জীবনদা জবাব দিলেন, 'বোকচন্দর' এইটে বুঝতে পারছিস্ নে যে, নৌকোতে ট্রেনের মতো ভীড় ঠেলতে হয় না,—এই গেল এক নম্বর। পেছনে টিকটিকি লাগবার

সম্ভাবনা কম,—এই হলো দুই নম্বর। দিব্যি নিরিবিলি ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে এগিয়ে চলো—তাতে দারুণ ক্ষিদেটাও জমে,—এই হলো তিন নম্বর। হাটে বাজারে গঞ্জে যেখানে খুশী নৌকো লাগিয়ে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো,—এই হলো চার নম্বর। যত খুশী বই পড়তে পড়তে চলো, বাধা দেবার কিংবা বিরক্ত করবার কেউ নেই,—এই হলো পাঁচ নম্বর। যখন ঘুম পাবে দিব্যি পাটাতনের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করো' —এই হলো ছয় নম্বর।

ভোম্বল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, 'এই রকম কত নম্বরের ফিরিস্তি আপনার ট্যাঁকে আছে জীবনদা ?

শুনে জীবনদাও হাসতে লাগলেন ; বললেন, 'এই জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের হাতে নানা জাতের নৌকো আছে। প্রয়োজনবোধে তারা কাজে লাগায়। বিপ্লবীরা সবাই নৌকো বাইতে ওস্তাদ। তারা কখনো নৌকোর মাঝি, কখনো পাটের ব্যাপারী, আবার অন্য সময় আমের কিংবা গুড়ের কারবারী সেজে বসতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। সব রকম ভাষাও তাদের ভালো রকম জানা আছে ; এই ধর্ ঢাকার 'বাঙালা' ভাষা, চাটগেঁয়ে ভাষা, যশুরে ভাষা, উড়ে ভাষা' হিন্দুস্থানী বাৎ, শান্তিপুরী মিষ্টি ভাষা সব কিছুই রপ্ত করতে হয়।

ভোম্বল তেমনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—বিপ্লবী মানে তা'হলে বহুরূপী ?

জীবনদারও দুই চোখে কৌতুক উপছে পড়ছে। বললেন, 'হ্যাঁ, বহুরূপী ত' বটেই। বহুরূপী না হলে টিকটিকির চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে কি করে ? কিন্তু সেইটেই বিপ্লবীর সব নয়, আংশিক রূপ মাত্র। বিপ্লবী যখন নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবার ব্রত গ্রহণ করে, যখন সে ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটায় কিংবা ডিনামাইট দিয়ে পুল উড়িয়ে দেয়, অথবা বুদ্ধির লড়াইতে ইংরেজ সিভিলিয়ান-মিলিটারীকে কাবু করে, স্বদেশী ডাকাতি করে দেশের মহাজনদের অতিরিক্ত টাকা কেড়ে নেয়, কিংবা দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর জলপ্লাবনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, তখন দেখতে পারবে তার অন্য রূপ। তখন আর বিপ্লবী বহুরূপী নয়।'

ভোম্বল মাথা নেড়ে জবাব দেয়—সে-কথা সত্যি।

ওরা কথা বলছিল, আর পালতোলা নৌকো এগিয়ে চলেছিল মন্থর গতিতে। নৌকো বেয়ে নিয়ে চলেছিল আর একজন বিপ্লবী।

সামনেই একটা চর পড়েছে।

জীবনদা হঠাৎ সেই চরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাঝিভাই, এই চরে নৌকোটা একটু থামাও ত'।'

ভোম্বলের মনে দারুণ কৌতুহল। সে শুধালে—কেন জীবনদা ? এই চরে আবার কি হবে ?

ততক্ষণে নৌকোটা চরের কিনারা ঘেঁষে হাজির হয়েছে। জীবনদা এক লাফে সেই চরের ওপর নেমে পড়লেন। তারপর চট্ করে দুটো 'কাউঠ্যা' ধরে ফেললেন। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই কাউঠ্যার মাংস ভারী সুস্বাদু। সেই কখন শেষরাত্তিরে রওনা হয়েছি। আজ দুপুরের খাওয়াটা ভারী জবর হবে দেখা যাচ্ছে।

ভোম্বল কখনও কাউঠ্যা খায় নি। সে আপত্তি করে বললে, 'উঁহু'! ওই বিচ্ছিরি জানোয়ার আমি খাচ্ছি না।'

জীবনদা তেমনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—আচ্ছা. এখন আমি কিছু বলছি না। খাওয়ার সময় দেখা যাবে।

দুপুরবেলা তিনজনে মিলে যখন খেতে বসেছে, হাঁড়ির ভাত কেবিল কমে যাচ্ছে। জীবনদা একাই অর্দ্ধেক হাড়ির ভাত শেষ করে দিয়েছেন।

ভোম্বল কলাপাতাটা চেটেপুটে সাফ করে নিয়ে করুণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা জীবনদা, ওই কাউঠ্যার মাংস হাঁড়িতে আর আছে ?'

এইবার ভোম্বলের কথা শুনে জীবনদা একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। দুটো গাং-শালিক সেই হাসির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকো চলল। সন্ধ্যের মুখে নৌকো গিয়ে বাবুই-বাসা বোর্ডিং-এর ঘাটে লাগল।

ছেলের দল কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়েছে যে ভোম্বল এসে গেছে।

অমনি তারা দল বেঁধে ঘাটে হাজির হয়ে ভোম্বলকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এক মিছিল বের করলো।

সকলের আগে যে ছেলেটি ছিল সে হাঁক দিলে—জনাব মীরজাফর জিন্দাবাদ!

অমনি সবাই এক জিগীরে সায় দিয়ে—জনাব মীরজাফর জিন্দাবাদ!

এই জয়ধ্বনি শুনে ভোম্বল একেবারে হকচকিয়ে গেল।

এতদিন বাদে সে বাবুইবাসা বোর্ডি-এ ফিরছে—ভেবেছিল কত আনন্দ করবে ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু সে রাতারাতি জনাব মীরজাফর হলো কি করে—ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলো না।

অ্যাঁ! সে কি বিশ্বাসঘাতক ? সে কি মীরজাফর ? ভাবলে, জীবনদাকে হাঁক দিয়ে সত্যিকারের কারণটা জিজ্ঞেস করে। পেছনে তাকিয়ে দেখলে, জীবনদা তার কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে গেছেন।

এখন হাঁক-ডাক করে বিশেষ সুবিধে হবে না। মনে মনে ভাবলে—পড়েছি ছেলেদের হাতে, চলে যেতে হবে সাথে।

কিন্তু অনেক মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারলো না, সে হঠাৎ মীরজাফর বনে গেল কোন্ সুকৃতির ফলে।

আসল কারণটা জানা গেল আর একটু বাদেই। ছেলের দল ওকে নিয়ে মিছিল করে যখন বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ভেতরকার উঠোনে উপস্থিত হলো, তখন সামনে চোখে পড়লো একটা সাজানো-গোছানো ষ্টেজ।

একটা ছোট ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হলো ভোম্বলের সামনে; তারপর তার গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়ে কুর্নিশ করে সজোরে বললে—বন্দেগী জনাব মীরজাফর!

ভোম্বল চীৎকার করে বললে—হ্যাঁরে তোদের ব্যাপারটা কি বল ত। আমি মীরজাফর? আমি বিশ্বাসঘাতক? আমি···আমি···

একটি ক্যাপ্টেন-গোছের ছেলে এগিয়ে এসে হুঙ্কার দিলে—তুমি যা-ই হও, আজ রাত্তিরের জন্য তুমি সিপাহ্‌সালার মীরজাফর।

—তার মানে?

—তার মানে তুমি মীরজাফর না সাজলে আজ আমাদের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। তাই আর কথা নয়—চট্‌পট্ মীরজাফরের পোষাকটা পরে তৈরী হয়ে যাও। চূণ-কালি যা মাখবার ওরাই দেবে'খন।

ভোম্বলের অবাক হবার ঘোর তখনো কাটে নি; তাই জিজ্ঞেস করলে—তোরা ত' আজ রাত্রে সিরাজদ্দৌলা নাটক করছিস্। সেটা না হয় বুঝতে পারলাম। কিন্তু আসল মীরজাফর যে সেজেছিল, সে গেল কোথায়? তাকে ধরে এনে রঙ মাখিয়ে দে না। মিছিমিছি আমায় নিয়ে টানাটানি করছিস্ কেন?

ছেলেটি বললে—তার কি আর যো আছে ভোম্বলদা? সে এখন তিনখানা কম্বলের তলায় কোঁ-কোঁ করছে। যা ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনি সুরু হয়েছে, তাতে আর তাকে পার্ট বলতে হবে না! দেখ গে, সাতজনে মিলে চেপে ধরে আছে তাকে।

—তবে উপায়?

—উপায় তুমি। তাই যেই শুনলাম—এদ্দিন পরে তুমি বোর্ডিংএ ফিরে এসেছ, অমনি বুঝে নিলাম তুমিই আমাদের মুস্কিল-আসান।

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো—যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান!

ভোম্বল বললে—এ ত ভালো জ্বালায় পড়লাম। কিছু জানি না, শুনি না, একটু-খানি পার্ট পর্যন্ত মুখস্থ নেই—আমি কি করে মীরজাফরের পার্ট করবো? না না, সে আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।

ছেলের দল আবদারের সুরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—আমাদের দাবী না মানলে জ্যান্ত পুতে ফেলবো।

সেই ক্যাপ্টেন ছেলেটি এগিয়ে এসে ভোম্বলের দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললে—দোহাই তোমার ভোম্বলদা, এই বাবুইবাসা বোর্ডিংএ এমন একটি ছেলেও নেই যে মীরজাফরের জটিল পার্টে নামতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত ভগবান আমাদের মুখ রক্ষা করেছেন।

ভোম্বল মুচকি হেসে উত্তর দিলে—ভগবানে দেখছি তোদের অগাধ বিশ্বাস। তা সেই ভগবান ব্যাটাকে ধরে-পাকড়ে মীরজাফর সাজিয়ে দে না, তা'হলে সব ল্যাঠা চুকে যায়।

ছেলেটি কিছুতেই দমবার নয়। উত্তর দিলে—ভগবান এখন ভোম্বলের মূর্তি ধরে আমাদের মুস্কিল আসান করতে এগিয়ে এসেছেন। কাজেই তাকে এখন ফেরাবো—আমাদের সাধ্য কি ?

ওই যে কথায় বলে না,—দশচক্রে ভগবান ভূত।

শেষ পর্যন্ত ভোম্বলকে ভূতই সাজতে হলো।

উৎসাহী ছেলের অভাব নেই। তারাই এগিয়ে এসে মীরজাফরের মুখে রঙ লাগালে, দাড়ি গজিয়ে গেল মীরজাফরের, বাব্‌ড়ী চুল হলো, সিপাহসালারের ঝক্‌মকে পোষাক গায়ে, নাগ্‌রা জুতো পায়ে, কোমরে তলোয়ার, আঙুলে হীরের আংটি ঝক্‌মক্ করছে !

জীবনদাও তখন ওকে দেখে চিনতে পারলেন না !

প্রাণে ভয় আছে বৈ কি ভোম্বলের। নাটকের ভেতর সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে কিছু জানে না। সেই ছেলেবেলায় কবে পাশের গাঁয়ে এই 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক দেখেছিল, তারই আব্‌ছা ছায়া যেন চোখের সামনে ভাসছে।

কিন্তু সেইটুকু ভরসা নিয়ে কি ভাঙা ডিঙি দরিয়ায় ভাসানো চলে ?

সাজ-পোষাক পরবার পর ওর সারা গা দিয়ে যেন কুল-কুল করে ঘাম বইতে সুরু করলো।

ভোম্বলের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছেন জীবনদা। তাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন। তারপর ওকে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় নেইরে বোকচন্দর। আমি এমন করে প্রম্পট্ করবো যে তোর কোন অসুবিধেই হবে না। একটুখানি উইঙস্ ঘেঁষে দাঁড়াবি, আর সব সময় কান খাড়া রাখবি। তা' হলেই তোর শুনতে বা বলতে কোনো অসুবিধেই হবে না।

এইবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ভোম্বল।

জীবনদা যদি পরিষ্কার করে কথাগুলো বলে যান, তবে একরকম করে চালিয়ে যেতে পারবে ভোম্বল। ওর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

আকস্মিকভাবে ভোম্বলকে পেয়ে ছেলের দলের উৎসাহও খুব বেড়ে গেল।

তারা সবাই এইবার নিজেদের মেক-আপ নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলো।

তখনই বাইরে কনসার্ট বেজে উঠলো। কনসার্টের শব্দে সারা উঠোন গমগম করতে লাগলো।

আশেপাশের গাঁ থেকে অভিনয় দেখবার জন্য অনেক লোক এসে জড় হয়েছে। তার ভেতর মেয়েছেলে আর ছোটদের সংখ্যাই বেশী। বাইরে রাস্তার ওপর পান-বিড়ির দোকান, তেলেভাজার দোকান, লেনোমেডের দোকান—সব বসে গেছে। খাবার দোকান নেই বটে, কিন্তু গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে এক কোণে

ওদিকে তিনটে বেল দিতেই ড্রপ উঠে গেল। সারা উঠোনময় লোকের মাথা গিসগিস করছে। প্রথম দৃশ্যে আলিবর্দ্দী আর সিরাজ বেশ ভালোই করলে।

তার পরেই মীরজাফরের গোপন মন্ত্রণার দৃশ্য। ভোম্বল দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে জীবনদার দিকে কান খাড়া করে রাখলে।

বুড়ো মানুষ—তার ওপর ষড়যন্ত্রকারী। বেশ থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাই প্রথম থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দৃশ্যটি শেষ হয়ে গেলে সবাই এসে ভোম্বলকে তারিফ করলে।

আরো গোটা কয়েক দৃশ্য পর পর হয়ে গেল। বোঝা গেল, নাটক বেশ জমে উঠেছে।

এমন সময় হঠাৎ জীবনদার গলা শোনা গেল—ড্রপ ফেলে দাও—ড্রপ ফেলে দও!

আচম্‌কা ড্রপ পড়ে যেন নাটকের ছন্দপতন ঘটালে।

জীবনদা ছুটে এসে বললেন, 'একদল পুলিশ নমশূদ্রপাড়ায় গিয়ে অত্যাচার করছে। ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। যে যেখানে আছ—সবাই চলে এসো আমার সঙ্গে। আগুন নেভাতে হবে—নইলে ঐ পাড়াকে-পাড়া পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সবাই সৈনিকের মতো প্রস্তুত হল।

একদল ছেলে কিছু হাঁড়ি, কলসী, বালতি যোগাড় করে নিলে। পুকুর থেকে জল তুলে আগুন নেভাতে হবে।

জীবনদা সবার আগে, আর সবাই সৈনিকের মতো লাইন করে এগিয়ে চলেছে।

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলে—দূরে নমশূদ্রপাড়ার আকাশটা লালে-লাল হয়ে গেছে।

ওখানে কে সর্বনাশের আবীর খেলছে?

॥ বারো ॥

এই নমশূদ্রের দলের অনেকে বিপ্লবীদের লাঠিখেলা শেখাতো। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলেই এই পাড়ার ডানপিটে ছেলেরা বিপ্লবীদের গোপন চিঠি নিয়ে দূরের পথে নৌকো ভাসিয়ে দিত।

খবরটা কি করে পুলিশের কানে ওঠে। তাই আজ রাত্তিরে অতর্কিতে তাদের এই অভিযান।

এই অঞ্চলের দারোগা অতি জবরদস্ত লোক—কাকেও ধরে আনতে বললে একেবারে বেঁধে নিয়ে আসে!

ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে একটু ইঙ্গিতমাত্র পেয়েছিল যে, এই নমশূদ্রপাড়াকে শায়েস্তা করতে হবে। তাই দারোগার মন একেবারে খুশীতে ভরে উঠলো। এই জাতীয় ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার কাজে দারোগার ভারী উল্লাস।

আগে থাকতেই সে মনে মনে ফন্দী এঁটে রেখেছিল। দারোগা খবর নিয়ে জেনেছিল যে, সেই রাত্রে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলেরা নাটক করবে। তাই গ্রামশুদ্ধ লোক ঐখানেই ভীড় করেছে। কাজেই নমশূদ্রপাড়াকে শায়েস্তা করার এই সুবর্ণ সুযোগ।

দারোগার মনে হল, সে যেন সত্যি যুদ্ধযাত্রায় যাচ্ছে। তাই পাহারাওলা-জমাদারদের হাতে শুধু লাঠিসোটা দিয়েই খুশী হয় নি, অতি-উৎসাহে নিজে গেছে সঙ্গে। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে ত'।

দারোগার মনে ভরসার কথা এই ছিল যে, সেই রাত্রে বোর্ডিং-এর ছেলেরা কেউ আর বাধা দিতে আসবে না। তারা ত' সবাই নাটক নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

দারোগার উদ্যোগ-পর্বটা হয়েছিল ভালোই। রাতের মিশ্-কালো আঁধারে ওরা গিয়ে নমশূদ্রপাড়া ঘেরাও করে ফেলেছিল। তারপর নির্বিকারে লাঠি চালিয়েছে। ছোট-বড় কাউকে রেহাই দেয় নি পাহারাওলা-জমাদারের দল।

এই অত্যাচার করেই কিন্তু দারোগা খুশী হয় নি—নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নমশূদ্রপাড়ার ঘরে ঘরে।

দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা যখন আকাশ ছুঁয়েছে তখনই বাবুইবাসা বোর্ডিং হাউস থেকে তা ছেলেদের চোখে পড়েছে। তাই ওরা আর কালবিলম্ব না করে জীবনদাকে গিয়ে খবর দিয়েছে। তার ফলে, ওদের অভিনয়ের মাঝখানেই ড্রপ ফেলে দিতে হয়েছে।

জীবনদার অধিনায়কতায় ছেলের দল যখন নমশূদ্রপাড়ায় গিয়ে হাজির হল, তখন দেখা গেল—মহাভারতের সেই পাণ্ডব-দাহন পর্ব সুরু হয়ে গেছে।

'আগুন আগুন' চীৎকার করতে করতে ছেলের দল এগিয়ে গেল।

দারোগা দেখলে মহাবিপদ। তার সবকিছু গুণপনা এক্ষুণি ধরা পড়ে যাবে। তাই সে পাগলের মতো সিটি বাজিয়ে—দলবল নিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ দৌড়।

পুলিশের দল যখন প্রস্থান করল তক্ষুণি সুরু হল জীবনদার আর্তত্রাণের কাজ।

তিনি ছেলেদের দলে দলে ভাগ করে দিলেন। এক দল পুকুর আর ডোবা থেকে কলসী করে জল তুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগুন নিভিয়ে ফেলবে। তারা সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল। হাতে হাতে জল ভর্ত্তি মাটির কলসী উঠে এল পুকুর থেকে, তারপর কুঁড়েঘরের আগুনের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আর একদল ছুটোছুটি করে দেখতে লাগল কে কোথায় চোট খেয়েছে, কিম্বা আগুনে পুড়ে গেছে।

আর একদল তৈরী হয়ে রইল প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল—বিপদের আভাস পেয়েই নমশূদ্রপাড়ার মেয়েরা ঝোপে-জঙ্গলে আর ডোবার জলে আশ্রয় নিয়েছিল।

এখন পুলিশের দল পালিয়ে যেতে—সেই মেয়েরা কেউ ঝোপ-জঙ্গল থেকে, কেউ পানা-পুকুরের ভেতর থেকে, কেউ নিকটবর্তী পাটক্ষেত থেকে এসে পাড়ায় জড় হল। কিন্তু তাদের ছোট ছোট বসতবাটি আগুনে জ্বলছে দেখে সকলের বুকফাটা কান্নার রোলে আকাশ-বাতাস একেবারে ভারী হয়ে উঠল।

পাড়ার জোয়ান নমশূদ্রের দল পুলিশের সঙ্গে খুব লড়েছে। পুলিশের কয়েকজনও বেশ ঘায়েল হয়ে ফিরে গেছে। কাজেই ওদের আক্রোশটা রয়েই গেল। কখন যে আবার পুলিশের দল প্রতিহিংসার জন্য রাতের আঁধারে ফিরে আসবে—সে-কথা ঠিক করে বলা শক্ত।

হঠাৎ একটা করুণ কান্নার শব্দ শুনে জীবনদা সচকিত হয়ে উঠলেন।

তাই ত! ডোবার ধারে এমন করে কাঁদে কে? কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জীবনদা সেই দিকেই ছুটলেন।

একজনের হাতে একটা টর্চ ছিল। সে আলো জ্বালাতেই দেখা গেল, ডোবার ঠিক কিনারায় একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে। সে দারুণ যন্ত্রনায় চীৎকার করছে।

এরাই তাকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখলো, হাঁটুটা তার একেবারে ভেঙে গেছে। জমাদার লাঠি চালিয়ে ওই ছোট মেয়েটার হাঁটু একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। তার আঘাত এত তীব্র হয়েছে যে, মেয়েটার গোটা মুখটা একেবারে নীল হয়ে গেছে!

জীবনদা নিজে তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বেচারীর পা-টা সত্যি ভেঙে গেছে—দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

সেই জন্যই মেয়েটির এই বুকফাটা কান্না। ইতিমধ্যে মেয়েটির মা এসে সেখানে হাজির হয়েছে। সে ক্রমাগত মাথা কুটতে লাগলো আর কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—ওই আমার একমাত্র মেয়ে দুখ্‌নী। মুখপোড়া পুলিশরা এসে আমার বাছার পা ভেঙে দিয়ে গেল। এখন কি করে আমি ওকে বাঁচাবো? সারা জীবন ওর কি ভাবে কাটবে? দুখ্‌নীর যে আর কেউ নেই!

দুখ্‌নীর মায়ের কান্নায় সবার চোখ জলে ভরে এলো।

এ অঞ্চলে যে ডাক্তার আছে—সে আবার পুলিশের হাতে ধরা। তাকে ডাকলে সে যে আসবে না সে-কথা জীবনদা বিলক্ষণ জানতেন।

জীবনদা ডাকলেন—ভোম্বল!

ভোম্বল জবাব দিলে—বলুন জীবনদা!

জীবনদা ওকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে কইলেন—তোকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে—

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে—কোথায় জীবনদা?

জীবনদার মুখে-চোখে দারুণ যন্ত্রনা! যেন আঘাতটা তিনিই পেয়েছেন। আর এই চরম আঘাত যেন তিনি কিছুতেই সইতে পারছেন না। একটুখানি চুপ করে রইলেন জীবনদা; তারপর বললেন—আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। নৌকো করে তাড়াতাড়ি চলে যা ভোম্বল। মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যা। নদীর ধারেই একটা গাঁ। সেই গাঁয়ে আছে আমার এক ডাক্তার বন্ধু। সে বিপ্লবীদেরও বন্ধু। ঘাটে নৌকো বাঁধাই আছে, আর দেরী করিস্‌ নে। নির্দ্দোষ মেয়েটার এই ব্যথা আমি আর সইতে পারছি নে।

জীবনদার মুখে এই কথা শুনে দুখ্‌নীর মা এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো; বললে—দাদাবাবু, আমাকেও পাঠিয়ে দাও আমার মেয়ের সাথে। ওকে ছেড়ে একা একা আমি কি করে থাকবো? ঘর ত' পুড়েছেই। এইবার পুলিশ মুখপোড়ারা এসে আমাদের জ্যান্ত পুঁতে রাখবে।

ওর কথা শুনে জীবনদা বললেন, 'সেই ভালো রে ভোম্বল। দুখ্‌নীর শোকাতুরা মাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে যা। নইলে এখানে থেকে'ও বুড়ী শুধু বুক চাপড়াবে, আর কেবলি কেঁদে ভাসাবে।'

একজন ছেলে টর্চ ধরলে, আর জীবনদা পকেট থেকে কাগজ বের করে খস্‌খস্‌ করে একটা চিঠি লিখে দিলেন। তারপর ছেলেদের বললেন—ওরে তোরা ধরাধরি করে দুখ্‌নীকে নৌকোয় তুলে দে।...ভোম্বল!

ভোম্বল জবাব দিলে—আমি তৈরী জীবনদা!

জীবনদা বললেন, 'আচ্ছা তোরা এগো, আমরা বাদবাকি সবাই এই দিকটা সামলাচ্ছি।'

আগে আগে টর্চ দেখিয়ে চললো একটি ছেলে। আর চারজন দুখ্‌নীকে আল্‌তো করে তুলে নিল। সঙ্গে চললো দুখ্‌নীর মা আর ভোম্বল।

ঘাটে নৌকো তৈরীই ছিল। আস্তে আস্তে ওরা দুখ্‌নীকে তুলে শুইয়ে দিল নৌকোর পাটাতনের ওপর। দুখ্‌নীর মা গিয়ে বসলো ওর পাশে।

নিঃশব্দে নৌকো ছেড়ে দিল।

মিশ্‌কালো আঁধার রাত।

ভোম্বল বসে বসে ভাবছিল।

মাথার ওপর রাশি রাশি তারা জ্বলছে আর নিভছে। কি ইঙ্গিত ওরা করছে—ভোম্বল তা জানে না। অবাক হয়ে ভোম্বল ওই দিকে তাকিয়ে রইলো। তার জীবনে যে নাটকের অভিনয় চলছে তা যেমন বিচিত্র—তেমনি অভিনব।

ওই তারাগুলোও কি গগনের মঞ্চে অভিনয় করে চলেছে? ওদের নাটকের বিষয়-বস্তুটা কি ভোম্বলের জানা নেই।

এই ত' খানিক আগে ভোম্বলও অভিনয় করেছিল। সেখানে তার পার্ট ছিল 'মীরজাফর'। এখন আবার সে নতুন ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে। এখানে তার আর্তত্রাণের ভূমিকা। এই পার্টে অভিনয় করে সে দর্শকবৃন্দের হাততালি কুড়োতে পারবে কিনা সে জানে না। পার্ট তার ভালো করে মুখস্থ নেই, তবু তাকে মঞ্চের ওপর অভিনয় করে চলতে হবে। মীরজাফরের ভূমিকায় ভরসা ছিলেন জীবনদা। কিন্তু এই মঞ্চে কে তাকে প্রম্পট্‌ করে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবে?

নিশুতি রাতে নৌকো এগিয়ে চলেছে। একটি ছোট্ট লণ্ঠন জ্বলছে নৌকোর ভেতরে। তারই মৃদু আলোতে দেখা যাচ্ছে দুখ্‌নীর মা মাঝে মাঝে ঘুমে ঢলে পড়ছে, আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠে মেয়ের রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

থেকে থেকে দুখ্‌নীর কাতরানি শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ও ঘুমিয়ে পড়ছে কিনা ভোম্বল ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না।

একটা গুবরেপোকা কেবলি সেই ছোট্ট লণ্ঠনটার কাচের ওপর মাথা ঠুকে মরছে। কোন্ অবিচারের প্রতিকারের আশায় গুবরেপোকাটা ক্রমাগত লণ্ঠনের কাচের ওপর মাথা ঠুকছে ভোম্বল আন্দাজ করতে পারে না।

ভোম্বল বোধ হয় এক সময় নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় নৌকোর ছৈয়ে ঠেস্‌ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দুখ্‌নীর কাতর আর্তনাদে ওর ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল।

দুখ্নীর মা কেঁদে বললে,'দাদাবাবু, পা-টা ত' এরই মধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে আমার একটু ঢুলুনি এসেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। পায়ের টন্‌টনানিতে ও যে কেবলি কেঁদে কঁকিয়ে উঠছে।'

ভোম্বল ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তা'হলে কি করা যায় ?

দুখ্নীর মা বললে, 'তুমি নৌকোটা একটু এই জঙ্গলের কিনারে লাগাতে বলো। আমি হাড়-মচ্‌কানোর গাছ খুঁজে-পেতে নিয়ে আসি। তাই লাগিয়ে দিই মেয়েটার পায়ে। দেখবে বেদনা আর ফুলো অনেকটা কমে যাবে।'

যে মানুষটি এতক্ষণ নিঃশব্দে নৌকো চালাচ্ছিল সে বললে' 'এই আঁধার রাতে তুমি একা একা জঙ্গলে ঢুকবে কি করে ? সাপ-কোপের ভয়ও ত' আছে !

দুখ্নীর মা বললে, 'সাপ আমার কি করবে দাদাবাবু ? আমার কোমরে সাপের ওষুধ শেকড় বাঁধা আছে। কোনো ভয় নেই আমার। তুমি একটু নৌকোটা কিনারে লাগাও দাদাবাবু। মেয়েটার কষ্ট আমি আর দু'চোখ মেলে দেখতে পারছি না।'

দুখ্নীর মায়ের কথায় জঙ্গলের ধারে নৌকো লাগানো হল। রাশি রাশি জোনাকি সেই জঙ্গলে যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা বড় কাস্তে হাতে নিয়ে দুখ্নীর মা লাফিয়ে নেমে গেল সেই জঙ্গলে।

ভোম্বল ভেবে দেখলে, কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। একা একা এই বুড়ী যাবে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর, আর সে আরাম করে নৌকোয় বসে ঘুম লাগাবে ? সেও এক লাফে তীরে উঠে বুড়ীর পেছন পেছন রওনা হল।

দুখ্নীর মা দুই হাতে ঝোপ-জঙ্গল সরাচ্ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে ভোম্বলকেও সেই আঁধার রাতে সেই জোনাকীর পিদিম-জ্বালা পথে এগুতে হল।

হঠাৎ পেছনদিকে গর—র্‌-র্‌-র্‌ ফ্যাঁস্‌ ! একটা বুক-কাঁপানো আওয়াজ সারা বনভূমিকে যেন নাড়িয়ে দিল।

ভোম্বলের ঘাড়ের ওপর একটা বাঘ লাফিয়ে পড়েছে।

ভোম্বলের আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে দুখ্নীর মা পেছনদিকে লাফিয়ে এল, তারপর মহিষ-মর্দ্দিনীর অসীম শক্তিতে সেই বাঘটার গলায় কাস্তেটা একেবারে আমূল বসিয়ে দিল !

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল বাঘের গলা থেকে।

। তেরো ।

কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

সেই আঁধার রাতে ঝোপ-জঙ্গলে ভরা বনে বাঘটা যে ভাবে লাফিয়ে এসে ভোম্বলের ঘাড়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল, তার আঘাত বড় কম ছিল না।

নৌকোর মাঝি বাঘের ডাক আর ওদের চীৎকার শুনে তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে একটি রামদা নিয়ে ছুটে চলে আসে।

কিন্তু ততক্ষণে বুড়ীর কাস্তের আঘাতে বাঘটা অক্কা পেয়েছে। যাবার আগে সে মরণকামড় বসিয়ে দিয়ে গেছে ভোম্বলের ঘাড়ে।

নায়ের মাঝি গোটা রাস্তায় চুপচাপ নৌকো চালিয়ে এসেছে।

এই মাঝিটিও বড় সোজা লোক নয়—একজন নামকরা বিপ্লবী। গায়ে অসুরের মতো শক্তি। কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। নৌকো চালাচ্ছে ত' নৌকোই চালাচ্ছে। তখন তাকে দেখে মনে হবে, নৌকো বাওয়া ছাড়া জগতে তার অন্য কোনো কাজ নেই। কিন্তু সত্যিকারের বিপদ যখন মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন তার সিংহমূর্তি সহসা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বাঘের থাবায় ভোম্বলকে অচৈতন্য হতে দেখে মাঝিটি যেন তার সত্যিকারের বিপ্লবী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল।

কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে নিয়ে মাঝিটি বললে, 'বুড়ি মা, তুমি তাড়াতাড়ি নৌকোয় ফিরে যাও। মেয়েটা ওখানে একলা পড়ে আছে। বিপদ-আপদের কথা ত কিছু বলা যায় না। আমি ভোম্বলের দেহটা তুলে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।'

বুড়ী বললে, 'যার জন্য আসা, তার ত কিছুই হল না বাবা, মাঝখান থেকে ছেলেটা বাঘের থাবা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল! আমার হয়েছে বাবা শ্রীবৎস রাজার বরাত। হাতের পোড়া শোলমাছও নদীর জলে পালিয়ে যায়।'

মাঝিটি বললে, 'সে জন্য আর আফশোষ করে লাভ কি মা? বিপদ-বাধা এলে আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। নইলে কিন্তু আমরা আরো বিপদে জড়িয়ে পড়বো।

হঠাৎ বুড়ী আনন্দে চীৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি বাবা, পেয়েছি। একটা হাড়-মচ্‌কা গাছের ওপরেই যে বাঘটা পড়ে আছে। আমি এই গাছের পাতা নিয়ে এগুই। তুমি ছেলেটাকে একা তুলতে পারবে ত'?'

মাঝি মৃদু হেসে উত্তর দিলে—এর তিন ডবল ভারী জিনিসও আমি কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে পারি।

বুড়ী নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, 'তবে আর ভাবনাটা কিসের? আমি গাছের পাতা নিয়ে নৌকোয় যাচ্ছি- তুমি বাছা যেন বেশী দেরী কোরো না। একে অচেনা জায়গা তার ওপর রাত-বিরেতের ব্যাপার। শীগগির আমাদের নৌকো ছেড়ে দিতে হবে। ছেলেটারও ত' চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করতে হবে।'

তারপর কি যেন চিন্তা করে বুড়ী বললে, 'এ হল ভালো। ছিল একজন রোগী, এখন দুইজনকে নিয়ে আমাদের রাত জাগতে হবে।

মাঝি জবাব দিলে—সে জন্য আমাদের কোনো ভাবনা নেই মা। যে ডাক্তারের কাছে আমরা যাচ্ছি, তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ। আমাদের একেবারে ঘরের লোক। আর তা ছাড়া রোগ ভালো করবার ব্যাপারে তাঁর যে হাতযশ আছে তার বুঝি তুলনা হয় না। নিজে থেকে ইচ্ছে করে গ্রামদেশে পড়ে আছেন আর আমাদের মতো সাধারণ লোকের উপকার করছেন। নইলে সহর অঞ্চলে গিয়ে ডিসপেন্‌সারী খুলে দিলে উনি হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারতেন। বললে বিশ্বেস করবে না মা, উনি গরীবের একেবারে মা-বাপ।

বুড়ী তার দুটি হাত জোড় করে একবার প্রণাম জানালে।

সে প্রণাম ভগবানের চরণে পৌঁছুলো, কি মানুষ-ডাক্তারের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

তখনো বেশ রাত রয়েছে।

নায়ের মাঝি দুইটি শক্ত রোগীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকো চালিয়ে দিয়েছে। কে জানে হয়ত ভোরের শুকতারার উদয়ের সম্ভাবনায় এই একক মাঝিকে আশান্বিত করে তুলেছে।

বাঘের থাবায় ঘায়েল হয়েছে ভোম্বল। ঘাড়ের কাছে তার গভীর ক্ষত। সেখান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

মাঝির মনে ভয়—শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না কি?

ওপাশে বুড়ীর মেয়েটাও ঝিম্ মেরে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও তার কাতর-আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল। এখন মেয়েটার মুখে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। পায়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে কি সত্যি ঝিমিয়ে পড়ল?

বুড়ী ত' নৌকোয় ফিরে ওর পায়ে কি সব পাতা থেঁতো করে বেঁধে দিয়েছে। সেই বনৌষধির গুণেই কি মেয়েটা এখন এমন ভাবে চুপচাপ করে চোখ বুজে শুয়ে আছে?

মাঝি প্রাণপণে দাঁড় টানছে।

আর কোনোমতেই দেরী করা চলে না। ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। নইলে তিনি যদি আবার ঘোড়ায় চেপে অন্য গ্রামে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়েন, তা'হলে হবে মহা-বিপদ! দু'দুটো মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে তা'হলে সে সত্যি বিপদে পড়ে যাবে।

কেন না,—সারা অঞ্চল টহল দিয়ে তিনি যে কখন বাড়ি ফিরবেন তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। শক্ত রোগী হাতে পড়লে তিনি অনেক সময় রোগীর বাড়িতেই আস্তানা গেড়ে বসেন। তখন তাঁকে খুঁজে বের করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে।

নৌকোর মাঝি এই সব কথা আপন মনে ভাবেছ আর তার বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বুড়ীরও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আর পর পর বিপদের আঘাতে বুড়ীও নৌকোয় পাটাতনের ওপর নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

ওর দেহে যে প্রাণ আছে—হঠাৎ দেখলে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছে না।

মাঝি মনে শক্তি সঞ্চয় করে। নাঃ, তাকে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না।

শেষরাত্তিরে নদীর শীতল বাতাস যেন তার কপালে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। সে আপন মনে গুণ-গুণ করে গান ধরে—

'—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে—'

ছোট নৌকো তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে চলে সমুখ পানে।

ভোরের মুখে নৌকো গিয়ে ডাক্তারবাবু ঘাটে লাগল।

ডাক্তারবাবুও তখন সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন আর মাথা নেড়ে গান গাইছেন—

'আকাশভরা সূর্য-তারা—বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান!'

দীর্ঘদেহ সৌম্যমূর্তি পাকা-চুল-দাড়ি—দূর থেকে ঠিক প্রাচীন যুগের ঋষির মতো মনে হয়। কিন্তু এই বয়েসেও চোখের জ্যোতি এতটুকু ম্লান হয় নি!

হঠাৎ নৌকোটা চোখে পড়তেই গান থামিয়ে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ডাক্তারবাবু—কি গো ঘাটের মাঝি, এবার ক'টা মরা আবার বৈতরণী-তীরে নিয়ে এলে?

ডাক্তারবাবুর আচম্‌কা হুঙ্কার শুনে বুড়ীর ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলো সে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললে—দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা!

কিন্তু ডাক্তারবাবুর 'মরা' কথাটা বুড়ীর কানে বড় বেসুরো ঠেকেছিল। তাই

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে—তোমার ত' বয়সের গাছপাথর নেই ! তা এই সক্কালবেলা জ্যান্ত মানুষকে 'মরা 'মরা' করে হাঁক পাড়ছ কেন ?

বুড়ীর কথা শুনে পাড়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মাঝি এবার হাতের লগিটা তুলে রেখে বললে—বুড়ী মা, ডাক্তারবাবুর কথায় তুমি ভয় পেয়ো না। জ্যান্ত মানুষকে উনি 'মরা' 'মরা' করে হাঁকডাক করেন। তখন আমরা বুঝতে পারি, সেই মরার বুকে পরাণ ফিরে আসতে আর বেশীদেরী নেই।'

বুড়ী যেন সেই কথা শুনে লজ্জা পেল ; বললে—ও মা। ডাক্তারবাবু নাকি ? তা পেন্নাম হই ডাক্তারবাবু। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মেয়ে মানুষ। আমাদের কথা ধরো নি যেন। আমার দুই ছেলেমেয়েকে একেবারে জ্যান্ত করে দিতে হবে। নইলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।

বুড়ীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন। তারপর হাতের দাঁতনটা ফেলে দিয়ে নৌকোয় উঠে বললেন—কী সর্বনাশ, ওরে মাঝি, একেবারে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিস্ যে। কী কাণ্ডটা বল ত ?

তখন নৌকোর মাঝি দুই রোগীর বিবরণ তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দিলে।

বুড়ী বললে—আমি একটা গাছের পাতা থেঁতলে দিয়ে ছেলেটার রক্তপড়া বন্ধ করে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন—খুব ভালো কাজ করেছ বুড়ীমা। আমার অর্দ্ধেক কাজ ত' তুমিই করে দিয়েছ। নইলে আমাকে এই পাড়াগাঁয়ে মহাবিপদে পড়তে হতো। এত রক্ত কোথায় পেতাম ?

ডাক্তারবাবুর হাঁকডাকে কয়েকজন কৃষকশ্রেণীর লোক এগিয়ে-এলো। তারপর তারা ধরাধরি করে ওদের দু'জনকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন—ওহে মাঝি, এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো। এখন নৌকোর মাঝিগিরি ছেড়ে আমার কম্পাউণ্ডার আর অ্যাসিস্টেণ্ট হতে হবে।

মাঝি বললে—ও কাজে আমি খুব রাজী। চলুন, কি কি আমায় করতে হবে দেখিয়ে দেবেন।

অপারেশনের ঘরে গিয়ে ডাক্তারবাবুর আর এক চেহারা।

দুইটি মরণাপন্ন রোগীর অপারেশন করতে হবে। বেশী দেরী করবার উপায় নেই ! তা'হলেই প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠবে।

রোগীদের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবুর হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

যেন এক মুহূর্তে পৃথিবী ভুলে গেলেন তিনি। সমস্ত যন্ত্রপাতি দ্রুতগতি যথাযথ ভাবে সাজিয়ে ফেললেন। তারপর নৌকোর মাঝির দিকে তাকিয়ে বললেন—অপারেশন-টেবিলের কাজ তোমায় মোটামুটি শিখিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে সাহায্য করো।

মাঝি বললে, 'আপনার কাছে ত 'ঘাটের মরা' নিয়ে কম বার যাতায়াত করতে হয় নি আমাকে। আপনি দয়া করে আমাকে ডাক্তারী শাস্ত্রের অনেক কিছুই শিখিয়ে দিয়েছেন।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন—এইবার তোমাকে সেই শিক্ষার পরীক্ষা দিতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করে নাও।

মাঝি বললে, 'সমরক্ষেত্রের সৈনিকের মতো আমি সব সময়েই প্রস্তুত।'

ক্ষিপ্রবেগে গুরু-শিস্য কাজে লেগে গেল। আলো জ্বলছে মাথার ওপরে। ঘরের দরজা চারদিকে বন্ধ। গ্রামদেশে যতখানি ব্যবস্থা করা সম্ভব সে বিষয়ে ডাক্তারবাবু চেষ্টা করে কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

ভোম্বল আর দুখ্‌নী এই দুইজনের ক্ষতই বিষাক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল।

ডাক্তারবাবুর অমানুষিক পরিশ্রমে আর সেই সঙ্গে 'মাঝি'র আন্তরিক সহযোগিতায় পুরো চার ঘণ্টার পর দুই রোগীর অপারেশন-কার্য সমাধা হলো।

ডাক্তারবাবুর মুখে এইবার হাসি ফুটে উঠলো।

তাই দেখে নৌকোর মাঝি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। ডাক্তারবাবু তাঁর সহকারীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বুড়ী তাঁর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বললে—তুমি আমার ধর্মবাপ! এইবার বল তো বাবা, আমার ছেলেমেয়ে বাঁচবে কিনা?

ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সকাল থেকে পেটে কিচ্ছু পড়ে নি। কেবলি ইঁদুরে ডন দিচ্ছে সেখানে। আগে দুই ধামা গুড়-মুড়ি নিয়ে আয় বুড়ীমা! তারপর অন্য কথা···হুঁ!!!

॥ চৌদ্দ ॥

ভোম্বল আর দুখ্‌নীর অপারেশনের পর সাতদিন কেটে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারবাবুর বাগানে ওদের সান্ধ্য মজলিশ বসেছে।

এত ছুটোছুটি তাঁর কাজকর্মের ভেতরও এই বাগানটির দিকে ডাক্তারবাবুর দুটি চোখ সব সময় সজাগ। তারই ফলে নানা রকম ফুলের গাছে ছোট্ট বাগানটি সত্যি মনোরম।

ফুলের মধুর গন্ধ ভেসে আসছে মৃদু সমীরণে, আর ওরা কয়েকজনে বসে ডাক্তার-বাবুর মুখে মজার মজার গল্প শুনছে।

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ডাক্তারবাবুর। বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক।

পুরোনো দিনের সেই সব কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী তিনি বসিয়ে বসিয়ে বলছিলেন আর আপন মনে বসে শুনছিল নৌকোর মাঝি, ভোম্বল, দুখ্নীর মা আর দুখ্নী।

ওই ছোট্ট মেয়ে দুখ্নী এখানে এসে যেন এক নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে। সেও ধীরে ধীরে দেশকে ভালোবাসতে শিখছে। তার ছোট্ট প্রাণে দেশপ্রেমের অঙ্কুর যেন ধীরে ধীরে আলো, মাটি আর হাওয়ায় বিকশিত হয়ে উঠতে চাইছে।

এক সময় ডাক্তারবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি এই রকম হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। অচেনা মানুষ—যারা জানে না, তারা আচম্কা সেই হুঙ্কার শুনে চমকে ওঠে।

দুখ্নীর মা শুধোলে—বেশ ত' গল্প হচ্ছিল, আবার বাঘের মতো ডাক ছাড়ছো কেন ?

ডাক্তারবাবু তেমনি আর একটা ডাক ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা বুড়ী মা, তুমি এমন নেমকহারাম কেন ?

বুড়ী হক্‌চকিয়ে গেল ; জিজ্ঞেস করলে—কেন ? কেন ? কসুরটা কি হলো শুনি ?

ডাক্তারবাবু কইলেন—অ্যাঁ, আবার বলছ কসুর হয় নি ? তোমার ছেলে-মেয়েকে আমি ভালো করে দিলাম, আর তুমি আমায় একদিন খাওয়ালে না ?

বুড়ী মার দুই চোখে জল ! বললে, 'সবই ত' তোমারই খাচ্ছি বাবা ! আমার মত গরীব-দুঃখী মা কি তোমারে খাওয়াতে পারে ?'

ডাক্তারবাবুর আবার হুঙ্কার শোনা গেল—হু আমি কি সেই কথা বলেছি নাকি ? আমি বলছি, বুড়ী মা নিজের হাতে আমাকে কিছু খাবার তৈরী করে খাওয়াবে।

বুড়ী মা বললে, 'দুখী মা তোমায় শাক রান্না করে খাওয়াতে পারে। আর কি পারে বেটা ?'

এই সময়টায় ডাক্তারবাবুর গলা ভারী হয়ে এলো। তিনি বললেন, 'দেখ মা, ছেলেবেলায় আমার মা মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু তৈরী করে খাওয়াতো। সে খাবার ত' এখন ভুলেই গেছি। আমাকে তুমি তাই তৈরী করে খাওয়াও দেখি একদিন !

বুড়ী মা হাসতে হাসতে বললে, 'এ আর বেশী কথা কি ? কালকেই আমার ছেলেদের মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু খাইয়ে দেবো।'

শুনে ডাক্তারবাবু আনন্দে মাথা দোলাতে লাগলেন।

খানিকটা চুপ করে থেকে তারপর তিনি বললেন, 'দেখ বুড়ীমা, সহরে যদি আমি চিকিৎসা করতাম, তা'হলে তোমার আশীর্বাদে আমি অনেক টাকা রোজগার করতে পারতাম। কিন্তু তা আমি পারি নি।'

বুড়ী শুধোলে, 'কেন গো? তোমার বাড়ি হতো, গাড়ি হতো,—ফটকে দারোয়ান থাকতো! আর আমার মতো বুড়ী দেখলে বলতো—হট্ যাও, তফাৎ যাও!'

বুড়ীর কথা শুনে ডাক্তারবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর খানিক বাদে বললেন, 'সত্যি বুড়ী মা, সত্যি তাই। সহরের ডাক্তার হলে আমি তোমাদের কাছাকাছি আসতে পারতাম না। আমার বিপ্লবী ভাইদের চিনতাম না। তা ছাড়া—বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর সনাতনবাবু এবং আমি ছিলাম সহপাঠী। একই সঙ্গে অমরা ডাক্তারী পাশ করে প্রতিজ্ঞা করি আমরা দেশের জন্য কাজ করবো। কিন্তু বন্ধু সনাতনের চোখ দু'টি একেবারে চলে যাওয়াতে সে আজ অন্ধ। তাই তার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। তা ছাড়াও আমার মায়ের আদেশ ছিল। আমার মা বার বার বলেছিলেন— আমি যেন গাঁয়ের লোকের দুঃখ দূর করি। মরবার সময়ও তাঁর মুখে একই কথা ছিল। তখনো আমি পুরোপুরি ডাক্তার হই নি। তবু আমার মায়ের আদেশ ছিল, ডাক্তার হয়ে আমি যেন গাঁয়ের লোকের দুঃখ দূর করি। সেই মায়ের হাতের মুড়ির মোয়া আর নারকোল-নাড়ু আমি আর খেতে পাই নে। বুড়ী মা আমাকে তাই খাওয়াবে বলেছে। আজ আমার আনন্দ হবে না?

হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর একটা শিস্ শুনে ডাক্তারবাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। নিজের চারপাশে একবার তাকালেন; তারপর নিজেই একটা শিস্ দিয়ে উঠলেন।

ডাক্তারবাবুর কাণ্ড দেখে ভোম্বল ত' অবাক! ডাক্তারবাবুর এ আবার কি নতুন খেলা সুরু হল?

একটু বাদেই দেখা গেল, একটি নেপালী ছেলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে সেইখানে হাজির হল; তারপর ডাক্তার বাদে আর সব অচেনা মুখগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বাহাদুর, এরা সব আমার দোস্ত আছে। এদের সামনে তুই সব কথাই খুলে বলতে পারিস্।'

সেই কথা শুনে বাহাদুরের কুতকুতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—হয়ত ও একবার মুচকি হাসলো; তারপর চারদিকে তাকিয়ে বললে—টিকটিকি···

ওর কথা শুনে আর রকম-সকম দেখে ডাক্তারবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—এখানে আবার টিকটিকি কোথায় দেখতে পেলি বাহাদুর?

বাহাদুর তার ছোট ছোট চোখ দুটোকে আরো ছোট করে উত্তর দিলে—টিকটিকি জানতে পেরেছে। আজ রাতে পাহারাওয়ালারা আসবে নৌকো করে। বাড়ি ঘেরাও করবে।

এই কথা শুনে ডাক্তারবাবু সত্যি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এই ছিঁচকে টিকটিকিগুলো ত' সত্যি ভাবিয়ে তুললে। এখন এই সন্ধ্যেবেলাতেই কি করা যায় মাঝি?

এই বলে তিনি তাঁর অপারেশন সহকারী নৌকোর মাঝির দিকে তাকালেন।

নেপালী ছোকরাটা খবরটা দিয়েই কোন ফাঁকে পালিয়ে গিয়েছিল তা কেউ লক্ষ্য করে নি।

ডাক্তারবাবুর মুখচোখের চেহারা মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন বদলে গেল। কোথায় সেই হাসি-তামাসা? কোথায় সেই মুড়ির মোয়া আর নারকেল-নাড়ু নিয়ে কৌতুক?

ডাক্তারবাবু বাগানের মধ্যেই পায়চারী সুরু করে দিলেন। দুটি হাত পেছন দিকে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে যেন সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে! কপালের চিন্তারেখাগুলো যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভোম্বলরা অবাক হয়ে যেন এক নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখতে লাগলো!

হঠাৎ ডাক্তারবাবু হাতদুটোকে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। তারপর বাঁ হাতের চেটোর ওপর ডান হাতের মুঠি দিয়ে একটা আঘাত করে বললেন—ঠিক হয়েছে—আর ভয় নেই!

নৌকোর মাঝি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছেডাক্তারবাবু? ব্যাপারটা কি?

ডাক্তারবাবু বিরক্তির সুরে উত্তর দিলেন—ছিঁচকে টিকটিকিরা পেছনে লেগেছে। আজই নাকি পুলিশের দল আমার বাড়ি ঘেরাও করবে। কিন্তু আমাকে সহজে কাবু করতে পারবে না বাছাধনেরা। তারা যদি ঘোরে ডালে ডালে, তবে আমি ফিরি পাতায় পাতায়—হুঁ হুঁ বাব্বা!

ডাক্তারবাবু আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর নৌকোর মাঝি আর ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আর দেরী নয়। এক্ষুনি তৈরী হয়ে যেতে হবে তোদের।

ওরা দু'জনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন—আমার মেয়ের বাড়ি। খালের পথ দিয়ে সেখানে পৌঁছুবার একটা সোজা রাস্তা আছে। তোদের এক্ষুনি নারকোলের মহাজন তৈরী করে দিচ্ছি। ঘাটে আমার নারকোল-ভর্তি নৌকো আছে। তাতে চেপে তোরা চট্‌পট্ রওনা হয়ে পড়।

ডাক্তারবাবু ওদের অপারেশন ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর নিজের হাতে ওদের সাজিয়ে দিলেন। বললেন—তোরা গাঁয়ে গাঁয়ে নারকোল বিক্রি করিস্, বুঝলি? পুলিশের কোনো নৌকো যদি রাস্তায় ধরে, তা'হলে সোজাসুজি এই কথা বলে দিবি।

সত্যি, ঘাটে নারকোল-বোঝাই নৌকো ছিল। ডাক্তারবাবুর বাগান থেকেই এসেছে। এখন সেই নৌকো কাজে লেগে গেল।

ডাক্তারবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর আপন মনেই বললেন—হুঁ হুঁ! কেমন জব্দ করলাম ব্যাটাদের। এখন রাত্তির বেলা বাড়ি ঘেরাও করে দেখবি—পাখী পালিয়েছে।

ডাক্তারবাবু মেয়ের নামে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

নারকোল-বোঝাই নৌকো এগিয়ে চললো খাল ধরে।

দু'পাশে বড় বড় উঁচু উঁচু গাছ। সেই সব গাছের ছায়া পড়েছে খালের জলে।

কাজেই মনের আনন্দে ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝি একটা ভাটিয়ালি গান ধরলে।

সেই গানের মধুর সুর সন্ধ্যেবেলার হাল্কা হাওয়ায় যেন দুই পাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

প্রায় শেষ রাত্তিরে ওদের নারকোল-বোঝাই নৌকো ডাক্তারবাবুর মেয়ের খিড়কীর পুকুরে গিয়ে হাজির হল।

তাদের কি করতে হবে ডাক্তারবাবু সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

নৌকোর মাঝি ধীরে ধীরে নেমে বাড়ির উঠোনের ধানের গোলার পাশ দিয়ে একটা ঘরের জানালায় টক্-টক্ করে শব্দ করলো।

শব্দ করবার আগে মাঝি দেখে নিলে জানালার সামনে একটা জামগাছ আছে কিনা!

ডাক্তারবাবুর মেয়ের ঘুম খুব পাতলা। এই জাতীয় ঘটনা তার বাড়িতে আরো ঘটেছে। কাজেই কোনো কিছুই তার অজানা নয়। উপযুক্ত বাপের কাছে শিক্ষা পেয়ে উপযুক্ত মেয়েই সে হয়েছে। তাই বহু বিপ্লবী বিপদে-আপদে এইখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার রাত কাটিয়ে অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু এই দলটি শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্যই আসেনি। কয়েকদিন এখানে বাড়ির লোকের মতো বসবাস করবে। ডাক্তারবাবুর চিঠিতে মেয়ের কাছে সেই নির্দ্দেশই ছিল।

ডাক্তারবাবুর মেয়ে সুরমা সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে দিলে। দুখ্নীর মা হল

—সুরমার দিদিমা। নৌকোর মাঝি আর ভোম্বল ওরা দুই মামা। আর দুখ্‌নী ওদের আশ্রিতা মেয়ে। এই পরিচয়ে ওরা আশ্রয় পেলে।

সুরমা ওদের কানে কানে যে কথা জানিয়ে দিলে, সেটাও কম চমকপ্রদ নয়!

ডাক্তারবাবুর মেয়ে গোপন দেশ-সেবিকা; কিন্তু ও দেশ-সেবিকা হলে কি হবে, তার স্বামী কিন্তু পুলিশের লোক!

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করে চলে। তাতে অবশ্য উভয়ের কাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

এও যেন এক লুকোচুরি খেলা।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। কাজেই ভয়ের কিছু ছিল না।

ওরা কয়েক দিনের মধ্যে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল!

দুখ্‌নীর মা কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথা ভোলেনি। সুরমার বাড়িতে বসেই মুড়ির মোয়া আর নারকোলের নাড়ু তৈরী করে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলে। যে লোকটি নিয়ে গিয়েছিল সে সুরমার বিশেষ বিশ্বাসী লোক। সে ফিরে এসে জানালে, ওই দিন রাত্রে পুলিশ এসে বাড়ি ঘেরাও করেছিল; কিন্তু কাউকে না পেয়ে মুখ চুণ করে পালিয়ে যাবার পথ পায় নি।

সেই খবর শুনে নৌকোর মাঝি, ভোম্বল, দুখ্‌নীর মা আর দুখ্‌নীর কি হাসি!

দিন কয়েক বাদে বাড়ির কর্তার এক খুড়তুতো ভাই এসে হাজির হল। সুরমার কাছে কি এক চিঠি নিয়ে এসেছে। সে কিছুদিন এইখানে থাকবে। ছেলেটি দুই দিনের মধ্যেই ভোম্বলের খুব বন্ধু হয়ে উঠলো। ছেলেটির নাম অনন্ত। যে ভারী চমৎকার ছবি আঁকতে পারে।

খালের ধারে, ধানের মড়াইয়ের পাশে, নদীর কিনারায় আর আম-বাগানের আশে পাশে ঘুরে সে অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেললো।

ভোম্বল বললে, 'আমায় ছবি আঁকা শেখাবে অনন্ত?'

অনন্ত ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, 'নিশ্চয়। তুমি যে আমার বন্ধু হয়ে পড়েছ!'

একদিন অনন্ত ভোম্বলকে একটা পোড়ো বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল। বললে—তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে।

—কি গোপন কথা?

—শোনো ভোম্বল, আমি তোমাদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি। আমি এই বাড়ির কর্তার ভাই নই, তাঁর চর। তোমাদের ওপর নজর রাখতে আমায় পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমায় ভালোবেসে আমি দেশকে ভালোবাসতে শিখছি। তাই আর মিথ্যাচার করতে পারবো না। এখান থেকে পালাও—নইলে সামনে সমূহ বিপদ।

॥ পনেরো ॥

শেষ পর্য্যন্ত ভোম্বল পালানোই ঠিক করলো। সবাইকার সঙ্গে জড়িয়ে ও যদি এখানে থাকে তবে সকলকেই সে বিপদের মধ্যে ফেলবে। এমন কি ডাক্তারবাবুর মেয়েও বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

তার চাইতে নিঃশব্দে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ওরা হয়ত পালানোর আসল কারণটা বুঝতে পারবে না, ওকে অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ ভেবে গালাগাল দেবে, কিংবা ওদের পক্ষে আর কিছু ভাবাও বিচিত্র নয়।

তবু ভোম্বল মনস্থির করে ফেললে।

রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে—ঠিক তখন পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভোম্বল একবার ভাবলে, ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে একটা চিঠি লিখে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলে, কোনো প্রমাণ কিংবা নিদর্শন রেখে যাওয়া কোনো ক্রমেই উচিত হবে না।

হঠাৎ যদি গোয়েন্দার দল খানাতল্লাসী করে তা'হলে এই চিঠি ডাক্তারবাবুর মেয়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। বিপ্লবীদের সঙ্গে যে তার যোগাযোগ আছে—সে-কথাও ভালো করেই প্রমাণিত হবে।

সুতরাং সে সঙ্কল্পও ভোম্বল মন থেকে মুছে দিল।

দুখ্‌নী এসে জিজ্ঞেস করলে, 'ভোম্বলদা, এতো ভাবছ কেনে ?'

ভোম্বল জবাব দিলে—আরে তোর কথাই ত ভাবছি। তোর পা-টা একেবারে সেরে গেছে ত' ?

দুখ্‌নী তার হাত নেড়ে, চুল দুলিয়ে পাকা বুড়ীর মতো বললে, 'সে ত' কবে ভালো হয়ে গেছে ভোম্বলদা ! এখন আমাদের বাড়ী ফিরে গেলেই হবেক।'

ভোম্বল জবাব দিলে—এত ব্যস্ত কিসের জন্য ? আগে ডাক্তারবাবু এসে তোকে দেখে যাবেন। তারপর তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

দুখ্‌নী চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'ভোম্বলদা, ইখানে আর ভালো লাগছেক নেই। মাও বলতিছে—

ভোম্বল মিটিমিটি হেসে বললে, 'কি বলছেক মা ?,

দুখ্‌নী উত্তর দিলে—আর কতকাল ইখানে থাকবেক। বাড়ি চলি গেলে হবেক।

ভোম্বল জবাব দিলে—তোদের কোনো ভাবনা নেই দুখ্‌নী। একবার ডাক্তারবাবু এসে পড়লে হয়। তিনি পরীক্ষা করে ছুটি দিলে একেবারে সোজা দেশে চলে যাবি।

দুখ্‌নীও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—ভোম্বলদা, তুমি মোদের সাথে যাবেক ত ?

—সে তখন দেখা যাবে !

ভোম্বল পাশ কাটিয়ে গেল দুখ্নীর প্রশ্নটার।

হঠাৎ ভোম্বল জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা দুখ্নী ,তুই কি খেতে ভালবাসিস্ ?

দুখ্নী মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলে—ঢ্যাপের মোয়া খেতে খুব ভালো লাগবেক।

ভোম্বল হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তোকে ঢ্যাপের মোয়া খাওয়াবো, কথা দিচ্ছি।

ভোম্বল জানতো' বাগ্দীপাড়ায় চ্যাপের মোয়া পাওয়া যায়।

কাজেই সে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিকেলের দিকে বাগ্দীপাড়ায় চলে গেল।

বাগ্দীর বৌরা বেতের ঝুড়ি, বাঁশের চুবড়ী এই সব জিনিস তৈরী করে হাটে-বাজারে বিক্রি করে। ভোম্বলের সঙ্গে ওদের খুব ভাব। সে কত দিন এই পাড়ায় এসে ওদের হাতের কাজ দেখে গেছে। ঢ্যাপের মোয়া যোগাড় করা আর শক্ত কাজ কি ? ঢ্যাপের মোয়া চাইতেই ওরা ওদের কালো হাঁড়ি থেকে বের করে দিলে কয়েকটা।

রাত ক্রমে গভীর হল। বাড়িশুদ্ধু সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দূরে অশথগাছের ডালে একটা ভূত-ভূতুম পাখী কেবলই ডেকে চলেছে। কিন্তু পাখীর ডাক শুনে ভয় পাবার ছেলে ভোম্বল নয়।

দুখ্নীর শিয়রে ঢ্যাপের মোয়াগুলো গুছিয়ে রেখে পা টিপে টিপে ভোম্বল বাইরে বেরিয়ে এল। একবার সে মনে করলো, সোজা বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ চলে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে দেখলে, জীবনদার অনুমতি না নিয়ে বাবুইবাসা বোর্ডিংএ যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ বর্তমানে ওখানকার অবস্থা তেমন কিছুই জানা নেই।

হয়ত এমনও হতে পারে যে, পুলিশের কড়া নজর রয়েছে বোর্ডিং-এর ওপর। কিন্তু প্রমাণের অভাবে পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।

সেক্ষেত্রে হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে অবস্থাটাকে জটিল করে তুলবে কেন ?

থম্কে দাঁড়ালো ভোম্বল।

কিন্তু ওই গাছের ছায়ায় মূর্তিমান প্রেতের মতো কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ? পুলিশের লোক নয় ত ?

হয়ত তারই খোঁজে গোপনে এ বাড়িতে এসেছে !

তখন এগুবে কি পেছুবে—ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না ভোম্বল। এমন সময় একটি পচিচিত গলা শোনা গেল—এগিয়ে আয় এদিকে।

এ কি ! এ যে জীবদার কণ্ঠস্বর।

একেবারে যাকে বলে মেঘ না চাইতেই জল।

প্রবল পুলকে ছুটে গেল ভোম্বল, তারপর জীবনদাকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরা গলায় বললে, 'জীবনদা, আপনি !!'

জীবনদা ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন—চুপ, চ্যাঁচাস্ নে। তোকে নিয়ে যেতেই আজ রাত্রে আমি এখানে এসেছি। দেখিস্—কেউ যেন জেগে না ওঠে।

ভোম্বল বললে, 'না, না, সবাই ঘুমিয়ে আছে। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। তাই আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছিলাম।'

জীবনদা জবাব দিলেন—যাক, ভালোই হল। তোকে আর ডাকাডাকি করতে হল না। এখন চল আমার সঙ্গে।

—কোথায় জীবনদা ?

—তোর ওপর এক শক্ত কাজের ভার পড়েছে। আর তাই আমি তোকে নিতে এসেছি। এখানে আর কোনো কথা নয়। ঘাটে নৌকো বাঁধা আছে। সোজা আমার সঙ্গে চলে আয়। যেতে যেতে সব কথা জানিয়ে দেবো।

দুইজনে নিঃশব্দে রওনা হল।

ভোম্বল একবার শুধু পেছন ফিরে তাকালো। গোটা বাড়িটাই নীরব নিঝুম। সারাদিনের খাটা-খাট্‌নীর পর সকলেই ঘুমুচ্ছে।

ওপরে আকাশের দিকে তাকালে ভোম্বল।

সেখানে কালপুরুষ নীরবে প্রহর গণনা করছে। আরো অসংখ্য তারা সারা আকাশে ছড়িয়ে আছে। তারাগুলো যেন চোখ পিট্‌পিট্ করে এই দুটি পলাতক মানুষকে দেখে নিলে।

অনেকগুলো 'ব' মেলে দিয়েছে একটি বুড়ো বটগাছ। সেইগুলো আঁকড়ে ধরে জীবনদার পেছন পেছন ভোম্বল নীচে নৌকোতে নেমে এল।

অন্যান্য বারের মতো একটি মাঝি চুপচাপ বসে আছে সেই নৌকোতে। ভোম্বল বুঝতে পারলে, মাঝিও একজন নামকরা বিপ্লবী। সে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে না।

ওরা দু'জনে নৌকোয় ওঠা মাত্র মাঝি খালের পথে নৌকো চালিয়ে দিলে।

ঘণ্টা খানেক চলবার পর সেই নৌকো নদীতে এসে পড়লো।

জীবনদা এইবার জিজ্ঞেস করলেন—ভোম্বল ঘুমুলি ?

জীবনদা পাটাতনের ওপর শুয়ে তারাদলের ওপর দিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখছিলেন।

এই মাত্র একটি উল্কা ছুটে গেল—দূর আকাশের কোণে।

জীবনদার প্রশ্নের উত্তরে ভোম্বল বললে, 'না, জীবনদা, ঘুম আসছে না।'

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে এই ফাঁকে কাজের কথাটা শুনে রাখ।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বেশ কিছুটা বাদে জীবনদা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'আজই শেষরাত্রে আমাদের এক বিপ্লবী বন্ধুর ফাঁসি হবে।

—অ্যাঁ ফাঁসি!

চমকে উঠলো ভোম্বল।

জীবনদা জবাব দিলেন—এতে চমকাবার কিছু নেই। আমাদের পথ যে ফুলে ঢাকা পথ নয়—তা ত' তোরা সবাই জানিস।

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।'

তাই আমরা গোপন বৈঠকে স্থির করেছি—একটি মানুষের বদলে আর একটি মানুষকে সরে যেতে হবে।

নৌকোর মাঝি আর ভোম্বল কোনো জবাব দিলে না।

জীবনদা আপন মনে বলে চললেন—এই ফাঁসি হবে ভোররাত্রে, আর সাহেবদের বিজয়-উৎসব হবে সারা রাত। এই বিজয়-উৎসবেই মা কালীর নামে আমাদের বলি নিবেদন করতে হবে।

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'কাজের দায়িত্ব কি আমার ওপরেই পড়েছে?'

জীবনদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

জীবনদাই আবার সেই নীরবতা ভেঙে বললেন, 'বাঘ মানুষের রক্ত খায়; কিন্তু বাঘেরও ত' প্রাণের ভয় আছে? তাই ওরা গভীর বনে বাস করে।'

আজ রাত্রে যে রক্তলোলুপ সাহেবের দল বিজয়-উৎসব করবে। তারা একটি নির্জ্জন বাংলো-বাড়ি নির্ব্বাচন করেছে। বাইরের সভ্য-জগৎ যেন এই আনন্দলোকের কোনো খবর জানতে না পারে। কিন্তু খবর গোপন করতে চাইলেই কি গোপন করা যায়?

ওদের যেমন গোয়েন্দা বাহিনী আছে—বিপ্লবীদেরও তেমনি "আছে শিক্ষিত গুপ্তচরের দল। তারা সব সময় সব খবর এনে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। তাই আমরা আগের থেকে সব খবরই জানতে পেরেছি। ভোররাত্রে আমাদের এক বিপ্লবী বন্ধু ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাবে, আর রাত্রিবেলা নেকড়ে বাঘের দলের হবে বিজয়-উৎসব।

সংহাররূপিণী ভয়ঙ্করী করালী কালী আজ জেগেছে; চীৎকার করে বলছে—'ময় ভূখা হুঁ'।

মায়ের সেই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু খুব গোপনে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিজয়-উৎসবকে রক্তসন্ধ্যায় রূপান্তরিত করতে হবে।

ধীরকণ্ঠে ভোম্বল বললে, 'আমি প্রস্তুত জীবনদা !'

জীবনদা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সারাদিন ধরে আমরা নৌকোতেই কাটাবো। দুপুরবেলা এক জায়গায় নৌকো লাগিয়ে খাওয়া দাওয়া সারবো। তারপর চলবে মহাবলির প্রস্তুতি-পর্ব।'

দুপুরবেলা একটা গঞ্জে নৌকো লাগিয়ে নৌকোর মাঝি ওপরে উঠে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে কিছু খাবার ও একটি কাগজ নিয়ে ফিরে এলো। এই গঞ্জে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটি আছে। এই ঘাঁটির বিপ্লবীরা আগে থেকে খবর পেয়ে ওদের জন্য খাবার তৈরী করে রেখেছিল।

জীবনদা সকলের আগে কাগজটা খুলে ফেললেন। বিপ্লবীর ফটো আর তার ফাঁসি হবার খবরটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠলো তিনটি বিপ্লবীর চোখে।

ভোম্বল তাকিয়ে দেখলে, জীবনদার দুই চোখ ভর্তি জল টল্‌টল্‌ করছে।

মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাঁর মনকে শক্ত করে তুললেন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কিছু কাল নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর নৌকোর পাটাতনের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললেন—হ্যাঁ, আজ রাত্রেই কালী করালী বলি চায় !!

গভীর রাতে ভোম্বল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একটি নির্জন বাংলো বাড়ী। ভেতরে আলোর ঝিলিক্‌।

দলে দলে সাহেব আর মেমসাহেবরা নাচছে।

ইংরাজী বাদ্য বাজছে।

বেয়ারার দল ঘন ঘন খাদ্য আর পানীয় পরিবেশন করছে।

জীবনদা জানিয়ে দিয়েছেন, যে সাহেবের বুক-পকেট থেকে লাল রুমাল উঁকি দিচ্ছে—তাকেই বলি দিতে হবে।

রাত যত গভীর হচ্ছে সাহেবদের নাচ তত জমে উঠছে।

ভোম্বল একটি জানালার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সুযোগ পেয়ে এক ঝাঁক মশা ওর দুটি পায়ের রক্ত যেন শুষে নিচ্ছে।

আশে-পাশে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। ডোবা থেকে ভেসে আসছে গ্যাঙোর-গ্যাঙ শব্দ।

হঠাৎ একটা ঝোপের ভেতর থেকে শঙ্খের শব্দ শোনা গেল।

ভোম্বল নিজেকে তৈরি করে নিল।

যেই সাহেবটা নাচতে নাচতে জানালার ধারে এসেছে, অমনি বোমা ফাটার শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বল ঝাঁপিয়ে পড়লো খালের জলে।

॥ ষোল ॥

প্রথমে বেশ খানিকটা সাঁতার কেটে চলেছিল ভোম্বল।

একবার ভাবলে—অন্ধকার রাত। এ ভাবে খালের জলে অসহায় ভাবে সাঁতার কাটা কি ঠিক হবে? পথঘাট কিছুই জানা নেই। এই খাল কোন্ দিকে কোন্ অঞ্চলে গেছে তাও সে জানে না। আবার ভাবলে, ঘটনাস্থল থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই ভালো।

কেননা নিশীথ রাতের ওই অভিযানের পর চারদিকে একটা সোরগোল পড়ে যাবে। তখন আততায়ীর সন্ধান করতেও ওরা কসুর করবে না।

সাঁতারু বলে ভোম্বলের একটা নাম আছে। কাজেই ও ঠিক করলে,—আসল ঘটনার জায়গা থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

এই ভেবে সে দুই হাত বৈঠার মতো চালাতে লাগলো।

প্রাণপণে এগিয়ে চলেছিল ভোম্বল।

মাঝে মাঝে খালধারের ঝোপ-জঙ্গলের সঙ্গে ওর কাপড় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু তা ও মোটেই গ্রাহ্য করে নি।

দু'ধারের পাড় ভেঙে ষ্টিম-লঞ্চ যেন ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে।

আরো কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর দেখা গেল খালটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে। তখন ভোম্বলের একটু হাত-পা খেলিয়ে সাঁতার কাটবার সুবিধে হলো।

বর্ষার জলে খালটা এখানে টইটুম্বুর, স্রোতেরও এখানে বেশ টান আছে।

সাঁতার কাটতে কাটতে ভোম্বলের মনে হলো কাছেই নদী, আর খালটা গিয়ে সেই নদীতে পড়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে এইবার ভোম্বল চিৎ-সাঁতার কাটতে লাগলো।

হঠাৎ ওর মনে হলো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে কিসে যেন কামড়ালে। তীব্র তার যন্ত্রণা। সাপ-টাপ নয় ত? এই অন্ধকারের মধ্যে কিসে যে হঠাৎ কামড়ে দিল সেটা বুঝবার কোনো উপায় নেই। কোথায় টর্চ—কোথায় লণ্ঠন—কে দেখবে?

আকাশে অনেক উঁচুতে তারাগুলো টিম-টিম করে জ্বলছে। কিন্তু ওগুলো শুধু চোখেই পড়ে। ওদের আলোতে কিছু দেখবার যো নেই।

কামড়ের জায়গাটায় তীব্র বেদনা বোধ করতে লাগলো ভোম্বল।

এ কি! ওর সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করছে কেন? তবে কি সত্যি সাপের কামড়?

অবশ্য জলে এই সময় ঢোড়া সাপেরা ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যদি সত্যি কোনো বিষধর সাপে কামড়ে থাকে, তা'হলে উপায় ?

ওর দেহটা যেন সত্যি অবশ হয়ে আসছে। দুই হাতে আর বল পাচ্ছে না। কি করে সাঁতরে এগিয়ে যাবে ?

হঠাৎ দেখতে পেলে—তার পাশ দিয়েই একটা ভেলা ভেসে যাচ্ছে। প্রাণপণ শক্তিতে সেই ভেলার একটা কলাগাছ ভোম্বল আঁকড়ে ধরলে।

তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

স্রোতের টানে সেই ভেলা কিন্তু ভেসে চললো সিধে নদীর দিকে। নদীতে পড়ে ভেলা এগিয়ে চললো দক্ষিণমুখো—শাঁ-শাঁ করে।

ভোম্বল সেই যে ভেলার কলাগাছটা আঁকড়ে ধরেছিল, সেটা আর ছাড়ে নি! তারপর কখন সে তীব্র বিষের জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে-কথা নিজে বুঝতেও পারে নি।

ভোরের দিকে ভাসতে ভাসতে সেই ভেলাটা একটা গঞ্জের কাছে গিয়ে আটকে গেল।

প্রথমে নৌকোর মাঝিরা ওকে দেখতে পায়। তাই ত'—একটা অচৈতন্য মানুষ এখানে কোথা থেকে ভেসে এলো ?

একজন দুইজন করে গঞ্জের ঘাটে ভীড় জমে গেল।

অনেক গুণী মানুষও ত' গঞ্জে-হাটে আনাগোনা করে। তাদের একজনের চোখে ধরা পড়লো অচৈতন্য ভোম্বলের দেহটা।

সে এগিয়ে এসে নাড়ি টিপে, চোখের পাতা উল্টে বললে—এ যে সাপে কাটা মানুষ। এখনো সময় আছে। আমি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি।

গুণী আজগর সর্দারকে তখন অনেকেই চিনতে পারলো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মস্তবড় ওঝা—নাম আজগর সর্দার। একেবারে মরা মানুষকে যেন জ্যান্ত করে দেয় সে।

জন কয়েক লোক তখন আজগর সর্দারকে ধরলে—নিশ্চয়ই ছেলেটার পরমায়ু আছে। নইলে হঠাৎ তোমার চোখে পড়ে যাবে কেন ?

জনতা ঘাড় নেড়ে বললে, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

আজগর সর্দার বললে, 'তা হলে কিছু সরষে নিয়ে এসো, তিল তেল নিয়ে এসো। ...আর একটা গাছের নাম বলে দিয়ে বললে, 'তার ডাল ভেঙে নিয়ে এসো।'

ঘাটের মাঝিরাই সব যোগাড় করে দিলে।'

গঞ্জে উৎসাহী লোকের তখন অভাব নেই। যারা দাঁতন করতে করতে মজা দেখছিল, তাদের মধ্যেই দু'জন পাশের জঙ্গলে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলো।

তখন সুরু হল আজগর সর্দারের খেল। কখনো বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ছে, কখনো অচৈতন্য দেহটার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার পর-মুহূর্তেই গাছের ডালটা দিয়ে দেহটা সপাৎ-সপাৎ করে পিটছে। হঠাৎ আজগর সর্দার বলে বসলো—পাঁচটি মুরগীর ছানা চাই।

গঞ্জে সব রকম মানুষই হাজির ছিল। তাদের একজনের মুরগীর ঝুড়িতে পাঁচটি মুরগীর ছানা খুঁজে পাওয়া গেল।

আজগর সর্দার এক-একটা মুরগীর ছানার পেছনের অংশটা খানিকটা কেটে ভোম্বলের পায়ের ক্ষতস্থানে চেপে ধরে। মুরগীর ছানাটা বিষের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। তারপর সেটা ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে।

এই ভাবে পাঁচটি ছানা যখন বিষের জ্বালায় মরে গেল, তখন আজগর সর্দার জনতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'খবরর্দার, এই মুরগীর বাচ্চা যেন কেউ খেতে যেও না। বাচ্চাগুলো সাপের বিষ টেনে নিয়েছে। যে ওগুলো খাবে সে নির্ঘাৎ সাপের বিষে মারা যাবে।

একজন জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা সর্দার, ছেলেটা বেঁচে উঠবে ত' ?'

এইবার আজগর সর্দার গর্বের হাসিতে হেসে উঠলো ; বললে, 'না-ই যদি বাঁচবে তবে আজগর সর্দার হাত লাগিয়েছে কেন ? বিষহরি মা মনসার দোয়া, চ্যাংড়াটা এবারের মতো সত্যি প্রাণডা ফিরে পেলো।

বলতে বলতেই সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, ছোঁড়াটা সত্যি চোখ খুলেছে।

জনতা তখন আজগর সর্দারের জয়ধ্বনি করে উঠলো।

যে ছেলে দুটো দাঁতন করতে করতে জঙ্গলে ঢুকে গাছের ডাল এনে দিয়েছিল, এইবার তারা এগিয়ে এলো। বললে, 'সর্দার, তুমি ত' মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে পারো। বিদ্যেটা আমাদের শিখিয়ে দাও না।'

আজগর সর্দার দুই কান আঙুল দিয়ে চেপে ধরে উত্তর দিলে—তোবা, তোবা—ও কথা বলতে নেই।

কেন সর্দার, বলতে নেই কেন ?

আজগর সর্দারের মুখে তখন গর্বের হাসি।

ফিস্-ফিস্ করে উত্তর দিলে—গুরুর নিষেধ আছে। মন্ত্র কাউকে শিখিয়ে দিলে তার গুণ একদম বরবাদ হয়ে যায়। তোমরা জোয়ান আদমী—সে-সব কথা জানবে কি করে ? ত্রিশ বছর গুরুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তবে আমি এই মানুষ জ্যান্ত করার বিদ্যে জেনেছি।

ইতিমধ্যে ছেলেটা উঠে বসেছে।

আজগর সর্দার বললে, 'একবাটি গরম দুধ খাইয়ে দিতে হবে যে। কার কাছে পাওয়া যাবে একবাটি গরম দুধ ?'

নৌকোর মাঝিরাই এগিয়ে এলো এই কাজে। খাল-বিল-নদীপথে ওদের যাওয়া আসা। সাপে কাটা মরা ওরা অনেক দেখেছে। তাই অভিজ্ঞতা ওদের সাধারণ লোকের চাইতে অনেক বেশী।

কার নৌকোতে যেন দুধ ছিল্ ; তোলা উনুনে গরম করে গেলাস ভর্তি করে নিয়ে এলো।

আজগর সর্দার সেই দুধ নিয়ে ধীরে ধীরে ভোম্বলকে খাইয়ে দিতে লাগলো।

আস্তে আস্তে ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠলো ; বোকার মতো ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলো সে—আমি কোথায় ?

আজগর সর্দার হো-হো করে হেসে উঠলো এইবার। সকালবেলাকার নদীর হাওয়ায় তার সাদা দাড়ি নিশানের মতো পত্‌পত করে উড়তে লাগলো।

আজগর আজ খুশীতে ডগমগ। সেই কোন যুগে ওর গুরু বলে দিয়েছে, যেদিন একটি সাপে কাটা মরাকে সে জ্যান্ত করতে পারবে সেদিন পুণ্যির খাতায় মোটা অঙ্ক জমা পড়বে।

ওর মন্ত্র যে ব্যর্থ হয় নি তাতেই ওর আনন্দ। তাই বললে—তুমি ঠিক জায়গায় আছ বাচ্চা। এখানে এসে না আট্‌কালে এতক্ষণ দরিয়া তোমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

ঘাটের মাঝিরা সায় দিয়ে বললে, 'সে-কথা সত্যি সর্দার!'

উৎসাহী লোকেরা ততক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে যে ছোকরাকে সাপে কামড়েছিল, সে ভেলা ধরে ভেসে যাচ্ছিল—ভাগ্যিস এই গঞ্জে এসে আটকে গিয়েছিল, তাই ত' আজগর সর্দার বিষ কাটিয়ে ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আজগর সর্দার জিজ্ঞেস করলে, 'তোর ঘর কোথায় বাচ্চা? কোথা যাবি তুই ?'

ভোম্বল কি উত্তর দিল কিছুই বোঝা গেল না।

আগের রাত্তিরের ঘটনাটা তার চোখে ঠিক ছায়া-ছবির মতো ভেসে উঠলো!

সেই সাহেব-মেমদের নাচ-গানের জলসা, হুল্লোড়, খানাপিনা, আলোর ঝিলিক—

সে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে—মিশ্‌কালো আঁধার রাতে গা ঢেকে।

তারপর সেই বোমা ফাটার শব্দ। মুহূর্ত মধ্যে সে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খাল দিয়ে সাঁতার কেটে আসছিল, হঠাৎ কিসে যেন পায়ে কামড়ালো।

ধীরে ধীরে ওর শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো—ও নেতিয়ে পড়লো, তারপর একটা ভেলাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলো বুঝি।

আর কিছু মনে নেই।

কিন্তু ভোম্বল বেশীক্ষণ জনতার মধ্যে থাকতে চায় না!

বিপদ যে কোন্ দিক থেকে আসে কে বলতে পারে? ক্ষীণকণ্ঠে বললে সে—তা'হলে আমি চলি?

অনেকে বললে—এখন ত' তুমি হাঁটতে পারবে না। কাছাকাছি কোনো নৌকোয় উঠে আরাম করো—বিশ্রাম নাও। শরীরে জোর হলে তবে যাবে।

ঘাটের মাঝিরাও সেই কথায় সায় দিলে।

এমন সময় এক বুড়ো আর বুড়ি সেই গঞ্জের ঘাটে এসে হাজির।

বুড়ো-বুড়ী বললে, 'দেখি দেখি, আমরা আগে দেখে নি!

সবাই পথ ছেড়ে দিলে। এরা দু'জন আবার কে?

ভোম্বলকে দেখে বুড়ী হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই ত' আমার কাতু...

বুড়ো চোখে ভালো দেখতে পায় না। হাত দুটো সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এদ্দিনে ফিরে এলি কাতু?'

কাতু? এই বুড়ো-বুড়ীর হারানো ছেলে বুঝি?

জনতার চোখে-মুখে বিস্ময়!

ভোম্বল ধীরে ধীরে জবাব দিলে—কিন্তু আমি ত' কাতু নই, আমার অন্য নাম।

বুড়ী হাউ-হাউ করে আবার কেঁদে উঠলো—এমন করে লুকোলে কি হবে? তুই আমাদের সেই হারানো কাতু। পাঁচ বছর আগে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি।

জনতার চোখে-মুখে নতুন বিস্ময়! মরা ছেলে জ্যান্ত হল,—আবার মা-বাবাকেও ফিরে পেলো।

আজগর সর্দার একবার ওপর দিকে হাত তুলে বললে, 'খোদা কা মর্জি।'

কিন্তু মুস্কিলে পড়লো ভোম্বল। সেই গাঁই-গুঁই করে আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আপনারা ভুল করছেন। আমি কাতু নই—আমি—'

নাম বলতে গিয়ে থেমে গেল ভোম্বল।

কিন্তু বুড়ী না-ছোড়-বান্দা; বললে, 'তুই আমার কাতু নোস্? কিন্তু চিবুকের

নীচে ওই যে তিল। ওটা তোর জন্মতিল। ওরে তুই মায়ের চোখকে ফাঁকি দিবি ?

বুড়ো বললে, 'না হয় পিঠই বেঁকে গেছে, চোখেই না হয় ছানি পড়েছে,—তাই বলে নিজের ছেলেকে আমি চিন্নতে পারবো না ? ওঠ—চল আমাদের সঙ্গে।

আজগর সর্দ্দার বললে, 'খোদা মেহেরবান্ !'

॥ সতেরো ॥

ভোম্বলের তখন শরীরের অবস্থা এমন নয় যে, বুড়ো-বুড়ীর কথার জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করে। তাই সে ভাবলে, এই সাপের কামড়ের পর তার প্রাণ যখন আবার ফিরে পেয়েছে তখন ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, সে অল্প-বয়েসেই মারা যায়।

হয়ত এই পৃথিবীতে তার করবার জন্য অনেক কাজ আছে।

কিন্তু কি সে কাজ ভোম্বল জানে না !

এক লহমার ভেতর অনেক কিছু ভেবে নিল সে।

এই অজানা-অচেনা অঞ্চলে তার একটা আশ্রয়ের একান্ত দরকার।

বিশেষ করে শরীর যেমন ঝিমিয়ে আছে, মাথা যে রকম ভারী বোধ হচ্ছে, আর পা যে ভাবে টলছে তাতে দু'চার দিন ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে।

আরো একটা কথা হচ্ছে। যে কাজ সে করে এসেছে, তাতে কয়েক দিন লুকিয়ে থাকাই দরকার। বিপদ কখন কোন্ দিক দিয়ে আসে, তা কেউ বলতে পারে না।

কাজেই ভোম্বল যদি এখন একটা আশ্রয় পায়, তা'হলে তার ভালোই হবে।

ভোম্বলের মনে হল—এই বুড়ো-বুড়ীর বেশে স্বয়ং ভগবান যেন তাকে আশ্রয় দিতে এগিয়ে এসেছে।

আশ্রয় নেওয়াই সব চাইতে ভালো। একটা নিরাপদ আশ্রয়—দেহের পক্ষে, মনের পক্ষে আর লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভোম্বলের একান্ত প্রয়োজন।

বুড়ো-বুড়ী এতক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওরা ভাবছিল, সাপের বিষের সেই ঝিম্‌টা এখনো বোধ করি সারা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে।

তাই জনতার দিকে তাকিয়ে বুড়ী বললে, 'তোরা বাছা দু'জন জোয়ান ছেলে আমাদের সঙ্গে আয় না। আমাদের কাতুকে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের বাড়ি বেশী দূরে নয়—এই নদীর কাছেই।

যে দুটি ছেলে জঙ্গলে ঢুকে আজগর সর্দ্দারকে গাছের ডাল এনে দিয়েছিল, তারাই এগিয়ে এলো ; বললে আপনাদের কোনো ভয় নেই। জঙ্গল থেকে যখন গাছের

ডাল যোগাড় করতে পেরেছি, তখন আপনাদের ছেলেকেও পৌঁছে দিতে পারবো। কিন্তু একটা কথা—

বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—কি বাবা, বলো, লজ্জা কোরো না।

ছেলে দুটো চোখ পিট্‌পিট্‌ করে জবাব দিলে—আমাদের কিন্তু পেট ভরে খাইয়ে দিতে হবে। সেই সকাল থেকে আপনার কাতুর জন্যে মেহনত আমাদের কম হয় নি।

বুড়ো এইবার ফোকলা দাঁতে ফিক্‌-ফিক্‌ করে হেসে উঠলো ; বললে, 'সে-কথা আর তোমাদের বলতে হবে না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার বংশধরকে খুঁজে পেলাম তোমাদের দয়ায়। জানো ত' অতিথি হচ্ছে নারায়ণ। তোমরা আমাদের বাড়িতে হাজির হবে আমার কাতুকে নিয়ে। কাজেই তোমরা হচ্ছ আমাদের কাছে নারায়ণ। যতদিন খুশী থাকো না আমাদের বাড়ি।

একটু থেমে বুড়ো আবার বললে, 'তবে শোনো বাছারা, আমার বাড়ির অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয়। ভগবান সবই দিয়েছেন। আমার বাড়ি আছে, পুকুর আছে, গোয়ালভরা গরু আছে। কয়েক শ' বিঘা ধানি জমিও আছে। কিন্তু আমরা চোখ বুজলে কে যে এর ভার নেবে—তাই ভেবে ভেবেই বুড়ো-বুড়ীর চোখের ঘুম চলে গেছে। ভগবানের দয়ায় আজ কাতুকে ফিরে পেলাম—আর আমি কোনো চিন্তা করি নে। তোমরা যাবে আমার সঙ্গে, সে ত' আনন্দেরই কথা। কাতুকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

তখন দুই জোয়ান এগিয়ে এলো। ভোম্বলও ওদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হল। বুড়ো আর বুড়ী আগে চলেছে আর দুই জোয়ান আর ছেলে ভোম্বলকে নিয়ে চলেছে তাদের পিছু পিছু।

বুড়ো-বুড়ীর বাড়ি খুব কাছেই। কাজেই দুই জোয়ানকে বিশেষ কষ্ট করতে হল না।

বুড়ো যা বলেছিল তা' কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলা নয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকেই বোঝা গেল—বেশ বাড়-বাড়ন্ত সংসার। মাঝখানে মস্তবড় উঠোন। পাকা দালান অবশ্য নেই। কিন্তু চারদিকে বড় বড় টিনের ঘর। এক-কোণে গোয়ালঘর, ঢেঁকিশাল, একটু পেছনে অনেকগুলো ধানের গোলা।

উঠোনের এক কোণে পাকা ইন্দারা। ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে গোটা বাড়িটা। যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে রয়েছে চারদিকে।

টিনের ঘরগুলোর সামনেই একটি করে বাগান। তাতে নানা রকম ফুল ফুটে রয়েছে।

বুড়ী উঁচু দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'কাতুকে তোমরা আগে এই খানেই শুইয়ে দাও। তোমরাও বাছা একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি সকলের

আগে গৃহ-দেবতার একটু পূজো করে আসি। তাঁরই অসীম দয়ায় কাতুকে আজ ফিরে পেয়েছি।

বুড়ী যেন ছুটেই ঘরের ভেতর চলে গেল।

বুড়ো বললে, 'হ্যাঁ বাছারা, তোমরা আগে বিশ্রাম করো। তোমাদের অনেক মেহনত গেছে। তারপর আমি তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি।

বুড়ো জোরে জোরে হাঁক দিলে—ওরে ভোলা, কোথায় গিয়ে রইলি তুই? আগে তাড়াতাড়ি এই দিকে আয়।

বুড়োর ডাকে একটি পাকাচুলের মানুষ এসে কাছে দাঁড়ালো। দেখে মনে হল—এই বাড়ির পুরোনো চাকর।

বুড়ো বললে, 'হাঁ করে দেখছিস্ কি? এদ্দিন বাদে আজ ভগবানের দয়ায় আমার কাতুকে ফিয়ে পেয়েছি। আর এই দুটি ছেলে ওকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছে। পুকুরে জাল ফেলতে হবে,—ভালো মাছ তুলতে হবে। গোয়াল থেকে দুধের যোগাড় কর। অতিথি নারায়ণ। ওদের পরমান্ন খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া ওবেলা সত্যনারায়ণের পূজো হবে আমাদের বাড়িতে। পাড়ার সবাইকে বলে আয়।

বুড়ো যে কি করবে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

ভোলা এতক্ষণ মন দিয়ে কর্তার সব কথা শুনলে; তারপর দু'পা এগিয়ে এসে কর্তার হুকুম তামিল করবার জন্যই যেন তাড়াতাড়ি বাড়ির কোন্ দিকে চলে গেল।

প্রতিবেশীদের আর খবর দিতে হল না। ছেলে-বুড়ো-বৌঝির দল যেন কাক-পক্ষীর মুখে সংবাদ পেয়ে দলে দলে এসে গোটা উঠোনটাকে ভর্তি করে ফেললে।

এতদিন তারা অনেকে কাতুর নামই শুনেছে—তাকে চোখে দেখে নি কখনো।

সবাই এগিয়ে এসেছে কাতুকে দেখবার জন্য। পাড়াগাঁয়ে এই জাতীয় মজাদার ঘটনা হামেশা কিন্তু ঘটে না।

একে ছেলেকে খুঁজে পাওয়া গেছে—সেইটেই একটা যথেষ্ট উত্তেজনামূলক ঘটনা। তারপর যখন জানা গেল, এই ছেলেটা সাপের কামড়ে মরেই গিয়েছিল, আজগর সর্দার ঝাড়-ফুক করে ওকে বাঁচিয়েছে, তখন লোক ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল হয়ে উঠলো।

একটি বুড়ী এগিয়ে এল লাঠি ঠুক্-ঠুক্ করতে করতে।

সে ভোম্বলের কাছে এসে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ অবাক হয়ে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বাড়ীর কর্তাকে ডেকে বললে, 'ও জনাদ্দন, এ তুমি কাদের বাছাকে ঘরে তুলে নিয়ে এলে? এ ত' আমাদের কাতু নয়!

এমন একটি সুন্দর নাটকের মাঝখানে যদি যবনিকা পড়ে যায় তবে কার ভালো লাগে ? বুড়ীর কথা শুনে অধিকাংশ লোক হৈ-হৈ করে উঠলো।

ওরা বললে, 'হ্যাঁ, বিন্দে পিসির যেমন কাণ্ড! বাপ-মা বলছে ও কাতু। আর উনি এলেন ফোপর দালালি করতে!'

আসল কারণটা হচ্ছে, বুড়ো-বুড়ীর অনেক টাকা। আজ যখন কাতুকে পাওয়া গেছে, তখন প্রতিবেশীদের ভালো রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হবেই। মাঝখান থেকে বিন্দে পিসি এসে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে—এই ব্যাপারটা উপস্থিত অনেকেরই পছন্দ হল না।

দু'একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'বিন্দে পিসি,তোমার চোখে ছানি পড়েছে, আগে ছানিটা ভালো করে কাটিয়ে এসো।'

আর একজন টিপ্পনী কাটলে—চশমা না হলে ওকে চিনবে কি করে বিন্দে পিসি ?

বিন্দে পিসি তখন আমৃতা-আমৃতা করতে থাকে ; বলে—আমার কিন্তু মনে হয় ও আমাদের কাতু নয়।

এমন সময় একটি ছেলে নাচতে নাচতে এসে উঠোনে ঢুকল। হাতে তার ঘুড়ি-লাটাই। ছেলেটি দেখতে অনেকটা ভোম্বলের বয়েসী।

সেই ছেলেটিকে দেখে সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো—এই ত পিন্টু এসেছে!

—পিন্‌টু কে ? পিন্টু কে ?

—পিন্টু হচ্ছে কাতুর খেলার সাথী। ছেলেবেলায় ওরা একসঙ্গে খেলতো যে!

তখন সবাই পিন্টুকে এগিয়ে দিলে সামনে।

পিন্টু নিশ্চয়ই তার খেলার সাথীকে চিনতে পারবে।

ইতিমধ্যে বুড়ী গৃহদেবতার পূজো সেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো ; বললে, 'আয় পিন্টু আয়। দেখবি আয় তোর খেলার সাথী কাতু আজ ফিরে এসেছে।'

সবাই উৎসুক হয়ে উঠলো পিন্‌টু কী বলে শুনতে!

ছোট ছেলে হলে কি হবে ? পিন্‌টু চট্‌ করে বুঝে নিলে—তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে। সে যদি বলে এই ছেলেটা কাতু নয়, তা'হলে এক মুহূর্তে এই আসর একেবারে ভেঙে যাবে। আর যদি বলে, এই ছেলেই তার খেলার সাথী কাতু, তা'হলে পিন্‌টুর আদর হাজার গুণ বেড়ে যাবে। পিন্‌টুর জন্য আসবে নানা রকমের খেলনা। রোজ এই বাড়িতে খেলার জন্য ডাক আসবে। মিলবে নানা জাতীয় মজাদার খাবার-দাবার।

চালাক ছেলে পিন্‌টু এক মুহূর্তের ভেতর সব কিছু ভেবে নিলে।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে আসছে দাওয়ার দিকে। সবাই তাকে পথ করে দিচ্ছে।

আজ সত্যি পিন্‌টুর সম্মান সব চাইতে বেশী। সে শুধু আজ পাড়ার পিন্‌টু নয়—সোজা কথায় আজ সে বিচারক!

পিন্‌টু আরো এগিয়ে এসে ভোম্বলের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল; তারপর বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই ত আমার খেলার সাথী কাতু।'

জনতা সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠল। বুড়ো তখন সবাইকে শুনিয়ে বললে, 'তোমরা ভাই সবাই আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসো। আজ আমি সত্যনারায়ণের পূজো দেবো। আজ আমার কাতু ফিরে এসেছে। আজ আমার কি আনন্দ!

হঠাৎ উঠোনের এক কোণ থেকে হেঁড়ে গলায় একটা চীৎকার শোনা গেল—না—না!!

সবাই সেই দিকে ফিরে তাকালে। পেয়ারাগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ষণ্ডামার্কা ছেলে। রাগে তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

বুড়ো চীৎকার করে উঠলো—বঙ্কা, তুই আবার আমার বাড়িতে ঢুকেছিস্?

বঙ্কা জবাব দিলে, 'ঢুকবো না? তুমি চোখ বুজলে, এ বাড়ি ত আমার। আমি তোমার ভাইপো, আজ আমাকে বঞ্চিত করে তুমি একটা পথের কুকুরকে কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে? আবার বলছ কিনা সে-ই তোমার কাতু! অমি বলছি তোমাদের কাতু মরে গেছে। বিন্দে পিসিও বলেছে, ও আমাদের কাতু নয়! তবু তুমি জোর করে জাহির করছ, ও তোমাদের কাতু!'

বুড়ী দাওয়া থেকে চীৎকার করে উঠলো—হ্যাঁ, আমি মা। আমি বলছি ও আমাদের কাতু।

বঙ্কা সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—ওই পথের কুকুরকে আমি খুন করবো!

॥ আঠারো ॥

বঙ্কা ছোঁড়া যতই ভয় দেখিয়ে যাক—বুড়ো-বুড়ীর কিন্তু আদরের সীমা নেই!

আর হবেই বা না কেন? হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছে, আর যে ছেলে কি না বংশের একমাত্র দুলাল—শিবরাত্রির শলতে! বাড়িতে যদি আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে থাকতো তা'হলে না হয় কথা ছিল।

এই বাড়ি-ঘর দোর, ক্ষেত-খামার, গোয়ালভর্তি দুধোলো গাই, পুকুরভর্তি মাছ—কে দেখবে, কে খাবে এসব?

বুড়ো-বুড়ী চোখ বুজলেই ত' সাত ভূতে এসে মচ্ছব লাগিয়ে দেবে।

ওই বঙ্কা ছোঁড়াটা তার ভেতরে একজন। উঠতে-বসতে সে কেবলি বুড়ো-বুড়ীকে শাসাচ্ছে। এখন যখন নদীর ধারে কাতুকে পাওয়া গেল তখন বুড়ো-বুড়ী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

সেই সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বললো বঙ্কা ছোঁড়ার। সে পাড়ায় সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো, 'ও কেন কাতু হতে যাবে? ও একটা পথের কুকুর! আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যই একটা সাজানো ছেলেকে বাড়িতে এনে হাজির করেছে। ওই বুড়ো-বুড়ী কি কম শয়তান? আমি ওই তিনটাকেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করবো।

বঙ্কা ছোঁড়ার কথা শুনে পাড়ার লোকে ভারী মজা পায়।

দোকানের মুদী, মিষ্টির দোকানের হালুইকর, ঘাটের মাঝি—সবাই ওকে ডাকে; ওকে চটিয়ে দিয়ে মজার মজার কথা শোনে।

পাড়ার মাতব্বরেরা, কিন্তু বঙ্কা ছোঁড়াকে বেশী পাত্তা দেয় না। তার চাইতে বুড়ো-বুড়ীকে তোয়াজ করে চললে লাভ বেশী।

হারানো রতন খুঁজে পাওয়া গেছে বলে বুড়ো-বুড়ী পাড়ার সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে একদিন খাওয়াবে। ভুরিভোজের আশায় সবাই খুশী।

বুড়ো-বুড়ীর ঘরে যেমনি প্রাচুর্য আছে, ঠিক তেমনি দশজনকে খাওয়াতেও তারা ভালোবাসে।

এখন ত' সেই বুড়ো-বুড়ীর আর আনন্দের সীমা নেই। তাদের হারানিধি ফিরে পেয়েছে। বুক ভরেছে বুড়ো-বুড়ীর। দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে মানত করছে। পাড়ার দশজনকে এই ত' পেট পুরে খাওয়াবার সময়।

সব চাইতে খুশী হয়েছে পিন্‌টু এ বাড়ীতে তার আদর অনেকখানি বেড়ে গেছে। উঠোন ভর্তি লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই পিন্‌টুই ত' বলেছে—ও ছেলে কাতু ছাড়া আর কেউ নয়। পিন্‌টুই ত' ওর খেলার সাথী ছিল।

পিন্‌টু যদি বলে তা'হলে সবাই সে-কথা বেদবাক্যি বলে মেনে নেবে।

তাই ত পিন্‌টুর আদর এ বাড়িতে এতখানি বেড়ে গেছে।

পিন্‌টুর জন্য নতুন ধুতি-জামা এসেছে, নানা রকম খেলনা এসেছে।

বুড়ো-বুড়ী তাদের কাতুর জন্য যা-যা কিনে আনছে, তার অর্দ্ধেক ভাগ পাচ্ছে ওর খেলার সাথী পিন্‌টু।

পিন্‌টু ত আজকাল আর নিজের বাড়ী থাকে না—দিনরাত এই বাড়ীতেই তার আনাগোনা। এলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে ক্ষীরের সাজ, চন্দ্রপুলী, ছানার পায়েস এনে ধরে।

সোনা মুখ করে পিন্‌টু সব সাবাড় করে দেয়। মনে মনে ভাবে, ভাগ্যিস কাতু ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি তার ভাগ্যটাও ফিরে গেছে।

এদিকে বুড়ো-বুড়ী কাতুকে কোনো কথাই বলতে দেয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি শুধুই—এটা খাও, ওটা খাও। নইলে শরীর সারবে কি করে ?

শরীরে কি আর কিছু আছে ? এমনিতেই পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দেহটা ত' আধখানা হয়ে গেছে, তার ওপর আবার বিষধর সাপের কামড় ৮ ভাগ্যিস মা মনসার দয়া হয়েছিল, তাই ছেলেটা প্রাণে বেঁচে গেল। কাজেই ভালো করে সেবা-যত্ন না করলে শরীর সারবে কেন ?

আর সেজন্য এক পায়ের ওপর খাড়া রয়েছে পুরোনো চাকর ভোলা। ভোলা কিন্তু কাতুকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। সকাল থেকেই তার সেবা-যত্ন সুরু হয়ে যায়। ভোরের রোদ্দুরে নাকি শরীর তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। তাই ভোলা সকালেই কাতুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসে।

ওদের ঘিরে সেখানে এক আসর বসে যায়। মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। কাতুকে যে কত কথা জিজ্ঞেস করে সবাই ঃ

—কেন বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে ?

—তোমার দুঃখ কিসের শুনি ?

—বুড়ো মা-বাপের মনে কষ্ট দিতে আছে ?

—এত দিন কোথায় কোথায় ঘুরলে শুনি ?

—তোমায় সাপে কামড়ালো কি করে ?

এমনি হাজার জনের হাজার প্রশ্ন। ভোলা কিন্তু কাতুকে কোনো কথারই জবাব দিতে দেয় না, বানিয়ে বানিয়ে নিজেই সব কথার উত্তর দেয়। এ ব্যাপারে বাহাদুরী দিতে হয় ভোলাকে। চমৎকার সব গল্প বানাতে পারে সে।

লোকে ভোলার মুখে মজার মজার কথা শুনে একেবারে তাজ্জব বনে যায়।

বঙ্কা ছোঁড়া আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করে ঘোরে। কিন্তু এত লোকের মাঝে কিছুই করতে পারে না ; শুধু আপন মনে বিড়বিড় করে আর বলে—রোসো, তোমাদের ঘুঘুর‌্বাসা আমি ভাঙছি—

ভোলা ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে বলে—ওই এক বিষধর সাপ ; যাকে কামড়াবে, তার আর রক্ষা নেই।

ভোলার সব কাজ এখন কাতুকে নিয়ে। নদীর ধারে রোদ পোয়ানো হয়ে গেলে, বাড়ী ফিরে কাতুকে গরম দুধ আর সন্দেশ খাওয়ায়।

কাতু মাছের ঝোল-ভাত খাবে বলে ভোলা প্রত্যহ টাট্‌কা কৈমাছ আর মাগুর মাছ ধরে নিয়ে আসে।

বুড়ী মাছের ঝোল ভাত রান্না করে।

ভোলা অনেকক্ষণ ধরে কাতুকে তেল মাখিয়ে দেয়। কবরেজ মশাই কি যেন

তেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এক ঘণ্টা ধরে সেই তেল রোদ্দুরে বসে মালিশ করতে হয়।

তারপর স্নান করে দুপুরবেলার খাওয়া। খাওয়ার পরে লম্বা একটা ঘুম।

বিকেলে ঘরে বসেই পিন্‌টুর সঙ্গে নানা রকম খেলা চলে কাতুর। ছানা আর ফল খেতে হয় এক থালা ভর্তি।

কয়েক দিনের ভেতরেই কাতুর শরীরটা দিব্যি ভালো হয়ে গেল।

অনিয়মে আর অত্যাচারে—তার ওপর সাপের কামড়ে ওর শররীটা সত্যি ভেঙে পড়েছিল। এখন ভোলার সেবা-যত্নে ওর রোগ-বালাই সব দূর হয়ে গেল।

কিন্তু যে কাতু নয়, যে আসলে ভোম্বল—তার চোখে কিন্তু ঘুম নেই।

এখানে কোনো খবরের কাগজ আসে না যে, বাইরের জগতের কোনো খবর পাওয়া যাবে!

সেই সাহেব ব্যাটার যে কী ঘটলো, সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে ধর-পাকড় কিছু হলো কিনা, এই বুড়ো-বুড়ীর স্নেহের নীড়ের মধ্যে বসে ভোম্বল সে সব ব্যাপারের কোনো খবরই রাখতে পারে না।

একদিন ভোম্বল ভোলাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, ভোলাদা, এখানে কোনো খবরের কাগজ পাওয়া যায় না?

শুনে ভোলা মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল—না না, এখানে তুমি খবরের কাগজ কোথায় পাবে? হুঁ! বুঝতে পেরেছি। দেহটা একটু ভালো হয়েছে কিনা, তাই মনটা আবার উড়ু-উড়ু সুরু করেছে! সেটি হবে না ভাই,—সে-কথা আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি।

আর একদিন ভোম্বল পিন্‌টুকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললে—আচ্ছা ভাই পিন্‌টু, এখানে খবরের কাগজ আসে না?

কাতুর মুখে সেই কথা শুনে পিন্‌টু শিউরে উঠে বলেছিল—ওরে বাবা! আমি খবরের কাগজ আনতে পারবো না। ভোলাদা আমায় বারণ করে দিয়েছে।

ভোম্বল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে—কেন? খবরের কাগজ পড়লে কি হয়?

পিন্‌টু চোখ দুটো বড় বড় করে জবাব দিয়েছে—হুঁ! আমি বুঝি জানি না ভেবেছ? ভোলাদা আমাকে সব বলেছে।

—কি বলেছে শুনি?

—ভোলাদা বলেছে, খবরের কাগজ পড়লেই তোমার মন উড়ু-উড়ু করবে। আর একদিন তুমি হঠাৎ শিকলি কেটে পালিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌টুর হাসি দেখে কে!

ও যে সব কিছু জানে—সে-কথা বোঝাতে পেরে পিন্‌টু ভারী খুশী হয়ে উঠল।

ভোম্বল বুঝতে পারলে, পিন্‌টু সব সময় তাকে চোখে-চোখে রাখে।

আর শুধুই কি পিন্‌টু ?

ভোলাদা নিজেই ওর ওপর কড়া নজর রেখেছে। এতটুকু চোখের আড়াল হতে দেয় না।

ভোম্বল আপন মনে বসে আকাশ পাতাল ভাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায় না।

সেদিন অমাবস্যার মিশ্‌কালো আঁধার রাত। সন্ধ্যে থেকে টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে।

পিন্‌টু ভোম্বলের সঙ্গে বসে খানিকটা লুডো খেললো। কিন্তু বারে বারেই ভোম্বল হেরে যেতে লাগল।

পিন্‌টু বললে, 'আজ তোর খেলায় মন নেই কাতু! নইলে তুই এমন করে কয়েক বার হেরে যাস্‌ ? থাক খেলা, আয় গল্পের বই পড়ি।'

দু'জনে মিলে শিকার-কাহিনী পড়তে লাগল।

এরই মধ্যে ভোলাদা দুইবার এসে ওদের দেখে গেছে। হাজার কাজের মধ্যেও পাহারা দেওয়ার কথাটা ভোলাদা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না।

আর এক ফাঁকে এসে বুড়ী ওদের দু'জনকে ডেকে নিয়ে গেল। রাত্তিরের খাবার শেষ করে দিলেই নিশ্চিন্ত!

আজকাল পিন্‌টু আর কাতু এক ঘরেই ঘুমোয়। বাইরের দাওয়ায় কম্বল পেতে ভোলাদা দরজা আগলে পড়ে থাকে। পালিয়ে যাবার কোনো পথই খোলা থাকে না।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। বেশ একটু ঠাণ্ডাও পড়েছে।

ভোলাদা শোবার আগে ওদের দু'জনের গায়ে দুটি পাতলা চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেল।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে পাশাপাশি দুটি ছেলে। রাত্রি তখন গভীর। দূরে থানার ঘণ্টায় দুটো বাজলো।

এই সময় ওদের জানালার ধারে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল।

মূর্তিটির সারা দেহ কালো আলোয়ানে ঢাকা। সেই মূর্তিটি এক পা-দু পা করে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো; তারপর সেই জানালার শিক ধরে উঁচু হয়ে উঠলো।

কালো আলোয়ানটা সরে যেতে দেখা গেল সেই মূর্তিটির হাতে একটি চক্‌চকে ধারালো ছোরা!

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বঙ্কাই চুপি চুপি এসেছে কাতুকে হত্যা করতে,—ওর পথের কাঁটা দূর করতে !

এদিকে কাতু আর পিন্‌টু অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তারা দুটিতে এই ঘটনার কিছুই জানতে পারছে না।

যখন বঙ্কা জানালার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে সেই ধারালো ছোরাটা কাতুর বুকে বসিয়ে দিতে গেছে —সেই সময় হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো।

কে যেন সেই মিশ্‌কালো আঁধারের ভেতর ঠিক বঙ্কার পেছন্ থেকে ওর পা দুটো আচমকা টেনে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। জানালার শিকের গায়ে ঐ ছোরাটা গিয়ে আছড়ে পড়তে একটা শব্দ হল।

সেই শব্দে ভোম্বলের ঘুম ভেঙে গেল। সে চট্‌ করে উঠে বসলো বিছানায়।

জানালার দিকে তাকিয়ে মৃদু আলোতে ভোম্বল দেখলে,—বঙ্কা ছুটে পালাচ্ছে, আর সেই জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জীবনদা।

ভোম্বল আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, 'এই যে জীবনদা !'

জীবনদা ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলে উঠলেন—চুপ ! এখন আর কথাটি নয়—

'বন্দরের কাজ হলো শেষ'
যাত্রা করো যাত্রীদল,—এসেছে আদেশ।'

ঘাটে নৌকো বাঁধা ! চুপি চুপি খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে আয়। তারপর নৌকোয় বসে সব কথা হবে।

ভোম্বল পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভোম্বল দেখলে—সেখানে তারার দল ঝিকিমিকি করে জ্বলছে।

ভোম্বলের মনে হল, অনেকদিন কারাগারে বন্দী থেকে সে এই মাত্র মুক্তিলাভ করলো !

ছুটে এসে সে জীবনদার ডান হাতখানি চেপে ধরলো।

॥ উনিশ ॥

নৌকোয় উঠে জীবনদা নিজেই হালে গিয়ে বসলেন।

ভোম্বল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এ কি জীবনদা, এবার আপনার সাথী কেউ নেই? একা একা নৌকো ভাসিয়েছেন যে?

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর করলেন—সাথী? তা এই ত' তুই পথের সাথী জুটে গেলি। তারপর মৃদুকণ্ঠে আপন মনেই উচ্চারণ করলেন—

'—হায় রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

বিপ্লবীর কোনো সাথী থাকতে নেই। প্রতি মুহূর্তে সে পথের সাথী বদল করে। নইলে যে তাকে ঘর বাঁধার নেশায় পায়!

ভোম্বল বললো, 'জীবনদা, এবার কিন্তু আপনি একেবারে দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। আমি আর থৈ পাচ্ছি না। বাঘের মুখ থেকে ত' বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন! এইবার কি করতে হবে আমায় বলুন।

জীবনদা তেমনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন; বললেন, 'বাঘের মুখ থেকে তোকে বার করে নিয়ে এলাম, এইবার সিংহের মুখে ঢুকতে হবে বলে।

ভোম্বল অধৈর্য্য হয়ে উত্তর দিলে, 'আপনি কিন্তু আবার ধাঁধার সৃষ্টি করছেন জীবনদা। সহজ সরল ভাষায় বলুন, এবার আমায় কি করতে হবে?

জীবনদা জবাব দিলেন, 'শোন ভোম্বল, এবার তোকে আবার অভিনয় করতে হবে।

তারপর গলা খাটো করে জীবনদা বললেন, 'আচ্ছা ভোম্বল, একে একে তোকে দিয়ে ত' আমি অনেক পার্টই করলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোর ভোম্বল নামটাই টিকে গেল দেখছি। তোর বাপ-মা যে তোর কি নাম রেখেছিলেন সে-কথা বোধ করি তুই-ও ভুলে গেছিস্!

ভোম্বল খুশী হয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ জীবনদা, এটা খুব খাঁটি কথা বলেছেন। বাপ-মায়ের কথা ভুলেছি, তাঁদের দেওয়া নামটা হারিয়ে ফেলেছি, আজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কোথায়ও আমার নেই। আপনি শুধু ভালোবেসে আমায় ঘাটে-ঘাটে ফিরি করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! জানি না—ছ্যাতলা-পড়া আর পোকায়-খাওয়া এই সওদা কোন হাটে বিকোবে।

জীবনদা কিন্তু ওর কথা শুনে ভারী মজা পেলেন। তাই আপন মনেই আবৃত্তি করে উঠলেন—

'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান ?
কোথায় রে তোর স্থান ?'

তবে শোন ভোম্বল, এবার তোকে এক ধনীর হাটে বিক্রি করতে নিয়ে চলেছি—

ভোম্বল যেন জীবনদার কথায় সাত হাত জলের তলায় পড়ে গেল! বললো, 'সব কথা খোলসা করে বলুন জীবনদা,আমি যে কোনো মতেই অগাধ জলে থৈ পাচ্ছি না।

জীবনদা যেন মজা করে সুতোর গিট খুলছেন! খানিকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর মুখ টিপে রহস্য-উপন্যাসের গোয়েন্দার মতো বললেন' 'হুঁ হুঁ! এবার তোকে দিয়ে আমরা একটা দরুণ প্রতিশোধ নেবো।'

ভোম্বলের মগজে যেন অনেকগুলো জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ঢুকে পড়েছে। জীবনদার কোনো কথারই কোনো হদিস পাচ্ছে না। সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে জীবনদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো; তারপর জিজ্ঞেস করলো—'ধনীর হাটে বিক্রি' আবার 'দারুণ প্রতিশোধ'—এসবের মানে কি বলুন ত' জীবনদা ?

জীবনদা চোখ মট্‌কে বললেন, 'আস্তে আস্তে কথা ভাঙছি। রহস্যের শেষ কথাটা যদি আগেই জানা হয়ে গেল, তা'হলে গল্পের কৌতূহল আর রইলো কোথায় ? জানবি—সব কথা জানবি। তবে ধীরে ধীরে সুতোর গিট খুলতে হবে ত'!

—আচ্ছা, তা'হলে আপনি গিট খুলুন। হতাশার সুরে বললো ভোম্বল।

দুই পা পাটাতনের ওপর মেলে দিয়ে জীবনদা এইবার আরাম করে বসলেন। তারপর একটা হাই তুলে বললেন—কাল সারাটা রাত মশার কামড়ে ভালো ঘুম হয় নি। তোদের ওই ভোলা চাকরটা কিছুতে ঘুমোয়নি। সারা রাত শুধু বারে বারে উঠছে, আর খুটখাট করছে! তারপর ও যদি কোনো মতে ঘুমোলো ত' এলো আবার বঙ্কা ছোঁড়া! তার আবার হাতে ধারালো ছোরা

ভোম্বল শিউরে উঠে বললো—একেবারে ডাকাত ছেলে। ওঁর ধারণা—ওর সম্পত্তি নিয়ে আমি ওখানে গ্যাঁট হয়ে বসে যাবো। তাই একেবারে ছুটে এসেছিল। ভাগ্যিস আপনি সময়মতো এসে পড়েছিলেন। নইলে ওই বঙ্কা ছোঁড়া আমার বুকে ছোরা বসিয়ে দিত!

জীবনদা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উত্তর দিলেন' 'হুঁ! ভারী ত' সম্পত্তি ওই বুড়ো-বুড়ীর,—তাই নিয়ে এত কাণ্ড! এইবার তোকে আমি লাখপতি করে দিচ্ছি!

ভোম্বল নড়ে চড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, ব্যাপার কি জীবনদা, বলুন ত'। সেই তখন থেকে খালি ধানাই-পানাই করছেন! আসল কথার ধারে কাছেও যাচ্ছেন না!

—তা'হলে এইবার আসল কথা শোন।

জীবনদা আসল গল্পের ঝুলি খুলে বসলেন ঃ

এক রায় বাহাদুর আছে, তার লাখ লাখ টাকা। কিন্তু টাকা ভোগ করবার কেউ নেই তিন কুলে।

এই রায় বাহাদুর সারা জীবন ধরে বহু বিপ্লবীর সর্ব্বনাশ করেছে, আর বহু স্বদেশ-প্রেমিককে ধরিয়ে দিয়েছে বৃটিশের হাতে। লোকটার ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে না ?

—কি করে প্রতিশোধ নেবেন ?—জিজ্ঞেস করলো ভোম্বল।

জীবনদা জবাব দিলেন, 'এই যখের ধন নিয়ে রায় বাহাদুর মহা বিপদে পড়ে গেছে ! না পারছে গিলতে, আর না পারছে ওগড়াতে। তাই বুড়ো মরবার আগে ঠিক করেছে—যাতে সাত-ভূতে তার টাকা লুটে-পুটে খেতে না পারে সেই জন্য পুষ্যিপুত্তুর নেবে ! একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোকে এইবার এই পুষ্যিপুত্তুরের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

ভোম্বল বললো, 'কিন্তু আমি যে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ছেলে, সেটা প্রমাণ করবে কে ?

জীবনদা বিজ্ঞের হাসি হাসলেন—জানিস্ ত', আমাদের বিপ্লবী দল চারদিকে ছড়িয়ে আছে। যে শিরোমণি ঠাকুরের ওপর রায় বাহাদুরের অগাধ বিশ্বাস, তিনি যে বিপ্লবীদেরও শিরোমণি—সেই কথা ওই বুড়ো রায় বাহাদুর জানবে কি করে ?

এই শিরোমণি ঠাকুরই তোকে নিয়ে যাবেন যাত্রার আসরে। তারপর তুই নেচে গেয়ে, 'অ্যাক্টো' করে যাত্রা জমিয়ে তুলতে পারবি নে ?

গম্ভীরভাবে ভোম্বল জবাব দিলে, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।

জীবনদা ভোম্বলের মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললেন, 'ওরে দুষ্টু, নিজের দর বাড়াচ্ছিস্ বুঝি ? জানিস্, ওই লাখ-লাখ টাকা হাতে এলে বিপ্লবী দলের কাজ কত সহজে এগিয়ে যাবে ?

ভোম্বল অবিশ্বাসের হাসি হেসে উত্তর দিলে—কিন্তু ওই ঝুনো রায় বাহাদুর যে আমাকেই পুষ্যিপুত্তুর বলে বেছে নেবে তার কি কিছু ঠিক আছে ? সারা জীবন লোক চরিয়েছে —নিশ্চয়ই ধড়িবাজ হবে !

জীবনদা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আরে বোকচন্দর, তা'হলে আমাদের শিরোমণি ঠাকুর রয়েছেন কি করতে ? সে-সব ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুই শুধু তোর 'পার্টটা' ভালো করে অভিনয় করবি যেন কোনো কিছুতে আটকে না যাস্।

ভোম্বল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'অঙ্ক কষতে দেবে না ত' ? তা'হলে আমি কিন্তু গোল্লা পাবো।

—আরে না না, অঙ্ক কষতে দেবে কেন ?

—ইংরজী ট্রান্‌শ্লেশন করতে বলবে না ত' ?

—তা' বলতে পারে।

—তা হলে কিন্তু আমি রায় বাহাদুরী ইংরেজী বলব! যেমন—I saw a leg-no -pond. আমি একটি পানা পুকুর দেখলাম।

—হুঁ! তা'হলে আর পুষ্যিপুত্তুর হতে হবে না!

এই বলে দু'জনে হো-হো করে হেসে উঠলো।

শিরোমণি ঠাকুর ভালো করে বাজিয়ে নিলেন ভোম্বলকে। তারপর বললেন—বেশ চালাক-চতুর ছেলে, ওকে দিয়েই কাজ হবে কিন্তু একটা কাজ তোমায় করতে হবে বাপু।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলো, 'কি কাজ শিরোমণি ঠাকুর ?'

শিরোমণি ঠাকুর অনেকক্ষণ ভোম্বলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, এই রায় বাহাদুরের চোখে ধূলো দিতে তুমি পারবে। কিন্তু তোমাকে ব্রাহ্মণের ছেলে সেজে যেতে হবে আমার সঙ্গে। পৈতে একটা ঝুলিয়ে দেবো তোমার গলায়, সেজন্য কোনো ভাবনা নেই। তবে—

—তবে কি ?

—গায়ত্রী মন্ত্র তোমায় মুখস্থ করে নিতে হবে। বুড়ো মহা ধড়িবাজ। কাজেই গায়ত্রী মন্ত্র জিজ্ঞেস করে বসতে পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে, অথচ গায়ত্রী জানো না —এ ত' আর হতে পারে না! কাজেই ওটা তোমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে। আর সব ক্রিয়া-কর্ম আমি তোমায় মুখে মুখে শিখিয়ে দেবো। কেমন ?

সুতরাং ভোম্বলকে গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করে নিতে হল। আর ব্রাহ্মণের ছেলের অন্যান্য নিত্যকর্ম শিরোমণি ঠাকুরের কাছ থেকে জেনে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

শিরোমণি ঠাকুর একদিন ভোম্বলকে পৈতে ঝুলিয়ে, কপালে ফোঁটা কেটে, তারপর একটি শিখা তৈরী করিয়ে—রায় বাহাদুরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

ভোম্বলকে দেখে রায় বাহাদুর বললেন, 'বাঃ বাঃ এ যে একেবারে সর্বসুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তান! একে কোথা থেকে যোগাড় করলেন শিরোমণি ঠাকুর ?

শিরোমণি ঠাকুর উত্তর দিলেন—আজ্ঞে মা-বাপের সঙ্গে ছেলেটি কাশীধামে ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের দু'জনের মৃত্যু হওয়ায় ছেলেটি অনাথ হয়ে পড়ে। তাই আমি ওকে আমার কাছেই নিয়ে এসেছি। ওর মা-বাবা আমারই যজমান ছিল কিনা! এ আমার একটা গুরু দায়িত্ব।

রায় বাহাদুর শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ; বললেন, 'আমার জন্যই বিশ্বনাথ ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

উত্তেজনায় রায় বাহাদুর ঘন ঘন কাশতে লাগলেন। তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল।

শিরোমণি ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, 'এ সময়ে আপনি এত কথা বলবেন না। একটু বিশ্রাম করুন।

রায় বাহাদুর কিন্তু থামলেন না ; আবার শিরোমণি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা শিরোমণি ঠাকুর, এই ব্রাহ্মণ-পুত্রের নাম কি ?

শিরোমণি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তন দিলেন—ওর নাম বিশ্ববন্ধু। বড় বিনয়ী, বড় ভালো ছেলে। জীবনে সত্যিকারের উন্নতি করবে।

উত্তেজনায় রায় বাহাদুর বিছানার ওপর উঠে বসলেন ; বললেন, 'আচ্ছা শিরোমণি ঠাকুর, আপনি ত' জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী। শ্রীমানের হস্তরেখার বিচার করেছেন কি ?'

শিরোমণি উত্তর দিলেন—না রায় বাহাদুর, সেটা ত' দেখা হয় নি।

রায় বাহাদুর ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন—আপনি আগে দেখুন শিরোমণি ঠাকুর, ওর হস্তরেখায় আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ?

শিরোমণি ঠাকুর নিজের চশমাটা বের করে চোখে লাগিয়ে নিলেন। তারপর ভোম্বলের হাতখানি টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

রায় বাহাদুর উত্তেজনায় যেন কাঁপছিলেন। তাঁর হাঁপানির টানও বেশ বেড়ে উঠেছিল।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে রায় বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন—শিরোমণি ঠাকুর, 'আপনি কি দেখছেন শীগ্‌গির আমায় বলুন। আমাকে আর এমন উৎকণ্ঠায় রাখবেন না।'

শিরোমণি ঠাকুর বেশ অভিনয় করতে পারেন দেখা গেল। চশমাটা চোখের ওপর ভালো করে বসিয়ে ভোম্বলের হাতটা উল্টেপাল্টে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'হুঁ। এতদিন ত' ওর হাত দেখি নি। 'এদিকে অনাথ বালকের রেখা রয়েছে ; ওদিকে আবার রাজযোগ। অদ্ভুত হাত—রায় বাহাদুর !'

রায় বাহাদুর চীৎকার করে উঠে বললেন, 'আর আমার মনে দ্বিধা নেই শিরোমণি ঠাকুর ! বিশ্বনাথ বিশ্ববন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি সব ব্যবস্থা করুন। আমি এই সুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকেই পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করবো।···ওরে কে কোথায় আছিস্, আমার নায়েবকে ডাক। শাস্ত্রানুসারে আমি এই দত্তকপুত্র গ্রহণ উৎসব

সম্পন্ন করবো। প্রচুর লোকজন খাওয়াবো। কাঞ্চন আর সবৎসা ধেনু ব্রাহ্মণদের দান করবো।...শিরোমণি ঠাকুর, আপনি পাঁজি দেখে শুভদিন ঠিক করুন।

অতি আনন্দে আর উত্তেজনায় রায় বাহাত্বর বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়লেন।

শিরোমণি ঠাকুর ভাবছিলেন, এখুনি যদি বুড়ো টেঁসে যায়, তা'হলে ত' সব মাটি!

॥ বিশ ॥

কোনো রকমে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেন রায় বাহাত্বর। অনেক আত্মীয়-স্বজন এসে ভীড় করেছে বাড়িতে। তারা যেন রায় বাহাত্বরের অসুখের খবর পেয়েই নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে এসে পড়েছে এই রকম একটা ভাব দেখাচ্ছে সবাই।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সকলেই মনে প্রাণে কামনা করছে—পুস্যিপুত্র নেবার আগেই রায় বাহাত্বরের মৃত্যু হোক। তা'হলেই তারা দশজনে মিলে কালনেমীর লঙ্কাভাগ করে নিতে পারে—রায় বাহাত্বরের এই বিরাট সম্পত্তিকে।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের মুখে ছাই দিয়ে রায় বাহাত্বর আবার দিব্যি খাড়া হয়ে উঠলেন।

খাস খানসামা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভালো অম্বুরী তামাক সেজে রায় বাহাত্বরের হাতে নলটা তুলে ধরলে। খুশী হয়ে বাড়ির কর্তা গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টানতে লাগলেন।

প্রথমেই ডাক পড়লো শিরোমণি ঠাকুরের। রায় বাহাত্বর বললেন, 'আমি আর একদিনও বিলম্ব করতে চাই নে। আমার টাকার অভাব নেই। আপনি আজই পোস্যপুত্র গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করুন। আমার ম্যানেজার আছে—চাইলেই টাকা পাবেন। লোকজন রয়েছে প্রচুর, তারা খাটবে। কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

তারপর একটু গলা খাটো করে বললেন, 'বুঝতেই ত' পারছেন শিরোমণি ঠাকুর, আপনার কাছে আমার লুকোবার কিছুই নেই। চারদিকে শকুনি-গৃধিনী আর শেয়ালের দল ওৎ পেতে আছে। আমি চোখ বুঁজলেই আমার বিরাট সম্পত্তি একেবারে তছ্‌নছ্‌ করে ছাড়বে।

কথায় বলে, পাগলা খাবি? না, আঁচাবো কোথায়?

শিরোমণি ঠাকুর ত' তাই চান।

তিনি একজন সেরা বিপ্লবী। যে করেই হোক, নিজের বুদ্ধিবলে রায় বাহাত্বরের

বিশ্বাসভাজন হয়েছেন। এই সুযোগে কোনো রকমে একটা লোক-দেখানো পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাতে যদি পারেন তা'হলে এই বিরাট সম্পত্তি বিপ্লবীদের হাতে আসে। এই পোষ্যপুত্রের অভিভাবক হবেন শিরোমণি ঠাকুর নিজে। তখন বিপ্লবীদের কাছে অর্থের আর কোনো অভাব হবে না।

মনে মনে ভারী খুশী হলেন শিরোমণি ঠাকুর। কিন্তু তিনি শুধু বিপ্লবী নন, একেবারে পাকা অভিনেতা। তাই যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবলমাত্র রায় বাহাদুরের অনুরোধেই এই ঢোক গিলছেন এমন একটা মুখের ভাব করলেন তিনি। বললেন, 'আপনার অনুরোধ আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি নে রায় বাহাদুর। আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করে পুষ্যিপুত্র নেবার সব ব্যবস্থা আমি এক্ষুণি করে ফেলছি।

রায় বাহাদুরের ম্যানেজার যে শিরোমণি ঠাকুরের হাতে গড়া শিষ্য এবং আদর্শ বিপ্লবী সে-কথা রায়বাহাদুর জানবেন কি করে? এমন কি কর্তার খাস খানসামাটি অবধি একজন বিপ্লবী।

আটঘাট না বেঁধে শিরোমণি ঠাকুর কোনো কাজে হাত দেন না।

গোপনে বিপ্লবীদের একটা পরামর্শ হয়ে গেল। সে-কথা রায় বাহাদুর ত' দূরের কথা, বাড়িব আত্মীয়-স্বজন কাকপক্ষীতেও জানতে পারলো না!

আত্মীয়-স্বজনরা যাতে 'শুভ-কাজে' কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে বিপ্লবীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আত্মীয় আছেন, আত্মীয় থাকুন। ভালো-মন্দ খান-দান, আর নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে নাক ডাকুন। কোনো কাজে বাধা দিতে এলেই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—হুঁসিয়ার সবাই।

'মিলিটারী ডিসিপ্লিনে' কাজ চললো শিরোমণি ঠাকুরের। তা ছাড়া বিপ্লবীদের আরো একটা ভয়ের কারণ আছে। রায় বাহাদুরের শরীরের যে অবস্থা তাতে তিনি যে কোন মুহূর্তে উত্তেজনায় 'হার্ট ফেল' করতে পারেন। সুতরাং 'আজ' হলে সে কাজ 'কাল' করা চলবে না—কোনো মতেই।

ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ এগিয়ে চললো। ম্যানেজারবাবু ঢালা আদেশ জারি করেছেন—দত্তকপুত্র গ্রহণের জন্য স্টেট থেকে সব রকম ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

আত্মীয়-স্বজনদের মোড়ল হচ্ছেন গদাইবাবু। তিনি দেখলেন, পোষ্যপুত্র নেওয়া আর কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না!

তখন গদাইবাবু এক কৌশল অবলম্বন করলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শিরোমণি ঠাকুরকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন।

তারপর হঠাৎ শিরোমণি ঠাকুরের দুটো পা জড়িয়ে ধরে গদাই বললেন, 'আপনি আমাদের বাঁচান শিরোমণি ঠাকুর!'

কিছুই যেন বুঝতে পারেন নি, এমনি মুখের ভাব করে শিরোমণি ঠাকুর দু' পা পিছিয়ে গিয়ে উত্তর দিলেন—এ কি গদাইবাবু, আপনি গণিমান্যি ব্যক্তি—আমার পা জড়িয়ে ধরছেন কেন ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি নে !

গদাইবাবু কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না শিরোমণি ঠাকুর ? ওই ভাগাড়ের শকুনটার মরণকালে ভীমরতি হয়েছে, তাই এই সময় একটা অজানা-অচেনা ছেলেকে কুড়িয়ে এনে পুষ্যিপুত্তুর করে নিচ্ছে। আপনি আমাদের বাঁচান শিরোমণি ঠাকুর। এই ছেলে-খেলা আপনি পণ্ড করে দিন।'

শিরোমণি ঠাকুর আরো অবাক হবার ভান করে উত্তর দিলেন—দেখুন, আমি কি করতে পারি গদাইবাবু বলুন ? ওঁর সম্পত্তি, উনি যদি বিলিয়ে দেন, তা'হলে আমাদের কি বলবার থাকতে পারে ? আর উনি আমাদের কথা শুনবেনই বা কেন ?

উত্তেজিত হয়ে গদাইবাবু বললেন, 'শুনবেন শিরোমণি ঠাকুর, নিশ্চয়ই শুনবেন। আমরা সবাই জানি, রায় বাহাদুর আপনার কথা বেদ-বাক্যি বলে মনে করে। আপনি শুধু বলুন, দত্তকপুত্র গ্রহণের শুভদিন এখন পাঁজিতে নেই। এই মাসটা তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই কাজের জন্য আমরা আত্মীয়-স্বজনের দল সমবেত-ভাবে আপনাকে একলাখ টাকা দেবো।

শিরোমণি ঠাকুর যেন খুব লোভে পড়ে গেছেন—এমনি মুখের ভাব করে বললেন, 'একলাখ টাকা আপনারা আমায় দেবেন ? আপনি কি বলছেন গদাইবাবু ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না···আমার মাথা ঘুরছে !

গদাইবাবু উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলেন—আপনার মাথা ঘোরার আমরা চিকিৎসা করবো। আপনি আমাদের সঙ্গে হাত মেলান। পুষ্যিপুত্তুর নেওয়া পণ্ড করে দিন। তারপর চাকর বেটাকে হাত করে রায় বাহাদুরের ওষুধের সঙ্গে আমরা বিষ মিশিয়ে দেবো। দেখি, ওই বুড়ো হাড় আর কয় দিন টেঁকে ! তখন আপনাকে আরো একলাখ টাকা নগদ দেবো আমরা। শুধু সম্পত্তিটা একবার হাতে আসতে দিন। আপনার কোনো অভাব আমরা রাখবো না।

শিরোমণি ঠাকুর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু মানুষ খুনের ব্যাপার। আমার বুক কাঁপছে। আমায় একটু ভেবে দেখতে দিন।'

—হ্যাঁ, ভাবুন, ভাবুন, শিরোমণি ঠাকুর, আপনাকে আর কষ্ট করে বাড়ি বাড়ি চাল-কলা বাঁধতে হবে না। শেষ বয়েসে আপনি পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করে রাজভোগ খাবেন। সে ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে করে দেবো। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে মিতালি পাতান।

শিরোমণি ঠাকুর ভেবে দেখলেন, এইসব কাল-সাপদের আগে থেকে চটিয়ে

কোনো লাভ নেই। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সাপও না মরে আর লাঠিও না ভাঙে।

তাই তিনি যেন ভারী ভড়কে গেছেন এই ভাব দেখিয়ে গদাইবাবুর কাছ থেকে সময় চেয়ে নিলেন। আর গোপনে ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিলেন—আজই পোষ্যপুত্র নেবার পর্বটা শেষ করে নিতে হবে। ওদের মতিগতি বিশেষ ভালো নয়। কি জানি, সম্পত্তির লোভে ওরা যদি রায় বাহাদুরকে বিষ দিয়ে বসে তা'হলে বিপ্লবীদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রায় বাহাদুর যেমন ধুমধাম করে অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন—তা হলো না বটে, তবে শিরোমণি ঠাকুরের পাকা মগজের বুদ্ধিতে সেই দিনই দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়ে গেল।

রাত্তিরে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসে এই বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেন। রায় বাহাদুর যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করলেন চারদিকে তার সাক্ষী রাখতে হবে ত'। এ বিষয়ে শিরোমণি ঠাকুরের আর ম্যানেজার বাবুর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ।

কাজের বাড়ি। অনেক সময় সিঁড়ি দিয়ে নামবার-ওঠবার সময় শিরোমণি ঠাকুর আর গদাইবাবু সামনা-সামনি পড়ে গেছেন। সেই সময় গদাইবাবুর চোখে যে প্রতিহিংসার আগুন দেখা গেছে—তাতে শিরোমণি ঠাকুরের মতো অভিজ্ঞ লোকও চমকে উঠেছেন।

কাল-সাপের দল না জানি কোথায়—কেমন করে বিষ ঢালে!

সত্যি, মনে মনে ভয় পেয়েছিলেন শিরোমণি ঠাকুর।

তাই কর্তার খাস খানসামাকে ডেকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'খুব হুঁসিয়ার. কাল-সাপের দল না জানি কি বিপদ বাঁধায়।' রায় বাহাদুরের কাছে সব সময় যদিও আমাদের কাজ হাসিল হয়েছে, তবু রায় বাহাদুরের আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার। সব কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকাপাকি করে নিতে হবে। তখন আত্মীয়-স্বজনদের হটিয়ে দিতে আর বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

খাস খানসামা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, 'সে সারারাত ঘুমুবে না, রায় বাহাদুরের ঘরে পাহারা দেবে। রাত্রির বেলা কাক-পক্ষীকেও ঢুকতে দেবে না রায় বাহাদুরের ঘরে।

শিরোমণি ঠাকুর এই বেলা নিশ্চিন্ত হলেন। সারা দিনে অনেক পরিশ্রম গেছে। একদিকে রায় বাহাদুরকে দিয়ে কাজটা সমাধা করে নিতে হবে, অন্যদিকে কাল-সাপ আত্মীয় স্বজনকে সামনে রাখতে হবে!

বিপদ যে কখন কোন্ দিক দিয়ে আসে—কেউ বলতে পারে না।

এইবার তিনি নিশ্চিন্ত। সেই রাত্রে কত দিন পর তিনি ঘুমুতে পারবেন।

কয়েক মাস হয়ে গেল—তাঁর চোখে ঘুম নেই।

পরিকল্পনাটাকে কার্যে পরিণত করতে হলে পা টিপে টিপে এগুতে হয়। পথটা সত্যি পিছল। ঠিক বিপ্লবীর কাজ এটা নয়। কিন্তু ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করতেই হবে।

তখন নিশ্চিন্তমনে তিনি বিপ্লবীদের সংগঠন করতে পারেন।

রায় বাহাদুরের এই পাপপুরী ছেড়ে জন্মের মতো চলে যাবেন তিনি। এই গৃহে কত বিপ্লবী কত নির্য্যাতন সহ্য করেছে। শিরোমণি ঠাকুরের কোনো কিছুই অজানা নয়।

আজ এত দিন পরে—রায় বাহাদুরের ওপর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পেরেছেন তিনি।

মনে মনে হাসলেন শিরোমণি ঠাকুর।

ম্যানেজার এসে বললেন, 'সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে আপনার। এইবার কিছু মুখে দিন।

বৃদ্ধ বিপ্লবীর মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'আজ আর কিছু খাবো না। এক গ্লাস মিশ্রীর সরবৎ যদি পাই—

শিরোমণি ঠাকুরের কথাটা শেষ হতে পারলো না। রায় বাহাদরের খাস খানসামা ছুটে এসে বলে, 'আমাদের নতুন মনিবকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শিরোমণি ঠাকুর আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলেন—অ্যাঁ। বিশ্ববন্ধু নেই? কোথায় গেল সে?

খাস খানসামা উত্তর দিলে, 'পাতি-পাতি করে আমি গোটা বাড়ি খুঁজেছি। কোথায়ও নতুন মনিব নেই।

শিরোমণি ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই ওই কাল-সাপের কাজ। হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি। তীরে এসে কি তরী ডুববে?

॥ একুশ ॥

শিরোমণি ঠাকুর পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। যেন বাঘকে কে খাঁচার মধ্যে পুরেছে।' তার বেরিয়ে আসবার কোনো উপায় নেই—নিস্ফল আক্রোশে সে কেবিল গর্জ্জন করছে!

হঠাৎ শিরোমণি ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এক কাজ করো তোমরা। বাড়ির সদর দরজায় কুলুপ এঁটে দাও। ওই কাল-সাপের দলকে আমি দেখছি। যদি ওরা বিশ্ববন্ধুকে বের করে না দেয়, তা'হলে ওরাও কেউ প্রাণ নিয়ে বাড়ির বাইরে পা দিতে পারবে না।

এই প্রবীণ বিপ্লবীর যেন হঠাৎ নব-যৌবন ফিরে এলো।

শিরোমণি ঠাকুর নিজের গা থেকে নামাবলী দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর এক গুপ্ত জায়গা থেকে একটা বন্দুক বের করে নিয়ে এলেন। কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি গদাইবাবুর ঘরের দরজায় গিয়ে ঘন ঘন করাঘাত করতে লাগলেন।

হঠাৎ গদাইবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দরজা খুলেই শিরোমণি ঠাকুরের ওই সংহারমূর্তি দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। গলার ভেতরটা কে যেন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে। তাঁর মনে হতে লাগলো যেন চিরকালের মতো কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু শিরোমণি ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বন্দুক বাগিয়ে ধরে হুমকি দিয়ে বললেন, 'শুনুন গদাইবাবু, ভালোয় ভালোয় বিশ্ববন্ধুকে বের করে দিন। নইলে দেখছেন ত' আমার হাতে বন্দুক। এই রাতের অন্ধকারে আপনাকে খুন করে রায় বাহাদুরের উঠোনে পুঁতে ফেলে সিমেণ্ট লাগিয়ে দেবো। কাক পক্ষীতেও সেকথা জানতে পারবে না। তারপর রটিয়ে দেবো যে, রায় বাহাদুরের সঙ্গে ঝগড়া করে আপনি বাড়ি ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন।

গদাইবাবু তখন বলির পাঁঠার মতো কাঁপছেন। শিরোমণি ঠাকুর—যিনি পূজো-আর্চ্চা নিয়ে থাকেন—তিনি কিনা বন্দুক ধরে তাঁকে খুন করতে ছুটে এসেছেন—এই মাঝরাতে!

নাঃ, পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! শিরোমণি ঠাকুর কিন্তু ছাড়বেন না ওঁকে।

শিরোমণি ঠাকুর হুমকি দিয়ে আবার বললেন—কী? মুখে যে আর কথা নেই!

কেউ বোবাকাঠি ছুঁয়ে দিল নাকি ? বিশ্ববন্ধুকে বের করে না দিলে আপনার প্রাণ থাকবে না, এই শেষ কথা বলে দিয়ে গেলাম।

গট্-গট্ করে চলে এলেন শিরোমণি ঠাকুর। 'তিনি তখন আর চাল-কলা-বাঁধা পূজুরী বামুন ঠাকুর মন—একেবারে যেন 'মিলিটারী ম্যান' হয়ে ফিরে এসেছেন।

ওদিকে রায় বাহাদুরের খাস খানসামা গিয়ে রায় বাহাদুরের কানে কথাটা তুলে দিয়েছে—আমাদের নতুন মনিবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কর্তা !

খবর শুনেই রায় বাহাদুর চীৎকার করে উঠলেন—কী ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমি এখনো মরি নি ! এখনই কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে সুরু করেছে।···এই কে আছিস্. আগে সদর দরজা বন্ধ করে দে। তারপর আমার চাবুকটা নিয়ে আয় ! আমি নিজের হাতে সবাইকে চাবুক চালাবো। রায় বাহাদুর এখনো মরে নি !

প্রবল উত্তেজনায় রায় বাহাদুর হাঁপাতে লাগলেন।

খাস খানসামা ওঁকে বিছানায় শুয়ে দিলে। কিন্তু রায় বাহাদুর অত সহজেই দমে গেলেন না। তিনি একটু দম নিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলেন। সারা জীবন বহু লোককে শায়েস্তা করেছেন। আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে ব্যাঙের লাথি খেতে তিনি রাজী নন।

তা ছাড়া তাঁর নিজের সম্পত্তি—তিনি সাতভূতের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন কেন ?

পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছেন—বেশ করেছেন। তাঁর নিজের টাকা যে ভাবে খুশী উড়িয়ে -পুড়িয়ে দেবেন তিনি। তাতে কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না ! তাঁর মনের বাসনা—এই পুষ্যিপুত্তুরকে তিনিমনের মতো ট্রেনিং করে দিয়ে যাবেন। তারই কাজের ভেতর দিয়ে তিনি বেঁচে থাকতে চান। নিজে যা করতেপারেন নি—এই পুষ্যিপুত্তুরের হাত দিয়ে তিনি তাই করাবেন। নিজের পল্লীতে নিজের নামে একটা বিদ্যালয় খুলে দেবেন। মায়ের নামে একটি আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করবেন। একটি পাঠাগার গড়ে তুলবেন নিজের বাপের স্মৃতিরক্ষার জন্য। এইসব পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছে শেষজীবনে। রায় বাহাদুরের মনে এ বাসনাও আছে যে, নিজের নামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে তাঁর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করবেন। নিজে ত' সে-সব করতে পারেন না। তাই ছেলের হাত দিয়ে নিজের এইসব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন।

কিন্তু যত গোলমালের সৃষ্টি করেছে এই সব লোভী কুকুরের দল। তিনি ওদের হাতে একটি কানাকড়িও তুলে দেবেন না। উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন সবাইকে।

খাস খানসামা কর্তাকে জানিয়ে দিলে যে, শিরোমণি ঠাকুরের আদেশে বাড়ির সদর দরজা আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শুনে ভারী খুশী হলেন রায় বাহাদুর ; মৃদু হেসে বললেন, 'শিরোমণি ঠাকুরের সব দিকে দৃষ্টি আছে। সেই জন্যই আমি ওঁকে এত ভালবাসি।'

রায় বাহাদুরের হুঙ্কার শুনে সারা বাড়িটা যেন থমথম করতে লাগলো।

ভীরু প্রকৃতির আত্মীয়-স্বজনেরা ভাবতে লাগলো—এ ত' আচ্ছা গেরোতে বাঁধা পড়া গেল। সম্পত্তির লোভ করতে এসে এখন বেঘোরে প্রাণ না যায়!

একটি নৌকো ভেসে চলেছে সেই আঁধার কালো রাতের বুক চিরে।

চারজন লোক ক্রমাগত দাঁড় টেনে চলেছে। মুখে তাদের কোনো কথা নেই।

আর দু'টি মানুষ চুপচাপ নৌকোর মাঝখানে বসে। তাদের মুখও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

এই ভাবে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল।

একে আঁধার রাত, তার ওপর মেঘের খেলা চলছে আকাশের গায়। মেঘের আনাগোনায় তারাদল মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে।

বয়েসে যিনি বড় তিনি নৌকোর মাঝখানে বসে সেই তারাদলের লুকোচুরি খেলা দেখছিলেন।

পাশে বসা ছেলেটিই প্রথমে কথা বললে, 'আচ্ছা জীবনদা, হঠাৎ আমায় নিয়ে পালিয়ে এলেন কেন? ব্যাপারটা ত' কিছুই বুঝতে পারলাম না। দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম নিজের ঘরে শুয়ে। আপনি এসে চুপি চুপি আমার ঘুম ভাঙিয়ে এক রকম পালিয়েই চলে এলেন। আসবার সময় শিরোমণি ঠাকুরকে পর্য্যন্ত কিছু বলা হল না।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'দেখ ভোম্বল, সব কথা তোর শুনে কাজ নেই। শুধু এই কথা জেনে রাখ, ও রকম ভাবে পালিয়ে না এলে তোকে বাঁচানো যেত না।'

—আমাকে বাঁচানো যেত না? কেন ব্যাপারটা কি? সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। কোনো দিন আপনার কাছে কোনো কথা জানতে চাই নি। আজ কিন্তু আমায় সব কথা খুলে না বললেই চলবে না।

ভোম্বলের চোখে মুখে একটা কৌতূহল জেগে উঠলো।

সেই মুখের দিকে জীবনদা খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

—তা'হলে নেহাৎই শুনতে চাস্?

—হ্যাঁ জীবনদা, আমাকে আর আঁধারে রাখবেন না। সব কথা আমায় খুলে বলুন। আমি জানি না, আমাদের সম্পর্কে শিরোমণি ঠাকুর কি ভাবছেন।

জীবনদা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—তা একটু ভাবছেন বৈ কি!

ভোম্বল আঁতকে উঠে উত্তর দিলে—কি সর্বনাশ!

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে শুনেই রাখ। আমি হঠাৎ খবর পেলাম গদাইবাবু একটা গুণ্ডা বাড়ির ভেতর নিয়ে এসেছেন। সে টাকার লোভে তক্ষুণি তোকে খুন করে লাস নিয়ে পালিয়ে যাবে। কাউকে খবর দেবার সময় ছিল না। তাই

তাড়াতাড়ি তোকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই ছিল না তখন।

ভোম্বল অবার বললে, 'কী সর্বনাশ! আমার একটার পর একটা ফাঁড়া মন্দ কাটছে না বলুন!'

প্রথমে সাপের কামড়। কোনো রকমে ওঝার মন্তরে প্রাণটা ফিরে এলো।

তারপর আবার নৈশ আক্রমণ। সে সময়ও জানালার ধারে গিয়ে আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন!

জীবনদা হেসে উত্তর দিলেন—আরে, আমর নামই যে জীবন।

ভোম্বল বললে, 'আবার নতুন করে এই কেলেঙ্কারী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। ভেবে দেখতে গেলে আমার জীবনটাই যেন একটা বিরাট উপন্যাস।'

জীবনদা মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন,'হ্যাঁ, প্রত্যেকের জীবনই এক একটা উপন্যাস। শুধু গুছিয়ে লিখতে জানা চাই! ভগবান ছক করে ত' জীবন তৈরী করেন না! এক এক জনের জীবননদী এক এক দিকে বয়ে যায়।'

ভোম্বল শুধোলে, 'আচ্ছা জীবনদা, আমাদের পালিয়ে আসার আসল ব্যাপারটা ত' শিরোমণি ঠাকুর জানতে পারছেন না। ওরা ত' খুব চিন্তায় পড়বেন।'

জীবনদা জবাব দিলেন, 'তা একটু চিন্তায় পড়বেন বৈ কি। শিরোমণি ঠাকুরকে জিজ্ঞেস না করে আমরা ত' কোনো কাজ করি না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, এ ক্ষেত্রে গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। দুর্ঘটনা একটা ঘটে গেলে আফশোষের অন্ত থাকতো না। এখন তোকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে—তাড়াতাড়ি আমায় আবার রায় বাহাদুরের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

ভোম্বল জিজ্ঞেস করলে, 'জীবনদা, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ভোম্বলের প্রশ্ন শুনে এবার জীবনদা মিটি-মিটি হাসতে লাগলেন; তারপর একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বল ত' তোকে এবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?'

ভোম্বল বললে, 'কি জানি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন! আপনার মনের ভেতর ঢোকা কি সহজ কথা! হয়ত নিয়ে যাচ্ছেন কোনো রেল লাইনের ধারে, কিংবা কোনো অজপাড়াগাঁয়ে লুকিয়ে থাকবার জন্য! অথবা কারো বাড়িতে চাকর সেজে কাজে লাগতে!'

বলতে বলতে আপন মনেই হো-হো করে হেসে উঠলো ভোম্বল। তারপর বললে, 'মজা মন্দ নয়।'

জীবনদার চোখে-মুখেও কৌতুক যেন নেচে বেড়াচ্ছে; জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, মজাটা কি সত্যি করে বল ত' ভোম্বল?

ভোম্বল জীবনদার কাছে আরও একটু ঘেঁষে বসে উত্তর দিলে—মজা নয়? এই

কিছুক্ষণ আগে ছিলাম—এক খেয়ালী বড়লোকের পুষ্যিপুত্তুর। আর খানিক বাদেই হয়ত এক রাগী মানুষের চাকর হয়ে বাসন মাজতে সুরু করতে হবে। আমার জীবনের নাটকটা প্রতি দৃশ্যেই বেশ জমে যাচ্ছে। নতুন নতুন পরিবেশ—নতুন নতুন ভূমিকা নতুন নতুন বেশ পরিবর্তন।

শুনে জীবনদা হো-হো করে হেসে উঠলেন। চারজন মাঝি কিন্তু নিঃশব্দে নৌকো বেয়েই চলেছে।

অন্ধকার রাতে আকাশে মেঘের লুকোচুরি খেলা চলেছে। কখনো তারার দলকে দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো বা ওরা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে।

ভোম্বল বললে, 'আজ বড়লোকের বাড়িতে দারুণ ভোজ হয়েছে। আর বসে থাকতে পারছি না জীবনদা। আমার দু' চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে।'

জীবনদা বললে, 'রাত শেষ হতে এখনো বেশ দেরী আছে। তুই পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নে না—আমি ঠিক জেগে আছি।'

ভোম্বল সবে তার দেহটা এলিয়ে দিয়েছে এমন সময়—একটু দূরে নদীর বুকে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

জীবনদা চমকে উঠলেন; বললেন, 'আর তোর ঘুমোনো হলোনা ভোম্বল। জলপুলিশ আমাদের গন্ধ পেয়েছে। তুই তাড়াতাড়ি একটা চাষার ছেলের পোষাক পরে নে। পাটাতনের তলাতেই পোষাকের সরঞ্জাম লুকানো আছে। তারপর কল্‌কে নিয়ে তামাক সাজতে বসে যা।

॥ বাইশ ॥

সত্যি.—শেষ পর্যন্ত জলপুলিশ এসে ওদের নৌকোটা ধরে ফেললে। লঞ্চ থেকে নেমে এলো এক জমাদার।

গোঁফ চুমড়ে পুলিশের লোক, বললে—খবরদার, পালাবার চেষ্টা করলে, আর নদীতে লাফিয়ে পড়লে গুলী করে কুকুরের মতো মেরে ফেলবো।

জীবনদা ইতিমধ্যে একেবারে বোকা চাষা সেজে গেছেন। বললেন, 'আজ্ঞে কর্তা, পালাবো কেন? চুরিও করি নি, ডাকাতিও করি নি। হাটে গিয়েছিলাম ছেলেটাকে নিয়ে, এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছি।'

পুলিশের লোকটা কিন্তু এত সহজে নিষ্কৃতি দিতে চায় না। জিজ্ঞেস করলে—হুঁ! হাটে গিয়েছিলি? তা তোদের নৌকোতে সওদা কোথায়? কি কিনেছিস্ হাট থেকে শুনি?

জীবনদা হঠাৎ বোকা চাষার মতো হি-হি করে হেসে উঠলেন।

পুলিশের জমাদারটা লাঠি দিয়ে একটা খোঁচা মেরে বললে—আরে, পাগল নাকি? হাসছে দেখ!

জীবনদা বললেন, 'আজ্ঞে কর্তা, সওদা করতে ত' হাটে যাই নি।'

—তবে কি করতে গিয়েছিলি? তামাশা দেখতে?

জীবনদা আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর পুলিশের লোকের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে কর্তা, আমার দুটো বোকা পাঁঠা ছেল, তাই ত' হাটে বিক্‌কির করে দিয়ে অ্যালম।

এইবার পুলিশের জমাদরটা চটে গেল—বোকা পাঁঠা! চালাকি পেয়েছ? লাঠির খোঁচা দিয়ে একেবারে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো।'

জীবনদা বোকা চাষার মতো তেমনি হো-হো করে হাসতেই লাগলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন—পেটের মধ্যি আমার কিচ্ছু নেই কর্তা। শুধুই পান্তাভাত আর প্যাঁজ! হি—হি—হি!

পুলিশের জমাদার আর কথা কাটাকাটি না করে তার সহকারী সহ জীবনদার নৌকোটা তন্নতন্ন করে তালাস করলে। কিন্তু এক পুঁটুলি চিড়ে-গুড়, আর হুঁকো-তামাক-টিকে ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না।

মোটা জমাদারটা আর একবার লাঠির খোঁচা দিয়ে বললে—যা—এবার তোরা খুব বেঁচে গেলি! ধরা-ছোঁয়ার কিচ্ছু রাখিস্ নি দেখছি। এই স্বদেশী বাবুগুলো হাড়বজ্জাত! একেবারে চেনবার যো নেই। মনে হয় যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু হাতে-নাতে যদি একবার পাই শ্রীঘরে ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়বো।

জলপুলিশের লঞ্চটা ঠকে গিয়েই যেন দূরে চলে গেল।

ভোম্বল পাটাতনের ওপর টান-টান শুয়ে পড়ে বললে—যাক, তা'হলে আর একটা ফাঁড়াও কাটলো!

জীবনদা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল হবে ত!

জীবনদার ডিঙি নৌকো আবার ভেসে চললো নদীর পথ ধরে।

ভোম্বল শুধোলে আচ্ছা জীবনদা, পথের বিপদ ত' কাটলো, এইবার সত্যি করে বলুন ত' আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনদা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন—'অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন শুনি ? জানিস্ ত'—সবুরে মেওয়া ফলে !

ভোম্বল বললে, 'তা ত' জানি। কিন্তু আমার মগজে সে মেওয়া যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে !'

জীবনদা ফোঁড়ন কাটেন—সেই শুকনো কাঠেই আবার ফুল ফুটবে—দেখে নিস্ তুই ! তারপর তুড়ি দিতে দিতে গান ধরলেন—

'হরিনামের গুণে—
গহন বনে—শুষ্ক তরু মুঞ্জরে।
বল মাধাই মধুর স্বরে—'

ভোম্বল বললে, 'জীবনদা, থাক এত রাত্তিরে আর কেত্তন ধরবেন না, তা'হলে জল- পুলিশের লঞ্চ আবার গান শুনতে ফিরে আসবে।'

জীবনদা বললেন, 'তা'হলে আমিও পাটাতনের ওপর চিৎ-পটাং হয়ে একটু ঘুমিয়ে নেই। সারাদিন সারারাত ধরে আমার ওপর দিয়েও কম ধকল গেল না ! তা ছাড়া পুলিশের জমাদার ব্যাটা বেমক্কা পেটে মেরেছে এক খোঁচা ! ব্যাটা যেন শাহান শা বাদশা !'

এই বলে জীবনদাও চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন। বোধ করি ওরা দু'জনে অনেক-ক্ষণ ঘুমিয়েছে।

সারারাত ধরে নৌকো চলেছে।

তারই কল-কল ছল-ছল শব্দে ঘুমের আমেজটা বেশ ভালো ভাবেই গাঢ় হয়ে এসেছিল।

হঠাৎ ভোম্বলের ঘুমটা ভেঙে গেল। পাটাতনের ওপর উঠে বসলো সে। তারপর অতি আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—এ কী জীবনদা, আপনি আমায় একেবারে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এ এনে হাজির করেছেন ?

জীবনদাও চোখ কচলে উঠে বসলেন ; উত্তর দিলেন—হুঁ ! এইখানেই ত' নৌকো বাঁধতে হবে আমাদের ! এখন থেকে তুই এই বাবুইবাসা বোর্ডিএ থাকবি।

ভোম্বলের গলায় কৌতূহল আর কৌতুক। শুধোলে—সে কি জীবনদা ? আপনারা আমাকে পোষ্যপুত্তুর করলেন, জমিদার করলেন। সেই জমিদারী কি আমি ভোগ করতে পারবো না ?

জীবনদার গলায় গাম্ভীর্য !

তিনি বললেন, 'শোন ভোম্বল, জমিদারী আর সম্পত্তি তোকে ভোগ করতে হবে না। রায় বাহাদুরের বিরাট বিত্ত আমরা অধিকার করেছি। তুই মাঝে মাঝে গিয়ে ক্ষুদে মালিকের মতো শুধু দেখা দিয়ে আসবি। তা'হলেই সেই সম্পত্তি

বিপ্লবীদের কাজে ব্যয় করা সম্ভবপর হবে। শিরোমণি ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সব ব্যবস্থা করে নেবো।'

ভোম্বলের চোখে-মুখে তখনও কৌতুক খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন খুব দমে গেছে সে—এই ভাবে অবাক হবার ভান করে বললে—এ্যাঁ! নদী পার হয়ে এখন বুঝি ভেলাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন? কোথায় জমিদার হয়ে বসে পায়ের ওপর পা রেখে মাছ, দুধ, ঘী, মাখন, ছানা খেয়ে ভুঁড়ি বাগাবো—তা নয় কিনা, তুই গিয়ে থাক বাবুইবাসা বোর্ডি-এ !!

জীবনদার মুখ কিন্তু গম্ভীর।

তিনি একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন—শোন ভোম্বল, এ হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। তোকে কয়েকটি জরুরী কথা এই ফাঁকে বলে নিই।

উল্কার মতো অনেক ঘুরেছিস্ তুই। এইবার তোকে সত্যিকারের মানুষ হতে হবে।

ভোম্বল জবাব দিলে, 'জীবনদা, তা'হলে কি এতদিন আমি অমানুষ ছিলাম?'

—শোন, তোকে বুঝিয়ে বলি—

জীবনদার ভারী গলা। বললেন, 'এতদিন বিপ্লবীদের প্রয়োজনেই ছুটোছুটি করেছিস্ তুই। হয়ত আমরা মানে বড়রা যে কাজ করতে পারতাম না, সেই অসাধ্য সাধন করেছিস্ তুই। কিন্তু এইবার তোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হচ্ছে সেই পীঠস্থান। এইখানে তুই নিজে পড়াশুনা করে বড় হবি, মানুষ হবি। আর আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করবি। জানিস্ ত' ভোম্বল, ভালো বীজ বপন না করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না। সেই জন্য এখন থেকেই ছোট ছোট ছেলেদের মনে ধীরে ধীরে বারি সিঞ্চন করতে হবে, তারপর বিপ্লবের বীজ বপন করে যেতে হবে। একদিন এরা প্রত্যেকেই সোনার ফসল ফলাবে। আবার প্রয়োজনে অগ্নি-কণার মতো জ্বলেও উঠবে।'

একটুখানি থেমে থেকে জীবনদা আবার বলতে সুরু করলেন—আমি জানি ভোম্বল, এই পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা, বিশেষ করে বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ক্ষুদে বিচ্ছুর দল তোকে খুব ভালোবাসে। আর সেই ত' তোর সত্যিকারের সুযোগ। তোর এই ভালোবাসাকে মূলধন করে তুই কাজে লেগে যা। ওদের দেহ আর মন দুই-ই তৈরী করতে হবে। বর্ষার জল যখন জমিতে পড়ে, সেই সময় চাষী ভাই লাঙল চালিয়ে মাটিকে তৈরী নেয় নেয়। জল সিঞ্চনের পালা শেষ হলে তবে চলবে বীজবপন।

তোকেও তেমনি ছেলেদের মনকে তৈরী করে নিতে হবে।

এই বাবুইবাসা বোর্ডিংএ থেকে—ওদেরই একজন হয়ে যা। ওদের জন্য ব্যয়া-

মাগার স্থাপন কর, ভালো করে ছেলেদের শরীরকে শক্ত কর। সাঁতার শিখিয়ে ওদের ক্ষিপ্রগতি করে তোল। হরিণশিশুর মতো দ্রুতবেগে ওরা যেন ছুটতে পারে। তা ছাড়া এখানে আশে-পাশে অনেক নির্জ্জন বনভূমি রয়েছে। সেখানে খুব গোপনে দলবদ্ধ ভাবে ছেলেদের লক্ষ্যভেদ করতে শিক্ষা দিবি। তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ওদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করবি।

আমি বলছি ভোম্বল, সে কাজ তোকেই করতে হবে। এই বাবুইবাসা বোর্ডিং হোক তোর কর্মক্ষেত্র, আর হয়ে উঠুক তোর নতুন জীবনের তীর্থক্ষেত্র।

জীবনদার মুখে উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শুনে ভোম্বলের শিরায় শিরায় যেন এক নতুন শিহরণ জাগলো।

জীবনদা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভোম্বলকে বললেন, 'দেখ, সনাতনদা দেশমাতার মুক্তির জন্যই তার জীবন উৎসর্গ করে চলে গেছেন। তাই তার কাজ আমাদেরই করতে হবে।

সনাতনদা মারা গেছেন শুনে ভোম্বল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। জীবনদা ভোম্বলের মাথায় হাত রেখে বললে কাঁদিসনে ভোম্বল, কাঁদিসনে। সনাতনবাবু যে কাজ করতেন তার ভার আমাকে আর তোকেই নিতে হবে। তাহলেই তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে। কি তুই পারবিনে?

পারবে, জীবনদা।

ভোম্বল নত হয়ে জীবনদার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, সনাতন আর 'আপনার কল্পনাকে আমি রূপ দেবো জীবনদা! আজ থেকে এই কাজই হোক আমার জীবনের ব্রত!'

বাবুইবাসা বোর্ডিং-এর ছেলের দল হঠাৎ সকালবেলা জীবনদার সঙ্গে ভোম্বলকে নৌকো থেকে নামতে দেখে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। ছেলেরা ঘিরে ধরলো ভোম্বলকে।

—এ কী ভোম্বল তুমি!

—হ্যাঁ, আমিই ত'। তোরা ভূত দেখছিস্ নাকি?

—এখন থেকে আমাদের সঙ্গে আমাদের বোর্ডিংএ থাকবে?

—থাকবো বলেই ত' এলাম।

—কী মজা! কী মজা!! কী মজা!!!

ছেলেদের আনন্দ-উল্লাসে যেন জোয়ার জাগলো।

ভোম্বল কোন্ ঘরে থাকবে—তাই ঠিক করতে বোর্ডিং-এর ছেলেরা মেতে উঠলো। ছেলেদের একজন বললে, 'আমরা ঘরটা চুনকাম করে দেবো।'

আর একজন বললে, 'আমরা, ঘরটাকে নানা রকম ছবি দিয়ে সাজিয়ে ফেলবো।'

—শুধু জাতীয় নেতাদের ছবি থাকবে।

—মাঝখানে ভারতমাতার একটি সুন্দর পট!

—রোজ সকালবেলা আমরা বন্দে মাতরম্ গান গাইবো।

—প্রত্যহ দাঁড় টেনে নৌকো বাইবো।

ছেলেদের মধ্যে যখন নানা আলোচনা চলছিল, জীবনদা তখন ভোম্বলকে নিয়ে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

একটা জায়গা জীবনদার ভারী পছন্দ হল। চারদিকে বড় বড় গাছ, আর মাঝখানে একেবারে ফাঁকা অঞ্চল—যেন ওদের প্রয়োজনেই কে তৈরী করে রেখেছে।

জায়গাটা ভালোরূপে দেখে নিয়ে জীবনদা বললেন, 'লক্ষ্যভেদ শেখবার এই উপযুক্ত জায়গা।

জীবনদা ব্যায়ামাগারেয় জায়গাও ঠিক করে ফেললেন। মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ছেলেরা কুস্তি লড়বে।

দিন কয়েক বাদেই বোর্ডিং-এ বাণী-বন্দনা উৎসব।

জীবনদার আগ্রহে আর ছেলেদের উৎসাহে এবার খুব ভালো ভাবে পূজো হচ্ছে।

সর্বশুক্লা সরস্বতীর মূর্তিখানি কী সুন্দর। ছেলেরা দল বেঁধে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিচ্ছে।

দেবীমূর্তির পিছনের চালচিত্রিতে একদিকে ভারতমাতার ভুবন-ভোলানো চিত্র শোভা পাচ্ছে। অন্য পাশে রয়েছে ভারতবর্ষের মানচিত্র।

দেবীকে প্রণাম করে—ভোম্বল মনে মনে কামনা করলো—আমার মনস্কামনা যেন সিদ্ধ হয়; এই অগ্নিকণার দল যেন ভারতের স্বাধীনতাকে একদিন বরণ করে নিয়ে আসতে পারে।

বন্দে মাতরম্!

আমার মায়ের মুখ

॥ এক ॥

এ-রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

কুশলের যেদিন জন্মদিন সেই দিনই তার মায়ের মৃত্যুদিন। এ-কথা শুনে কেউ যেন মনে না করে যে, কুশলের জন্মদান করেই তার মা অকালে দেহরক্ষা করেছিলেন।

ঘটনাটা মোটেই তা নয়। কুশলের দুখিনী মা সারাজীবন কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছেন। তারপর একদিন চরম দুঃখের মধ্যে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। সেদিন তাঁর চোখ দু'টিতে কুশলের মুখখানি ক্ষণকালের জন্যে ভেসে উঠেছিল কিনা—সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

আজ যে কুশলের জন্মদিন সে-খবর এ-অঞ্চলে কে না জানে? সেই জন্মদিনের উৎসবে যারা নিমন্ত্রিত হয়েছে তাদের চাইতে যারা মুখে-মুখে খবরটা পেয়েছে—তাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

কলেজের ছাত্রদল, বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা, কারখানার শ্রমিক দল, নদীর ঘাটের মাঝি-মাল্লারা সবাই জানে এ অঞ্চলের প্রাণ-পুরুষ কুশলের আজ জন্মদিন।

তাই নিমন্ত্রণ না থাকলেও—শুধু পাখীর মুখে খবর পেয়ে ওরা দলে দলে মিছিল করে আসবে এই বিশেষ বাড়িটিতে।

সে কথা কুশলও যে না জানে তা নয়।

কুশলের আজ জন্মদিন এ-কথা অজানা লোকেরও আজ জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার মায়ের আজ মৃত্যুদিন এ-কথা কুশল ছাড়া আর কেউ জানে না। জানবার সুযোগও হয় নি কারো কখনো। কুশলের জন্মদিনের উৎসবে তার মায়ের মৃত্যুদিনের বেদনাকে যেন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে দিয়েছে।

আজ সকাল থেকে সারাটা দিন ধরে যে আনন্দের প্রবাহ চলবে, সে-কথা কুশল বেশ অনুমান করতে পারছে।

প্রথমেই মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর এসে অতি ভোরে তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

ছেলেরা সকলেই কৃতি। তারাও একে একে এসে বাপের পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

নিজের সারা জীবনের চেষ্টায় বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে কুশল। ছেলেরা তার বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছে। কাজ ভাগ করে দিয়ে কুশল নিজে নিশ্চিন্ত।

ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই অঞ্চলের সব কিছু গড়বার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে কুশল। ছোট-বড় সকলেই যে কুশলের বিশেষ পরিচিত এই কথাটাই নানাভাবে সকলে জানাতে চায়।

এটা দোষের কিছু ব্যাপার নয়, মানুষের স্বাভাবিক বাসনা। কুশল সব কিছুই বোঝে আর আপন মনে তৃপ্তির হাসি হাসে।

জন্মতিথি উৎসবে তাকেই মানায়, যার জীবন—ধনে-জনে-মানে একেবারে সফল হয়ে ওঠে।

সেদিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কুশলের জীবন একেবারে সাফল্যের শিখরে গিয়ে পৌঁচেছে।

আজ তার জীবনে চাইবার বা কামনা করবার কিছু নেই।

কিন্তু আর একদিকে তীব্র বেদনার মতো তার দুখিনী মায়ের কথা যখন মনে হয় —চরম দুঃখে সে যেন একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সেই সময় সে তার মায়ের জন্যে কোনো সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না।

তার আজকের এই প্রাচুর্য তার দুখিনী মায়ের সারা জীবনের অভাব-অনটনকে যেন দাঁত বের করে বিদ্রূপ করতে থাকে।

আজ সারা সকাল ধরে মানুষের মিছিল যেন আসছে তার বাড়ির দিকে।

সেই ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়া দিনে মায়ের তপ্ত বুক ছাড়া সারা দুনিয়ায় ওর প্রাণ জুড়োবার জায়গা ছিল না। আজ কুশল এ-কথা জানে আর বিশ্বাস করে যে মানুষের ভালবাসা সে পেয়েছে। তার আশে-পাশের সকলে তাকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে।

এ অঞ্চলের সুধীজনেরা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। ছাত্রদল তাদের আস্থা জানিয়ে গেছে। খেলোয়াড় দল জানিয়ে গেছে তাদের উচ্ছ্বাস, শিক্ষকদল প্রকাশ করে গেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া কারখানার শ্রমিক দল, নদীর ঘাটের মাঝি-মাল্লারা, বাজারের দোকানদাররা অবধি বাড়ি-বয়ে এসে রাশি রাশি উপহার দিয়ে গেছে তার জন্মদিনে।

জন্মদিন ত' অনেকেরই হয়। বহু লোকও আমন্ত্রিত হয়, কিন্তু এমনটি সচরাচর দেখা যায় না।

অবশ্য এর পেছনে কুশলের বিরাট কর্ম-প্রতিভা লুকিয়ে আছে।

নিজের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও··· এই অঞ্চলের সব কিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কুশলের কর্ম-কুশলতা জড়িয়ে আছে।

এ অঞ্চলের ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের বিদ্যালয়, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী। খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, রঙ্গমঞ্চ, ক্লাব, সভা-সমিতি সব কিছুর সঙ্গে কুশলের কর্ম-কুশলতার সূক্ষ্ম-সূত্র যেন চারিদিক দিয়ে জড়িয়ে আছে।

স্থানীয় মহিলা সমিতিরও এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে কুশলের সহযোগিতা ও আনুকুল্যেই এই মহিলা সমিতিটি গড়ে উঠেছে। আর নানা-ধরণের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য সংগঠণমূলক কাজ করে চলেছে।

এই সব মহিলারাও দল বেঁধে এসে নানা জাতের হাতের কাজ উপহার দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের পর এসেছিল পাটকলের বিদেশী ব্যবসায়ী আর অফিসারের দল। তাদের জন্য আলাদা রকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এ বাড়ির ছোট মেয়ে তনুকার আবদার ছিল কিন্তু অন্যরকম।

সে তার বন্ধুদের দিয়ে একটি ছোট্ট নৃত্য-নাটিকার আয়োজন করেছিল। সেই নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল আবার তাদেরই "কুশল ভবনের" হল ঘরে—ঠিক সন্ধ্যেবেলায়।

সেই সময় যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মেয়েদের গান শুনে, নাচ দেখে আর আলোর খেলায় খুশী হয়ে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

অনেকের জন্যে আবার পদকও ঘোষণা করা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আর অধ্যাপকেরাই এই পদকের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাতে তনুকার আর আনন্দের সীমা ছিল না।

মেয়ের বাবা অবশেষে একটি মোটা অঙ্কের চেক মেয়ের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

তাতে কচি মুখের হাসি সেই হলঘরটিকে ভরিয়ে তুলেছিল। একটি মানুষের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আশে-পাশের সকল জনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা বড় সহজ কথা নয়।

বাড়ির ঝি-চাকরেরা এসেও গৃহস্বামীর পদধূলি নিয়ে গেছে, আর হাত ভরে বক্‌শিস পেয়ে হাসি মুখে ফিরে গেছে।

বাড়ির ভেতর থেকে তাগিদ এসেছে এখন রাত্রের খাবার পাঠাতে হবে কি না!

কিন্তু অবেলায় খেয়ে কুশলের আজ ক্ষিদে নেই! তা ছাড়া মনটা কানায় কানায় ভরে আছে বলেই কি আজ রাত্রে ক্ষিদে পায় নি?

কুশল জানিয়েছে, খাবার যেন তার শোবার ঘরে ঢেকে রেখে দেয়া হয়। বেশী রাত্তিরে ক্ষিদে পেলে কিছুটা খেয়ে নেবে।

চুপচাপ বসে আছে কুশল তার লাইব্রেরী ঘরে।

ধীরে ধীরে সারা বাড়ীর উৎসবের আলো নিবে এসেছে।

এই কিছুক্ষণ আগেও যে বাড়ী নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আর অভ্যাগত মানুষের কলহাস্যে মুখরিত ছিল—সেটা যেন ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এসেছে।

একটা নীল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে কুশল, তার এই লাইব্রেরী ঘরে।

চুপচাপ বসে আছে মানুষটি যেন এক অসীম সমুদ্রের সামনে।

এই আলো-আঁধারী ঘরে একা একা চুপচাপ বসে কত কথাই না মনে পড়তে লাগলো।

মনে জাগল, কত সময় কুশল দুঃস্থ-সাহিত্যিকদের পুস্তক রচনার জন্য অর্থ সাহায্য করেছে।

আজ তার কেবলি থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল, তার নিজের এই বিচিত্র জীবনী সে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় নি কেন ?

নিজের জীবনী লিখতে গেলে কি অনেক অবান্তর কথা এসে পড়ত ?

অথবা ছেলেবেলার দুঃখের আর অভাবের কথা লিখলে আজকের দুনিয়ার চোখে সে খাটো হয়ে পড়ত ?

সবাই মুখ টিপে টিপে হাসত তার সেই ভুলে যাওয়া চরম দুর্দিনের কথা জানতে পেরে ?

আশে-পাশে কি অনেক ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে ? নাকি তার মগজেই রাশি রাশি ঝিঁঝিঁ পোকা বাসা বেঁধেছে ? কিছুতেই তাদের সেই ঝিম্‌ঝিমে ডাককে সরানো যাচ্ছে না ?

নিজের দু'টি আঙুল দিয়ে সে তার কপালটা টিপে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

কিন্তু ঝিঁঝিঁ পোকার সেই ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না।

কুশল আপন মনে ভাবতে লাগলো। যারা আজ তার জন্মতিথি উৎসবে যোগ-দান করে ঘরে ফিরে গেল—তারা কেউ খুশী হয়েছে, কেউ কেউ বাড়ীতে ফিরে গিয়ে ঈর্ষায় হয়ত অনেক নিন্দাবাদ করেছে। কেউ খোসামোদ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছে। আবার দিলদরিয়া অনেকে সুখ-শয্যায় আরামে নিদ্রা উপভোগ করছে। তাদের মনে কোনো গ্লানি নেই।

অপরের ঐশ্বর্য দেখে খুশী হয়, এমন মানুষও ত' দুনিয়ায় আছে!

এই জন্মদিনের উৎসবে যারা গৃহটি সজ্জিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, যারা ফুলের মালা সরবরাহ করেছে, যে সব লোক খাবারের জোগান দিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠান

আলোক মালায় বাড়ীটি রোশনাই করেছিল, যারা বিভিন্ন সময়ে এসে তাকে উপহার দিয়ে গেছে,—এমন কি যে সব ভিক্ষুক উৎসবের ফেলে-দেয়া খাবারগুলি খেয়ে তার জয়ধ্বনি করে নিজ নিজ ডেরায় ফিরে গেছে—সকলেই এখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে।

কিন্তু তার চক্ষে আজ রাত্রে ঘুম নেই কেন? তার সৌখীন শোবার ঘরে সুন্দর করে বিছানা পাতা আছে। রাত্রের আহারের জন্য নানা জাতীয় মুখরোচক খাদ্য ঢাকা দেয়া আছে, সাদা ধবধবে নেটের মশারি ফ্যানের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে, কিন্তু তার নয়নে নিদ্রা নেই!

এই অবস্থা ত' তার চিরদিন ছিল না। মায়ের বুকের কাছটিতে শুয়ে সে ছেঁড়া কাঁথায় দারুণ শীতে রাত কাটিয়েছে।

তখন ত' তার চোখ দু'টিতে ঘুমের অভাব হয় নি।

আজ কেন তার জানা সারা দুনিয়া ঘুম পাড়ানি মাসি-পিশির আল্‌তো ছোঁয়ায় সারাদিনের ক্লান্তিতে ভুলে সুখ-স্বপ্নে মগ্ন রয়েছে···আর সেই কেন একা জেগে থেকে বিভীষিকা দেখছে?

বিভীষিকা?

হঠাৎ এই কথাটি তার মনে এলো কেন?

সে ত' আজ সুখী, তৃপ্ত, সম্পদে ঐশ্বর্যে সার্থক।

তবে সে কেন গভীর রাত্রে বিভীষিকা দেখবে?

সে চোখ তুলে ঘরের দেয়ালগুলির দিকে তাকাল।

ওই ত' তার ছেলে-মেয়েদের হাসি মুখগুলি দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় শোভা পাচ্ছে—

ছোট মেয়েটির ফটোর দিকে তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না।

কোঁকৃড়া-কোঁকৃড়া একমাথা ভর্তি চুল। তার ওপর চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি।

দেখে মনে হয়—এখুনি বুঝি গান গেয়ে উঠবে। বাড়ির সবাইকার ফটোই সযত্নে টাঙ্গানো আছে। বাড়ির গৃহিণী খুশী-খুশীভাব নিয়ে তাকিয়ে আছেন—ছেলে-মেয়েদের দিকে।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়-আত্মীয়া,বন্ধুদের ছবিও রয়েছে। খাস খানসামার ছবিটিও বাদ পড়ে নি এই মিছিলের মাঝখান থেকে।

কুশল সারা জীবনে যত জায়গায় গিয়েছেন তারও ফটোগুলি রয়েছে দেয়ালের আর এক দিকে সাজানো।

কোথায়ও গেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে, আবার কোথায়ও পাড়ি জমিয়েছেন—নিছক দেশ ভ্রমণের আনন্দে।

ক্যামেরাম্যান কোনো ছবি তুলতেই ভুল করে নি। কিন্তু এই বহু রকম চিত্রের শোভা যাত্রায় কোথায় তার মা? তার একখানি ছবিও এই বিরাট গৃহের কোনো দেয়ালে স্থান পায় নি—

আজ তার দুখিনী মায়ের বিষাদ মলিন মুখখানি কি কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

॥ দুই ॥

তখনো ভোরের আলো সারা আকাশটায় ছড়িয়ে পড়ে নি। কখন যে মায়ের ঘুম ভেঙেছে কেউ জানে না।

সারা উঠোনটায় মা গোবর জলের ছড়া দিচ্ছেন, আর আপন মনে স্তোত্র আবৃত্তি করে চলেছেন।

এরই মধ্যে মায়ের মনে হ'ল—পূবের আকাশটা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। এইবার বোধকরি সকল আঁধার দূর করে দিয়ে রাঙা সূর্যি উঠবে।

কুশল কিন্তু তখনো জাগে নি।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের ভেতর মায়ের মুখের সেই—সংস্কৃত স্তোত্র ওর কানের ভেতর এক গুঞ্জরণের সৃষ্টি করেছে। তাতে শেষ রাত্তিরের মধুর স্বপ্ন আরো মিঠে হয়ে উঠেছে।

আরো কিছুক্ষণ এইভাবে মায়ের মুখের গুন গুন গান শোনা গেল।

ভোরের পাখ-পাখালি চারদিকে ডাকাডাকি সুরু করেছে।

মা হঠাৎ উঠোন থেকে হাঁক দিলেন, ওরে কুশু, তুই কি আজ উঠবি নে? এরপর রদ্দুরে সারা উঠোন ছেয়ে যাবে।

কুশল এই ডাকটির জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু বিছানাটা ছাড়তে পারছিল না।

এইবার এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো কুশল। তারপর লাফাতে লাফাতে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

মা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন, একি, একেবারে আদুল গা যে! এক্ষুণি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। যা, দোলাইটা জড়িয়ে নে গায়ে।

তারপর গলাটা একটু খাটো করে আদরের সুরে কইলেন, আচ্ছা কুশু, তোর কি

বুদ্ধি-সুদ্ধি আর কোনো কালেই হবে না ? হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করলে তখন উপায় ? এর পর আবার পাঠশালায় যেতে হবে—

কুশু কিন্তু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ঠিক বাদুড়ের মতো ঝুলতে লাগলো।

মা হাসতে হাসতে বললেন, আর আদর খেতে হবে না। চারদিকে তাকিয়ে দেখ, দিনের আলো দিব্যি ফুটে উঠেছে।

কুশল মায়ের গলা ছেড়ে দিয়ে উঠোনের এদিক-ওদিক পানে চেয়ে দেখলে—

ওদের উঠোনের এক ধারে শিউলী গাছের তলায় রাশি রাশি ফুল পড়ে যেন সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর সাদা আর হলদে চিকণের কাজ তৈরী করেছে।

তাছাড়া শিউলী ফুলের মিষ্টি সুবাস সারা উঠোনটাকে যেন মাতিয়ে রেখেছে।

ওদিকে গোয়াল ঘরের পাশের ছোট ঘরটি থেকে একদল হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ করতে করতে পুকুরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভোর হয়ে গেছে, এখন আর ওদের অন্ধকার ঘরে আট্‌কে রাখা যাবে না। তাই ছোট বাখারীর দরজাটা খোলার শব্দ পেয়েই ওরা দল বেঁধে পুকুরের জলে গুগ্‌লীর সন্ধানে চলেছে।

গাই দু'টোও হাম্বা হাম্বা রব তুলেছে গোয়াল ঘরে। ওদেরকে বের করে এনে এখন দুধ দুইতে বস্‌বে—বিষণ খুড়ো।

বিষণ খুড়ো একটু দূরে গোয়ালা পাড়ায় থাকে। কিন্তু কুশলের সঙ্গে ভারী ভাব।

কুশলদের অনেক কাজ বিষণ খুড়ো প্রাণের টানে করে দিয়ে যায়।

আশে-পাশের ফুল গাছগুলিতে নানা জাতের আর নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। তারই তলায় তলায় যে ঘাসের জমি আছে সেখানে মুক্তোর মতো ফোঁটা ফোঁটা শিশির জমে আছে। এই শিশির হাত দিয়ে তুলে নিয়ে কুশল ঠোঁটে আর মুখে মাখতে লাগলো। তাতে নাকি ঠোঁট ফাটে না!

মা বললেন, ঘুঁটের ছাই আছে উনুনের ধারে। একটুখানি হাতে করে নিয়ে সোজা পুকুরঘাটে চলে যা। ভালো করে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে আসবি। দাঁতে যেন ময়লা জমতে না পারে। এর মধ্যে বিষণ এসে পড়বে। সে গাইয়ের দুধ পানিয়ে দেবে। ঘরে মুড়ির মোয়া আছে। কলাও বোধ করি পেকেছে। তাই মেখে খেয়ে পাঠশালায় চলে যাবি।

ওদের পাঠশালা সকাল বেলা বসে। দুপুর বেলা পণ্ডিতমশাই কোন দোকানে গিয়ে যেন খাতা লেখেন।

কুশল পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে হাজির হ'ল। অনেকগুলি শাপলা ফুটে আছে ঘাটলার আশে-পাশে। একটা বড় নারকেল গাছের গুড়ি কেটে এই ঘাটলা তৈরী করা হয়েছে। অনেক ওপরে পাড়। মাটি কেটে সিঁড়ির মতো থাক করা হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে ঘাটলায় এসে পৌঁছুতে হয়।

এই পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। কুশল তাদের অনেককে চেনে। তাদের মজার মজার সব নাম দিয়েছে।

—রাঙা মূলো, বিজলী আলো, ঢেউ জাগানো, মনভোলানো—এ সব নাম কুশলের দেয়া।

অনেক সময় বন্ধুদের ডেকে ঘাটলায় এনে হাজির করে। মুড়ি ছিটিয়ে দেয় জলের ওপর।

তখন এই সব মাছের দল এসে ঘাটলার ধারে ভীড় করে।

কুশল বন্ধুদের মাছগুলি সব চিনিয়ে দেয়। কার যে কোন নাম—বন্ধুরা ঠিক ঠিক বলতে পারে না।

কুশলের কিন্তু কখনো ভুল হয় না।

ওই যে টক্‌টকে লাল রুই মাছ—ওর নাম রাঙা মূলো। আর ওই যে ঝিলিক মারছে চিতল—ওটার নাম—ঢেউ জাগানো। আর মন-মাতানো—কোনটা, বল দেখি ?

ছেলের দল এদিক-ওদিক তাকায় ঠিক মত জবাব দিতে পারে না।

কুশল তখন প্রাণখুলে হাসতে থাকে।

—কেমন তোদের ঠকিয়ে দিলাম,—দেখলি ত' ?

ওদিকে উঁচু পাড়ের ওপর থেকে মায়ের ডাক শোনা যাচ্ছে—

ওরে কুশু, ঘাটলা থেকে তাড়াতাড়ি চলে আয়—বিষণ এসেছে। গাইয়ের দুধ পানাতে বসেছে।

কুশল লাফে লাফে উঠে এলো উপরে।

গোয়াল ঘরের কাছে এসে দেখে বিষণ খুড়ো দিব্যি উবু হয়ে বসে একটি বড় হাঁড়িতে দুধ পানিয়ে নিচ্ছে।

মা আর ছেলে—ওরা ত' মোটে দু'জন—তাই পরিমাণে অনেক দুধ ওদের বেশী হয়। মা নানা রকম ক্ষীরের সাজ, আর পিঠে-পায়েস তৈরী করেন এই দুধ থেকে।

ওদের গাইয়ের দুধে ত' এক ফোঁটা জল মেশানো হয় না। তাই সে দুধের স্বাদের তুলনা নেই।

মায়ের ব্যবস্থা মত গরম দুধ, মুড়ির মোয়া আর কলা মেখে মজা করে ফলার করে কুশল পাঠশালায় রওনা হ'ল।

গাঁয়ের কয়েকটি ছেলে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল পথের ধারে।

এক বন্ধু জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে কুশল, আজ তুই আসতে এত দেরী করলি কেন ?

কুশল চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে ওর দিকে তাকালে। বললে, হুঁ! হুঁ! সে এক ভারী মজার ব্যাপার।

সবাই এগিয়ে এলো, কি রে কি ?

কুশলের মুখে সেই দুষ্টুমীর হাসি লেগেই আছে।

উত্তর দিলে, আজ আমার পুকুরের মাছগুলোকে ভালো করে দেখে এলাম।

আর এক বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, রাঙা মূলো, বিজলী আলো, ঢেউ খেলানো আর মনভোলানো ?

কুশল বললে, হ্যাঁরে ওরাই। দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে পুকুরের টল্‌টলে জলে। আরো অনেক বেড়ে গেছে। দেখতে শুন্‌তেও ঝক্‌মকে হয়েছে!

ছেলের দল শুনে খুব খুশী হ'ল।

বললে, আর একদিন দল বেঁধে গিয়ে তোর মাছগুলোকে ভালো করে চিনে আস্‌বো। রাঙা মূলোটাকেই বেশ চেনা যায়। আর সব মাছগুলো যে সবার সঙ্গে মিশে পড়ে।

ওরা গল্প করতে করতে পাঠশালার দিকে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে পথের ধারে একটা পোড়ো বাড়ির উঠোনে একটা পেয়ারা গাছে অনেকগুলি পেয়ারা পেকে আছে দেখা গেল।

ছেলের দলের তখন কি আর পাঠশালার কথা মনে থাকে ? একবার সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকালো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঙ্গপালের মতো।

দেখতে দেখতে গোটা গাছটা একেবারে সাফ্‌ হয়ে গেল। আর ছেলেদের কোঁচড় আর পকেট ভর্তি হয়ে উঠল।

এতক্ষণে বাছাধনদের মনে পড়ল যে অনেক দেরী হয়ে গেছে, এইবার পাঠশালায় গেলে পণ্ডিত মশায়ের বেত নিশ্চয়ই পিঠের ওপর পড়বে।

তখন ছেলের দলের মধ্যে দু'টো ভাগ হয়ে গেল। এক দল বলছে, আর পাঠশালায় গিয়ে কাজ নেই। তার চাইতে চল—সোজা নদীর পথে চলে যাই। সেখানে যেতে যেতে দিব্যি পেয়ারাগুলো সাবাড় করা যাবে।

আর এক ভাগ কিন্তু ওদের কথায় রাজী হ'ল না।

তারা বললে, চল ত' আগে দেখা যাক—ইস্কুল বসেছে কি না। তারপর অবস্থা বুঝে পাঠশালার পেছন দিক দিয়ে সট্‌কান দিলেই হবে।

আবার দু'দল একমত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেল।

একটি ছেলে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল। পাঠশালার দরজা ত' বন্ধ!

তখন সে পাঠশালার পেছনে পণ্ডিত মশায়ের ঘরের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। পণ্ডিত মশায়ের ভাইপো আর দু'টি ছেলের সঙ্গে মারবেল খেলছে। তাদের কাছে জানা গেল পণ্ডিত মশায়ের জ্বর হয়েছে। আজ আর পাঠশালা বসবে না।

এই সুখবরটি দেবার জন্যে ছেলেটি ছুটতে ছুটতে নিজেদের দলে ফিরে এলো।

তখন সবাই মিলে হল্লা করে নদীর পথে রওনা হ'ল। এমন সুখবরটি যে ওরা সকালবেলা পাবে—সে কথা ভাবতেই পারে নি!

সকলেরই কোঁচড় ভর্তি টস্‌টসে পাকা পেয়ারা। সেইগুলো চিবুতে চিবুতে দারুণ কোলাহলে ওরা যেন বিশ্ব জয় করতে এগিয়ে চললো।

ছেলের দলের উল্লাসের নমুনাই আলাদা। ওরা পেয়ারা যত না খাচ্ছে—তার বেশী ছড়িয়ে ফেলছে। কয়েকজন কিষাণ ভাই গরু নিয়ে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল—জমি চাষ করতে।

ওরা দল বেঁধে তাদের পথের মাঝখানে থামিয়ে দিলে। তারপর নিজের নিজের কোঁচড় থেকে পেয়ারাগুলি বের করে দিয়ে বলবে, কিষাণ ভাইরা, এই পাকা পেয়ারা-গুলো সঙ্গে নিয়ে যাও। লাঙল চালাতে চালাতে যখন খিদে পাবে—এইগুলো খেও।

কিষাণ ভাইরাও খুশী হয়ে পেয়ারাগুলো নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

তখন ক্ষুদে পড়ুয়ার দল গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চললো।

আরো কিছু দূর চলে যাবার পর ছেলেদের চোখে পড়ল—গাছের উঁচু ডালে কয়েকটি পাখী বাসা বাঁধছে। কোথা থেকে খড়-কুটো সব কুড়িয়ে এনেছে।

পাখীর দল আপন মনে চ্যাঁচামেচি করছে আর বাসা বেঁধে চলেছে।

ছেলের দল পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে ওদের নিপুণ কাজ দেখতে লাগলো।

একটি ছেলে বললে, এই পাখীর বাসা ভাঙতে হবে। আর কয়েকটি ছেলে তার ওই কথায় আপত্তি তুললে।

বললে, ওরা আপন মনে কেমন সুন্দর কাজ করে চলেছে। সেগুলো ভেঙে ফেলবার কি দরকার শুনি?

আর এক দল ফোড়ন কেটে উত্তর দিলে, আরে বোকচন্দর, ভেঙে ফেলাতেই ত' মজা। দেখবি ওরা কেমন চ্যাঁচামেচি করে; আর একটি ছেলে বললে, ঠুকরে দিতেও ত' পারে?

ইস্‌! অমনি ঠুকরে দিলেই হ'ল। আমাদের হাতে ছুরি থাকবে না?

দু'টি উৎসাহী ছেলে লাফিয়ে উঠল গাছে।

বেশীর ভাগ ছেলে দাঁড়িয়ে রইল নীচে, কি ঘটে মজা দেখবার জন্যে।

বেশ পুরোনো,—অনেক দিনের গাছ।

ছেলে দু'টো সবে ডাল বেয়ে খানিকটা উঠেছে এমন সময় গাছের কোটরের ভেতর ফোঁস্ ফোঁস্‌ শব্দ শুনে সবাই চমকে গিয়ে মাথার ওপর দিকে তাকালো।

সেই আঁধার কোটরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে—একটি কাল সাপ!

ফণা তুলেছে উঁচু করে। এই বুঝি ছোবল মারে। একটি ছেলে ভয় পেয়ে গাছের ডাল ছেড়ে দিয়েছে।

অমনি ধপাস্ করে পড়ে গিয়েছে নীচে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছেলেদের সোরগোল।

পা ভাঙল নাকি ছেলেটার ? চ্যাং দোলা করে তুলে ধরলে তাকে—সবাই মিলে।

॥ তিন ॥

সেই কোন সকালে বেরিয়ে গেছে ছেলে—এখনো বাড়িতে ফেরবার নামটি নেই! রান্নাঘরে মার মন টিঁকছে না! কেবলি ঘর-বার করছেন মা!

ছেলে হেলেঞ্চা শাক খেতে ভালোবাসে। মা বিষণকে দিয়ে সে শাকের ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে বেতের আগা দিয়ে তেতো ডাল পছন্দ করে। মায়ের সে দিকেও নজর আছে।

পটল পাতার বড়া কুশুর ভালো লাগে। কিন্তু কার জন্যে এ-সবের ব্যবস্থা করা ?

ছেলে ত' কখনো পাঠশালা থেকে ফিরতে এত দেরী করে না।

মায়ের কত আশা এই ছেলে বড় হবে,—মানুষ হবে—দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে,—তবেই ত' মায়ের বুকে শান্তি ফিরে আসবে।

কিন্তু ছেলে যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে মন্দ হয়ে যায়—তা হলে ত' ভস্মে ঘি ঢালা হবে।

মায়ের দু'চোখ জলে ভরে আসে। কিন্তু কি যে তাঁর বেদনা—কাউকে মুখ ফুটে বলা যায় না। মা কইতেও পারেন না, আবার সইতেও পারেন না, আপন মনে গুম্‌রে কেঁদে মরেন।

শেষকালে অনেক তেতেপুড়ে—যেন দুপুর বেলার গন্‌গনে রোদ সাঁতরে মুখ লাল করে ছেলে বাড়িতে ফিরে এলো।

মা একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিচ্ছু তাকে বললেন না।

কুশল বুঝতে পারলে মা ভারী চটে গেছেন। তাই এখন আর কোনো কথা নয়।

সোজা গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মা। আগে আমায় খেতে দাও—

ছেলে জানে মায়ের কাছে ক্ষিদের কথা বললে, মায়ের সব রাগ জল হয়ে যাবে।

মা-ও কোনো কথা বললেন না, ছেলেকে খেতে বসিয়ে দিলেন। ছেলে তখন একটুখানি মনের জোর পেয়ে বললে, 'মা তুমি খেয়ে নাও, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

মা ছেলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। চুপচাপ নিজের কাজ সেরে নিলেন।

তারপর হেঁসেলে ঢুকে কোনো রকমে নিজের খাওয়া সেরে চলে এলেন।

কুশল মনে মনে ভাবছে, মা আজ খুব রেগে গেছে। তাঁকে আগে ঠাণ্ডা করতে হবে। অন্যান্য দিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দিব্যি এক ঘুম লাগায়। কিন্তু আজ মায়ের মনকে নরম করতে হবে। তাই এদিক-ওদিক না তাকিয়ে খাতা খুলে বসল—অঙ্ক কষতে হবে।

ইতিমধ্যে মা হাত মুখ ধুয়ে মুখ-শুদ্ধি করে, নিজের খাটের ওপর গিয়ে বসলেন।

খোকা নিজের খাট থেকে তাকিয়ে সেটা দেখলে। তারপর বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অঙ্ক কষতে সুরু করে দিলে।

খানিকটা সময় একেবারে চুপচাপ। তারপর মা ডাকলেন—খোকা, শুনে যা আমার কাছে।

কুশল ডাক শুনে চম্‌কে উঠল। মা যখন কুশু বলে ডাকেন—বোঝা যায় সেটা আদরের ডাক—। কিন্তু যখন খোকা বলে মা গম্ভীর গলায় আদেশের সুরে কিছু বলেন, ছেলে বোঝে সেটা শাসনের সুর।

কুশল তখন চুপচাপ খাতা-পত্র বন্ধ করে মায়ের খাটের কাছে হাজির হ'ল।

খোকা বুঝলে, মা তাকে সত্যি কিছু বলবেন, আর সে কথার ওপর কোনো আপিল চল্‌বে না।

মা ছেলের দিকে একবার তাকালেন। ছেলেও অপরাধীর মতো মায়ের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে।

কুশল হঠাৎ মায়ের গা ঘেঁসে বসে পড়ে বললে, 'তুমি রাগ কোরো না মা। আজ পণ্ডিত মশায়ের জ্বর হয়েছে বলে পাঠশালা বসে নি। ভাবলাম, তখুনি বাড়িতে ফিরে আসবো। কিন্তু পাঠশালার একটি ছেলে পাখীর বাসা নিতে একটা গাছের উঠেছিল। সেখানে একটা সাপ ওকে তাড়া করে। ভয় পেয়ে ও গাছ থেকে পড়ে যায়। পা-টা বুঝি ভেঙেই গেছে। তাই নিয়ে ত' এতক্ষণ ধরে সবাইকার হুজ্জুৎ চল্‌ছিল। ওদের বাড়িতে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। কবরেজমশাই এসে দেখে কি সব পায়ে বেঁধে দিয়ে গেছেন।

এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে কুশল হাঁফাতে লাগ্‌লো।

মা সব কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর

মৃদু কণ্ঠে বললেন—খোকা, আমি তোমায় বলেছি না, পাঠশালার পড়া শেষ হলে সোজা বাড়িতে চলে আস্‌বে। রাস্তায় রাস্তায় দুষ্টুমী করে ফিরবে না ?

কুশল মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের ভঙ্গীতে বললে—আর কখনো দুষ্টুমী করবো না মা। তুমি আমায় কিচ্ছু বোলো না মা।

তারপর হঠাৎ নিজের গলার স্বরে একটা আহ্লাদে ভাব এনে বললে—মা, তোমার বেতাগের তেতো ডাল আজ এত স্বাদের হয়েছে যে কী বলব।

এইবার মা হেসে ফেললেন। বললেন—হুঁ! ওই সব বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা! কিন্তু আজ আমি কিছুতেই ভুলছি নে।

খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ রইলেন মা।

তাপর বললেন—খোকা, তুই একটু একটু করে বড় হচ্ছিস—আমার চোখের সাম্‌নে। তুই নিজে বুঝতে পারিস নে। কিন্তু আমি রোজ ভোরে তোকে দেখি। অনেক রাত্তিরে যখন তুই ঘুমিয়ে থাকিস, আমি মাটির প্রদীপ ধরে তোর মুখখানি দেখি—

খোকা, তুই কি মানুষ হয়ে তোর এই দুখিনী মায়ের দুঃখ দূর করতে পারবি নে ?

খোকা চেয়ে দেখল—মায়ের দু'টি চোখে জল টল টল করছে।

সে লজ্জা আর অনুশোচনায় মায়ের বুকে মুখ লুকোলো। তার গলার ভেতর দিয়ে কিসের একটা পিণ্ডি পাকিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে আসতে চাইল।

কিন্তু সে মনে মনে ঠিক করল—কিছুতেই কাঁদবে না। মা ছেলের কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগলেন।

তারপর বললেন,—আমরা চিরকাল এমন গরীব ছিলাম নারে খোকা। তোর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন—তখন আমাদের অনেক ধানী জমি ছিল! কত পুকর আর গোলাবাড়ী ছিল।

পাকা ধানে ভর্তি থাকত সেইসব গোলাঘর। সারা বছর ধরে চালান যেত ধান—নৌকো করে।

তারপর তুই এলি আমার কোলে। তখন আমাদের বাড়-বাড়ন্ত সংসার।

তোর বাবা ঠিক করলেন, পাকা দালান তৈরী হবে—ইট পোড়ানো হ'ল নদীর ধারে।

তোর বাবার কত আশা পাকা দোতলা দালান হবে। বাড়ির সাম্‌নে থাক্‌বে ফুলের বাগান, আর পেছনে থাক্‌বে ফলের বাগান।

দিন-রাত শুধু নক্সা তৈরী করতেন তোর বাবা। আমায় দেখাতে এলে বলতাম—ওসব আমি কি বুঝি ? তোমার খোকাকে দেখাও।

শুনে তোর বাবা হাসতেন। তখন তুই কতটুকু। ঠিক যেন একটা পুতুলের মতো।

তোর বাবা তোকে কোলে তুলে নিয়ে নাচাতেন, আর কেবলি জিজ্ঞেস করতেন—তুই কোন ঘরটায় থাকবি রে খোকা? সেই ঘরে তোর ভালো কাঁঠাল কাঠের টেবিল তৈরী করে দেবো। তুই পড়াশোনা করে একেবারে বিদ্বান হয়ে উঠবি। চাই কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পড়বি।

কথা বলতে বলতে মা খানিকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই খোকা যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে মন্দ হয়ে যায়—পড়শোনা না করে, তা হলে আমি আর কি করতে পারি বল? তোর বাবা ত' স্বর্গ থেকে সবই দেখছেন! তুই কোথায় যাচ্ছিস—আর কার সঙ্গে মিশছিস—সব কিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন তিনি।'

খোকা মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আর আমি কখনো দুষ্টু হবো না মা! কখনো আর মন্দ কাজ করবো না। দেখো—কেমন মন দিয়ে আমি এখন থেকে পড়াশোনা করি।

কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

মা আর ছেলের চোখের জলের দু'টি ধারা এক সঙ্গে মিশে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে ছেলে মুখ তুলে তাকালো। মাকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মা, বাবার কি অসুখ করেছিল?

মার মুখখানি একেবারে বেদনায় মাখামাখি হয়ে গেল। কোনো দিন ত' ছেলের কাছে এসব দুঃখের কথা বলেন নি। তবু আজ বুকে বল এনে ছেলের কাছে সব কিছু বল্‌বেন ঠিক করলেন।

ধীরে ধীরে মা বলতে লাগলেন:

দিন রাত ছুটোছুটি আর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তোর বাবার শরীরটা ক'দিন থেকে বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। তারপর একদিন আবার দারুণ বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরে এলেন।

সেই দিন রাত থেকেই খুব জ্বর সুরু হয়ে গেল। কয়েকদিন গেল যমে-মানুষে টানাটানি।

আমি তখন একা মানুষ সংসারে। কোন্‌দিক যে সামলাবো—বুঝে উঠতে পারলাম না।

গাঁয়ের পুরোনো কব্‌রেজ মশাইকে খবর দেয়া হ'ল।

তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে নানা রকম বড়ি আর ওষুধের ব্যবস্থা করলেন।

এই বলে মা একটু নীরব রইলেন।

তারপর যেন চোখের সাম্‌নে কি একটা ঝাপ্‌সা ছবি দেখতে পারছেন—এইভাবে কইতে লাগলেন—

সে রাত্তিরের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। সন্ধ্যে থেকে যেমন ঝড় যেমনি বৃষ্টি!

যত রাত বাড়ে তত ঝড়ের তাণ্ডব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সেই সঙ্গে তোর বাবার জ্বরের তাপও বাড়তে সুরু করে। কাউকে যে একটা খবর দেবো, সে উপায়ও নেই।

এই ঝড়ের দাপাদাপিতে কোবরেজ মশাই এসে আর দেখে যেতে পারেন নি।

আমি ওই রোগীকে নিয়ে তখন অকূল পাথারে পড়লাম।

একবার ভাবলাম, নিজেই ভিজতে ভিজতে গিয়ে কোবরেজ মশাইকে ডেকে নিয়ে আসি! আবার তখুনি মনে হ'ল—এই রোগীকে একা ফেলে আমি বাড়ি ছেড়ে কি করে যাবো? সেই সময়ে যদি একটা কিছু বিপদ ঘটে?

কি করি,—কোন দিকে যাই—আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মনে হ'ল—পৃথিবীর শেষ দিন যেন ঘনিয়ে এসেছে।

এমন মুষলধারে বৃষ্টিও আর কখনো দেখি নি।

সেই একলা বাড়িতে—সেই জল-ঝড়ের রাত্রে নিতান্ত অসহায়ের মতো ভগবানকে ডেকে বললাম—'আমি আর কিচ্ছু চাইনে, তুমি এই মানুষটির প্রাণটিকে বাঁচিয়ে রাখো—'

তারপর আমি হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। সেই আচ্ছন্নভাব কেটে গেল বিষণের ডাকাডাকিতে—

ওই দারুণ ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে বিষণ ছুটে এসেছে আমার এই চরম বিপদে।

তখন মনে হ'ল ভগবান যেন আমার কথা শুনতে পেয়েছেন। তাই ঠিক দেব-দূতের মতো বিষণকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমাকে এই চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

বিষণ আমায় বললে, 'হঠাৎ আচম্‌কা ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর মনে হ'ল তোমাদের এই সাঙ্ঘাতিক বিপদের কথা। বাড়িতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই সে-কথা ত' আমি জানি।'

একা একা তুমি মা কি করবে? রোগী যদি তোমার কথা না শুনে বিছানা ছেড়ে উঠতে চায়—তা হলে তুমি খুবই মুস্কিলে পড়বে—তাকে সামাল দিতে।

ওদিকে মাথার ওপর কাল-ভৈরব যেন মরণের শিঙা বাজিয়ে চলেছে!

কিন্তু আর কিছু ভাববারও সময় ছিল না। যে কোনো সময় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওই জল-ঝড় মাথায় নিয়ে মহাদেব আর নন্দী-ভৃঙ্গীর নাম নিয়ে

বেরিয়ে পড়লাম। আমার চোখের সামনে কত বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল। জাত গোয়ালার ছেলে—বড় কঠিন প্রাণ। তাই কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে ছুটতে ছুটতে এসেছি—'

মা বলছিলেন,—সেই কাল-রাত্তিরে বিষণ নিজের জীবনকে যেন বাজি রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল—

প্রথমে গেল—কোবরেজ মশায়ের বাড়ি।

কিন্তু তিনি বুড়ো অথর্ব মানুষ। তাঁর বাড়ির লোকেরা তাঁকে কিছুতেই ওই দুর্যোগের মধ্যে বেরুতে দিলে না। তিনি বিষণের হাতে মকরধ্বজ, কস্তুরী-ভৈরব আরো কি সব ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বৃষ্টির তোড়ে সেই ওষুধ কোথায় ভেসে গেল।

বিষণ কিন্তু এতটুকু দমে নি।

তারপর ছুটেছিল তোর জ্যাঠা-মশায়ের বাড়ি। কিন্তু তাঁরাও কেউ ওই জল-ঝড়ে বেরুতে পারলেন না।

শেষ রাত্তিরে তোর বাবার জীবন-দীপ যেন দম্‌কা হাওয়ায় নিবে গেল!

॥ চার ॥

এর পর কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

মা আর ছেলে যেন পাথরের মূর্তির মতো নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল।

অনেকক্ষণ বাদে কুশল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, "মাগো, এমন করে আমার বাবার কথা ত' তুমি কখনো আমায় বলো নি!"

মা উত্তর দিলেন, "ভেবেছিলাম, তোকে আগে আমার মনোমত করে মানুষ করে তুলবো। তারপর তোর বাবার আশা-আকাঙ্খার কথা সব খুলে বলব। কিন্তু খোকা, তুই যদি দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাস—তা হলে কোন্ আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো?"

মায়ের চোখে জল—

খোকার চোখেও জল—!

কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছে না!

খোকা মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললে, "আর আমার ভুল হবে না। আজ থেকেই আমি আমার পড়বার টেবিলটা ঠিক করে জানলার ধারে বসিয়ে নেবো। আমার বই-পত্তর, খাতা-পেন্সিল, সব গুছিয়ে নেবো। তুমি দেখে নিও মা, এখন

থেকে আমি রোজকার পড়া রোজ করবো। কোনো দিন অঙ্ক কসতে ভুল হবে না।" খোকার কথা শুনে মায়ের মুখ-চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা বললেন, "শোন খোকা, তুই খুব ভালো কথা বলেছিস। আমাদের কিছু নেই। আমরা গরীব মা আর ব্যাটা। সব আবার নতুন করে সুরু করবো। যা কিছু ক্ষুদ-কুড়ো আছে আমাদের, আবার নতুন করে গুছিয়ে নেবো।"

একটু থেমে মা বললেন, "ভালো কথা, আজই ত' লক্ষ্মীবার। আজ আমাদের আঁধার ঘরে লক্ষ্মী পূজো করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন জীবন সুরু করবো।"

খোকা জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা মা, লক্ষ্মীপূজো করবে, আর সেই সঙ্গে সরস্বতী-পূজো করবে না ?

মা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, "তোর রোজকার পড়াশোনাই ত' সরস্বতীপূজো। জ্ঞান লাভই ত' সরস্বতীর আরাধনা। তাও সুরু হবে আজ থেকে।"

মা তার পুরোনো ট্রাঙ্ক বের করে সব মেঝেতে ঢেলে ফেলে ধুলো-বালি ঝেড়ে গুছিয়ে গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

মা মৃদু হেসে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানিস খোকা, এটা আমার বিয়ের ট্রাঙ্ক। আমার বিয়ের পর আমার মা সব কিছু এই ট্রাঙ্কে গুছিয়ে দিয়েছিলেন।

খোকাও এগিয়ে গেল দেখবার জন্য "এই তোমার বিয়ের ট্রাঙ্ক—? দেখি কি কি আছে এর ভেতর।"

মা উত্তর দিলেন, "অনেক কিছুতে ঠাসা ছিল এই ট্রাঙ্ক। দু'টি মানুষ চাপা দিয়ে এটাকে বন্ধ করতে পারত না। আজ একেবারে খালি—শূন্য বাক্স ঢল ঢল করছে।„

মা এই ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুঁজে পেলেন।

মা বললেন, "জানিস খোকা, তোর বাবা যখন আমায় ছেড়ে চলে গেলেন—আমি লক্ষ্মী পূজো বন্ধ কর দিলাম। ভাবলাম, আমিই অলক্ষ্মী, আর এ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো করে কি হবে ? কিন্তু আজ ভাবছি, তোর কল্যাণের জন্য আবার মা লক্ষ্মীর ঘট বসাতে হবে। লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন করতে হবে।"

—"মা এটা কার ফটো ?"

কুশল বাক্সের একেবারে তলা থেকে একটি ছোট ফটো হাতে তুলে নিলে।

দেখেই মনে হ'ল অনেকদিনের তোলা ফটো। প্রায় আবছা হয়ে এসেছে। তবু মুখটিকে চেনা যায়।

মা কোনো কথা বলছেন না। কুশল আবার জিজ্ঞেস করলে, "কার এই ফটো তোমার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছ ? আমায় বলো না।"

মৃদু স্বরে মা উত্তর দিলেন, "তোর বাবার ফটো। "দেখি-দেখি—আমার বাবার ফটো ?"

কুশল সচকিত হয়ে উঠল।

খানিকক্ষণ আগেও এই ফটোটির কোনো মূল্য ছিল না কুশলের কাছে-। কিন্তু যে মুহূর্তে তার মায়ের মুখে শুনলো যে, ওটা তার বাবার ছবি, তক্ষুণি সমস্ত মন-প্রাণ উন্মুখ হয়ে উঠল—সেই ছবিটি ভালো করে দেখবার জন্যে।

একদৃষ্টে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুশল সেই ফটোখানার দিকে।

ওর বন্ধু-বান্ধব, খেলার-সাথী যত আছে—সবাইকার বাবা আছে। কিন্তু কুশলের বাবা নেই।

সেই জন্যে ওর মনে একটা অজানা বেদনা জমাট বেঁধে আছে। দেখে চোখ আর ফেরাতে পারে না কুশল।

অনেক কালের তোলা পুরানো ফটো—তবু মুখখানা দিব্যি বোঝা যায়।

কুশলের হঠাৎ মনে হ'ল—তার নিজের মুখটাও অনেকটা এই রকম দেখতে।

কুশল তার দুখিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে' "আচ্ছা মা, তুমি বাবার ফটোটা সুন্দর করে বঁধিয়ে কেন ঘরে টা।নিয়ে রাখো নি ? তা হলে ত' এমন আবছা হয়ে যেতো না !"

মা উত্তর দিলেন "কে আমায় বাঁধিয়ে দেবে ?" মা আর ছেলের বুকে কত কথা ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগলো—কেউ কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না।

কিছুক্ষণ বাদে বিষণ এসে উঠোনে ঢুকলো। বললে, ';মা-ব্যাটাতে চুপ-চাপ ঘরের ভেতর বসে থাকলেই হবে ? আজ আর রান্না-বাড়া কিছু হবে না ? আমি বাজারে যাচ্ছি—কি আনতে হবে বলো—"

মা এগিয়ে এসে বললেন, "শোন বিষণ, আজ লক্ষ্মীবার। আজ আর মাছ এনে দরকার নেই। খোকা আজ আমার হেঁসেলেই খাবে। লক্ষ্মীপূজোর জন্যে কিছু ফলমূল নিয়ে আসিস্। এই নে পয়সা—"

সারাদিন ধরে মা-আর ছেলেতে ঘরের সব জঞ্জাল সাফ করলে।

কুশল তার বাবার ফটো কোথায় লুকিয়ে রাখলে ওর মাকে আর দেখালে না।

ঘরের কোণে কোণে অনেক মাকড়শার জাল জমেছিল—মা সেগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন।

ঘরে লক্ষ্মীর পট আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসাতে হবে। এখন কি আর ঘরে জঞ্জাল জমিয়ে রাখা চলে ?

মালকোঁচা মেরে খোকাও মায়ের সঙ্গে ছুটোছুটি করে কাজ করতে লাগল। ওর মনটা খুব খুশী খুশী হয়ে উঠল।

কুশলের পড়ার টেবিলের আশে-পাশেও অনেক জঞ্জাল জমেছিল। ছেঁড়া কাগজের টুকরো, ঘুড়ি তৈরীর লাল-নীল কাগজ, কাঠি আর লেই। পুরোণো বছরের ক্যালেণ্ডার, আরো কি সব আছে বাজে জঞ্জাল। মাথার ওপর ঝুলও জমেছিল বিস্তর।

ঝাঁটা চালিয়ে কুশল সব সাফ করে ফেললে। তারপর নিজের পড়বার বইগুলি খুঁজে খুঁজে বের করল। শ্লেট আর পেন্সিল যে কোথায় গড়িয়ে পড়েছিল, নতুন করে তার সন্ধান করল কুশল।

ওর পড়ার টেবিলের ওপর মায়ের একটা পুরোনো খদ্দরের চাদর পেতে নিল। তারপর একধারে বই, অন্যদিকে শ্লেট-পেন্সিল, হাতের লেখার খাতা, অঙ্কের খাতা সব গুছিয়ে রাখল।

মা ইতিমধ্যে ঘরের জঞ্জাল সব সাফ করে ফেলেছেন। তারপর একটি মাটির হাড়িতে গোবর আর মাটি গুলে নিয়ে সারাটা ঘর সুন্দর করে নিকিয়ে ফেললেন মা।

মা ডেকে বললেন, "এখন আর ঘরের ভেতর আনাগোনা করিস নে কুশু।"

কুশল জিজ্ঞেস করলে, "কেন মা, যেতে বারণ করছ কেন? আমিও না হয় তোমার সব কাজ হাতে-হাতে করে দিতাম।"

ওর কথা শুনে মা হেসে উঠলেন।

বললেন, "ওরে বোকা ছেলে সেজন্যে বারণ করি নি।"

—"তবে?"

—"এখন ঘরটা নিকিয়ে ফেললাম ত'? এই সময় ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে কাদার চাপড়া উঠে উঠে আসবে। তাই খানিক্ষণ ঘরটাকে শুকুতে দিতে হবে। মেঝেটা না শুকুলে আলপনা দেবো কি করে?"

কুশলের মুখ-চোখ আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, "তুমি আজ আলপনা দেবে মা?"

মা কুশলের হাসি-খুশী মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, "আজ নতুন করে লক্ষ্মীপূজো সুরু করছি ত'! লক্ষ্মীর পট বসাবো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি বসাবো। তাই আজ আলপনা দিতে হয়। সেই জন্যেই ত' ঘরের মেঝেটা গোবর জল দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে নিলাম।"

সব দেখে আর মায়ের মুখের কথা শুনে কুশলের বেশ ভালো লাগছে।

তাই সে জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা মা, তুমি আলপনা দিতে পারো? কার কাছে শিখলে শুনি?"

মা খোকার কথা শুনে এত দুঃখেও হি-হি করে হেসে উঠলেন।

বললেন, "বোকা ছেলে। আমিও ত' একদিন ছোট্ট মেয়ে ছিলাম। জানিস খোকা, আমার মা খুব ভালো আলপনা দিতে পারতেন। কি সুন্দর কাঁথা শেলাই করতে পারতেন। আমি আমার ছেলে বয়েসে তাঁর কাছেই সব শিখেছিলুম।"

কুশল বললে, "তুমি ভারী মজার কথা বলেছ মা! তুমি তখন ছোট্ট মেয়ে, ডুরে শাড়ী পরে মায়ের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে ঘুরছ, ছোট্ট হাতে আলপনা দিচ্ছ এমনি একটি ছবি যদি থাকতো, তা হলে খুব মজা হত। আমি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দিতাম। আমার সব খেলার সাথীদের দেখাতাম।"

মায়েরও কেমন খুশী খুশী ভাব।

ছোট্ট মেয়ের মতো কলকলিয়ে উঠলেন যেন মা।

বললেন, "তোর কি বুদ্ধি খোকা! আমাদের ছেলেবেলায় ফটো তোলার রেওয়াজ ছিল নাকি? আর মায়ের ছেলেবেলাকার ফটো এতদিন থাকত নাকি?"

মা মুখে কথা বলছেন, আর হাতে-হাতে সব কাজ সেরে নিচ্ছেন।

তারপর বা এক সময় বললেন. "খোকা, আজ তুই দুপুর বেলা এতটুকু ঘুমুতে পারিস নি। যা, এই বেলা একটু গড়িয়ে নে। বিকেলের দিকে আবার অনেক কাজ।

খোকা মায়ের গা ঘেঁসে বসে বললে, "আজ আর আমার ঘুম পাচ্ছে না মা! আজ তোমার কাছে কাছেই থাকি।"

মা খুশী হয়ে বললেন, "সেই ভালো। অবেলায় ঘুমিয়ে কাজ নেই।"

এমন সময় বাড়ির দোর গোড়ায় বিষণের গলা শোনা গেল।

—"এই ধরো মা, লক্ষ্মীপূজোর সব ফল নিয়ে এসেছি। শশা, কলা, শাঁকআলু, পেঁপে, তাছাড়া বাতাসা, গুড়, ধূপকাঠি, যা যা হাতের কাছে পেয়েছি সব নিয়ে এসেছি।"

মা দাওয়ায় বেরিয়ে এসে বললেন, "বেশ করেছ বিষণ। তুমি যে গুছিয়ে সব কিছু আনবে তা আমি আগেই জানতাম।"

বিষণ পোট্‌লা বাঁধা সব সওদা দাওয়ার ওপর রেখে বলে, "আর কি করতে হবে মা, চট্‌পট বলে ফেল। আমাকে আবার এক্ষুণি ঘরে ফিরতে হবে। গাইগুলোকে মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হয় নি।"

মা বললেন, "দু'টো ঝুনো নারকেল বের করে ছুলে দিতে হবে যে বিষণ।"

বিষণ উত্তর দিলে, ও আমি এক্ষুণি করে দিয়ে যাচ্ছি। দা-খানা কোথায় আছে তুমি আগে আমায় বের করে দাও।"

মা ঘরের ভেতর থেকে দা-খানা বের করে দিলেন নারকেল দু'টি ছুলে ফেলবার জন্যে।

মা যে কখন চাল ভিজিয়ে রেখেছিলেন খোকা জানতেই পারে নি।

সেই চাল বেটে নিয়ে একটুখানি জল মিশিয়ে সুন্দর আলপনা দিতে সুরু করেছেন মা।

মেঝেটা শুকিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে। আর তার ওপর মায়ের দেওয়া আলপনা দেখে খোকার দুই চোখ জুড়িয়ে গেল।

মায়ের দু'টি হাত এক জায়গায় থেমে নেই।

পূজোর ফলগুলি কেটে সুন্দর করে সাজানো হ'ল—ছোট ছোট থালায়।

লক্ষ্মীর পট বসেছে, তারই পাশে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠল ঘরের কোণে। ধূপকাঠির গন্ধে বাতাস সুরভিত হয়ে উঠল।

মা একটা আসন বিছিয়ে নিয়ে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে সুরু করে দিলেন।

খোকাকে বললেন, "তুই এইখানে বসে শোন।" খোকাও চোখ দু'টি বন্ধ করে মনে মনে কল্পনা করলে। আজ থেকে মা এখানে করবেন লক্ষ্মীপূজো, আর খোকা পড়ার টেবিলে বসে মা সরস্বতীকে আহ্বান জানাবে।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকালবেলা পাঠশালায় যেতে আবার রাস্তার মোড়ে ছেলেদের সেই জটলা।

একজন বললে, "পণ্ডিত মশায়ের ত' অসুখ করেছে, একদিনেই কি আর ভালো হয়ে গেছেন?"

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে টিপ্পনি কাটলে, ঠিক কথা বলেছিস। আজও পণ্ডিতমশাই পাঠশালায় পড়াতে আসবেন না।

পরামর্শ দেবার ছেলের অভাব নেই দলে। সে সোজা এগিয়ে এসে বললে, তাহলে আর পাঠশালায় গিয়ে কি হবে? চল, সোজা একটা নিরিবিলি বাগানে ঢুকে পড়ি। পেয়ারা, কলা, পাকা পেঁপে যা জোটে—

ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনে নেচে উঠল।

এমন মজা পেলে কে আর পাঠশালায় পড়তে যায়? কিন্তু বাড়িতে মারের ভয় আছে—এমন ছেলেরও ত' অভাব নেই দলে।

তারা বেঁকে দাঁড়ালো।

ওরা বললে, আগে পাঠশালায় গিয়ে দেখবো—পণ্ডিতমশাই এসেছেন কিনা, তারপর অন্য কথা—

কুশলও সেই মতে মত দিলে।

সে বললে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। সকাল বেলা আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি পাঠশালায়' গিয়ে পড়াশোনা করবো বলে। এখন বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ালে চলবে কেন?

তখন ছেলে মহলে দু'টো দল হয়ে গেল।

একদল বাগানের ফল-ফলারির লোভে অন্যদিকে এগিয়ে গেল। আর একদল ইস্কুলের পথে চলে গেল।

পাঠশালায় পৌঁছে দেখা গেল, ছেলেদের আশঙ্কাই সত্যি। পণ্ডিতমশাই আজও পড়াতে আসেন নি।

তখন যারা দল ভ্রষ্ট হয়ে পাঠশালায় এসে ঢুকেছিল—তারা আবার দ্বিগুণ উদ্যমে হারা উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েকটি ছেলে এ সময় ঠিক কি করবে—বুঝে উঠতে পারছিল না।

যাদের বাড়িতে মা-বাবা খুব কড়া, তারা সোজাসুজি বাড়ি ফিরে যাবার পক্ষে। অকারণ পথে পথে ঘুরে বাড়ি গিয়ে বকুনি খাবার ইচ্ছে তাদের আদৌ নেই।

কুশল মনে মনে ভাবছিল,—পণ্ডিতমশাই যখন আসেন নি, তখন মায়ের কাছেই ফিরে যাই,—তার কাছে বসে বাবার গল্প শুনি।

আর কয়েকটি ছেলে—অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি সব পরামর্শ করছিল।

কুশলকে ডেকে ওরা বললে, চল, তোদের পুকুরে গিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা যাক। যে সব মাছ ধরা পড়বে—সবাই মিলে ভাগ করে নেবো—। না হয় তোর ভাগে কিছু বেশীই পড়বে।

কুশল আপত্তি করে বললে, না-না. আমার মা রাজি হবেন না। মিছিমিছি তোরা কেন যাবি আমাদের পুকুরে।

ছেলের দল না-ছোড়বান্দা।

তারা বললে, চল না তোর মার কাছে। বেশী ছেলে সঙ্গে নেবো না। আমরা চারজন আছি। তোর মাকে রাজি করার ভার আমাদের।

কুশল আর বেশী আপত্তি করতে পারল না।

তখন এই ছোট্ট দল মহা উৎসাহে কুশলের মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

দলের ভেতর যে চটপটে সে এগিয়ে গিয়ে বললে, মাসিমা, আজ আমরা আপনার পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরবো। আমাদের কিন্তু অনুমতি দিতে হবে।

কুশলের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি কথা? তোমরা সকাল বেলায় গেলে পড়াশোনা করতে! এখন বলছ, পুকুরে মাছ ধরবে?

ছেলেটি এতটুকু লজ্জা পেল না। চট্‌পট্‌ উত্তর দিলে, আমরা ত' পাঠশালাতে পড়তেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের অসুখ আজও সারে নি। তাই পাঠশালা বসবে না। আর একটি ছেলে বললে, এই খবর পেয়েই একদল ছেলে গেল বাগানে-বাগানে ফল-ফলারি খেতে, আর আমরা চারজন এলাম পুকুরে মাছ ধরতে।

মা এইবার হেসে ফেললেন।

বললেন, তাই তোমরা ঠিক করেছ—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।

এইবার বোধকরি ছেলেটি লজ্জা পেল। সে মাথা চুলকে জবাব দিলে, না-না, তা কেন, পড়ার সময় আমরা ঠিক পড়ব। তবে মাছ-ধরাটাও ত' একটা খেলা। আজ না হয় আপনার পুকুরে সেই খেলাই খেলি—

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, আমি তোমাদের মাছ ধরতে অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে, কি প্রতিজ্ঞা? ও, বুঝতে পেরেছি। যে মাছ ধরা পড়বে তার অর্ধেক বুঝি কুশলের জন্য দিয়ে যেতে হবে?

মা তেমনি হেসে উঠলেন ওর কথা শুনে। বললেন, দূর বোকা ছেলে, তা নয়। তোমাদের আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে—পরের বাগানে ঢুকে আর কখনো ফল-ফলারি চুরি করতে পারবে না।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না-না মাসিমা, আমাদের এই ফল পাড়া ঠিক চুরি করা নয়। আমরা ত' দিনের বেলা সকলের চোখের সামনেই ফল পেড়ে খাই। ওটাকে কি ঠিক চুরি করা বলে?

মা জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই বলে। যার বাগান—তার কাছ থেকে ত' তোমরা অনুমতি নাও না। না বলে অপরের জিনিস নেয়া মানেই চুরি করা। বুঝলে ত'? আজ আমার কাছে যেমন অনুমতি চাইলে তেমনি যদি অনুমতি চাও— সে আলাদা কথা।

ছেলেটি উত্তর দিলে, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি মাসিমা। আমরা সেই প্রতিজ্ঞাই করলাম।

মা খুশী হয়ে বললেন, আচ্ছা যাও, তোমরা পুকুরে মাছ ধরো গে। কিন্তু শুধু হাতেই তোমরা মাছ ধরবে নাকি?

ছেলেরা খুশী হয়ে উত্তর দিলে, না-না, তা কেন? আপনার অনুমতি পেলাম। এইবার আমরা বাড়ীতে বই শ্লেট রেখে ছিপ নিয়ে আসবো।

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ছুট্ লাগালো যে যার বাড়ীর দিকে—

মা পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন, সবাই বাড়ীতে বলে এসো কিন্তু। নইলে মা-বাবা আবার ব্যস্ত হয়ে থাকবেন।

ছেলেরা হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। মুখে কথা বলবার সময় তাদের নেই—ওরা এত খুশী হয়েছে।

এইবার মা কুশলের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, ছেলের মুখেও মৃদু হাসি।

কুশল এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম মা, তুমি অনুমতি দেবে না!

মা আগের মতোই হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, তা' কেন? ওরা বড় মুখ করে মাসিমা বলে আমার কাছে এসেছে, আমি কি অনুমতি না দিয়ে পারি?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আজ অনুমতি না দিলে কাল ওরা চুরি করত! সেটা কি ভালো হ'ত?

ছেলেদের উৎসাহের অন্ত নেই।

খানিকক্ষণ বাদেই ওরা ছিপ-টিপ নিয়ে এসে হাজির। পুকুরের একটা নিরিবিলি কোণ দেখে ওরা বসে পড়ল।

ছেলেরা বললে, আয় কুশল, তোর জন্যেও একটা সুন্দর ছিপ নিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে বসে যা—

কুশলের ত' ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার অভ্যাস নেই। তাই বন্ধুদের কথায় গাঁই-গুঁই করতে লাগলো।

কিন্তু বন্ধুর দল ওকে সহজে ছাড়বে কেন? বললে, সেটি হচ্ছে না। আজ সবাই মিলে মজা করে মাছ ধরবো। তা ছাড়া মাসিমার অনুমতি যখন পাওয়া গেছে—তখন আর ভয়টা কি শুনি?

কুশল কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু আমি যে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে শিখি নি!

বিষণ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল।

সে এগিয়ে এসে বললে, তুমি ভাবছ কেন খোকাবাবু? আমি তোমায় ছিপ দিয়ে মাছ ধরা শিখিয়ে দিচ্ছি—

কুশল কৌতুক করে উত্তর দিলে, তাহলে তুমি আমার গুরুমশাই হলে?

বিষণও তেমনি মজার মানুষ। বললে, ঠিক! ঠিক! আমি হচ্ছি মাছ মারার গুরুমশাই—

তারপর বিষণ পুকুরের ধারে গিয়ে ঘাসের ওপর আরাম করে বসে খোকাকে মাছ ধরার কলা-কৌশল সব শিখিয়ে দিলে।

—ঠিক এমনি করে ছিপটাকে বাগিয়ে ধরবে। তারপর বড়শীতে টোপ গেঁথে নেবে—

কুশলের একটুতেই অধৈর্য।

শুধালো, কি টোপ গাঁথবো, তাই বলো না।

বিষণ ছেলে মানুষের কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলো। বললে, আমি মাটি খুঁড়ে এক্ষুণি কেঁচো তুলে আনছি। সেই কেঁচো বড়শীতে গেঁথে নিলেই দিব্যি টোপ হবে।

কেঁচোর কথা শুনে কুশলের গা ঘিন্‌-ঘিন করতে লাগলো। বললে, অ্যাঁ। ছিঃ ছিঃ! ওই কেঁচোগুলোর গায়ে হাত দিতে হবে?

বিষণ খোকার কথা শুনে হাসতে লাগলো। বললে, এত ঘেন্না-পিত্তি থাকলে মাছ ধরা যায় না। এখন আমি যা বলছি শোন,—মাছ ধরতে গেলে সক্কলের আগে ধৈর্য চাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে। তবে তোমার যদি বরাৎ ভালো থাকে তাহলে—চট করে বড়শীতে মাছ ধরতে পারে। সবাইকার বরাৎ ত' এক রকম নয়। কেউ ছিপ ফেললেই মাছ ওঠে, আবার সারাদিন ঠায় বসে থাকলেও কারো কপালে কিছু জোটে না। আজ তোমার বরাৎ দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে ছেলের দল বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বিষণ বললে, দেখ দাদাবাবুরা, সবাই মিলে এক জায়গায় জড় হয়ে বোসো না। পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে বোসো, তাহলেই মাছ এসে বড়শীতে ঠোক্কর দেবে।

বিষণ খোকাকেও সব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

বিষণ বললে, শোনো খোকা,—নানারকম মাছ এসে বড়শীতে ঠোক্কর মারবে। দেখে দেখে বুঝে নিতে হবে—কোন্‌টা আসল ঠোকর। ফাৎনার দিকে সব সময় নজর রাখতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে ছিপে টান মারতে হবে! যদি বড়শীতে আট্‌কাতে পারো তবেই বুঝবো বাহাদুর।

মাথা চুলকে কুশল বললে, আচ্ছা বিষণ খুড়ো, তুমি একটা মাছ ধরে আমায় দেখিয়ে দাও,—তারপর দেখনা আমি ছিপে কত মাছ আট্‌কে ফেলছি—

বিষণ হো-হো করে হেসে উঠল।

—ওরে দুষ্টু ছেলে, তোমার চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি। পরের হাত দিয়ে মাছ মেরে নিজে বাহাদুরী নিতে চাও? সেটি হতে দিচ্ছি না। তোমার নিজের হাতে মাছ ধরতে হবে।

বিষণ খুড়ো খোকাকে আবার সব ভালো করে হাত ধরে বুঝিয়ে দিলে।

মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো কেঁচো বের করে একটি মাটির খুরিতে রেখে দিলে।

তারপর বললে, এইবার এই ঘাটের কিনারায় ঘাসের ওপর বোসো। ছিপটাকে এইভাবে বাগিয়ে ধরো। বড়শীতে কেঁচো আমি গেঁথে দিয়েছি—

খোকাকে বসিয়ে দিয়ে বিষণ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

ছেলেরাও তৎপর হয়ে চার কোণে নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে পড়েছে।

মাছ ধরার একটা দারুণ নেশা আছে। ওদেরকে আজ সেই নেশায় পেয়ে বসেছে।

বিষণ তখন বাড়ির ভেতর একবার চলে গেল।

মা বললেন, শোনো বিষণ, ছেলেরা যখন মাছ ধরতে এসেছে—তখন ওদের মাঝে মাঝে খাবার দিতে হবে। নইলে ছেলেমানুষ ত' ওরা—অনেকক্ষণ ধরে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারবে কেন?

মাথা নেড়ে বিষণ বললে, সে ত' সত্যি কথাই। আমাদের এতখানি বয়েস হয়ে গেছে, এখনো মাছ ধরতে বসলে ঘড়ি-ঘড়ি ক্ষিদে পায়। ক্ষুদে মানুষদের ক্ষিদে আরো বেশী।

মা উত্তর দিলেন, ঘরে মুড়ি আছে, খৈ আছে, আর গুড়ও আছে হাঁড়িতে। আমি ওদের জন্যে মোয়া তৈরী করে-দি। আর আমাদের শশার মাচায় শশা ফলেছে। বিষণ, তুমি বরং কয়েকটা কচি শশা কেটে দাও—

বিষণ খুশী হয়ে উত্তর দিলে, সেই ভালো মাঠান সেই ভালো। তুমি মোয়া তৈরী করতে থাকো,—আমি এই ফাঁকে বাড়ি থেকে আর একবার ঘুরে আসি—

। ছয় ।

পাড়া-গাঁয়ের নিশুতি রাত। সারাটা অঞ্চল যেন অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে।

কোথায়ও এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই।

মাঝে মাঝে বাদুড়ের ডানা ঝট্‌পটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক পরে পরে দু' একটি নিশাচর পাখীর ডাক কানে ভেসে আসছে।

কুশলও নিজের খাটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

মায়ের ঘুম খুব পাতলা।

কিন্তু মা আজ রাতে স্বপ্ন দেখছেন। দুঃস্বপ্ন দেখে মায়ের পাতলা দেহটা মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে।

মা স্বপ্ন দেখছেন, একটা কালো মেঘ সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। কোথা থেকে একটা অশুভ বাতাস ছুটে আসছে তাদের কুটিরের দিকে। এখুনি বুঝি ঘরটাকে ভেঙে ফেলে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

মা প্রাণপণে তাঁর খোকাকে বুকে চেপে ধরেছেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরে

রাখতে পারছেন না। এলোমেলো বাতাসের মাতামাতি এত বেড়ে উঠেছে যে ঘরের সব কিছু জিনিস-পত্র খড় কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক।

অন্ধকারে কিছুই ভাল করে চোখে পড়ে না। মনে হচ্ছে আর বুঝি কখনো আলো জ্বলবে না।

এই বিপদ থেকে কি করে রক্ষা পাবেন মা? ছেলেকেই বা কি করে বাঁচাবেন?

সেই গাঢ়, মিশকালো আঁধারের ভেতর ফুটে উঠল দুটি জ্বলন্ত চোখ। সেই আগুনের হল্‌কা বয়ে নিয়ে আসা চোখ দু'টি ক্রমশঃ বড় হচ্ছে।

সেই চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে মা শিউরে উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যে কার ওই চোখ দু'টি তাকে ভয় দেখাচ্ছে? চোখ দু'টি কি তাদের গ্রাস করতে চায়?

অবশেষে মা বুঝতে পারলেন, অশুভ এক কালো বেড়াল তাদের বাড়িটিকে যেন গ্রাস করতে চাইছে।

ওই জ্বলন্ত চোখ দু'টি সেই কালো বেড়ালের। নিমেষের মধ্যে সেই কালো বেড়াল কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

মা হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন, কোথায় ঝড়—কোথায় বৃষ্টি? ওদের বাড়িতে যেন আগুন লেগেছে।

দাউ দাউ করে বাঁশের বেড়াগুলো যেন জ্বলছে। আরো অবাক কাণ্ড পুকুরের জলও যেন আগুনে জ্বলছে। মাছগুলো প্রাণের দায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙ্গায় এসে পড়ছে! কিন্তু সেখানেও কি নিস্তার আছে? আগুন ক্ষ্যাপা মোষের মতো তাদের তাড়া করছে।

ওদের গোয়াল ঘরেও আগুন জ্বলে উঠল। গাভীরা হাম্বা হাম্বা রবে আর্তনাদ করতে লাগলো। হাঁসের দল পুকুরে যেতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। কোন্ দিকে যাবে? পুকুরের জলেও আগুন লেগেছে। কেরোসিন তেলে আগুন লাগলে যে অবস্থা হয় অবিকল সেই দৃশ্য।

পায়রাগুলো আকাশের বুকে উড়তে গিয়ে ঝলসে গেল। আশে-পাশে আম-জাম-কাঁঠাল নারকেল গাছগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূরে ঐ গাছের ন্যাড়া ডালে বসে আছে ও-সব কি! কাক নাকি?

মায়ের মুখে আর কোনো শব্দ নেই। খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা আতঙ্কে যেন পাথর হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ওইভাবে তিনি বসে ছিলেন—তার আদৌ খেয়াল নেই।

হঠাৎ মা সভয়ে তাকিয়ে দেখেন—একদল শকুনি তাদের উঠোনের মাঝখানে উড়ে এসে বসছে।

অমঙ্গলের অগ্রদূত শকুনিগুলি কিন্তু এই লেলিহান-অগ্নিদাহে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না।

শকুনিগুলির কোন্ দিকে নজর মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

কতকগুলি কাল-প্যাঁচা কি এধার-ওধারে উড়ে উড়ে বিশ্রী সুরে ডাকছে ?

গাইগুলি কেবলি হামলাচ্ছে কিন্তু ধোঁয়ার জন্যে তাদের চোখে দেখা যাচ্ছে না।

মা বার বার প্রদীপ জ্বালবার জন্যে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোথা থেকে দমকা হাওয়া এসে সেই প্রদীপ নিবিয়ে দিচ্ছে।

খোকা কি তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ? মা কি করবেন, কোন্ দিকে যাবেন—কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কোথা থেকে এই অমঙ্গলের আগুন ছড়িয়ে পড়ল—তাদের বাড়ির চারদিকে এটা সত্যি বিস্ময়ের ব্যাপার।

ওদের খাটেও সেই লেলিহান অগ্নিশিখা এসে তার থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর বুঝি বাঁচবার কোনো উপায় নেই। এইবার মা-ছেলে দুই জনেকেই এক সঙ্গে পুড়ে মরতে হবে।

খোকার একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। হঠাৎ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মা পাগলের মতো ছুটতে সুরু করে দিলেন। কোথায় যাচ্ছেন—কোন দিকে পা বাড়াচ্ছেন সে ব্যাপারে এতটুকু খেয়াল নেই।

তারপর মা বিহ্বলের মতো খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল। থর্‌থর্ করে মায়ের সারা দেহটা যেন কাঁপছে। দুই হাত দিয়ে মা তার বুক চেপে ধরলেন। তবু সেই কাঁপুনি থামে না।

এইভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর খাটের পায়া ধরে মা উঠে বসলেন।

কোথায় আগুন, কোথায় কি ? আগাগোড়াই তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন।

খোকা নিশ্চিন্ত মনে বিছানার ওপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কিন্তু মায়ের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা।

তিনি এই দুঃস্বপ্ন দেখলেন কেন ? নিশ্চয়ই খোকার কোনো অমঙ্গল হবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, ভোর হবার আর বেশী বাকি নেই।

আশে-পাশে আবছা-আঁধারে এখুনি ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়বে। চারদিকে গাছগুলির শাখায় শাখায় ভোরের পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মা দুর্গা-দুর্গা বলে প্রণাম জানালেন, তারপর কাপড় আর গামছা নিয়ে দ্রুতবেগে দরজা খুলে বেরিয়ে—স্নানের উদ্দেশ্যে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

মায়ের প্রাতঃস্নান শেষ হবার কিছু পরেই বিষণ এসে হাজির।

খোকা তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি।

বিষণ ওকে বিছানা থেকে তুলতে যাচ্ছিল।

মা ওকে বাধা দিয়ে বললেন—থাক্, ও ঘুমুচ্ছে ঘুমুক। আগে তোমার সঙ্গে দরকারী কথাগুলো সেরে নি।

বিষণ শুধোলে, আমার সঙ্গে আবার কি দরকারী কথা শুনি? হাটে যেতে হবে বুঝি?

মা জবাব দিলেন, হাটে ত' যেতে হবেই। তার আগে আমাকে কয়েকটি জিনিস তাড়াতাড়ি এনে দিতে হবে বিষণ। শোনো, তুমি খোকাকে আবার যেন কিছু বোলো না। আমি আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

বিষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কি? মা বললেন, শোনো বিষণ, কাল সারারাত বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মনে হচ্ছে, আমার খোকার কিছু অমঙ্গল হবে। তাই আগে থেকেই সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো। অমঙ্গল সব কেটে যাবে।

বিষণ বললে, তাই নাকি? তুমি এতও জানো বৌঠান। সঙ্কট-নারায়ণের ব্রতের কথা ত' আগে শুনি নি।

ম্লান হেসে মা উত্তর দিলেন, আমরা যখন খুব ছোট—সেই সময় আমার ঠাকুমা এই সঙ্কট-নারায়ণ ব্রত করতেন। একটু বড় হতে আমি সেই ব্রতের সব নিয়ম শিখে নিয়েছিলাম। জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে এলে এই ব্রত করতে হয়। তাহলে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।

বিষণ শুধোলে, তাহলে কি কি আনতে হবে আমায় চট্‌পট বলে দাও। আমি এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি—

মা বললেন, আমি একটু আগেই একটা ফর্দ্দ লিখে রেখেছি। বিষণ তুমি একটু কষ্ট করে আগে এনে দাও।

বিষণ উত্তর দিলে, তোমার কাজে আমার কষ্ট কি? আমি যাবো আর আসবো। এর ভিতর তুমি ব্রতের সব জোগাড়-যন্ত্র করে নাও।

মা বিষণের হাতে একটি ফর্দ্দ আর টাকা এনে দিলেন। আর বিষণ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে কুশলের ঘুম ভাঙল। সে চোখ কচ্‌লে বিছানার ওপর উঠে বসল।

সে মাকে মেঝের ওপর কি জোগাড়-যন্ত্র করতে দেখে শুধোলো, এত বেলা হ'ল, আমায় ডাকো নি কেন মা? আর মেঝের ওপর এ-সব কি কাণ্ড করছ তুমি?

মা শুধু একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর মনে-মনে ভাবলেন, খোকার কাছে আসল কথাটা লুকিয়ে রাখা ঠিক হবে না। সোজাসুজি বলে ফেলাই

ভালো। তাই তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখ খোকা, আমি আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো ; আমার মানত ছিল। পরে তোমায় সব খুলে বলব।

খোকাও আবদার করে উত্তর দিলে, আমিও তাহলে আজ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

মা খোকার চোখের দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, খোকা তুই ইস্কুলে যাবি নে ? মিছিমিছি ইস্কুল কামাই করা কাজের কথা নয়।

খোকা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল। হাত তালি দিয়ে বল্লে, হুঁ ! হুঁ ! কেমন ঠকিয়ে দিয়েছি তোমায়। আজ আমাদের পাঠশালা নেই। তাই আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করবো—

মা বললেন, শোন খোকা, ছেলেদের এ ব্রত করতে নেই। মায়েদের এ ব্রত করতে হয়। আমি পরে তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

ইতিমধ্যে বিষণ ব্রতের সব সওদা নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

মা বললেন, খোকা যাও, পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ-টুক ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার ধামা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। তাই খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ পড়াশোনা করো—

খোকা নাচতে নাচতে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল। সেখানে ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজে, ভালো করে পুকুরের জলে মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে এলো।

মা বললেন, বারান্দায় গামছা রয়েছে দড়িতে ঝোলানো,—আগে ভালো করে হাত-মুখ মুছে নাও। ধামার নীচে চিড়ের মোয়া আর নারকেল-কোরা রেখেছি। খেয়ে নিয়ে পড়তে বোসো—

খোকা খেতে খেতে মায়ের ব্রতের নিয়ম পালন করা দেখছিল।

খোকা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, মা সব কাজ হাঁটুর তলা দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে কষ্ট করে করছে।

তাই খোকা শুধোলে, আচ্ছা মা, তুমি হাঁটুর তলা দিয়ে হাত গলিয়ে এমনভাবে কষ্ট করে কাজ করছ কেন ? সোজাসুজি সব কাজ করলে হবে না ?

মা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, নারে বোকা ছেলে—সঙ্কট নারায়ণের ব্রত এইভাবে সঙ্কটের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন করতে হয়।

মা সারাদিন ধরে এই নিয়ম পালন করে—সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত সমাধা করলেন। তারপর উনুনে নিজের ভাত-তরকারী রান্না করে নিলেন। সে কাজটাও সঙ্কটের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন করতে হ'ল।

সব শেষে খোকা মায়ের প্রসাদ পেলে।

সেইদিন গভীর রাত্রে খোকা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা মা,

এখন ত' ব্রত শেষ হয়ে গেছে, এখন আর তোমার বলতে বাধা নেই। তুমি হঠাৎ সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করতে গেলে কেন?

মা খোকার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, শোন খোকা, কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। তাই ব্রত করলাম। সঙ্কট-নারারায়ণের ব্রত করলে—সব অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। তোর চলার পথে আর কোনো বিপদ-আপদ আসবে না, তুই মানুষ হয়ে উঠতে পারবি—এই ত' মায়ের কামনা।

॥ সাত ॥

কুশলের বন্ধুর দল একদিন এসে উপস্থিত হ'ল ওর মায়ের কাছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কি খবর তোমাদের? একেবারে সকালবেলাই দল বেঁধে এসে হাজির?

বরুণ এগিয়ে এসে বললে—মাসিমা, আমরা আজ বনভোজনে যাবো। একটা বড় নৌকো পাওয়া গেছে, কোনো ভাড়া দিতে হবে না। কুশলও আমাদের সঙ্গে যাবে, আপনি অনুমতি দিন।

মা একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকালেন। সকাল বেলার সোনালী রোদে ওদের হাসি মুখগুলি আনন্দে আর উৎসাহে উদ্দীপ্ত।

মা খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। ছেলের দলের এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে তিনি দমিয়ে দিতে চাইলেন না। তাই তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা, অনুমতি না হয় দিলাম কিন্তু জানো ত' খোকা আমার সাঁতার জানে না?

বন্ধুদের সামনে খোকা বলায় কুশল বেশ একটু লজ্জা পেলো। ওর মুখখানি লাল হয়ে উঠল।

সে খাটো গলায় অনুযোগের সুরে বললে—মা, তুমি যেন কি! আমি কি এখনো খোকাই আছি নাকি?

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—সব মায়ের কাছেই ছেলেরা চিরকাল খোকাই থাকে রে। আর তোর বয়েসটাই বা এমন কি হয়েছে শুনি?

অনুমতি পেয়ে ছেলের দল মহা খুশী।

সত্য বললে—ফিরে এসে মাসিমার সঙ্গে ঝগড়া করা যাবে। আমরা ত' আর 'খোকা' বলি নি। শোন্ কুশল, শুধু একটা ধুতি আর একখানা গামছা নিলেই হবে। তেল-টেল আমরা যোগাড় করে শিশিতে ভরে নিয়েছি।

হিতেন ফোঁড়ন কাটলে—আর কিছু দরকার হবে না। আমরা চড়ুই-ভাতির সব কিছু কালই যোগাড় করে রেখেছি।

মা ওদের বাধা দিয়ে বললেন—দাঁড়াও—দাঁড়াও—তোমাদের চাল-ডাল, আলু-আনাজ, তরকারী এ সব যোগাড় হয়েছে ?

বরুণ উত্তর দিলে—সব বাড়ী থেকেই চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী চাঁদা হিসেবে চেয়ে নিয়েছি। আর বোধকরি দরকার হবে না।

কুশল এইবার আপত্তি জানিয়ে কইলে—বাঃ! তা কেন? আমার ভাগটা আমাকে দিতেই হবে। মা, তুমি আমার জন্যে চাল-ডাল, আনাজ-তরকারী সব দিয়ে দাও। নইলে আমি কার ভাগ খেতে যাবো ?

ওর কথা শুনে ছেলের দল হাসতে লাগ্‌লো।

সত্য বললে—ওরে বোকা ছেলে, এতগুলি লোকের মধ্যে দু' চার জনের খাবার এমনিতেই বেশী হয়ে যায়।

কিন্তু কুশল সে কথা শুনবে কেন ? তার ভাগ সে চাঁদা হিসেবে দেবেই, নইলে বন্ধুদের মধ্যে তার মুখ থাকবে কেন ?

মা ওদের কথা-বার্তা শুনে মিটিমিটি হাসছিলেন। এইবার এগিয়ে এসে বললেন—একটু দাঁড়াও তোমরা, আমি খোকার ভাগটা দিয়েই দি। নইলে সারাদিন আবার ওর মন খুঁত-খুঁত করবে। মনে হবে—কার ভাগটা যেন খেয়ে ফেললাম।

মায়ের কথা শুনে ছেলের দলও হাসতে লাগলো। ততক্ষণে কুশল ধুতি আর গামছা গুটিয়ে নিয়ে একটি পুঁটলি তৈরী করে ফেলেছে।

ঘরের ভেতর থেকে মা চাল-ডাল, আলু-বেগুন, কুমড়ো ইত্যাদি যা পেলেন সুন্দর করে সাজিয়ে সত্যের হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও আমার খোকার ভাগ। এখন ওর খেতে লজ্জা পাবার কথা নয়।

ছেলেরা হুল্লোড় করে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

মা জিজ্ঞেস করলেন—কখন ফিরবি তোরা ?

বরুণ জবাব দিলে—আমরা নৌকো নিয়ে ষোলআনীর চর অবধি যাবো। এদিকে নৌকোর ভেতর রান্না হতে থাকবে। একটা ভালো জায়গা বাছাই করে নিয়ে আমাদের চড়ুইভাতি হবে। সঙ্গে কলাপাতা, মাটির গেলাস রইল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধেই হবে না।

হিতেন বললে—একটা সুবিধে মত জায়গায় নেমে ভালো করে সরষের তেল গায়ে মেখে দুপুরবেলা স্নান সেরে নেয়া যাবে। আমাদের ফিরতে ফিরতে একেবারে সন্ধ্যের মুখে।

ছেলের দল আবার বললে—আপনি কুশলের জন্যে কোনো ভাবনা-চিন্তা করবেন না মাসিমা। আমরা ত' সবাই এক সঙ্গেই রইলাম।

মা জবাব দিলেন···আর কোনো ভাবনা নেই। সাঁতার জানে না কিনা, তাই ভয় করে। তোমরা একটু চোখ রেখো ওর ওপর। আর খোকা, জলের ধারে যাস নি যেন। না হয় নৌকোর ওপর ঘটি দিয়েই স্নান সেরে নিস।

খোকা উত্তর দিলে—আচ্ছা মা···

সবাই হুল্লোড় করে রওনা হলো নৌকো করে।

সকাল বেলার ঝিলমিলে রোদে ওদের মন-প্রাণ যেন একেবারে নেচে উঠল। খাল পেরিয়ে নদীর বাঁক ধরে নৌকো এগিয়ে চললো।

নদীর তীরের দৃশ্য ওদের মনকে টেনে নিলে। কোথাও সাজানো বাগান, কোথাও বাঁধানো ঘাটলা, কোথাও ছেলের দল সার বেঁধে ইস্কুলের পথে চলেছে।

কোন অঞ্চলে যেন হাট হবে, হাটুরেরা মাল-পত্তর নিয়ে কিছু যাচ্ছে নৌকো করে, আবার একদল মাথায় বোঝা নিয়ে নদীর পারে-পারে ছুটছে। হয়ত সুবিধে মত জায়গায় খেয়া পার হয়ে যাবে।

এক জায়গায় ছেলেরা দেখলে—জেলের দল নদীর বুকে জাল ফেলে মাছ ধরছে। চক্‌চকে রূপোলী মাছগুলো যখন ধরা পড়ছে—দেখে ছেলেরা আর চোখ ফেরাতে পারছে না।

বরুণ আনন্দে নৌকোর পাটাতনের ওপরই লাফাতে সুরু করল। বললে—দেখ ভাই, এখান থেকে আমরা কিছু টাটকা মাছ কিনে নিয়ে যাই। ভারী মজা হবে। বেশ ঘন করে সরষে-পাতুরী রান্না হবে।

সত্য ওকে ঠাট্টা করে বললে—তুই যে এখন থেকেই মুখ চোটকাতে সুরু করলি। ও মাছ খেলে কি আর কারো হজম হবে?

শেষ পর্যন্ত ছেলেদের আগ্রহে জেলেদের কাছ থেকে অনেক মাছ কেনা হ'ল। আড় মাছ, পাবদা মাছ, রুইয়ের পোনা, বেশ কিছু টাটকা চিংড়ি মাছও পাওয়া গেল।

একজন বামুন ঠাকুর ওদের সঙ্গে ছিল।

মাছ পেয়ে তার আনন্দ দেখে কে? সে আগেই সোনামুগের ডাল চাপিয়ে দিয়েছিল। এইবার টাটকা তাজা মাছগুলি কেটে নিয়ে সরষে-পাতুরী রাঁধবার জন্যে তৈরী হ'ল।

ছেলেদের মধ্যে একজন বললে,—এসো আমরা ধাঁধার জবাব বের করি। দেখি কে কাকে ঠকাতে পারে।

নানারকম মজার ধাঁধা ওদের মুখস্থ। ঠাকুমা-দিদিমার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে।

হিতেন বললে—আচ্ছা জবাব দাও দেখি—

"পৃথিবীটা কার বশ ?"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল—"পৃথিবী টাকার বশ !"

হিতেন মাথা দুলিয়ে বললে—এটা তোমরা সবাই জানো দেখছি। আচ্ছা বলো দেখি—

"ছোট্ট ছোট্ট ছেলেগুলো—
নদীর বুকে আছে—
তপ্ত তাপের কামড় খেয়ে
তিড়বিড়িয়ে নাচে ॥"

কেউ এ-ধাঁধার জবাব দিতে পারলে না। ছেলের দল এ-ওর মুখের দিকে বোকার মতো তাকাল।

খানিকবাদে কুশল লাফিয়ে উঠে বললে—আমি জানি এ-ধাঁধার উত্তর—

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—কি-কি-কি ?

কুশল সকলের মুখের দিকে একবার তাকালে। তারপর ভারিক্কি চালে জবাব দিলে, এই ধাঁধার উত্তর হচ্ছে—খৈ।

ছেলের দল হুল্লোড় করে উঠল—খৈ ? কেমন করে হ'ল শুনি ?

কুশল বললে—খৈ ভাজা দেখেছিস ত ? খৈয়ের ধানগুলো প্রথমে চুপচাপ শুয়ে থাকে কড়ায়ের মধ্যে। সেইটে হ'ল নদীর বুকে থাকা। তারপর খোলা গরম হলে আগুনের তাপে ওরা তিড়বিড়িয়ে নাচতে সুরু করে দেয়। ছেলের দল জবাব শুনে সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—সাবাস ! সাবাস ! সাবাস !

ইতিমধ্যে নৌকো নদীর বুকের ওপর দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

নদীর পারে একটা সুন্দর ছায়া ঢাকা অঞ্চল সকলের চোখে পড়ল। ওটা একটা আম বাগান। নীচে যেন একেবারে সবুজ গালিচা পাতা। নিরিবিলি জায়গা। একেবারে লোকজনের ভীড় নেই।

ছেলের দল নৌকোর ওপরেই লাফাতে সুরু করল।

বরুণ বললে—এইখানেই আমরা আমাদের চড়ুইভাতির পালা শেষ করবো—

সকলেরই পছন্দ হ'ল জায়গাটা।

নৌকো কিনারায় ভেড়ানো হলে ছেলের দল লাফিয়ে লাফিয়ে পারে নামতে সুরু করল।

সত্যি জায়গাটা মনোরম।

ওপরে সব ঝোপড়া আমগাছ' তাতে গোটা জায়গাকে ছায়ায় ঢাকা করে

রেখেছে। আমগাছগুলির ফাঁক দিয়ে দিয়ে রদ্দুর এখানে-সেখানে ঝিলিমিলি তৈরী করেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন, আলো-ছায়ার আলপনা।

দিব্যি সমতল বনভূমি। তকৃতকে পরিষ্কার।

একদল ছেলে গিয়ে আমগাছের শক্ত ডালে দোলনা তৈরী করে দোল খেতে সুরু করে দিলে।

আর কয়েকটি ছেলে আমগাছের ছায়ায় বসে নানারকম কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করল। ওরই ভেতর দিয়ে ছুটোছুটির বিরাম নেই।

ইতিমধ্যে নৌকোর ওপরেই রান্না অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে বামুন ঠাকুর হাত চালিয়ে শেষ করতে সুরু করল।

সেসব কলাপাতা কেটে নিয়ে আসা হয়েছিল—নদীর ঘাটে মাটির গেলাসের সঙ্গে সেগুলিও পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা হ'ল।

ছেলের দল তখন তেল মাখতে বসে গেল গাছতলায়।

সত্য চেঁচিয়ে বললে—যারা সাঁতার জানো, তারা আমার সঙ্গেএসে নদীর জলে। দেখি, কে কেমন সাঁতরাতে পারো।

বরুণ সেই সঙ্গে কুশলকে সাবধান করে দিয়ে কইলে—তুমি যেন আবার ওদের সঙ্গে নদীর জলে নামতে যেও না। মাসিমার বারণ আছে।

কুশল উত্তর দিলে—না-না, আমি কিছুতেই নদীর জলে নাম্‌বো না। একেবারে সাঁতার জানি না, নদীর তলে তলিয়ে যেতে আমি রাজি নই।

সত্যের ডাকে একদল ছেলে কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে নৌকো থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা সত্যি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল।

কুশল চারদিক ভালো করে দেখে নিলে। একটা জায়গা একেবারে নদীর পারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কুশল এক-পা দু-পা করে সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে একটা ঘটি আগেই চেয়ে নিয়েছিল। সেই ঘটিতে জল ভরে ভরে কুশল দিব্যি স্নান করতে লাগলো।

স্নানের পরই সত্যিকারের চড়ুইভাতি।

ধোয়া কলাপাতাগুলো সার সার লম্বা করে সাজিয়ে নিল ছেলের দল। তার-পরই বসে গেল সবাই।

বামুন ঠাকুর একে একে পরিবেশন করছে, আর ওরা বিপুল আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠছে।

বাড়ীতে বসে খেলে কি আর এমন আনন্দ হয়? বামুন ঠাকুর পরিবেশন করছে—গরম গরম ভাত, তার মাথায় তপ্ত ঘী, ব্যাসন দিয়ে বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, মটরশুঁটি শাক, মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মাছের ঝোল, আর পাতুরী। সবার শেষে

আছে দই আর রসগোল্লা! দু'টি ছেলে কোন্ ফাঁকে জোগাড় করে এনেছে এই মিষ্টি তা কেউ জানে না।

ছেলেদের কলরবে নীরব বনভূমি সচকিত হয়ে উঠল! একদল কাক খাবারের লোভে গাছের ডালে বসে—কাঁ-কাঁ চীৎকার সুরু করে দিলে।

তারপর অনেক খাওয়া-দাওয়া, অনেক গান, অনেক খেলাধূলা আর হুল্লোড়ের পর ওরা নৌকো করে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

॥ আট ॥

ওদের নৌকো যখন নদীতে ভেসে আসছে—তখন পশ্চিম আকাশে কত বিচিত্র রঙের খেলা সুরু হয়ে গেছে।

লাল, হলুদ, সবুজ আর সোনা-রূপোয় যেন পশ্চিম দিকের আকাশটা মাখামাখি হয়ে গেছে।

সারাদিন আলো দেবার পর সূর্যিমামা বিদায় নিচ্ছেন। বিদায়ের ঘটা দেখে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। বিধাতা-পুরুষের রঙের পাত্র বুঝি আচমকা ঢেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আর সুরলোকের শিল্পীদল বুঝি মনপ্রাণ খুলে হোলি খেলছে সেই রঙ কুড়িয়ে নিয়ে।

ছেলের দল অবাক হয়ে সেই রঙের খেলার দিকে তাকিয়ে রইল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাইকার ঠোঁটে যেন কেউ এসে বোবাকাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

তারপর ধীরে ধীরে সেই রঙের বন্যার ওপর একটা কালো কুয়াশার আবরণ নেমে এলো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো।

ওরা সমবেত সুরে গান ধরলে—

"আমি ভয় করবো না—
দু'বেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।"

নদীর ছল্ ছল্ শব্দ, নৌকোর দাঁড় ওঠা-পাড়ার আওয়াজ, দূরের নদী তীরে মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ, ঊর্ধ আকাশে অজানা পাখীর ঘরে ফেরার ক্লান্ত সুর তাদের সবাইকার মনে যেন এক বিষণ্ণ আবেশ জাগিয়ে তুললো। তবু ওরা গান গেয়ে চলেছে—

"শক্ত যা তাই সাধতে হবে—
মাথা তুলে রইবো ভবে—
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরবো না
আমি ভয় করবো না।"

সবাই যখন গানে-গানে মাতোয়ারা কুশল নদী থেকে এক ঘটি জল তুলতে গেছে মাথা নীচু করে—

হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হ'ল—বরুণ, সত্য, হিতেন চীৎকার করে উঠল, আরে আরে—কী সর্বনাশ! আমাদের কুশল যে নদীর জলে পড়ে গেল।

সবাই হায় হায় করতে লাগলো, কিন্তু কেউ নদীর জলে নামতে রাজি নয়।

ওদের বামুনঠাকুর কাউকে কিছু না বলে চট্ করে মালকোঁচা মেরে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কুশলের মাথার চুল শক্ত করে আঁকৃড়ে ধরেছে। নইলে কুশল যদি আবার ওকে জাপটে ধরে তাহলে দু'জন শুদ্ধ অতল তলায় তলিয়ে যাবে।

ছেলের দল তখনো প্রাণপণে চীৎকার করছে—নৌকো থামাও—নৌকো থামাও—

যারা দাঁড় টানছিল আগে তারা কিছুই বুঝতে পারে নি। এইবার ছেলের দলের চীৎকারে ওরা দাঁড় টানা বন্ধ করে দিলে।

বামুনঠাকুরের চেহারাটাও যেমন বিশাল—সে জলের সঙ্গে যুঝে চলেছে দারুণ-ভাবে হাত চালিয়ে।

ছেলের দল বুক-ফাটা চীৎকার করছে—উঠিয়ে দাও ওকে নৌকোর ওপরে—

কিন্তু বললেই কি আর চট্ করে নৌকোর ওপরে একটা মানুষকে তুলে দেওয়া যায়। হোক না ছোট ছেলে। তার দেহের ভারও কম নয়।

বামুনঠাকুর একদিকে জলের সঙ্গে আর একদিকে কুশলের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝে চলেছে। যে জলে ডুবতে চলেছে, কাছে গেলে সে যাকে হোক জাপটে ধরতে চায়।

ফলে, যে উদ্ধার করতে যায় তার হয় সমূহ বিপদ। সেই বিপদ কাটিয়ে নিজের আর অপরের প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক কৌশলে উদ্ধারকারীকে এগিয়ে আসতে হবে।

ততক্ষণে নৌকোর গতি থেমে গেছে।

যারা দাঁড় টানছিল—তারাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ছেলের দল বললে, বামুনঠাকুর, আর একটু এগিয়ে এসো—আমরা সবাই ধরাধরি করে ওকে নৌকোর ওপর টেনে তুলবো।

বামুনঠাকুরের দম বুঝি আর থাকে না। তবু প্রাণপনে যুঝছে সে। এইবার কুশলকে ঠেলে দিল নৌকোর দিকে।

ছেলের দল প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওরা চটপট তার দু'টোই হাত ধরে ফেলে। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে কুশলকে একেবারে নৌকোর পাটাতনের ওপর তুলে ফেললে।

কী সর্বনাশ! জল খেয়ে কুশল যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে! ওর জ্ঞান কি ফিরিয়ে আনতে হবে ছেলের দল তা জানে না।

কেউ এসে মাথায় পাখা সুরু করল, কেউ হাত-পা টিপে দিতে লাগলো, আবার কেউ চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলো।

কিন্তু কুশলের জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসে না।

ছেলেরা মহা বিপদে পড়ে গেল।

একজন বললে, তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে হবে—

কিন্তু এই নদীর মাঝখানে নৌকোর ওপর ডাক্তার পাওয়া যাবে কোথায়?

ওদিকে বামুনঠাকুরের অবস্থাও খুব কাহিল। তার ওপর দিয়েও কম ধকল যায় নি।

ওই রকম করে ঝাঁপিয়ে জলে পড়া, তারপর নদীর বুকে প্রাণপণে সাঁতার কেটে কুশলকে টেনে আনা, অবশেষে সেই দেহকে নৌকোর ওপর ঠেলে তুলতে সাহায্য করা, আর নিজেরও উঠে আসা।

এই সব কিছু জড়িয়ে পরিশ্রম কম হয় নি। চায়ের জন্যে যে দুধ ছিল নৌকোতে—তারই খানিকটা দুধ গরম করে একটি ছেলে এসে বামুনঠাকুরকে খাইয়ে দিলে। তাতে বামুনঠাকুর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু বিপদ ঘটল কুশলকে নিয়ে। ছেলেদের সেবা করবার আগ্রহ কম নয়।

কিন্তু জলে ডোবা মানুষের জ্ঞান কিভাবে ফিরিয়ে আনতে হয় ওরা তা জানে না।

তখন ছেলের দল মরিয়া হয়ে বললে, তাড়াতাড়ি নৌকো চালাও। আমাদের এক্ষুণি ওদের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে—

অনেকগুলি হাতে দাঁড় পড়ে—ছপ্-ছপ শব্দে এগিয়ে যায় মন-পবনের নাও। কিন্তু কুশল কথা কইছে না, নড়ছে না, চোখ মেলে তাকাচ্ছে না।

ছেলের দল সত্যি ভয় পেয়ে গেল। একটা যদি সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে তা হলে ওদের মাসিমার কাছে, মানে কুশলের মার কাছে আর মুখ দেখাতে পারবে না।

যাই হোক সকলের সমবেত চেষ্টায় নৌকো খুব দ্রুতবেগে নদী ছাড়িয়ে খাল বেয়ে একেবারে কুশলদের বাড়ির পেছন দিকে এসে হাজির হ'ল।

ছেলেরা ধরাধরি করে কুশলকে নামিয়ে আনলে নৌকো থেকে।

কয়েকজন ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো একজন ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তারকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে গাঁয়ে যে প্রবীণ কবরেজ মশাই আছেন—তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে।

কুশলের ওই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো বিষণখুড়ো। দাওয়াতে একটি মাদুর পেতে দিলে। ওকে সবাই মিলে শুইয়ে দিলে যত্ন করে।

মা তখন ঘরের ভেতর সন্ধ্যা-আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত। বিষণখুড়ো চোখ আর হাতের ইসারায় বললে, চুপ! এখন ওর মাকে ডেকো না। তাহলে ভারি ভয় পেয়ে যাবে। জলে ডোবা মানুষকে জ্ঞান কি করে ফিরিয়ে আনতে হয় আমি জানি। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করো—

ছেলেরা যারা উপস্থিত ছিল, সকলেই এগিয়ে এলো। তখন বিষণখুড়ো কুশলের পেটে চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে একবার বসায়, আর একবার শোয়ায়।

এই করতে করতে গল্ গল্ করে বেশ খানিকটা জল ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিষণখুড়োর দৃষ্টি এখন ওর মুখের দিকে। এইবার ধীরে ধীরে কুশল চোখ মেলে তাকালো।

বিষণখুড়োর মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বললে, যাক আর কোনো ভয় নেই প্রাণে বেঁচে গেছে। ছেলের দল তখন আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে মা প্রদীপ হাতে ঘর থেকে বেরুলেন। উঠোনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে যাবেন। ছেলেদের সাড়া পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, এ কি ব্যাপার? আমার খোকা বেঁচে আছে ত'?

বিষণখুড়োর মুখে তখন আর হাসি ধরে না। বললে, আর ভয় নেই। জ্ঞান ফিরে এসেছে।

মা সেইখানে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আপন মনে বিড় বিড় করে কইলেন, এইজন্যেই বুঝি আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম?

বিষণখুড়ো ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলবার জন্যে কইলে, তুমি আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন বৌঠান? তাড়াতাড়ি তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে খোকার জন্য দুধ গরম করে নিয়ে এসো—

মা-ও যেন অথৈ জলে পড়ে গিয়েছিলেন। নাকি দিবা স্বপ্ন দেখছিলেন আপন মনে?

হঠাৎ যেন নিজের হুঁস ফিরে এলো। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ত'! তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হবে।

মা উঠোনে নেমে গেলেন। মনে ওঁর কিসের ঝড় বইছে কে জানে!

ইতিমধ্যে দুই দল ছেলে, ডাক্তার আর কবিরাজ দুই জনকে ডেকে নিয়ে এলো।

ওরাও ত' ব্যাপার দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বন-ভোজনের পরিণাম যে এমন হবে, সে কথা ছেলের দল ভাবতেই পারে নি।

এইবার কুশল চোখ মেলে তাকাচ্ছে দেখে ওদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

ডাক্তার আর কবিরাজ মশায় দু'জনেই এসে বসে পড়লেন।

তারপর ভালো করে কুশলকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রবীণ কবিরাজ মশাই নাড়ি দেখে বললেন, আর কোনো ভয় নেই। আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি—

ডাক্তার বয়েসে পৌঢ়। এই গ্রামেরই লোক। তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কবরেজ মশাই বললেন, খানিকটা কুসুম-কুসুম গরম দুধ খাইয়ে দিতে হবে।

বিষণখুড়ো উত্তর দিলে, হ্যাঁ কোবরেজ মশাই, ওর মা গরম দুধ আনতে গেছে—

খুশী মনে ডাক্তার আর কবিরাজ বিদায় নিলেন।

গভীর রাত।

সারা প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণনা করছে।

খোকা নিজের বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মা অপলক নেত্রে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওই আকাশের তারা, গাছের পাতা, রাতের বাদুড়, কোটরে বসা লক্ষ্মী-পেঁচা সবাই যেন পরম আগ্রহ নিয়ে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কখন খোকা জেগেছে, কখন খোকা আগের মতো কথা বল্‌বে, হেসে উঠবে, আর এই উঠোনে ছুটোছুটি করবে।

গোয়ালের গাইগুলো, খোপের পায়রা আর হাঁসগুলোও কি ডাক্‌তে ভুলে গেছে? খোকা কথা বললে ওরা আবার নতুন করে ডাক্‌তে সুরু করবে!

মার চোখে আজ ঘুম নেই কেন?

মায়ের মনে প্রশ্ন জাগে—কেন দুঃস্বপ্ন দেখলাম? খারাপ স্বপ্ন দেখেও কেন ছেলেকে যেতে দিলাম? কেন খোকা নদীতে ডুবে গেল?

এ কি ভাগ্যের নির্মম খেলা? তবু মায়ের মনে এই সান্ত্বনা—সঙ্কট-নারায়ণ-ব্রত তার খোকাকে আবার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ নয় ॥

এই ঘটনার মাসখানেক পরের কথা।

মা রোজই খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। সেদিন আরো আগে মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে কালো একটা কুয়াশা যেন ছড়িয়ে দেয়া আছে; সূর্য ওঠার তখনো অনেক দেরী।

সেই আঁধারের মাঝে পিদিম জ্বেলে মা ঘরের অনেক কাজ শেষ করলেন।

ঘরের মেঝেতে ঝাঁট দিয়ে ভালো করে নিকিয়ে নেয়া হ'ল। তারপর বাইরের আকাশের কালো পর্দাটা একটু ফিকে হতে মা কাপড় গামছা, ঘটি নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

ঘর থেকে বেরুবার আগে মা ধীরে ধীরে খোকাকে ডাকলেন—ওঠ খোকা, আজ সকালে সকাল উঠতে হবে।

খোকা একবার চোখ পিট্-পিট্ করে তাকালে। তারপর শুধোলে, কেন মা? এখনো ত' রাত রয়েছে। এত সকাল উঠে কি হবে?

মা যেন কানে-কানে বলার মতো করে বললেন—ওরে খোকা, আজ তোর বাবার মৃত্যুদিন।

কথাটা শুনেই খোকা একেবারে বিছানার ওপর উঠে বসল। ওর দু'চোখ থেকে ঘুম একেবারে পালিয়ে গেল। ওর বুকের মাঝখানটিতে কে যেন হঠাৎ একটা বাণ ছুঁড়ে মারলে।

এই দিনটিতে তার বাবা মারা যান।

সে তখন কতটুকু ছিল? মা ত' সেই দুঃখের দিনটিকে ঠিক মনে করে রেখেছেন।

কাউকে জানতে দেন নি। অথচ প্রতিটি দিন তাঁর এই কথা মনে পড়েছে। নীরবে তিনি রোজ এই দিনটির জন্যে যেন মনের মন্দিরে ধ্যান করেছেন।

মা ত' খোকাকে জাগিয়ে দিয়ে পুকুর খাটের দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু খোকার ছোট্ট মনে যে সব ভাবনা-চিন্তার ঢেউ জাগল, তারই উত্তাল তরঙ্গে সে যেন একা একাই হাবুডুবু খেতে লাগলো।

এই ঘরটিতেই ত' বাবা থাকতেন! তিনি কখন ঘুম থেকে উঠতেন, আর কখনই বা ঘুমুতে যেতেন? সারাটা দিন তিনি কি কি কাজ করতেন?

কি খেতে ভালোবাসতেন তার বাবা? বাবা আর মা দু'জনে মিলে সামনের ফুলের বাগানটার মাটি কুপিয়ে, জল ঢেলে, সার দিয়ে সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন।

বাবা মরার পর আর মায়ের সেই বাগান করার দিকে যত্ন নেই। যে কটি গাছ আপনা থেকে ফুল ফোটায়, মায়ের পূজো তাই দিয়েই কোনো রকমে সারা হয়ে যায়।

এই দিনটিতে বাবা তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হয়ত তাদের অসহায় করে ফেলে রেখে যেতে চান নি, মৃত্যুর কঠিন হাত তাঁকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আজ এতদিন পর বাবার আত্মা কি তাঁর মৃত্যুদিনে এই ধূলির ধরণীতে ফিরে আসবে? তিনি কি দেখতে আসবেন আমরা কত কষ্টে আছি?

এই সব প্রশ্ন ছোট্ট খোকার মনে জাগছিল। আজ তার বাবার মৃত্যুদিনে সে কি ভালো কাজ করতে পারে যাতে ওর বাবার আত্মা তৃপ্ত হবে?

নানা কথা খোকা আপন মনে ভাবছিল। বাবা যেখান দিয়ে হাঁটাচলা করতেন, যেখানে বসে আপন মনে পড়াশোনা করতেন, যেখানে তাকে আদর করতেন, যে খাটে তিনি ঘুমোতেন, যে পুকুরে তিনি স্নান করতেন—সবই হয়ত সেই রকম আছে—কিন্তু সেই মানুষটি আর তাদের মাঝখানে নেই।

এই রকম দুঃখের ঘটনা জগতে কেন ঘটে? বিধাতা পুরুষ কি ইচ্ছে করেই মানুষের মনে কষ্ট দেন।

ছোট খোকা ঠিক্ ঠিক কিছু বুঝতে পারে না। তবু তার অন্তরে প্রশ্নের বিরাম নেই! ইতিমধ্যে মা পুকুর ঘাট থেকে ফিরে এসেছেন।

খোকা তার মাকে শুধোলে—আচ্ছা মা, আমিও কি গিয়ে পুকুর ঘাটে স্নান করে আসবো?

মা উত্তর দিলেন—আর একটু বেলা হোক, তখন তুমি স্নান করবে। নইলে তোমার আবার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

খোকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, মা কি করেন? স্নান করে ফেরবার মুখে মা বেশ কিছু ফুল তুলে নিয়ে এসেছেন। সেই ফুল দিয়ে মা বোধহয় এখন মালা গাঁথবেন।

ঠিক তাই!

খোকা বুঝতে পেরেছে। ওই মালা বাবার ফটোতে লাগিয়ে দেবেন মা। তারপর মনে মনে বাবার ধ্যান করবেন।

এই সময়টায় খোকা পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখটুখ ধুয়ে এলো।

তারপর যে বাগানটা এক সময় মা-বাবা দিনরাত খেটে তৈরী করেছিলেন সেইখানে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। অনেক গাছই এর মধ্যে মারা গেছে। তবু কতকগুলো ফুল গাছে এখনো ফুল ফুটছে।

খোকা আপন মনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে মা বেরিয়ে এলেন বাইরে।

খোকা বাগানে ঘুরছে দেখে মা-ও দাওয়া থেকে নীচে নেমে এলেন।

বললেন—জানিস খোকা, এই বাগানে আগে কত ফুল ফুটত। তোর বাবা এই বাগানটা বড় ভালোবাসতেন। এই যে দেখছিস কৃষ্ণচূড়া আর আমলকী গাছ, ওখানে তিনি সুন্দর একটি দোলনা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই দোলনাতে তুই কত দোল খেতিস।

খোকা চোখ পিট্‌পিট করে বললে—হ্যাঁ মা, কী মজা যে হতো।

মা বাগানের একটা কোণে গিয়ে খোকাকে দেখিয়ে বললেন—আচ্ছা বল ত' খোকা, এটা কি গাছ?

খোকা উত্তর দিলে—আমায় ঠকাতে পারবে না। আমি জানি, ওটা বকফুল গাছ—

মা বললেন—জানিস খোকা, এই বকফুল গাছটা তোর বাবা নিজে হাতে পুঁতে-ছিলেন। এক সময় এই গাছে প্রচুর ফুল ফুটত। সাদা সাদা ফুলে সারা গাছটা ছেয়ে থাকত।

খোকা বললে—এখনো ফুল ফোটে, কিন্তু অনেক কম। মা হাসতে হাসতে কইলেন, কিন্তু মজার কথাটা ত' এখনো বলি নি।

খোকা শুধোলে—কি মজার কথা মা?

মৃদু হাসিতে মার মুখখানি ভরে গেল। জবাব দিলেন—তোর বাবা এই বকফুল ব্যাসন দিয়ে ভাজা খুব ভালো বাসতেন।

খোকা হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললে—আচ্ছা মা, একটি কাজ করলে ত' হয়—

মা খোকার চোখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে?

খোকার মুখে মিষ্টি হাসি।

—একটা কথা আমার মাথায় এলো। তুমি আগে শোনো, হেসো না যেন!

—আহা, তুই বল না শুনি—

—আমি বলছিলাম কি, বাবা যা-যা খেতে ভালোবাসতেন—তুমি আজকের দিনে তাই রান্না করো! আমি আমার দু'চার জন বন্ধুকেও নেমন্তন্ন করি—

মা উত্তর দিলেন—তা মন্দ কি! বাল্য ভোজ ত' ভালই। ওতে আত্মার তৃপ্তি হয়।

খোকা শুধোলে—আচ্ছা মা, তুমি আত্মা বিশ্বাস করো?

মা জবাব দিলেন—নিশ্চয়ই। আত্মার ত' ক্ষয় নেই। আত্মা আছে বৈ কি!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—তোর কাছে ত' আমি ঠাকুর শ্রীরাম-

কৃষ্ণের গল্প বলেছি। তিনি যখন দেহ রক্ষা করলেন—শ্রীশ্রীমা শাঁখা আর চুড়ি খুলে রাখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঠাকুর দর্শন দিয়ে বললেন—এগুলো খুলে রাখছ কেন? 'আমি কি মরেছি? জীবন আর মৃত্যু—এত' শুধু এ-ঘর আর ও-ঘর।

খোকা উত্তর দিলে—হ্যাঁ মা, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তোমার কাছেই শুনেছি—

মা বললেন—তারপর শোন্—, যীশুখৃষ্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেলা হ'ল—তারপরেও তিনি বহুবার তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া হিন্দুরা আত্মার তৃপ্তির জন্যে গয়ায় পিণ্ড দেয়।

খোকার কৌতূহলী মন অনেক কিছু জানতে চায়। সে হঠাৎ মায়ের কাছে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা মা, আমার বাবাও ত' আমাদের দেখছেন,—আমরা কি ভাবে আছি, চলছি-ফিরছি—সব দেখছেন। তিনি কেন আমাদের দেখা দেন না?

মা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর কইলেন—তা ত' বলতে পারবো না বাবা! তবে এইটুকু জানি, তিনি আমাদের সব সময় দেখছেন আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা সব তিনি জানেন। হয়ত এই বাড়িতে ঠিক এই সময় তাঁর আত্মা উপস্থিত রয়েছে, আমাদের সব কথা শুনছেন, কিন্তু আমরা কিছুই টের পাচ্ছি না। দেহ ধারণ করবার শক্তি হয়ত সব আত্মার নেই। কিন্তু আত্মা সব জায়গায় চলা-ফেরা করতে পারে এ কথা আমরা বিশ্বাস করি—

—ঠিক আছে মা। খোকা বললে—বাবা কি কি খেতে সাধারণত ভালোবাসতেন তুমি আজ তাই রান্না করো। তাঁর আত্মার তৃপ্তি হবে।

মার মুখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো। কিছুক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন—শাক খেতে তোর বাবা খুব ভালো-বাসতেন। ঘন ছোলার ডাল ওর খুব প্রিয় ছিল। ব্যাসন দিয়ে বেগুন ভাজা আর বক্ ফুল ভাজা তাঁর কাছে বেশ মুখরোচক ছিল! এ ছাড়া লাউয়ের তরকারী, পাবদা মাছ পেলে তিনি খুব খুশী হতেন।

—পাবদা মাছ না হয় আমি যোগাড় করে নিয়ে আস্‌বো—

মা আর ছেলে তাকিয়ে দেখ্‌লে বিষণ খুড়ো ওই কথা বলতে বলতে উঠোনে এসে ঢুকছে।

খোকা আনন্দে হাততালি দিয়ে বললে—তাহলে তোমার আর কোনো ভাবনা রইল না। ছোলার ডাল ঘরে আছে। শাকের জন্যে ভাবনা নেই। বেগুন, বক ফুল আর লাউ নিজেদের বাগানেই ঝুলছে। এক বাকি ছিল পাবদা মাছ,—তা' বিষণ খুড়ো যোগাড় করে নিয়ে আসবে। আমি যাই মা, আমার চার জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে আসি—

সঙ্গে সঙ্গে খোকা ছুট লাগিয়েছিল। পেছন থেকে মা ডেকে বললেন—শুনে যা একটা কথা—

খোকা ফিরে এসে বললে—আবার পেছু ডাকলে ত' ?

মা হেসে বললেন—খনার বচন জানিস ত' ? মা পেছন ডাক্‌লে কিছু হয় না—! 'আগে থেকে পিছু ভালো যদি ডাকে মায়—'

খোকা শুধোলে—কি বলবে বলো।

মা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'শোন্‌ বলি, সেই যে বামুনঠাকুর তোদের বন-ভোজনের দিন যে তোকে নদী থেকে তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছিল—তাকেও নেমন্তন্ন করে আয়। অমন উপকারী মানুষ আমার আর কে আছে ? তা ছাড়া ব্রাহ্মণ মানুষ ওকে নেমন্তন্ন করলে আত্মা খুশী হবে—'

খোকা জবাব দিলে—আচ্ছা, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসছি—

সেদিন সারা সকাল মা মনোমত করে রান্না করলেন। রান্না করতে করতে তাঁর দুই চোখ বারে বারে জলে ভরে উঠল।

আজ মানুষটি বেঁচে থাকলে কত আনন্দ করতেন, কত রসিকতা করতেন।

কিন্তু কে বললে, তিনি নেই ? হয়ত আশে পাশে ঘুরছেন, হয়ত লাউয়ের ডগাটা মাচার ওপর তুলে দিচ্ছেন। বেগুন গাছের পোকা ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, না হয় পুকুর ঘাটে গিয়ে বিষণের মাছ ধরা দেখছেন !

মায়ের চোখের সামনে এই সব ছবিগুলো ভেসে উঠল। সেদিন দুপুর বেলা সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে মায়ের রান্না খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগ্‌লো—

মা মনে-মনে ভাবলেন, আর একটি কলাপাতার সামনে আর একটি মানুষ বসে চেটে-চুটে কি সব খাবার খেয়ে নিল ? হয়ত তাকে চোখে দেখা যায় নি। তবু সে একেবারে মিথ্যে হয়ে যায় নি। হয়ত সে এসেছিল—

হঠাৎ একটি গানের কলি—মায়ের কানে ভেসে এলো—"তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো—মলিন মর্ম মুছায়ে"।

খোকার বাবা অনেক সময় গানটি গুণ গুণ করে গাইত।

॥ দশ ॥

সারাটা দিন মায়ের এতটুকু বিশ্রাম ছিল না।

একদিকে ঘরের সব কাজ—অন্যদিকে এতগুলি মানুষের রান্না।

মা যে সারাদিন না খেয়ে এই অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন—এ কথা কাউকে জানতে দেন নি।

রান্না করবার সময় একবার মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ভাগ্যিস কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন। নইলে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেত।

ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে তিনি বিষণকে দাওয়ার ওপর বসিয়ে দিলেন।

নিজের হাতে পরিবেশন করে তিনি বিষণকে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ালেন। বর্তমানে তাঁর যা নিঃসহায় অবস্থা সেই সময় বিষণের মতো একটি উপকারী সুহৃদ তাঁর আর কেউ নেই।

বিষণও সব কটি পদ চেয়ে নিয়ে তার খাওয়া শেষ করল।

বললে—বৌঠান, তোমার রান্না যেন একেবারে অমৃত। পেট ভরে ডিগ্ ডিগ্ করে তবু মনে হয় আরো একটু চেয়ে নি।

মা বললেন—আজ তুমি পাব্দা মাছ খুব ভালো এনেছিলে বিষণ। রান্না করে, তোমাদের পাতে দিয়ে আমিও খুব তৃপ্তি লাভ করেছি।

মা আর বিষণ দুই জনেই জানে যে, এই বাড়ীর কর্তাটি পাব্দা মাছ খুব পছন্দ করতেন। তাই কেউ আর সে কথা উল্লেখ করলেন না।

বিষণ দাওয়াটা নিকিয়ে হাঁসগুলোকে ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

বললে—আজ সারাদিন বাড়ীর কোনো খোঁজ নিতে পারি নি। এইবার একটু পা চালিয়ে চলে যাই—

মা কিছু মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা ওর কোঁচড়ে ঢেলে দিলেন।

বললেন—আর ত' কিছু দিতে পারলাম না। এইগুলোই ছেলে-মেয়েদের হাতে দিও।

বিষণ বললে—তুমি ত' সব সময়ই কিছু-না-কিছু দিচ্ছ বৌঠান। আজ আবার এত কিন্তু কিন্তু হচ্ছ কেন?

বিষণ গান গাইতে গাইতে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

এইবার মা একটু নিজের দিকে তাকাবার অবসর পেলেন।

খোকা বন্ধুদের এগিয়ে দিতে গেছে।

আর ওই বাচ্চা ছেলেটা সারাদিন কি করে ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকে। ওর-ও ত' বন্ধু-বান্ধব আছে, খেলার মাঠ আছে—বাইরের জগৎকে বাদ দিলে ওই বা বাঁচবে কি করে ?

মা চুপ করে দাওয়ার ওপর একটু বসলেন।

চাঁদের মৃদু জোছ্‌না উঠেছে। বাগান থেকে কয়েকটি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এই রকম নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ীর মানুষটি কতদিন মাদুর পেতে বসেছেন, আপন মনে গুণ-গুণ করে গান করেছেন, আর বারে বারে ওঁকে ডেকেছেন সেই মাদুরের ওপর এসে বসতে।

কিন্তু তখন ওঁর সময় হয় নি। সংসারের কত কাজ ওর হাতে। দু' দণ্ড বসবার সময় কোথায় ?

আজ এই নিরিবিলি সন্ধ্যাবেলায় মায়ের মনে হচ্ছে কত অবসর! ওই মলিন চাঁদের আলো, বাগানের কয়েকটি গাছের ফুল, নীড়ে ফেরার কয়েকটি পাখী যেন তাকে ডাক দিয়ে বলে গেল, আর কি তোমার কাজ রইল ঘরে ?

সারাদিন উপবাসে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ক্ষিদে-তেষ্টা একেবারে নেই! যেন এমনিভাবে চুপচাপ বসে থাক্‌তেই ওর ভালো লাগছে!

কিন্তু একেবারে উপোস করে থাক্‌লে, কাল সকালে উঠে সংসারের কাজে লাগবেন কি করে ?

খানিকটা সাবুদানা ভিজে আর নারকেল কোরা ছিল। তাই গুড় দিয়ে মেখে খেয়ে—ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল খেলেন মা। তারপর নিজের ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিলেন।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল।

খোকা কখন ফিরে এলো, ঢাকা দেয়া খাবার খেয়ে সে কখন নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল,—মা কিচ্ছু জানতে পারেন নি।

গভীর রাত্রে ওর মনে হ'ল—তার নিজের নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

এমনভাবে কাতর কণ্ঠে কে ওকে ডাকছে—কিছুতেই তিনি বুঝতে পারছেন না দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে,—ডাক শুনছেন—তবু বিছানা ছেড়ে কিছুতেই উঠতে পারছেন না!

এর পর আবার স্পষ্ট ভাষায় চেনা গলা শোনা গেল।

—এখনো ঘুম ভাঙল না? শীগ্‌গির উঠে পড়ো, ঘরে যে আগুন লেগেছে! তোমার খোকাকে বাঁচাও!

অ্যাঁ? আগুন।

কোথায় লাগলো? কখন লাগলো?

সেই দুঃস্বপ্নই কি এতদিনে সত্যি হ'ল ?

এইবার ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলেন মা।

তাই 'ত'!

চারদিকে আগুন তার লেলিহান শিখা বিস্তার করেছে।

কতক্ষণ ধরে তিনি সাবধান বাণী শুনছেন—তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না!

এই আগুনের বেড়াজাল থেকে তাকে বেরুতেই হবে। একদিকে যেমন আগুন, —অন্যদিকে তেমনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী। খোকা এখনো অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে!

সারাটা দিন ওর-ওখাটা-খাটুনি আর পরিশ্রম কম হয় নি।

তাই খোকাও এই দারুণ বিপর্যয়ের কথা বিন্দুমাত্র জানতে পারে নি!

—ডান দিকে দরজা—খোকাকে কোলে নিয়ে খিল খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো—

সেই চেনা মানুষটির গলা আবার স্পষ্টভাবে শোনা গেল।

মা আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না।

দু' চোখ ধোঁয়ায় জ্বলে যাচ্ছে। তবু তিনি মনে সাহস আর বল নিয়ে খোকার বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।

খোকাকে কোনো রকমে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরে তিনি প্রাণপণে ছুটলেন দক্ষিণ দিকের দরজার খিল খুলতে।

ধোঁয়ার আর আগুনের তাপে সে দরজার খিল কি আর সহজে খুলতে চায় ?

কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। যে করেই হোক খোকার জীবন রক্ষা করতেই হবে।

আর সেই চেনা গলার মানুষটি কি কোনো সাহায্যই করবে না? দরজা তাকে খুলে ফেলতেই হবে—আগুনের তাপে খিলটা সত্যি আটকে গিয়েছিল।

মায়ের প্রাণপণ টানে সেই বন্ধ-দুয়ার খুলে গেল। খোকাকে জড়িয়ে ধরে, মা যেন ঘর থেকে একেবারে ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

একটু বাদেই সেই জলন্ত ঘরটি একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

মায়ের কপালে একটা চোট লেগেছিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিল না।

মা শুধু একবার লেলিহানঅগ্নি-শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করে হতাশার সুরে বললেন, একটা জিনিসও বাঁচানো গেল না। আজ আমরা একেবারে পথের ভিখিরী হলাম।

এই ব্যাপারে খোকা একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বেরুচ্ছিল না!

ইতিমধ্যে এই সর্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখা দেখে—গ্রামবাসী আর প্রতিবেশীরা অনেকেই ছুটে এলেন।

পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলো বিষণ খুড়ো—বিষণ খুড়ো ত' উন্মাদের মতো ঘরের জিনিস-পত্র বাঁচাবার জন্যে সেই আগুনের মধ্যেই ঢুকতে যাচ্ছিল—

কিন্তু মা তার হাতখানি ধরে ফেললেন। বললেন, আমাদের ত' সর্বস্বই গেছে, তুমি কেন এই আগুনের মধ্যে প্রাণ দিতে যাবে? কিছুই আর বাঁচানো যাবে না। তার চাইতে তুমি দূরে বসে আগুনের খেলা দেখো।

সেই শেষ রাত্তিরে আগুনের লক্-লক্ শিখা দেখে যারা আশ-পাশ থেকে এসে জুটেছিল—তারা সকলে হায়-হায় করতে লাগলো।

মা যেন কত কষ্টে নিজের বুকের রক্ত জল করে একমাত্র ছেলেটিকে মানুষ করছিলেন, সে কথা গাঁয়ের কারো অজানা ছিল না।

এখন কি ওদের গতি হবে—কোথায় গিয়ে ওরা মাথা গুঁজে দাঁড়াবে সেই হ'ল গাঁয়ের মানুষের এক মস্ত বড় ভাবনা।

জ্বলন্ত ঘরখানি থেকে মাঝে মাঝে টিন, কাঠ, বাঁশের টুকরো, কোনো তপ্ত বাসন-কোসন ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসছে—সবাই এসে মা আর খোকাকে একটু দূরে একটা গাছতলায় বসিয়ে দিল।

বিষণ খুড়ো পাগলের মতো চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো।

না, কোনো কিছুই আর বাঁচাবাব উপায় ছিল না। অবশেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, সর্ব-হারার মতো বিষণ খুড়ো একটা গাছতলায় বসে পড়ল।

দুই হাত দিয়ে সে কেবল তার মাথার চুলগুলি টানতে লাগলো।

তার দুই চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকলো।

কিন্তু জলের আভাস মাত্র নেই মায়ের চোখে! যার সব গেছে—কান্নাটুকুও বুঝি তার অবশিষ্ট নেই।

মা এক দৃষ্টে সেই ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খোকার মুখে যেন কে বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে।

সে না পারছে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে, আর না পারছে—নিজে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতে।

তাদের এই দুঃখের সায়র যে কত গভীর তা ওই ছোট ছেলেটি যেন অনুধাবণ করতে পারছিল না।

খোকা আপন মনে ভাবছিল, এই যে মা দুঃস্বপ্ন দেখে সঙ্কট নারায়ণের-ব্রত করলেন—কি শুভ ফল হ'ল তার?

তাদের দুঃখের পাথারে ডুবিয়ে মারাই কি বিধাতার ইচ্ছে?

অথচ তারা ত' কারো কোনো ক্ষতি করেনি। আপন মনে মা-আর ছেলে কোনো রকমে বেঁচে ছিল—গাঁয়ের এক প্রান্তে! তাদের দুঃখের ভাগ নিতেও কাউকে

ওরা ডাকে নি ? বিষণ খুড়ো সকল আপদে-বিপদে ওদের একেবারে আগলে রেখেছিল। আজ সেই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অবশেষে সেই কালরাত্রির প্রভাত হ'ল। কোনো কোনো প্রতিবেশী তাদের ডাকল—নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু মা যেন একেবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন !

বিষণ খুড়ো খোকাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে বললেন—চল বৌঠান, তুমি আমার বাড়ি চলো। সেখানে একটা বাড়তি ঘর ত' আমার আছে। কষ্ট হলেও সেইখানে তুমি খোকাকে নিয়ে মাথা গুঁজে থাকো। তারপর আমি তোমার নিজের ভিটেয় ঘর তুলে দিচ্ছি—

পাথরের মূর্তির মুখে যেন কথা ফুটল। মা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—না রে বিষণ, বিধাতা যখন সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমায় পথের ভিখারী করে দিলে,—তখন আর এখানে থাকবো না। এখানে আমার স্বামীকে হারিয়েছি, তারপর আবার সব কিছু খোয়ালাম। এখন আমার একমাত্র কাজ হবে এই খোকাকে মানুষ করে তোলা। ওর এক পিসি আছে। আমি ভাবছি খোকাকে নিয়ে সেইখানেই চলে যাবো। কিন্তু তোমাকে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে—

বিষণ বললে—সে না হয় পৌঁছে দেবো। খোকার পিসির বাড়ি কত দূর ?

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন—কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে বন-তুলসী গ্রাম আছে না ? সেই গাঁয়েই খোকার বড় পিসির বাড়ি। ওই এক পিসিই বেঁচে আছেন—

মায়ের কথাটা লুফে বিষণ বললে—হ্যাঁ, বন-তুলসী গাঁয়ের নাম শুনেছি। ওখানে খুব বড় হাট হয়—

মা বললেন—গরুর গাড়ী করে যেতে হয় সেখানে। কিন্তু আমার হাতে ত' একটি আধলাও নেই !

বিষণ জবাব দিলে—গরুর গাড়ী করে না হয় আমি সেথায় তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো। একটা গরুর গাড়ী ত' আমার নিজেরই আছে।

একটু চুপ করে থেকে বিষণ যেন আপন মনেই বললে—কিন্তু আমি বলছিলাম কি —দু'চার দিন বাদে একটু সুস্থ হয়ে রওনা হলে হত না ?

মা করুণ কাতর কণ্ঠে কইলেন—আর থাকতে বলিস নে বিষণ। যদি তোর গরুর গাড়ী খালি থাকে ত' বেলাবেলি রওনা হয়ে পড়ি। হয়ত সূর্যাস্তের আগেই আমরা বন-তুলসী গাঁয়ে পৌঁছে যেতে পারবো।

বিষণ কইলে—তা হলে তোমার এই ঘাটলার ওপরেই একটু বোসো বৌঠান, আমি গাড়ীটা জুড়ে নিয়ে আসি—

গ্রাম ছেড়ে গরুর গাড়ী চলেছে বন-তুলসী গাঁয়ের দিকে—

মা আর ছেলে চুপচাপ গাড়ীতে পাতা খড়ের গাদার ওপর বসে আছে।

মায়ের ছ'টি চোখে এই গাঁয়ের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ; সবই ত' ঠিক আছে—। যে যার আপন কাজ করে চলেছে। চাষী ভায়েরা নিজ নিজ ক্ষেতের কাজে চলেছে, জেলেরা জাল ফেলতে চলেছে—খালের ধারে, গাড়ী বাঁক নিতে দেখা গেল—পাঠশালা বসেছে একটা গাছ তলায়।

খোকা হঠাৎ বললে, 'আমার বইগুলোও সব পুড়ে গেল—

মা খোকার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আবার হবে। খোকা, মানুষ তোমায় হতেই হবে।

॥ এগারো ॥

সারাদিন ধরে গাড়ী চলেছে।

বিষণের মুখেও কোনো কথা নেই।

সে আপন মনে গাড়ী চালিয়ে চলেছে।

পেছন ফিরে যে একবার ওদের মুখের দিকে তাকাবে বিষণখুড়োর সে সাহসও নেই।

তাই বলে চাবি দেয়া পুতুলের মতো সে শুধু সমুখ পানে চেয়ে রয়েছে, আশে-পাশে কোনো দিকে তাকাবার যেন তার কোনো উপায় নেই। গাড়ীর ভেতর আরো ছ'টি পুতুল যে নির্বাক হয়ে বসে রয়েছে—সে দিকে ভুলেও সে একবার চেয়ে দেখছে না।

এইভাবে গরুর গাড়ী চলেছে এগিয়ে এক গ্রাম ছেড়ে আর এক গ্রামে।

এরই মধ্যে গণগণে রোদ্দুর উঠে গেছে মাথার ওপর। আরো কিছুদূর চলবার পর একটা হাট পড়ল পথের পাশে।

এতক্ষণে বিষণখুড়োর বুঝি সম্বিৎ ফিরে এলো। সে এইবার গাড়ীর পেছন দিকে তাকালো।

বললে—কারো পেটে ত' কিছু পড়ে নি! হাট যখন মিলল—তখন মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা কিনে নিয়ে আসি। ওই ত' পাশেই টল্‌টলে পুকুর। গাড়ী থেকে নেমে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নাও বৌঠান। খোকার মুখটাও ত' কাল্‌চে মেরে গেছে।

তারপর হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে বিষণ যেন শিউরে উঠল।

কইলে—একি বৌঠান, তোমার কপালে একটা চোট লেগেছিল কাল রাত্রে? কপালে যে রক্ত জমে আছে।

মা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কাল রাত্রে খোকাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় চৌকাঠে লেগেছিল। সেকথা আগে বলবে ত'? বিষণ অনুযোগ করে বললে।

আমি এক্ষুণি গাঁদা গাছের পাতা নিয়ে আসছি। তারই রস কপালে লাগিয়ে দাও। এক্ষুণি সেরে যাবে। তোমরা গাড়ী থেকে নেনে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি যাবো আর আস্‌বো।

বিষণ গরুর গাড়ীটাকে রাস্তার একধারে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর কিছু খড় গাড়ী থেকে বের করে বলদ দু'টির সাম্‌নে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো হাটের দিকে।

মা মনে মনে ভাবলেন, সব যার খোয়া গেছে পথই ত' তার একমাত্র সম্বল।

খোকাকে নিয়ে তিনি গরুর গাড়ী থেকে নেমে এলেন। এই দিকটা বেশ ঘাসে ঢাকা। ঘাট্‌লাটা নারকেল গাছের গুড়ি কেটে তৈরী করা হয়েছে। হাটটা একটু দূরে বসেছে।

খোকাকে নিয়ে মা ঘাট্‌লার কাছে নেমে গেলেন। দিব্যি টলটলে জল। মনে হয় এই শীতল জল দেহ-মনের সব ব্যাথা-বেদনা ধুয়ে মুছে দেবে।

মা বললেন' 'খোকা, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নে্। নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বিষণ এক্ষুণি মুড়ি-মুড়কি কিনে নিয়ে আসবে। ও আগের জন্মে নিশ্চয়ই তোর ভাই ছিল। নইলে এত দরদ কেন আমাদের ওপর। তোর যে খুব ক্ষিদে পেয়েছে সেকথ গাড়ী চালাতে চালাতে ঠিক টের পেয়েছে। বুঝ্‌লি খোকা, একেই বলে প্রাণের টান

খোকা কিন্তু তার ক্ষিদের কথা একবারও বললে না। শুধু মাকে জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা মা, আমরা ত' পিসির বাড়ি যাচ্ছি, কিন্তু পিসি যদি আমাদের চিন্‌তে না পারেন? যদি তাঁদের বাড়িতে আমাদের থাকতে না দেন?

এত দুঃখেও মার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মা বললেন, 'দুর বোকা ছেলে, তা কেমন করে হবে? তোর আপন পিসি যে। বড় পিসি, বুঝলি? তোর আরো দু'জন পিসি ছিলেন, তাঁরা অনেক কাল আগেই মারা গেছেন। তোর এই পিসিই তোর বাবার বড় বোন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন, আদর সোহাগ সবই ত' এই বড় পিসির সঙ্গে। তোকেই না হয় দেখেন নি, কিন্তু আমায় ত' দেখেছেন, জানেন। কতবার ওঁদের বাড়িতে আসবার জন্যে আমায় নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু নিজের সংসার ফেলে ত' আর আসা হয় নি।

খোকা জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা এখন এভাবে গেলে কি বড় পিসি তোমায় চিনতে পারবেন ?

মা উত্তর দিলেন—তা ঠিক আর পারবেন না ? 'তবে এইভাবে পথের ভিখিরী হয়ে যে কারো দরজায় গিয়ে হাজির হবো।' সেকথা কি কোনো দিনের তরে ভাবতে পেরেছিলাম ?

কথা বলতে বলতে মা খোকাকে নিয়ে ওপরে উঠে এসেছেন।

ওদিক থেকে দেখা গেল বিষণখুড়ো ছুটতে ছুটতে আসছে। বিষণ বললে—এই নাও বৌঠান, গাঁদা গাছের পাতা। ভালো করে হাতে চট্‌কে কপালে লাগিয়ে দাও। একেবারে সেরে যাবে।

তারপর খোকার দিকে তাকিয়ে বিষণখুড়ো কইলে—খুব ক্ষিদে পেয়েছে তোমার আমি বেশ বুঝতে পারছি। আরে আমারই ক্ষিদের চোটে পেটের নাড়ি চিন্ চিন্ করছে···আর তুমি ছেলে মানুষ, তোমার ত' ক্ষিদে পাবেই। শোনো, আমি কোঁচড় ভর্তি মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা নিয়ে এসেছি। একটা দোকানে গরম গরম জিলিপি ভাজ্‌ছিল তাও কিছুটা নিয়ে এলাম। তোমার ভালোই লাগ্‌বে। বৌঠান, তুমি খাবে ত ?

মা বললেন—পাগল, বাসি কাপড়ে রয়েছি, সারাদিন স্নান করি নি···আমি কি যেখানে-সেখানে খেতে পারি ? তার ওপর সন্ধ্যা-আহ্নিক হয় নি,—সারাটা দেহ অশুচি হয়ে রয়েছে। তোমরা দু'জনে খেলেই আমার খাওয়া হবে। না, না, তুমি কিছু ভেবো না বিষণ, উপোস করার অভ্যাস আমার চিরকালই আছে। ছেলেবেলায় শিব রাত্রির উপোস, বার-ব্রতের উপোস আমার ঠাকুমার সঙ্গে কত করেছি।

বিষণ বুঝতে পারলে বৌঠানকে অনুরোধ করা বৃথা। গরুর গাড়ীতে বসে কিছুতেই তিনি খাবেন না। তাই খোকাকে তার খাবার ভাগ করে দিয়ে নিজেও কোচড় ভর্তী মুড়ি-মুড়কি নিয়ে খেতে বসে গেল।

খোকা খেতে খেতে বললে—মুড়িগুলো খুব মুচ্‌মুচে এনেছ বিষণখুড়ো—

বিষণখুড়োও খুশী মনে জবাব দিলে—আরে খোলাতে গরম গরম ভাজছে যে।

তারপর একটু থেমে বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। পাকা সবরী কলা পেলাম কয়েকটা। নিয়ে এসেছি। নাও খোকা—তুমিও খাও, আমিও খাই। মুড়ি-মুড়কির সঙ্গে পাকা সবরী কলা বেশ ভালোই লাগ্‌বে।

খোকা কলা খেতে খেতে বললে—একটা মজা দেখেছ বিষণখুড়ো ? তুমি খাচ্ছ, আমি খাচ্ছি—সামনে বলদ দু'টো দিব্যি খড় চিবুচ্ছে, শুধু মা-ই চুপচাপ বসে আছে। তার কপালে আজ বিধাতা পুরুষ খাবার জোটান নি।

মা উত্তর দিলেন—দূর বোকা ছেলে ; বললাম না, তোরা খেলেই আমার খাওয়া হ'ল।

ওদের দু'জনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর বিষণখুড়ো আবার বলদ দু'টিকে জুতে দিলে গাড়ীর সঙ্গে।

হেলতে দুলতে গাড়ী আবার এগিয়ে চললো, গাঁয়ের পথ ধরে।

পথের দুই ধারে হাট তখন খুব জমে উঠেছে।

গাড়ী চালাতে চালাতে বিষণখুড়ো বললে—শোনো খোকা, এখানে পুকুরের জল নাই বা খেলে। পথে যেতে যেতে যদি 'টিপ-কল' পাওয়া যায় সেইখানে দিব্যি তেষ্টা মিটিয়ে নেবে।

খোকা উত্তর দিলে—সেই ভালো।

মা বললেন—কলা খাবার পর কিছুক্ষণ জল খেতে নেই। পরে সুবিধে মত জল খেলেই হবে।

গাড়ী আবার এগিয়ে চলে তার গতিতে। এইবার সকলেই বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

মনের বেদনাটা একটু যেন দূরে সরে গেছে। বিষণখুড়ো গাড়ী চালাতে চালাতে গান ধরল—

"এই ঘাটে লাগাইয়া নাও
দুঃখের কথা কইয়া যাও
ওরে ও রঙ্গীলা নায়ের মাঝি—ঈ—"

মা দেখ্‌ছেন—পথের দুই ধারে চির পরিচিত মানুষ জন।

ওদের ত' কোনো পরিবর্তন হয় নি!

তবে তাদের মাথায়ই বা কেন এমনভাবে বাজ ভেঙ্গে পড়ল!

বিধাতা পুরুষ কি কেবল দুঃখ দিতেই তাদের এই ভূবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ?

ছোট্ট খোকার মনেও নানা কথা জাগছিল।

—এই ত' যতদূর চোখ যায় কত রকমের বাড়ি চোখে পড়ছে। কারো পাকা বাড়ি, কারো টিনের ঘর, কারো ছনের ঘর, আবার কারো খড়ের ঘর। কারো ঘর একদিকে হেলে পড়েছে, দু'তিনটে বাঁশ দিয়ে প্যালা দিয়ে রেখেছে। সামনে বাগান, পেছনে পুকুর, মড়াই ভরা ধান কারো বাড়িতে, সামনের পুকুরে দলে দলে হাঁস সাঁতার কাট্‌ছে। ছাগল, ভেড়া এখানে-ওখানে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ; ছেলের দল উদোম গায়ে আপন মনে খেলাধূলা করে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ির চালে অনেক লাউ-কুমড়ো ফলে আছে। সিম গাছ হাওয়ায় দুলছে। একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। কোথায়ও বা পানের বরজ। কেমন সবুজ

পানের পাতাগুলো। রদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করছে। দাওয়ায় বসে বুড়োরা মনের আনন্দে তামাক টান্‌ছে, গল্প-গুজব করছে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি রসিকতা করছে! কিন্তু ওদের মতো কারো বাড়ি ত' আগুনে পুড়ে যায় নি! ভগবানের এ কি রকম বিচার খোকা বুঝতে পারে না! মা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, সঙ্কট-নারায়ণের ব্রত করল। কত কষ্ট করল, উপোস করল,—তাতে কি ফল হ'ল।

খোকা আপন মনে ভাবে, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পায় না।

ওদের গরুর গাড়ী অজানা পথে এগিয়ে চলে। পথে একটা টিপ-কল পাওয়া গেল। মেয়েরা কাপড় কাঁচছে, বাসন ধুচ্ছে। বিষণখুড়ো নীচে নেমে গেল। গাড়ীর ভেতর একটা লোটা ছিল, ভালো করে মেজে নিল, খোকাকে এনে জল দিল। বললে—টিপ-কলের জল, ভারী মিষ্টি আর ঠাণ্ডা; এইবার খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে নাও।

খোকার খাওয়ার পর বিষণখুড়োও এক লোটা জল ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেল্‌লো। বলদ দু'টোকেও জল খাইয়ে নিল।

তারপর আবার গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ী এগিয়ে চলে ধীর মন্থর গতিতে—বিষণ-খুড়োর গলায় বেলাশেষের গান।

রোদের তেজ এরই মধ্যে অনেক নরম হয়ে এসেছে। বিষণখুড়ো গাড়ী চালাতে চালাতে একজন হাটুরেকে শুধোলে—হ্যাগো, বলতে পারো—বন-তুলসী গাঁটা আর কত দূর?

লোকটা একটু থেমে উত্তর দিলে—তোমরা বন-তুলসী গাঁয়ে যাবে বুঝি? এই সামনের দীঘল মাঠটা পেরুলেই ত' বন-তুলসী গ্রাম। ওই যে দু'টো তাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা শিব-মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—ওইটেই হ'ল গে তোমার বন-তুলসী গ্রাম। তা' বন-তুলসী গ্রামে কার বাড়িতে যাবে তোমরা?

বিষণখুড়ো মায়ের মুখের দিকে তাকালো—

মা ধীরে ধীরে বললেন—ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ি।

হাটুরে লোকটি বললে—ও, ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ি? তিনি ত' বহুকাল দেহ রেখেছেন। তা ছেলে দু'জন এখন দিব্যি লায়েক হয়েছে। রম্‌রমা সংসার। বড় ছেলে ইস্কুলের মাষ্টার, আর ছোট্ট ছেলে ক্ষেত-খামার, জোত-জমি দেখে। ওদের অনেক ধানী জমি আছে। সংসারে মা লক্ষ্মীর কৃপা আছে।

মা কি নিশ্চিন্ত হবার একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন?

বিষণখুড়োর গাড়ী দ্রুত বেগে এগিয়ে চললো। সেই বড় মাঠটা পেরুতে পেরুতেই সূয্যিমামা পাটে বসলেন।

ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে গাঁয়ের লোকের সদর দরজার দিকটা দেখিয়ে দিলে।

গাড়ী গিয়ে একেবারে বার-বাড়ির উঠোনের কাছে হাজির হ'ল।

একদল ছেলেমেয়ে খেলাধূলা করছিল। একটা গরুর গাড়ীকে ঢুকতে দেখে তারা এসে ভীড় জমালো। ঠিক সেই সময় বড় পিসি প্রদীপ নিয়ে উঠোনে নেমে আসছিলেন।

মা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম জানালো। বললে—বড়দি, আমরা সব খুইয়ে এতদিনে তোমার কাছে ছুটে এসেছি—

এতক্ষণ বাদে বোধকরি মায়ের ত্বই চোখ জলে ভরে গেল। বড় পিসি প্রদীপ ধরে একবার মায়ের মুখখানি দেখলেন। তারপর একটি মেয়ের হাতে প্রদীপ দিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলেন।

—এ কি চেহারা হয়েছে তোর বৌ? আমার সোনার ভাইটি যেদিন চলে গেল—সেইদিনই বুঝেছি তোদের কপাল পুড়ল। কতবার ভেবেছি ছুটে যাই। কিন্তু তোর ওই সাদা সিঁতি দেখতে যেতে পারি নি বৌ। তুই যে আপনার জন মনে করে ছুটে এসেছিস তাতেই আমি শান্তি পাচ্ছি—বৌমারা কোথায় গেলে গো? আমার ভাইবৌকে একেবারে পুকুরঘাটে নিয়ে যাও। স্নান করে আসুক। মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এই বুঝি আমার সোনা ভাইটির ছেলে? বড় পিসি খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আমি তোর বড় পিসি।'

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব শুনবো, সব বলব। আমাদের ত্বঃখের কি আর শেষ আছে?'

॥ বারো ॥

মায়ের চোখের জল যেন বড় পিসির জন্যেই জমা হয়েছিল। বড় পিসি যত কাঁদেন, মা তত চোখের জল ফেলেন। রাত বেড়ে যায় তবু ওদের ত্বজনের কথা যেন শেষ হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় মা স্নান আহ্নিক করে সামান্য কিছু মুখে দিয়েছেন। খোকা গরম গরম মাছের ঝোল ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বড় পিসি রাগ করে বলেছেন, এরকম পাখীর আহার করলে ত' চলবে না বাপু। তোমাদের ত্বজনকেই শরীরটাকে ধাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমার গোয়ালে কত গরু,

কাল সকালে সব দেখাবো। বুঝলে খোকা, দুধ খেলেই দু'দিনে শরীর মোটা-সোটা হয়ে উঠবে। খোকা, আজ তুই ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে বাড়ির সবাইকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের বাড়ির সব কিছু দেখাবো। এখন আমরা দুটিতে একটু সুখ-দুঃখের কথা কই।

খোকা ত' ঘুমুতেই চায়।

কিন্তু কিছুতেই ওর ঘুম আসে না। জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে আলাদা হয়ে একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে।

ওইটি কি ওর বাবার চোখ ?

ওদের দুঃখের শেষ নেই দেখে ওই তারার চোখও কি জলে ভরে উঠেছে ? খোকা কিছুতেই বুঝতে পারে না।

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে চলেছে।

ঝোপে-ঝাড়ে—গাছের মাথায় অগুন্‌তি জোনাকীর আলো। ওই জোনাকীর দল কি খুঁজে বেড়াচ্ছে কে জানে!

এই যে বড় পিসির বাড়ি খোকা এলো, এখানে কত লোকজন, রম্‌রমা গম্‌গমা সংসার। সবাই খোকাকে কি চোখে দেখ্‌বে কে জানে। ভালো বাসবে ত' খোকাকে সকলে ?

একটা টিক্‌টিকি ডেকে উঠল, ঠিক্-ঠিক্-ঠিক্। টিক্‌টিকিরা কি সবসময় ঠিক কথা বলে ?

অনেক দূরে বোধ হয় গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর একদল শেয়াল ডেকে উঠল।

ওরা কি রাতের প্রহর গননা করছে ? একদল বাদুড় ডানা ঝাপটে চলে গেল। জানালা দিয়ে খোকা তাদের কালো ডানার ছবি দেখতে পেলে।

মা আর বড় পিসি তখনো মনের ব্যথা কথায় প্রকাশ করে চলেছে।

ওরা বোধহয় মনে করছে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে, মা তখন বড় পিসিকে চুপি চুপি বলছে, শোনো বড়দি, আমি আর কিছু চাইনে। তুমি আমার খোকাকে শুধু মানুষ করে গড়ে তোলো। ও ত' তোমারও বাপের বাড়ির বংশের শেষ প্রদীপ। ওকে অকালে নিভতে দিও না তুমি। ও যেন লেখা পড়া শিখে মানুষ হতে পারে—এই ব্যবস্থা শুধু করে দিও বড়দি।

বড়পিসি শুধু মাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। ফিস্ ফিস্ কার কইলেন, তুই কিচ্ছু ভাবিসনে বৌ। তোরা যখন আমার কাছে এসে পড়েছিস, তখন তোদের আর কোনো ভাবনা নেই। আমার সোনা ভাইয়ের একমাত্র ছেলেকে কি আমি বানের জলে ভাসিয়ে দিতে পারি ?

রাত গভীর হয়েছে।

কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

ঘরের কোনের ভীরু-প্রদীপটি রজনীর শেষ প্রহরের শীতল হাওয়ায় কখন নিভে গেছে কেউ তার খোঁজ রাখে না।

কয়েকটি ছেলেমেয়ের কলহাস্যে খোকার ঘুম ভেঙে গেল। খোকা তাকিয়ে দেখলে, অনেক রোদ্দুর উঠে গেছে। বাইরে সোনালী আকাশ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর তার বিছানার চারপাশে একদল ছেলেমেয়ে কোলাহল করে বলছে, চল, আমাদের সঙ্গে আমাদের নতুন খেলাঘরে।

বড় পিসি এগিয়ে এসে বললেন, দাঁড়া, আগে তোদের সবাইকার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দি—

ছেলেমেয়ের দল হুল্লোর করে বললে, পরিচয় আর কি করিয়ে দেবে ঠামা? আমাদের একজন খেলার সাথী বাড়ল এই ত'—

বড় পিসি বললেন, সে ত' ঠিক কথা। তবে কে কাকে কি বলে ডাকবি সেটা ঠিক করে নিতে হবে না?

বড় পিসি ফোক্‌লা দাঁতে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, খোকা হচ্ছে তোদের একটা ছোট্ট কাকু। আচ্ছা, তোরা সবাই ওকে সোনা কাকু বলে ডাকিস।

কি মজা! কি মজা! একেবারে সোনা কাকু! ছেলেমেয়ের দল একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

বড় পিসি বললেন, দাঁড়া, তোরা অমন ছট্‌ফট্‌ করিস নে। শোন খোকা এদিকে আয়, এই যে দেখছিস লক্ষ্মী মেয়েটি, এর নামও লক্ষ্মী।

খোকা শুধোলে, 'আমি কি ওকে লক্ষ্মীদি বলব?'

বড় পিসি ফোক্‌লা দাঁতে আবার হেসে উঠলেন। বললেন, 'দুর বোকা ছেলে, তুই ত' সোনাকাকু হলি ওদের। ওরা তোর ভাইপো ভাইঝির দল। আচ্ছা আমার সঙ্গে আয় সবাইকে চিনিয়ে দিচ্ছি। আমার দুই ছেলে, ভবন আর লগন।

ছেলেমেয়ের দলও একটা মজা পেয়ে গেল।

ওরাও ওদের নতুন-পাওয়া সোনাকাকুকে কেন্দ্র করে, ঠামার সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে চললো।

বড়পিসি বললেন, 'এই আমার বড় ছেলের ঘর। ভবন আছিস রে—

ভবন বেরিয়ে আসতে বড়পিসি বললেন, খোকা, ভবনকে প্রণাম কর! ও হল তোর বড়দা। ওদের ইস্কুলেই তোকে ভর্তি হতে হবে। ভবন খোকাকে কাছে ডেকে

আদর করলেন, বললেন' আমাদের মামাত ভাই। বেশ, বেশ, ভর্তি করে দেবো আমাদের ইস্কুলে।

ছোট ভাই লগন উঠোনে দাঁড়িয়ে। কামলারা উঠোনে চাল শুকুতে দিয়েছে। তিনি তাই তদারগ করছেন। মহা ব্যস্ত-বাগিস মানুষ। চারদিকে তার দৃষ্টি। পায়রা, হাঁস, ছাগলের দল এসে চাল না খেয়ে ফেলে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন।

বড়পিসি বললেন, খোকা। এই তোমার ছোড়দা,—প্রণাম করো।

লগন বললে, থাক্, থাক,—কাল সন্ধ্যায় এলে বুঝি তোমরা? যাও ওদের সঙ্গে খেলা ধূলো করোগে।

বড় পিসি এইবার খোকাকে নিয়ে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

এটাকে রান্না বাড়িও বলা চলে।

তখনি রান্না বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে।

বামুনদিদি দুটো উনোনে রান্না সুরু করে দিয়েছে। বড়পিসি খোকাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

বললেন—এই তোমার বড় বৌঠান, আর এই তোমার ছোট বৌঠান। দুজনকে প্রণাম করো—

খোকা এগিয়ে গিয়ে দুই বৌঠানকে প্রণাম করলে। বড় বৌঠান বললেন, তোমরা সবাই বসে যাও। সকাল বেলার জল খাবার খেয়ে নাও। ভাত খেতে দেরী হতে পারে। লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে খোকার হাতে একটি ঘটি এনে দিলে। খোকা দাওয়ার এক কোনে গিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নিলে।

প্রত্যেকের নামে একটি করে বেতের ছোট ধামা, আর একটি করে বাটি।

সার সার কাঠের পিঁড়ি পাতা আছে।

সবাই তাতে সার দিয়ে বসে গেল।

লক্ষ্মী, কার্তিক, গনেশ বড়দার ছেলেমেয়ে, মণ্টু আর সণ্টু ছোড়দার ছেলেমেয়ে।

কে ওদের সোনাকাকুর গা ঘেঁসে বস্‌বে তাই নিয়ে ছোটদের মধ্যে ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেল।

বড় পিসি বললেন, খোকা তুই লক্ষ্মীর কাছে বোস। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। পিসির বাড়ি নতুন এসেছিস বলে লজ্জা করিস নি যেন।

লক্ষ্মী বললে,—মা, সোনাকাকুর ছোট বেতের ধামা আর বাটি দাও—

বড় বৌঠান উত্তর দিলেন, দেখে শুনে নে না লক্ষ্মী। আমার কি মরবার ফুরসৎ আছে? কুট্‌নো কুট্‌তে কুট্‌তে উঠে এসেছি।

লক্ষ্মী গিয়ে ওদের সোনাকাকুর জন্যে বেতের ধামা আর কাঁসার একটা বাটি নিয়ে এলো।

ছোট বৌঠান সবাইকে খাবার ভাগ করে দিচ্ছেন। ছোট্ট বেতের ধামা গুলিতে মুড়ির মোয়া আর সবরী কলা। বাটিতে বাটিতে ঢেলে দেয়া হল গরম দুধ। মেখে নিয়ে খেতে হবে।

এই হল সকাল বেলার বাল্যভোজ। লক্ষ্মী গিন্নিবান্নির মতো বললে, 'বেশ ভালো করে বাটিতে মেখে নাও সোনাকাকু। খাওয়ার পর আমরা তোমায় ভালো করে গোটা বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বো—

ছোটদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। বিশেষ করে যখন তাদের একটি নতুন সাথী জুটে গেছে। গোটা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাতে হবে! কার কি সম্পত্তি আছে খেলাঘরে, সব নতুন মানুষটিকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এর মোহ কি কিছু কম?

বড় পিসি বললেন, লক্ষ্মী, তোদের সোনা কাকুকে নিয়ে সব কিছু দেখিয়ে আনবি। এইবার আমি চলি—

খোকা মনে মনে ভাবলে, সকাল থেকে মাকে একবারও দেখেনি। নিশ্চয়ই বড় পিসির কাছে-কাছেই আছে মা। হয়ত বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করছে। কিন্তু এখন ছোটর দলকে এড়িয়ে একবার মার কাছে যাওয়া চল্‌বে না।

ওরা তাহলে হয়ত দুয়ো দেবে। তাই খোকা চট্‌পট ওদের সঙ্গে সকালবেলার খাওয়া শেষ করে নিলে।

হাত মুখ ধুয়ে একেবারে লক্ষ্মীর হাতের পুতুল হয়ে সবাইকার সঙ্গে বেরুতে হল পিসিরবাড়ি প্রদক্ষিণ করতে।

বলা বাহুল্য কার্তিক, গনেশ, মণ্টু, সণ্টু সবাই ওকে ঘিরে এগুতে লাগলো।

লক্ষ্মী বললে, চল সোনাকাকু, সক্কলের আগে তোমায় আমাদের শিব মন্দির দেখিয়ে আনি।

সুন্দর একটি সাদা শিব মন্দির একটি বিরাট জলাশয়ের ধারে তার ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

লক্ষ্মী বলে, আমাদের বাড়ির সব কাজে আগে শিব মন্দিরে প্রণাম করে যেতে হবে। এ বাড়িতে কারো বিয়ে হলে নতুন বৌ এসে আগে এই শিব মন্দিরে প্রণাম করবে। কেউ যদি কোনো কাজে বিদেশে যায় তা' হলে এই শিব মন্দিরে প্রণাম করে রওনা হতে হবে। বাড়ির বৌরা রোজ সন্ধ্যায় এই শিব মন্দিরে প্রদীপ দেয়। শিব রাত্রির সময় এখানে তিন দিন ধরে মস্ত বড় মেলা হয়। বাড়ি শুদ্ধু সকলেই একদিন উপোস করে।

তারপর এই দিকে এসো সোনাকাকু। এই দেখ আমাদের অতিথিশালা। বাইরে থেকে অতিথি-ফকির-সাধু-সন্ন্যাসী এলে এইখানে থাকে। তিন দিন পর্য্যন্ত তারা এই ঘরে থাকতে পারবে।

এইবার এইদিকে-ডাইনে এসো। এই হচ্ছে আমাদের মণ্ডপ ঘর। এখানে দোল-দুর্গোৎসব-বাসন্তি-সরস্বতী সব রকম পূজো হয়। আমাদের পুরোহিত ঠাকুর আছেন। তিনি এসে পূজো করেন। আমরা সব পূজোতে অঞ্জলি দিই। তুমিও আমাদের সঙ্গে অঞ্জলি দেবে ত'?

—এই যে দেখছ সার সার সব গোল ঘর—এটা আমাদের গোলাবাড়ি। এখানে সারা বছরের ক্ষেতের ধান তোলা হয়।

এইবার আমাদের গোশালা দেখ্‌বে এসো। অনেক গাই-বলদ আছে আমাদের। ওদের বোধহয় মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেছে। দু'জন রাখাল আছে তাদের দেখা শোনা করবার জন্য। একজনের নাম বিন্দু, আর একজনের নাম সিন্ধু। এমন হাসাতে পারে তারা। পরে ওদের দেখতে পাবে তুমি।

খোকা ছোটর দলের সঙ্গে এগিয়ে চলে। কিন্তু মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে।

বিষণ খুড়ো কোথায় গেল? সে কি তার গরুর গাড়ী নিয়ে আজ সকালেই চলে গেছে?

ওদের কাছে সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না খোকা। কেমন যেন লজ্জা করে। ওরা কি ভাববে।

ছেলেমেয়ের দল ওকে নানান জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে।

—ওই যে খোপ খোপ কাঠের বাক্সগুলি দেখছ, ওখানে আমাদের পায়রাগুলি থাকে। নীচের দিকে থাকে হাঁসের দল। ওরা সব আমাদের সরোবরে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

লক্ষ্মী বললে, কাকার ইচ্ছে ছিল, হাঁসের সঙ্গে অনেক মুরগীও পুষবে। কিন্তু ঠামা রাজী হয়নি বলে—মুরগীর খাঁচাগুলি অমনি খালি পড়ে আছে—

লক্ষ্মী ওদের রথতলাটাও ঘুরিয়ে নিয়ে এলো। কাঠের রথ একটি উঁচু টিনের ঘরের নীচে রয়েছে। রথের সময় বাইরে টেনে নিয়ে আসা হবে রথটিকে। কত লোক মিলে এই রথের রশি টানবে।

লক্ষ্মী বললে, আর যা কিছু বাকি রইল তোমায় পরে দেখাবো সোনাকাকু। এই বার তুমি আমাদের খেলাঘর দেখ্‌বে এসো।

বাড়ির একান্তে চারদিকে ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সুন্দর নিরিবিলি একটি জায়গা। ওপরে খড়ের চালা। পাশে খানিকটা খোলা যায়গা একটি গাছের ডালে দোলনা ঝুলছে।

লক্ষ্মী বললে, আমরা এখানে রোজ দোল খাই। খেলাঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে খোকা দেখ্‌লে নানাধরণের মাটির আর কাঠের পুতুল থাক্‌-থাক্‌ সাজানো রয়েছে। রান্না বাড়ার জন্য ছোট ছোট থালা, গেলাস, বাটি, কুট্‌নো কোটবার বঁটি, শিল, নোড়া—কোনো কিছুরই অভাব নেই। আর এক কোণে দুটো ছোট ছোট উনুন।

লক্ষ্মী বললে, ওখানে আমাদের খেলা ঘরের রান্না হয়। তারপর একটু থেমে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কইলে, কিছুদিন বাদেই আমার মেয়ের সঙ্গে মণ্টুর ছেলের বিয়ে। আমরা খুব ঘটা করেই বিয়ে দেবো। তখন কিন্তু সোনাকাকু তোমায় খুব খাটা-খাট্‌নি করতে হবে।

বিষণখুড়ো তার গরুর গাড়ী নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে। আর তার দেখা পাওয়া যাবে না।

যদিও মা বলে দিয়েছে, মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেতে—কিন্তু বিষণখুড়োও ওদের সংসারে একা মানুষ,—তাকে ক্ষেত-খামার দেখতে হয়, হাট-বাজার করতে হয়, ছেলেপিলের অসুখ-বিসুখ আছে। তবু যে ওদের জন্য এত করত,—সেটা নেহাৎ প্রাণের টানে।

বড়পিসির বাড়িতে এসে মাকেও সব সময় কাছে পাওয়া যায় না। মস্ত বড় বাড়ি, বাড়ির লোক ছাড়াও, অনেক আত্মীয়-স্বজন, আশ্রিত মানুষ এই বাড়ির ভেতর নিত্যি পাত পাতে।

সেই জনারণ্যের মধ্যে খোকা কি তার মাকে হারিয়ে ফেলল? এখানকার ছেলেমেয়েদের দল ছেড়ে আলাদা করে মায়ের কাছে দু'দণ্ড বসতে ওর লজ্জা করে।

তাই মার আর ওর মধ্যে ফাঁকটা একটু বেড়ে যেতে লাগ্‌ল।

খোকার নিজের গাঁয়ে যে সব ছেলেরা তার খেলার সাথী ছিল—তাদের কথা ওর সব সময়ই মনে হয়।

কিন্তু সে ভালো করেই জানে যে, ওদের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। যদিও অনেক দূরে সে চলে আসে নি, তবু সেটা খুবই সত্যি কথা—যেখানে তাদের একটি ঘরও নেই—সেই ছেলেবেলার খেলাঘরে ওরা ফিরে যাবে কি করে? আপন মনে বসে বসে খোকা এই সব কথা ভাবে।

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে শুধোয়, একি সোনাকাকু, তুমি একা-একা বসে এত কি ভাবছ? এদিকে আমার ছেলের বিয়ে যে এগিয়ে এলো। একটা বিয়ের পদ্য কিন্তু তোমায় লিখে দিতে হবে—

খোকা অবাক হয়ে বলে, কবিতা? কিন্তু আমি ত' কবিতা লিখতে পারি না।

লক্ষ্মী কিন্তু না-ছোড় বান্দা। বলে, তা হলে একটি ছোট্ট পাল্‌কি তৈরী করে

দাও। পাল্‌কি নইলে বর কি করে আসবে? আমাদের সেই যে দুই রাখাল—বিন্দু আর সিন্ধু তাদের বলেছিলাম। ওরা কি বললে জানো? ওরা কইলে, বর আসবার সময় ওরা দুটি ঢোলক আর ভেঁপু বাজাবে। কিন্তু বর আসবার পাল্‌কির কি হবে বলনা সোনাকাকু?

খোকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বড় পিসি এসে তার বড় ছেলেকে বলেন, ওরে বড় খোকা, এই খোকাটাকে তুই আজই তোদের ইস্কুলে ভর্তি করে দে—

বড়দা হেসে উত্তর দেন, ঠিক! ঠিক!! কার্তিক গনেশের সঙ্গে খোকাও আজ আমার সাথে ইস্কুলে যাবে। ওকে আজই ভর্তি করে দেবো। মা, বড় বৌকে বলো, ওকে যেন তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেয়—

বড়দা আর কার্তিক গনেশের সঙ্গে খোকা দুপুর বেলা এখানকার ইস্কুলে গিয়ে হাজির হল।

খোকা ত' বই-টই কিছু নিয়ে আসতে পারে নি। তাই এখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশাই ওকে ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে জেনে নিলেন—সে কোন ক্লাসে পড়বার উপযুক্ত।

বাঙলা বানান জিজ্ঞেস করলেন, কয়েকটা অঙ্ক কষতে দিলেন, আর দেখে নিলেন—হাতের লেখাটা কেমন?

তারপর বড়দাকে ডেকে বললেন, ছেলেটি কার্তিক-গনেশের ক্লাসেই ভর্তি হতে পারবে।

শুনে বড়দা খুব খুশী হলেন।

হেডমাষ্টার মশাই খোকার নাম জিজ্ঞেস করলেন—খোকা জবাব দিল—শ্রীকুশল ভট্টাচার্য।

তখুনি ইস্কুলের কেরাণীকে ডেকে হেডমাষ্টার মশাই ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর পাঠিয়ে দিলেন—কার্তিক-গনেশদের ক্লাশে।

কার্তিক আর গনেশ ওকে নিজেদের ক্লাসে পেয়ে খুব খুশী হল।

শুধোলে, সোনাকাকু, তুমি আমাদের সঙ্গে পড়বে? তা হলে ত' ভারী মজা হবে। বোসো এসে,—আমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে বোসো। আমাদের বইয়েতেই কাজ চলে যাবে তোমার। এই নাও না—ধরো—

বিকেলবেলা বাড়িতে ফিরে বড়দা সবাইকে শুনিয়ে দিলেন—খোকার ভর্তি হবার কথা। মাকে ডেকে খুশী হয়ে কইলেন, বুঝলে মামী, তোমার ছেলে পড়াশোনায় খুব চট্‌পটে। হেডমাষ্টার মশাই যা-যা জিজ্ঞেস করেছেন—সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। ওকে কার্তিক-গনেশের ক্লাসেই ভর্তি করে নেয়া হল।

মা বললেন, তুমি ওকে একটু দেখো বাবা। ছেলেটাকে তোমরাই মানুষ করে গড়ে তোলো,—আমি আর কি বলব ?

বড়দা আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিলেন, সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না মামী। তোমার ছেলেটা বেশ মেধাবী আছে। ও পড়াশোনাতে বেশ ভালো হবে বলেই মনে হয়।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর পুতুল-মেয়ের বিয়ে খুব ধূমধাম করে সুরু হয়ে গেল।

ওদের খেলাঘরটা বেশ ভালো করে সাজানো হল। এ সব ব্যাপারে ছোড়দার খুব উৎসাহ। দেবদারু পাতা আর লাল নীল কাগজ রাশি রাশি এনে দিল ছোড়দা। তাই দিয়ে ছেলেমেয়েদের তোরণ দ্বার তৈরী করলে, রঙীন কাগজের শেকল ঝুলিয়ে দিলে চার দিকে। বিন্দু আর সিন্ধু সব কাজ ফেলে ঢোল আর ভেঁপু বাজাতে সুরু করে দিলে।

ছোরদা বললে, ছোট ছোট রসমুণ্ডী তৈরী করিয়ে এনে দেবো। তাই সবাইকার হাতে হাতে বিলি করে দিতে হবে—

লক্ষ্মী এসে তার কাকার কাছে আবদার ধরলে, কাকু, আমার মেয়ের বিয়েতে গরম গরম খিচুড়ি আর আলুর দম করতে হবে—নইলে নিমন্ত্রিতেরা সব খাবে কি ?

ছোরদা অবাক হয়ে বললে, অ্যাঁ! বলিস কিরে ? একেবারে গরম খিচুড়ি আর আলুর দম ? তা হলে চুপি-চুপি বলে দিচ্ছি তোকে—সোজা বামুন দিদিকে গিয়ে ধর। ও ছাড়া আর কেউ এই যজ্ঞি ব্যাপার সামাল দিতে পারবে না।

অবশেষে সত্যি ধূমধাম করে লক্ষ্মীর মেয়ের সঙ্গে মণ্টুর ছেলের বিয়ে হল।

বাদ্যভাণ্ড বাজল, পথ পরিষ্কার করে সাজানো হল। সেই সরোবরের কাছ থেকে মিছিল করে—শিব মন্দির হয়ে বরের পালকি চলে এলো খেলা ঘরে। বিয়ের সময় কতরকম বাজী পোড়ানো হল। সবাইকে পাতা পেতে বসিয়ে খাওয়ানো হল—গরম খিচুড়ি, আলুর দম আর রসমুণ্ডী।

পুতুল মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়ি চলে গেল—লক্ষ্মী কেঁদেকেটে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিলে।

লক্ষ্মীর মা বললেন, আজকালকার মেয়েগুলো পেট থেকে পড়েই ডেঁপো হয়ে ওঠে। নইলে লক্ষ্মীর পেটে পেটে এত দুষ্টুমী। আমিও লক্ষ্মীর বিয়ের সময় এমন চোখের জল ফেলতে পারবো না।

তারপর মার দিকে তাকিয়ে বড়বৌঠান ফোড়ন দিলেন। আসলে ওর মাথা খাচ্ছে ঠাকুরপো। অত আদর দিলে মেয়ে ত' আহ্লাদী হবেই।

যাই হোক্—লক্ষ্মীর মেয়ের বিয়ে ত' বেশ ভালো ভাবেই চুকে গেল। পরদিন এঁটো পাতা নিয়ে কাক, বেড়াল আর কুকুরদের মচ্ছব সুরু হয়ে গেল।

তাই দেখতেও ছোটদের আবার ভীড় জমল।

কথাটা নাকি অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়েছিল। বড়পিসি তীর্থ ভ্রমণে যাবেন। এক বছর ধরে তিনি ভারতবর্ষের বহু আশ্রম ঘুরবেন। এইবার তীর্থ ধর্ম না করলে পরে ত' তিনি আরো স্থবির হয়ে পড়বেন। পথের সাথী হবেন—বাড়ির বড়ছেলে। মানে খোকার বড়দা।

খোকা দেখলে, মা আসতে বড় পিসি যেন হাতে চাঁদ খুঁজে পেলেন।

তিনি একদিন নিরিবিলি মাকে কাছে ডেকে বললেন, শোন বৌ, তুই এসে পড়েছিস্ বেশ ভালই হল। আমার তীর্থের পথে তুই আমার সঙ্গে থাকবি,—তাহলেই আমি বল-ভরসা পাবো। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি ত' ছেলে একা কতদিক সামলাবে বল!

মা বেশ কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, বড়দি, তোমার সঙ্গে তীর্থ করতে পারা ত' সত্যি ভাগ্যের কথা। আমি নিঃসম্বল অনাথা বিধবা। একটা কানাকড়িও আমার হাতে নেই। তোমার পথের সাথী হলে যে আমার স্বর্গসুখ হবে—সেকথা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু বড়দি, আমায় তুমি ভুল বুঝোনা, খোকাকে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না। এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান-আরাধনা ওই বংশ-প্রদীপকে মানুষ করে গড়ে তোলা। তারপর তোমার দয়ায় সুদিন যদি সত্যি আসে তাহলে খোকাই আমাকে তীর্থ করিয়ে আনবে। তুমি আমায় ক্ষমা করো বড়দি, এখন আমি কোনো তীর্থেই যেতে পারবো না।

মায়ের মুখে এই কথা শোনার পর বড়পিসি আর মাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে পিড়াপিড়ি করে নি।

তারপর এক শুভদিন দেখে বড়পিসি তীর্থের পথে রওনা হল।

বড়দা মায়ের সঙ্গে গেলেন। তিনি ইস্কুল থেকেও লম্বা ছুটি নিয়েছেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ছুটি আরো বাড়িয়ে নেবেন। গ্রামের ইস্কুল—ধরতে গেলে একরকম নিজেদেরই বিদ্যালয়। তাই ছুটি বাড়িয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হবে না।

পুরোহিত ঠাকুর এসে শুভযাত্রার শুভ-লগ্ন ঘোষণা করলেন।

যাত্রার প্রাক্কালে বড়পিসি বাড়ির জনে জনে সবাইকে ডেকে আশীর্বাদ জানালেন।

বড়দা ছেলেমেয়েদের সকলকে ডেকে ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বললেন। ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে। আর মেয়েরা পড়ে মাষ্টার মশায়ের কাছে বাড়িতে। বড়দা খোকাকে আলাদা করে বললেন, খুব মন দিয়ে সব বিষয় পড়বে। সামনেই ষাণ্মাসিক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় ভালো ফল দেখাতে হবে।

খোকা মুখে কোনো কথা বলতে পারলে না। মাথা নীচু করে বড়দার পায়ের ধূলো নিলে।

সারা গোড়ির লোক এসে বড় পিসিমা আর বড়দার পায়ের ধূলো নিলে।

ওঁরা দুজনে শিব মন্দির আর মণ্ডপে প্রণাম করে গরুর গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। মাল-পত্র আগেই তুলে দেয়া হয়েছিল। এখান থেকে গরুর গাড়ী যাবে সোজা রেল ষ্টেশণে।

সারা বাড়ির দায়িত্ব পড়ল এখন ছোড়দার ওপর। গাড়ী আস্তে আস্তে বড় সড়কের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোড়দার কাজ যেমন বেশী—তেমনি তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে ভালো বাসেন।

কোথায় দল বেঁধে বেড়াতে যেতে হবে, কোন পুকুরে জাল ফেললে বড় চিতোল আর রুই মাছ ধরা যাবে, কোন্ নদীর ধারে বন-ভোজন করতে হবে—এই সব মজাদার ব্যাপারে তিনি নিজেই ছোটদের উস্‌কে দিতেন। তারপর তাদের নিয়ে হৈ-চৈ-এ মেতে উঠতেন।

বড় বৌঠান আবার এসব হুল্লোড় বেশী পছন্দ করতেন না। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার ক্ষতি করে তাদের কাকার সঙ্গে নানা তাণ্ডবে সময় নষ্ট করুক—এ ব্যাপারটা তার দুই চক্ষের বিষ। তবু তিনি বাড়ির ছোট কর্তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না। শুধু বলেন, ঠাকুরপোই বেশী আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে।

ছোট বৌঠান কিন্তু মজা দেখেন আর আপন মনে হাসেন। নিজের বড় জায়ের সঙ্গে স্বামীর এই কপট-কলহ আর মান-অভিমান বাড়ির ছোট বৌ বেশ মজা করে উপভোগ করেন।

কিন্তু এই মান-অভিমান অনেক সময় তেতো হয়েও ওঠে।

কিছুদিন বাদেই বিদ্যালয়ের ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল।

কার্তিক আর গনেশ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরে এসে সবাইকে সমস্বরে জানিয়ে দিলে, আমাদের সোনাকাকু আমাদের ক্লাসে একেবারে প্রথম হয়েছে। কি মজা—কি মজা!

এর আগে ওরা দুভাই ক্লাসে প্রথম আর দ্বিতীয় হত। কিন্তু এখানে নতুন এসেই যে ওদের সোনাকাকু সবাইকে হটিয়ে দিয়ে বেশী নম্বর পেয়ে একেবারে প্রথম হয়ে গেছে—এইটেই দুই ভায়ের গর্বের কারণ। ও পাড়ার গোবিন্দ যে প্রথম হতে পারেনি—তাতেই ওরা মহা খুশী।

ছোড়দা এই খবর শুনে ছোটদের নিয়ে একটি আনন্দ আসর বসিয়ে দিলেন। রসগোল্লা কিনে এনে সবাইকার মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

ছোট বৌদিও খুশী হয়ে বললেন, আমি তোমাদের একদিন পরমান্ন খাওয়াবো।

খোকা মনে মনে ভেবেছিল—বড়বৌঠান ও তাকে ডেকে আদর করবেন আর সবাইকার সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নেবেন।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল একটু অন্যরকম। একদিন সন্ধ্যাবেলা বড় বৌঠান খোকাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা খোকা, তুই এখানে এসেই পরীক্ষায় একেবারে প্রথম হয়ে গেলি, কারো খাতা দেখে টুকিস নি ত' ?

খোকা এই রকম কথা শুনে অবাক হয়ে বড় বৌঠানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে না, না টুক্‌বো কেন? আমি যা জানতাম—তাই লিখেছি—

ওর ছোট্ট মনে এই রকম একটি ধাক্কা যে খাবে খোকা তা আদপেই ভাবতে পারেনি।

যখন সবাই আনন্দ করছে, আশীর্বাদ জানাচ্ছে, আর মিষ্টি কথা বলছে—সেই সময় বড় বৌঠানের এই জাতীয় কথা খোকার চোখে জল এনে দিয়েছিল।

সে মাকেও এ সম্পর্কে কোনো কথা জানাতে পারল না। তার ভারী লজ্জা করতে লাগ্‌লো। অথচ মজা এই যে কার্তিক গণেশ কিন্তু তাদের সোনাকাকুর সাফল্যে মহা খুশী। ইস্কুলে আর বাড়িতে এই শুভ-সন্দেশ সকলকে জানিয়ে দিয়ে লাফাতে লাগ্‌লো।

গভীর রাত্রে যখন কেউ জেগে থাকে না—

সারা বাড়িটা একেবারে নিশুতি হয়ে যায়—তখন মা ওর চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, শোন খোকা, তোকে মানুষ হতে হবে। এই বড়পিসি তোকে আশ্রয় দিয়েছেন, আমায় মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিয়েছেন, সে কথা কোনো দিনের তরে ভুলবি নে। লেখাপড়া শিখে তুই যখন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবি—তখনই তোর এই দুখিনী মায়ের সব দুঃখ দূর হবে। ওপর থেকে তোর বাবা আমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন। তার বড় ইচ্ছে ছিল—তাদের খোকা মানুষ হবে,—দশজনের একজন হবে,—আর সকলের দুঃখ দূর করবে।

খোকা শুধু মায়ের কথাগুলো চোখ বন্ধ করে শুনে যায়। কোনো উত্তর করে না।

তার নিজের আকাঙ্খাও বড় কম নয়। সে চায় প্রতি বছর ক্লাশে প্রথম হয়। ইস্কুলের পড়া শেষ করে শহরে যাবে, সেখানে কলেজের পড়ায় সকলকে ছাড়িয়ে একেবারে ওপরে উঠে যাবে। আরো ওপরে উঠবার সিঁড়ি তাকে খুঁজে নিতে হবে। সে যখন সত্যিকারের মানুষ হবে—তখন অনেক টাকা রোজগার করবে। গরীব-দুঃখীর সব অভাব দূর করবে; আর মাকে নিয়ে ভারতের সব তীর্থে ঘুরে বেড়াবে।

ওর জন্যেই মা বড়পিসির সঙ্গে তীর্থে যায় নি। সে কথা খোকা শুনেছে। বড় হয়ে মায়ের মনোবাঞ্ছা সে পূর্ণ করবেই।

মায়ের মুখের অনেক আশা-আকাঙ্খার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কখন যে খোকা ঘুমিয়ে পড়ে—নিজেই সে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না।

সকাল হতেই লক্ষ্মী এসে বলে, সোনাকাকু, আজ আমাদের খেলাঘরে নবান্ন-উৎসব হবে, তোমায় কিন্তু পুরোহিত হতে হবে—

খোকা হাসতে হসেতে উত্তর দেয়, আমি পুরোহিত, তাহলেই তোমাদের নবান্ন উৎসব হয়েছে আর কি। তা কি করতে হবে শুনি? টিকিতে জবাফুল বেঁধে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে হবে?

লক্ষ্মী উত্তর করে, বাঃ তা কেন? আজ আমাদের বাড়ি নতুন ধান উঠবে। মা, কাকিমা যেমন ধানের শিষ বরণ করে নেবে, নবান্ন তৈরী করবে—নতুন চাল, নতুন গুড় আর নারকেল কোড়া দিয়ে,—তেমনি আমরাও নবান্ন উৎসব করবো আজ আমাদের খেলাঘরে। কাকাবাবু বলছেন, নতুন গুড়, ধানের শিষ, নারকেল-সব আমাদের আলাদা করে দেবেন। পুরোহিত ঠাকুরকে ত' মারা আট্‌কে রাখ্‌বে। কাজেই বুঝতে পারছ,—আমাদের খেলাঘরের জন্যে একজন আলাদা পুরোহিত চাই। আর তুমি ছাড়া আমাদের খেলাঘরের পুরোহিত আর কে হবে শুনি?

লক্ষ্মীর এতগুলি দরকারী কথা শুনে খোকা হেসে ফেলে। তারপর উত্তর করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আজ আমাকে নামাবলী গায়ে দিয়ে, টিকিতে ফুল বেঁধে যাত্রার দলের পুরোহিত সাজতে হবে। তা সে ত' ও বেলার ব্যাপার। শোন লক্ষ্মী, আজ ইস্কুলে বেশ শক্ত শক্ত অঙ্ক আছে। সেইগুলো আগে শেষ করে ফেলি—

লক্ষ্মী খুশী হয়ে কইলে, আচ্ছা সোনাকাকু, এখন তুমি শান্ত, সুবোধ ছেলে হয়ে পড়াশোনা করো—ও বেলা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কিন্তু না বলতে পারবে না।

খোকা উত্তর দিলে, না রে,—না বলব কেন? যখন আমাদের 'লক্ষ্মী দিদিমণির আদেশ—

ভারী অসভ্য তুমি সোনাকাকু—ভারিক্কি চালে বেণী দুলিয়ে লক্ষ্মী জবাব দেয়। —জানো ত' নবান্ন উৎসবের পর আবার মায়ের সত্যনারায়ণ পূজো আছে। সে আবার মহা ঘটাকরে পূজো। কত লোক প্রসাদ নিতে আসবে দেখো—! আমারও আজ অনেক কাজ—মরবার ফুরসৎ অবধি নেই।

লক্ষ্মী চোখে-মুখে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে এবার সত্যি সত্যিই চলে যায়।

খোকা—মানে, ইস্কুলের কুশল—সেদিন ইস্কুলে পৌঁছে দেখে—পড়াশোনার দিকে কারো বিশেষ দৃষ্টি নেই। সবাই মনের আনন্দে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুশল এর কারণ কিছু বুঝতে পারলে না। কার্তিক, গনেশকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে তারা এক গাল হেসে ফেললে। বললে, তাহলে সোনাকাকু, আজ সারা গাঁয়ে নবান্নের উৎসব কিনা,—তাই ইস্কুলেও আজ পড়াশোনা আদৌ হবে না।

খোকা শুধোলে, তবে কি হবে শুনি? কার্তিক-গনেশ চোখ টিপে বললে, আজ কপাটি প্রতিযোগিতা। একদিকে আমরা ছাত্রদল, আর অন্যদিকে মাষ্টার মশাইরা। বুড়ো বুড়ো মাষ্টার মশাইরা অবশ্য খেলায় নামবেন না। তবে যাদের বয়েস কম-তারা দেখো, কেমন মালকোঁচা মেরে এগিয়ে আসেন—

খোকা বললে, তোরা খেলগে যা, আমি বসে বসে সবাইকার খেলা দেখি—

কার্তিক গনেশ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলো। বললে, সেটি হচ্ছে না সোনা-কাকু, মনিটর যে তোমার নাম আগেই দিয়ে দিয়েছে—

খোকা সত্যি অবাক হয়। সে কিছু জানল না, আর মণিটর দিব্যি তার নাম দিয়ে দিল খেলাতে। অবশ্য খোকা মনে-মনে জানে-কপাটি খেলা সে বেশ ভালোই জানে—

কার্তিক-গনেশ মিথ্যা কথা বলে নি! তার খানিক বাদেই ছাত্র খেলোয়াড়দের নাম ডাকা হল। আর তার মধ্যে কুশল চক্রবর্ত্তীর নামও আছে।

কুশল প্রথমে একটু আপত্তি জানিয়েছিল,—আমি নতুন এসেছি, খেলা ত' ভালো জানি না! কিন্তু কি ছাত্রদল, আরকি মাষ্টারদল কেউ তারা আপত্তির কথা শুনলেন না।

কাজেই বাধ্য হয়ে কুশলচন্দ্রকে খেলার মাঠে-মালকোঁচা মেরে নামতেই হল।

একজন প্রবীণ মাষ্টারমশাই রেফারী হলেন। মাষ্টার মশায়ের দলে যারা নামলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই কম বয়সে। আর ছেলের দলে-বড় ছোট মিশিয়ে আছে। খেলা সুরু হবার একটু পরেই কুশল একজন মাষ্টার মশায়ের ঠ্যাং পাক্‌ড়ে ধরে একেবারে শুয়ে পড়ল। তখন অন্যান্য ছেলেরা এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ফলে সেই মাষ্টার মশাই 'মার' হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুশলের জয়ধ্বণি উঠল গোটা খেলার মাঠে। কুশলকে দেখতে ছোট খাটো হলে কি হবে—কপাটি খেলায় পাক্‌ড়ে ধরতে সে একেবারে ওস্তাদ।

এর পর ছাত্রদলের কয়েকজন 'মার' হয়ে গেল। তখন সবাই চীৎকার করতে লাগল—কুশল কি করছ? গায়ে মাটি মেখে চট্‌পট্‌ পাক্‌ড়ে ধরো—

সকলের সমবেত সোল্লাস ধ্বণিতে কুশলও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

যে করেই হোক ছাত্রদলের মান রাখতে হবে। তারপর খেলা আবার জমে উঠল!

কুশল পর পর কয়েকজন মাষ্টার মশাইকে কুপোকাৎ করে ফেললে।

তখন ওদের দলে ডাকবার আর কেউ নেই। রেফারী বাঁশী বাজিয়ে ঘোষণা করলেন,-এই খেলায় ছাত্রদলেরই জয় হয়েছে।

তখনও ছাত্রেরা সবাই মিলে কুশলকে কাঁধে করতে গেল। কিন্তু দেখা গেল, কুশলের একটি পা মচ্‌কে গেছে।

যাক্‌না পা মচ্‌কে-ও ত' এখন ছেলেদের কাঁধে উঠে প্রসেশনের সামিল হবে। নাই বা হাটতে পারল—ওকে এখন বয়ে নিয়ে যাবে ছেলের দল।

কার্তিক-আর গনেশ পাশে পাশেই চলছিল। ওরা ফোড়ন কেটে বললে, কেমন মজা সোনাকাকু—!

ছেলের দল সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অবশেষে ত্রিলোচন ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। কার্তিক-গনেশ আগে থেকেই খবরটা দিয়ে রেখেছিল। তাই দেখা গেল—বাড়ী শুদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওরই আসার প্রতীক্ষায়।

ছোড়দা এগিয়ে ছিলেন—সবার আগে। তিনি হাসতে হাসতে খোকাকে বললেন, কিরে, দারুণ খেলে একেবারে পা মচ্‌কে এলি? তা ভাবনা নেই। লক্ষ্মী চূন-হলুদ গরম করে বারে বারে লাগিয়ে দেবে'খন। পা মচ্‌কা দুদিনে পালাতে পথ পাবে না।

খোকা ছেলেদের কাঁধ থেকে নেমে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ভেতর বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো—

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে বললে, কিন্তু এ কি কাণ্ড করে এলে সোনা-কাকু, এখন এই ন্যাংড়া পুরোহিত নিয়ে কি করে আমাদের খেলাঘরের নবান্ন উৎসব হবে?

ছেলের দল ভারী মজা পেলে লক্ষ্মীর কথায়। তারা সমস্বরে সোল্লাসধ্বনি করে উঠল—"জয় ন্যাংড়া পুরোহিতের জয়।"

ছোড়দা এই রকম হৈ-হুল্লোড়ই পছন্দ করেন। তিনিও চীৎকার করে সবাইকে ডেকে বললেন, ওহে ছেলের দল, তোমরা কেউ পালিয়ে যেওনা যেন। আমাদের এখানে আজ নবান্ন উৎসব। তারপর ন্যাংড়া পুরোহিতের পূজো। তারপর সত্য নারায়ণের পূজো। তোমরা সকলে প্রসাদ নিয়ে—তারপর বাড়ি ফিরবে।

ছেলের দল আবার ন্যাংড়া পুরোহিতের জয়ধ্বনি করে উঠল। লক্ষ্মী ততক্ষণে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে খোকাকে বসালে। বললে, তুমি এখানে চুপচাপ বসে থাকো সোনাকাকু। আমি চূণ-হলুদ গরম করে নিয়ে আসি। কয়েকবার লাগালেই সেরে যাবে'খন।

মা একবার এসে খোকাকে দেখে গেলেন। কিন্তু বাড়ি ভর্ত্তী মানুষ। তা ছাড়া একই দিনে নবান্ন-উৎসব আর সত্য নারায়ণের পূজো। বাড়ির বৌরাও ব্যস্ত। তাই তিনি তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলে গেলেন।

মায়ের ইচ্ছে ছিল-দু'দণ্ড ছেলের কাছে একটু বসেন। আর ছেলের বাসনা ছিল—মা একটু হাত বুলিয়ে দিক—তা'হলেই ব্যথা অর্দ্ধেক সেরে যাবে।

কিন্তু সব সময় সব মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। তাছাড়া ছেলে মেয়ের দল—তাকে ঘিরে রয়েছে—

কার্তিক বললে, তুমি মাষ্টার মশাইদের খুব ঘায়েল করেছ সোনাকাকু—

গনেশ বললে, আচ্ছা, মাষ্টারদের মধ্যে আর কারো পা ভাঙেনি ?

কার্তিক বললে, ভাঙ্‌লেই কি আর কেউ মুখ ফুটে বলবে ? মণ্টু জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা সোনাকাকু, তুমি যে কপাটি খেলায় এত নাম করলে-তা মাষ্টার মশাইরা তোমায় কোনো পুরস্কার দেবেনা ?

সণ্টু মুখ চট্‌কে ফোড়ন কাটলে, যদি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকে, তবে কিন্তু আমাদের বাদ দিলে চল্‌বে না—

এমন সময় লক্ষ্মী এসে ঘরে ঢুকল। বললে, তোরা এখন সব ঘর খালি করে দে। আগে আমাদের ন্যাংড়া পুরোহিতকে ভালো করে তুলতে হবে।

লক্ষ্মী গরম গরম চুণ-হলুদ গোলা খোকার পায়ে লাগিয়ে দিলে। বললে, চুপটি করে এখন খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘর খালি করে দিলে।

একটু বাদে খোকা বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ বড়বৌঠান আর মায়ের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো। ওরা ঘরের ভেতর ছিলেন, তাই খোকাকে দেখতে পেলেন না। বড় বৌঠান বললেন, দেখ মামী, হঠাৎ বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি। রান্নার বামুন দিদি এইমাত্র ঝগড়া করে পুঁটুলি নিয়ে চলে গেল। এদিকে কাজের বাড়ি—নবান্ন-উৎসব, তার ওপর আবার সত্য নারায়ণের পূজো। এখন হেঁসেলে কে যায় বলত ? আমি ত' মহা বিপদেই পড়ে গেলাম !

মা উত্তর দিলেন, তাতে তুমি এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন বড় বৌ ? আমিই হেঁসেলে যাচ্ছি। তুমি সত্য নারায়ণের পূজোর দিকে চলে যাও।

খোকা আর ওখানে দাঁড়ালো না। কিন্তু কেন যেন তার দুই চোখ এই দুখিনী মায়ের জন্যে জলে ভরে এলো !

তবে কি সেই কথাই ঠিক যে, ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ?

ওদিকে বাইরে থেকে ছেলের দল হল্লা করে কুশলকে ডাকৃছে। বলছে, ভারী ত' একটু পা মচ্‌কেছে—তারই জন্যে ওকে একেবারে বিছানা নিতে হবে নাকি ?

লক্ষ্মী এসে বললে, ইস্কুলের ছেলের দল তোমায় চীৎকার করে ডাকৃছে সোনাকাকু। তুমি এক কাজ কর—আমাকে ভর দিয়ে বাইরের ঘরে চলো। সেখানে তোমার জন্যে একটি চেয়ার দিয়ে এসেছি। ওদের সঙ্গে গল্প গুজব করলে ওরা শুন্‌বে বলছে !

খোকা উত্তর দিলে, সেই ভালো লক্ষ্মী। একা একা এঘরে আর কতক্ষণ বসে থাকৃবো ?

লক্ষ্মী বললে, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গরম চূন হলুদ লাগিয়ে দিয়ে আসব। দেখবে, রাত্তিরের মধ্যেই ব্যাথা একেবারে কমে গেছে।

বাইরের ঘরে ছেলেদের হুল্লোড়, গান, আবৃত্তি আর বক্তৃতা পুরোদমেই চলেছে। সে গিয়ে ওদের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিল। কিন্তু মায়ের শুক্‌নো মুখখানি তার কেবলি মনে পড়তে লাগল।

॥ পনেরো ॥

বড় পিসির চিঠি এসেছে।

তারা প্রথমে গয়াধামে গিয়েছেন। সেখানে পূর্বপুরুষদের নামে পিণ্ডিদান করা হয়েছে। বড় পিসি মাকে জানিয়েছেন, তাঁর ভাইয়ের নামেও বড়দা পিণ্ডি দিয়েছেন। ভাগ্‌নের ত' শ্রাদ্ধের আর পিণ্ড দেবার অধিকার আছে।

বড় পিসি বাড়ির বৌদের আরো জানিয়েছেন যে, এখন তাঁরা নানা তীর্থে ঘুরতে থাকবেন ? তাই সব সময় চিঠি লিখতে পারবেন না। বাড়ির কেউ যেন সেজন্য ব্যস্ত না হয়। ছোড়দাকে লিখেছেন, বাড়ির কর্তা এখন সে। কাজেই সকল দিকে যেন তার দৃষ্টি থাকে। বড়দা খোকাকে আর বাড়ির ছেলেমেয়েদের মন দিয়ে পড়াশোনা করতে বলেছেন।

এদিকে লক্ষ্মীর কথাই সত্যি হয়েছে। বারে বারে চূণ-হলুদ গরম করে লাগানোর ফলে খোকার পা মচ্‌কানো একেবারে সেরে গেছে।

সে আবার কার্তিক-গনেশের সঙ্গে ইস্কুলে যেতে সুরু করেছে।

ওদিকে ইস্কুলে একটা মজাদার ব্যাপার ঘটে গেল। মাষ্টারমশাইরা ছেলেদের কাছে কপাটি খেলায় হেরে গেলেন বলে সবাই মিলে চাঁদা করে ছাত্র খেলোয়াড়দের একদিন ভোজ খাইয়ে দিলেন।

আর একটি ভালো খবর আছে। বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারমশাই কুশলকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওকে পড়াশোনার অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওর সব কথা শুনে তিনি ভারী খুশী হয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর নাকি যথাযথ হয়েছিল। সব শেষে ওকে আনন্দ সংবাদটি জানিয়ে দিলেন। কুশলের ষান্মাসিক পরীক্ষার ফল দেখে আর খেলাধূলার নমুনা দেখে ইস্কুল কমিটি খুব খুশী হয়েছে। তারা কুশলকে একটি ফ্রিশিপ দিয়েছেন। এখন থেকে কুশলের আর কোনো মাইনে দিতে হবে না। যদিও তার বড়দা বলেছিলেন, কুশলের ইস্কুলের মাইনে তিনিই দেবেন। এখন হেডমাষ্টার মশাই আনন্দের সঙ্গে জানালেন; মাইনে আর ওকে দিতে হবে না। ও এখন থেকে ইস্কুলের ফ্রী ছাত্র হয়ে গেল।

সেইদিনই বাড়ি ফিরে কুশল তার মাকে কথাটা জানিয়ে দিলে। আর হেড্‌মাষ্টার মশাই তার সঙ্গে কথা বলে যে খুব খুশী হয়েছেন সে কথাও জানিয়ে দিতে ভুললো না।

মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে তিনি কোনো কথা বললেন না। তবে খোকা একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে, মায়ের দু'চোখ আনন্দে আর গর্বে জলে ভরে উঠেছে।

বড়বৌঠানও খুব খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি এগিয়ে এসে খোকাকে আদর করে বললেন, বাহাদুর ছেলে খোকা, সংসারের কয়েকটি টাকা কেমন কায়দা করে বাঁচিয়ে দিলে।

ছোড়দার উল্লাস কিন্তু অন্য রকম।

লাফিয়ে উঠে ছোড়দা বললে, খোকা বাহাদুর ছেলে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে ত' কিছু মিষ্টি মুখ করাতে হচ্ছে সবাইকে। বাজার থেকে ফেরবার সময় দেখে এলাম হরলাল ময়রার দোকানে গরম গরম রসগোল্লা ভাজ্‌ছে—! কি বলিস তোরা কার্তিক-গনেশ ?

কার্তিক-গনেশ লাফিয়ে উঠে বললে,তুমি ঠিক কথা বলেছ কাকু। সোনাকাকুর এই সাফল্যে আমাদের বাড়ির একটা সুনাম হল ত' ? কাজেই গরম-গরম রসগোল্লা যদি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লক্ষ্মী বললে, এ ব্যাপারে আমার দাবী সকলের আগে।

—কেন ? কেন ?

প্রশ্ন এলো চারদিক থেকে—

লক্ষ্মী গম্ভীর চালে উত্তর দিলে, আমিই ত' বারে বারে চূণ-হলুদ গরম করে সোনাকাকুর পায়ে লাগালাম। তাতেই ত' তার পা একেবারে ভালো হয়ে গেল। তার জন্যেই ত' সোনাকাকু ইস্কুল যেতে পারল। আর ইস্কুলে গেল বলেই ত' হেডমাষ্টার মশাই ওকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন নানা প্রশ্ন। আর তার ফলেই ত' এই ফ্রীশিপ।

লক্ষ্মীর কথা বলার ধরণ শুনে বাড়ি শুদ্ধু সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

এতক্ষণ সন্টু-মন্টু কোনো কথাই বলেনি। ওরা শুধু ঘরের এককোণে বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল।

এইবার এগিয়ে এসে ফোড়ন কাট্‌লে, বা-রে! আমরা বুঝি বাণের জলে ভেসে এলাম ? সোনাকাকু, খেলা জিতে ফিরে আসবার পর আমরা জামা-জুতো খুলে রাখি নি ? পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিইনি ?

মা এইবার বললেন, ঠিক! ঠিক! ওরাও ত' কাজের ছেলেমেয়ে—। অস্বীকার করবার কোনো যো নেই।

ছোড়দা তখন উঠে পড়ে বললেন, যে হেতু আমি এখন বাড়ির কর্তা, সেই জন্যে এই ছোটদের বাহিনী নিয়ে সোজা হড়লালের দোকান আক্রমণ করবো—তারপর যা ঘটে ঘটুক—

ছেলেমেয়ের দলকে একটা গরুর গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে ছোড়দা যেন রাজ্যি জয় করতে বেরিয়ে গেল! ঘর ভর্তি মানুষ ওর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলেন!

ছোট বৌ বললে, সত্যি মামী, তোমার ছেলের অনেক গুণ। বড় হলে দেখবে ও ঠিক দশ জনের একজন হবে।

বড়বৌয়ের বোধকরি কথাটা পছন্দ হল না। তিনি একটু মুখ ঝামটা দিয়ে কইলেন, বড় হলে কে কি মূর্তি ধরে মারমুখী হবে—তা কি আগে থাকতে বলা যায়? আর ঠাকুরপোর ওই এক কাণ্ড! একে ত' নাচুনী বুড়ি—তাতে আবার ঢোলের বাড়ি! দেখ আবার কয় হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে ফেরে?

বড় বৌয়ের মুখে এই ধরণের কথা শুনে মায়ের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল।

তার ছেলের জন্য একটা সংসারে অকারণ অপচয় হোক—তা তিনি চান না। এ বাড়ির ছোট ছেলে সত্যি নাচুনী বুড়ি—একটা সুযোগ পেলেই হল—একেবারে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেবে। খোকাই যেন অপরাধী এই ভাবে চুপচাপ সে বসে রইল।

কিন্তু যে চুপচাপ করতে জানেনা, সে কিন্তু একেবারে হৈ-হুল্লোড়ে বিশ্বজয় করে ফিরে এলো। দেখা গেল—একটু বাদেই গরুর গাড়ী ভর্তি হাসি মুখ শিশু কিশোর-কিশোরীর দল,—আর সেই সঙ্গে গরম গরম রসগোল্লা চার হাঁড়ি—

দূর থেকেই ছোড়দা সোল্লাস ধ্বনিতে যেন বাড়ি ঘর দোর কাঁপিয়ে তুলেছে—

—বৌঠান-আগে ছোটদের দাও। তারপর বাড়ির সবাইকে। ভালো কথা, মামীর জন্যে এক বাটি আলাদা করে রেখে দাও। উনি ত' আবার সবাইকার ছোঁয়া খাবেন না।

মা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, না—না, আমার জন্যে মিষ্টির দরকার নেই। ছোটরা আনন্দ করে খাবে, আর তাই দেখেই আমরা খুশী। বাল্য-ভোজের মতো পবিত্র জিনিস আর কিছু আছে? স্বয়ং বালগোপাল ত'। ওদের মুখ দিয়েই ভক্তের দেয়া সব কিছু ভালো বস্তু আস্বাদন করে থাকেন।

—ছোড়দা বললেন, সেই ভালো কথা। এই চার হাঁড়ি রসগোল্লা ঠাকুর ঘরে প্রসাদ করে নিলেই হবে। বালগোপাল আস্বাদ নিন, আর আমরা সবাই প্রসাদ গ্রহণ করি। লক্ষ্মী, তুই কি বলিস?

বড় বৌঠান মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, আর লক্ষ্মীকে নাচাতে হবে না, ও ত' নেচেই আছে। ওই যে কথায় বলে না,—জামাই পিঠে খাবে? না, আঁচাবো কোথায়?

ছোট বৌঠান এগিয়ে এসে বললেন, না-না, লক্ষ্মীর কি দোষ ? ও ওর সোনা-কাকুর সাফল্যে কত আনন্দ পেয়েছে—তাই ত' নাচানাচি সুরু করেছে। ওই যাক হাঁড়িগুলো ঠাকুর ঘরে নিয়ে—

বড় বৌঠান কিন্তু এই প্রস্তাবে ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, হুঁ! তুমি ভালো কথা বলেছ ছোট বৌ! তা নইলে আর মিষ্টিগুলো নয়-ছয় হবে কি করে ? বলে এক রকম রাগ দেখিয়েই বড় বৌঠান আর এক দিকে চলে গেলেন।

মায়ের কথার ওপর লক্ষ্মী আর কোনো কথা বলতে সাহস করলে না। শুধু চুপি চুপি ছোট বৌঠানকে বললে, না বাপু, আমি হাঁড়ির ভার নিতে গিয়ে কি মার খাব ? কাকিমা হাঁড়িগুলো ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা যা' হোক—তুমিই করো—

ছোটবৌ দেখলে, ছোটর দল মুখ শুকিয়ে সব এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে!

গরম রসগোল্লার লোভ সাম্‌লানো শক্ত। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে ওদের উৎসাহ ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। তবু একেবারে আশা ছাড়তে পারে না। তাই ছোট বৌঠানের আশে-পাশেই ওরা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলে ওদের ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাতে লাগ্‌লো।

শেষকালে ছোট বৌঠানই সব সমস্যার সমাধান করলেন। ঠাকুর ঘরে হাঁড়িগুলি প্রসাদ করিয়ে দিয়ে—ছোটদের মধ্যে রসগোল্লাগুলো বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

কিন্তু যার জন্যে এই হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা'-তাকে ত' কোথায় দেখা যাচ্ছে না।

ছোট বৌঠান মণ্টু-সণ্টুকে ডেকে বললেন হুঁ। নিজেরা ত' খুব গিল্‌ছিস্। কিন্তু যার নাম করে এতগুলো রসগোল্লা এলো তাকে খাইয়েছিস ?

মণ্টু-সণ্টু উত্তর দিলে, ও! সোনাকাকুর কথা বলছো মা ? সে ত' লজ্জা পেয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

খোকা ততক্ষণ ম্লানমুখে-রান্না ঘরে ঢুকে মায়ের হেঁসেল-ঠেলা দেখছে।

রান্নার বামুন দিদি চলে গেছে-সে কত দিন হল। কিন্তু মায়ের হেঁসেল ঠেলার কামাই নেই। বড় বৌঠান কি ইচ্ছে করেই সেদিন বামুন দিদিকে বাড়ি থেকে তাড়ালো ?

খোকার ছোটমনে আজ শুধু এই প্রশ্ন!

॥ ষোল ॥

খোকা বুঝতে পারে। মা যেন একটু ভয়ে ভয়ে থাকেন এই বাড়িতে। যদি কিছু অঘটণ ঘটে, যদি খোকাকে নিয়ে তার এই বাড়িও ছাড়তে হয়-তবে ছেলেকে মানুষ করবেন কি করে ?

বড় পিসির সাথে তীর্থ-ভ্রমণের এত বড় একটা সুযোগ মা ছেড়ে দিয়েছেন—শুধু

খোকার পড়াশোনার কথা ভেবে,—সেটা খোকা বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু তার ফল যে একেবারে উল্‌টোটি হবে সেকথা কে ভেবে রেখেছিল।

বড় পিসি নেই এখন বড় বৌঠানই বাড়ির গৃহিনী। তিনি যা ভালো বুঝবেন তাই হবে।

এখন খোকা বেশ বুঝতে পেরেছে যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা বড় বৌঠান-ইচ্ছে করেই রান্নার বামুনদিদির সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সাত তাড়াতাড়ি কাজ কর্মের আছিলায় মাকে নিয়ে হেঁসেলে ঢুকিয়েছে। দু' একজনের জন্যে রান্না অতি সহজেই করতে পারে মা। কিন্তু এ বাড়িতে পাত্ পাতার লোকের ত' অভাব নেই। যে রকম ভারী হাঁড়ি-কড়া-ডেকচি মাকে তুলতে হয়-তাতে খুব অল্প দিনের ভেতরই মা অসুস্থ হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই বিপদ থেকে মাকে কে বাঁচাবে ? বড় পিসি থাকলে নিশ্চয়ই বড় বৌঠান এই রকম ছল করে বামুন দিদিকে তাড়াতে পারত না।

ছোড়দা বাইরের হাজার ঝামেলায় ব্যস্ত। অন্দর মহলে কি ঘটছে—সে খবর তার কাছে হয়ত আদৌ পৌঁছয় না।

বড় বৌঠানের আর একটি চমৎকার ব্যবস্থা আছে। পরিবেশনের সময় হয় তিনি নিজে এগিয়ে আসেন, আর না হয় লক্ষ্মী কিম্বা আশ্রিত কোনো মহিলাকে দিয়ে কাজ সারেন। ব্যস্ত-বাগীশ ছোড়দা জানতেই পারেনা-দিনের পর দিন কে এতগুলি লোকের রান্না করছে। ছোট বৌঠান লজ্জা পেয়ে দু' একদিন রান্নার কাজে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বড় বৌঠান অন্য কাজের অজুহাতে তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং মায়ের এ ব্যবস্থার যে কোন ওলট পালট হবে, তা আর নয় কোনো বামুন দিদি যে আসবে, সে কথা ত' মনে হয় না।

খোকা সকাল-সন্ধ্যে পড়া শোনা করে, বিকেলে খেলার মাঠে যায়—, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে-কিন্তু তার মনের ভেতরটা যেন পুড়ে যেতে থাকে।

তাদের এ দশা কেন হল ? অভাব ছিল তাদের মা-ছেলের ছোট্ট সংসারে। কিন্তু মনে কোনো অশান্তি ছিল না।

এখানে এসে সে পড়াশোনার ভালো সুযোগ পেরেছে, খেলা-ধূলায় মেতে উঠতে পেরেছে, কিন্তু তার মনে এতটুকু শান্তি নেই। মাকে একটা সংসারের দাসী করে সে কি লেখাপড়া শিখ্‌তে চায় ? এ বাড়ির কাজের ধারা এমন যে, কারণে-অকারণে সারাটা দিন সবাই যেন চরকি পাক খাচ্ছে।

তার ফলে—গভীর রাত্তির ছাড়া মায়ের সঙ্গে ওর নিরিবিলি দেখা হয় না।

বড় পিসির ঘরেই ওরা মা-ছেলে থাকৃছে। বড় পিসি সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন। তাতে ঘরটাও খালি থাকে না।

সারাটা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মা যখন ছেলেকে বুকের কাছে পান—তখন কত কাথাই যে তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। অনেক কথা তাঁর বলবার থাকে বলে কোনো কথাই তিনি বলতে পারেন না। খোকাই বরং মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে,—চল না আমরা ফিরেই যাই—

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা উত্তর দেন, কোথায় যাবি খোকা? আমাদের ঘরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! অভাগা না হলে কি এমন করে ঘর পোড়ে?

খোকা কিন্তু একটু অবুঝ হয়। বলে, কেন মা, আমাদের বিষণ খুড়ো আছে। সে ঠিক লোকজন জুটিয়ে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর তৈরী করে দেবে। তাতে মা-ব্যাটার দিব্যি যায়গা হবে।

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন।

হয়ত কোনো প্রলোভনে তিনি ক্ষণে-ক্ষণে আন্দোলিত হয়ে ওঠেন। শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর আবাস—কিন্তু ছেলের কথা ভেবে তিনি ক্ষণিক দৌর্বল্য মন থেকে দূর করে দেন। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করেন, নারে তা হয় না। একটুখানি কষ্ট করলে আমার কিছু হবে না। তোকে লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়ে মায়ের দুঃখ দূর করতে হবে। একথাটি তুই একদিনের জন্যেও ভুলিস নে।

রাত কত হয় কে জানে।

বাড়ি শুদ্ধু লোক হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু মা আর ছেলের চোখে ঘুম নেই!

বাইরে একটা রাত জাগা পাখী হঠাৎ ডেকে ওঠে। খোকা বলে, তুমি ঘুমোও মা। আবার ত' সেই ভোর বেলা উঠে তোমায় হেঁসেল ঠেলতে যেতে হবে।

মা কিন্তু কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেন। বলেন, সেজন্যে তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না খোকা। তুই শুধু তোর পড়াশোনার কথা ভাববি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর বড় পিসি ফিরে এলে আর কোনো গোলমাল থাক্‌বে না।

দুই অসহায় মানুষ একে অপরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

ফলে, দুই জনের কারো চোখেই ঘুম আসে না।

বিদ্যালয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই প্রায়ই খোকাকে ডেকে পাঠান।

ওর ওপর তাঁর কেমন যেন অপত্য স্নেহ পড়ে গিয়েছে।

সেদিন তিনি ওকে ডেকে বললেন, কোনো কিছু পড়া বুঝতে অসুবিধে হলে তুমি সোজা আমার কাছে চলে আসবে—

খোকা উত্তর দিলে, হ্যাঁ স্যার, তা ত' আসতেই হবে। হেডমাষ্টার মশাই আবার বললেন, হ্যাঁ, শোনো কুশল, তোমার বড়দা এখন নেই, সেজন্যে কোনো ব্যাপারে

এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। তোমার বই, খাতা-পত্র অভিধান যদি কিছু দরকার হয়— আমায় জানাবে। আমি এই সব ব্যবস্থা করে দেবো।

কুশল মাথা নীচু করে বললে, নিশ্চয়ই আপনার কাছে চলে আসবো স্যার—

হেডমাষ্টারমশাই আবার তাকে উৎসাহিত করে বললেন, শোনো কুশল, ভালো করে লেখাপড়া শিখে মানুষ তোমাকে হতেই হবে। আমি তোমার বড়দার কাছে তোমাদের সব কথা শুনেছি। মায়ের দুঃখ তোমাকে দূর করতেই হবে। শোনো কুশল, আমিও খুব গরীবের ছেলে ছিলাম। চেয়ে-চিন্তে বই জোগাড় করে অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছি।

খোকা অবাক হয়ে তাদের প্রধান শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেড মাষ্টার মশাই বল্লেন, হ্যাঁ, যে কথা বলতে তোমায় ডেকেছি সেই দরকারী কথাটাই ত' ভুলে বসে আছি—

কুশল আগ্রহের সঙ্গে শুধোলে, বলুন স্যার।

—শোনো কুশল, আমাদের এই বিদ্যালয় থেকে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। ছেলেরা নিজেরাই নানা রকম বিষয়ে লিখবে। কেউ প্রবন্ধ লিখবে, কেউ গল্প লিখবে, কেউ ভ্রমণ কাহিনী বা কবিতা রচনা করবে। আবার যারা ছবি আঁকতে পারে তারা ছবি এঁকে দেবে এই ম্যাগাজিনে। তাহলে কেমন হবে বলত ?

কুশল উত্তর দিলে তাহলে ত' ভালই হয় স্যার। হেডমাস্টার মশাই উত্তর দিলেন, একজন শিক্ষক তোমাদের সকল ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আর ছাত্রদের পক্ষ থেকে তুমি দায়িত্বনাও। তোমার হাতের লেখাটাও বেশ ভালো আছে।

কুশল আপত্তি করে বললে, আমি ত' স্যার নীচু ক্লাশে পড়ি,—আমার জ্ঞানই বা কতটুকু ? আপনি বরং ওপরের ক্লাশের কোনো ছেলের ওপর এই দায়িত্ব দিন।

প্রধান শিক্ষক মশাই বললেন, আচ্ছা, আমি ভেবে দেখছি—

সেদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর খোকাকে খেলার মাঠে যেতে হয়েছিল।

কপাটি খেলার কতকগুলি নিয়ম কানুন সে ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

খেলতে খেলতে বয়েসে-বড়-খেলোয়াড়কে ও কি ভাবে পাকড়ে ধরা যায় তারও অনেকগুলি কৌশল সে ছাত্রদের শিখিয়ে দিচ্ছিল। সব সময় ওৎ পেতে থাকতে হবে মাঠের একটা কোন থেকে।

এই সব শিখিয়ে সে যখন বাড়ীতে ফিরে এলো, তখন তার দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে। ইচ্ছে ছিল বড় বৌঠানের কাছে গিয়ে সরাসরি খেতে চাইবে। তাই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে খাবার ঘরে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে দেখলে, বড় বৌঠান বাড়ির ছেলেমেয়েদের গরম লুচি ভেজে

খাওয়াচ্ছেন। খোকাকে সেই অসময়ে ঢুকতে দেখে বড় বৌঠানের চোখের ভুরু একটু কুঁচকে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, খোকা তুমি ঘরে গিয়ে একটু বোসো, আমি তোমার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

খোকা ধীরে ধীরে চলে এলো ঘর থেকে। কিন্তু লক্ষ্মীর এ ব্যবস্থা আদৌ মনঃপূত হল না। সে লাফিয়ে উঠে খোকার হাতটি ধরে বললে, বারে—সোনাকাকুকে আমাদের মতো গরম গরম লুচি ভেজে দাও মা! ওর বুঝি খিদে পায় না!

বড় বৌঠান ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে একবার মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

।। সতেরো ।।

বড় পিসির এত বড় বাড়ি, বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই সোনাকাকু বলতে পাগল, বাড়ির দুই কর্তা—বড়দা ছোড়দার তুলনা নেই। সংসারে যেন মা লক্ষ্মীর কৃপা উপচে পড়ছে। চারিদিকের বাগানে ফুলের হাসি, ফলন্ত গাছগুলি রসালো ফলের ভারে নত—চারদিকে সবুজের মেলা, আকাশের নীলে মোহময় নদীর জলে বুঝি আনন্দের আমেজ···তবু খোকার মনে সুখ নেই।

বিদ্যালয়েও সে প্রধান-শিক্ষক থেকে সুরু করে সবাইকার শুভেচ্ছা আর প্রীতি পেয়ে ধন্য হয়েছে। তবু মনের অগোচরে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা বারে বারে তাকে পীড়া দিচ্ছে!

তার মা কি তাকে মানুষ করার জন্য এমনি ভাবে তিল তিল করে মরণকে বরণ করে নেবে? দু বেলা এতগুলি লোকের রান্না করে মায়ের দেহের যা অবস্থা হয়েছে, —বয়েস অল্প হলেও খোকা তা বেশ বুঝতে পারে।

মাঝ রাত্তিরে খোকার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলে সে বেশ বুঝতে পারে—মায়ের ঘুম হচ্ছে না, শুধু বিছানায় শুয়ে এ-পাশ-ও-পাশ করছে।

এই যে দুই বেলা গন্‌গনে উনুনের ধারে বসে মাকে এতগুলি মানুষের জন্যে রান্না করতে হচ্ছে তাতেই এই অনিদ্রা রোগ জন্মেছে।

খোকা একথাও বেশ বুঝতে পারে যে, ছোড়দা বাড়ির ভেতরকার কোনো খবরই রাখে না। সেখানে একেবারে বড় বৌঠানের রাজত্ব। বড়পিসি থাকলে অবশ্য ব্যাপারটা আদৌ ঘটতে পারত না! কিন্তু এখন পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া মায়ের বুঝি আর কোনো গতি নেই। এই কি তার চির দুখিনী মায়ের নিয়তি?

খোকা ভেবে-ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না। পড়াশোনায় সে মন বসাতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক মশাই তার ওপর কতখানি ভরসা করে বসে আছেন খোকা সে কথা বেশ ভালো করেই জানে। ইস্কুলে ক্লাশের পড়া দিতে

গিয়ে মাঝে মাঝে এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে শেষ কালে নিজেই লজ্জিত হয়। এক এক দিন মাস্টার মশায়ের ডাকে সে চম্‌কে ওঠে! তাই ত' পড়াশোনার সময় সে কি কথা ভাবছিল? না—না, ক্লাশে পড়া দেবার সময় সে অন্য কথা ভাববে না। মা শুন্‌লে মনে বড় কষ্ট পাবে। তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা একেবারে বৃথা হয়ে যাবে। খোকা সমস্ত মন প্রাণ একত্র করে নতুন ভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে গিয়ে দেখে বাড়িতে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেছে।

বড় বৌঠান সারা বাড়ি ময় একেবারে দাপাদাপি করে ফিরছেন।

—ও জিনিস হজম করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না—একথা আমি সরাসরি বলে দিচ্ছি। আমি ঠিক পেটের থেকে বের করে আন্‌বো।

ইস্কুল থেকে ফিরে খোকার বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু বাড়ির এই তপ্ত আবহাওয়া দেখে বড় বৌঠানকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

একবার ভাবলে, লক্ষ্মীকে ডেকে খানিকটা মুড়ি-চিড়ে চেয়ে নেবে। কিন্তু আশে পাশে কাউকেই দেখতে পেলে না।

ওদিকে অন্দর মহলের কোলাহলটা কেবলি বেড়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় দেখা গেল, একটি ছোট ধামায় করে লক্ষ্মী মুড়ির মোয়া আর নারকেল নাড়ু নিয়ে আসছে। খোকা কিছু বলবার আগেই লক্ষ্মী বললে, শোনো সোনাকাকু, তুমি এই খাবার খেয়ে নাও। ইস্কুল থেকে ফিরে পেটে ত' কিছু পড়ে নি। তাই আমি বুদ্ধি করে নিজেই নিয়ে এলাম।

খোকা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা লক্ষ্মী, আজ বড় বৌঠান এত চটেছেন কেন? কি হয়েছে বাড়িতে? আমায় সব খুলে বলত?

লক্ষ্মী কৌতুক করে উত্তর দিলে, আজ তুমুল কাণ্ড। জানো সোনাকাকু, মা নাকি স্নান করার সময় তাঁর কানের মাকড়ি খুলে ইন্দারার ওপর রেখেছিল। তারপর বেমালুম ভুলে গেছে। খাওয়া দাওয়ার পর জানো ত' মা পান মুখে দিয়ে এক ঘুম লাগায়। বিকেলে উঠে চুল বাঁধতে গিয়ে আয়নায় তাকিয়ে দেখে কানে তাঁর মাকড়ি নেই! এখানে খোঁজে ওখানে দেখে, সেই মাকড়ি দুটির আর সন্ধান পাওয়া যায় না! সেই থেকেই ত' মা গোটা বাড়িতে দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছে। বলে,—যে নিয়েছে তাকে ওগড়াতেই হবে। আমি বললাম, মা, এখুনি এত তেলপোড়া করছ কেন? আগে তোমার বাক্স, দেরাজ টেরাজ গুলো ভালো করে খুঁজে পেতে দেখ। তোমার মাকড়ি সবাই চেনে। পেলে নিশ্চয়ই এনে ফেরৎ দিত।

—তা আমার কথা শুনে মা মারমুখী হয়ে তেড়ে আমার চুলের মুঠি ধরতে এলো। আমি ত' এক ছুটে পালিয়ে এসেছি। মা কেবলি এঘর-ওঘর দাপাদাপি করছে আর

বলছে, বাইরের কেউ ত' অমোর মাকড়ি নিতে আসে নি। ঘরের কেউ পেয়ে লুকিয়ে রেখেছে। দুধ দিয়ে আমি কালী সাপ পুষেছিলাম।

লক্ষ্মী তার গালে একটা আঙুল রেখে বললে, শোনো কথা। এখানে কাল-সাপ কোত্থেকে এলো তাত আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা!

লক্ষ্মীর মুখে এইকথা শুনে খোকা একেবারে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল।

লক্ষ্মী তাকে ধমক্ দিয়ে বললে, তোমার আবার কি হল সোনাকাকু? চট্‌পট মোয়া আর নারকেল নাড়ু খেয়ে নাও। সেই কখন ইস্কুলে গেছ,—তোমার যে দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে সেকথা আমি বেশ বুঝতে পারি। কার্তিক-গনেশ আজ সকাল সকাল ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। ওরা বায়না ধরেছিল, ছোট কাকার সঙ্গে নৌকো করে ধান বিক্রী দেখতে যাবে। একটা বাগান থেকে নাকি নারকেলও পাড়া হবে।

লক্ষ্মীর মুখে সব কথা শুনে খোকার ক্ষিদে তেষ্টা যেন একেবারে উবে গেল। লক্ষ্মী এত আদর যত্ন করে খাবার ওর হাতে তুলে দিলে। কিন্তু সেই মোয়া আর নারকেল নাড়ু ওর গলা দিয়ে নাম্‌বে?

লক্ষ্মী বললে, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই সোনাকাকু! এক্ষুনি ভাঁড়ার ঘর থেকে এবেলার রান্নার সব জিনিস-পত্র বের করে দিতে হবে। মা যা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে,—এখন ওর কাছে কেউ এগুতে সাহস করবে না।

লক্ষ্মী পা চালিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এখন খোকা কি করবে? লক্ষ্মীর দেয়া খাবারও সে ফেলে দিতে পারছে না। সমস্ত মন-প্রাণ চাইছে মায়ের কাছে ছুটে যেতে। কিন্তু সেদিকেও ওর পা সরছে না।

একবার খেলার মাঠে যাবার দরকার ছিল। ছেলেরা আবার বার বার করে বলে দিয়েছে।এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে বড়বৌঠানেরগলা আবার শোনা গেল।

—আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি—, কেউ বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমি আব্দুল ওঝাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। সে এসে বাটি চালান দেবে। মাকৃড়ি আমাকে বের করতেই হবে—

খেলার মাঠে যাবে বলে খোকা উঠেছিল। কিন্তু বড় বৌঠানের ওই হুম্‌কি শুনে সে আবার একটা মোড়ার ওপর বসে পড়ল। আজ যে সে আবার খেলার মাঠে যেতে পারবে এমন ত' মনে হয় না।

এই সন্ধ্যাবেলাটা সে কি করে কাটাবে তাই আপন মনে ভাবতে লাগল।

মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিক কি এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে? মা কি এরই মধ্যে আবার হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে? হঠাৎ খোকার মনে হল, আচ্ছা মা কি ঠিক মত খেতে পারছে? মায়ের ছানা-চিনি দিয়ে জল খাবার খাওয়া অভ্যাস। কে তার হাতে সেই জিনিস তুলে দিচ্ছে? খোকা আর ভাবতে পারে না।

তাদের নিজেদের ফেলে আসা গাঁয়ে ফিরে যাবার কি আর কোনো উপায় নেই? সেখানে অভাব ছিল, কিন্তু অশান্তি ছিলনা। খোকার মনে এই কথাই বার বার জাগতে লাগল।

এমন সময় অন্দর মহলে একটা সোরগোল উঠল—এসেছে—এসেছে।

লক্ষ্মী আবার এক ফাঁকে ছুটে এলো খোকার কাছে। বললে, সোনাকাকু, মজা দেখবে এসো—। সেই আব্দুল ওঝা তার ঝুলি-ঝোলা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। ও নাকি বাটি চালান দেবে। যে লোক মায়ের মাকৃড়ি নিয়েছে—সেই বাটি নাকি গিয়ে তার পায়ে আটকে থাক্‌বে—কিছুতেই খোলা যাবে না। মাকৃড়ি বের করে দিলে তবে সেই বাটি আপনা আপনি পা থেকে খুলে পড়ে যাবে।

তুমি মজা দেখবে এসো সোনাকাকু—লক্ষ্মী আবার এক ছুটে বাড়ির ভেতর পালিয়ে গেল। খোকা এক পা-দু'পা করে বাড়ির ভেতরকার উঠোনে গিয়ে হাজির হল। সেখানে মায়ের সঙ্গে তার একবার চোখাচোখি হল। কিন্তু কোনো কথা বলার ত' উপায় নেই।

আব্দুল ওঝা তার লাঠি উঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল, ভালো-মন্দ মানুষ যে যেখানে আছ সবাই এসে এখানে জড় হও। আমি এক্ষুণি এই বাটি চালান দেবো। আর চক্ষের পলকে চোর ধরে ফেলবো।

কিন্তু এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটল। লক্ষ্মী লাফাতে লাফাতে এসে বললে, আর বাটি চালান দিতে হবে না। এই ত' মা তোমার মাকড়ি জোড়া, তোমার পুরোনো চুলের ফিতের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

খোকা তাকিয়ে দেখল, বড় বৌঠানের মুখটা একেবারে আমশীর মতো শুকিয়ে গেছে।

॥ আঠারো ॥

এবার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মশাই এক নতুন নিয়ম চালু করলেন।

পরীক্ষার সময় ছাত্রদের কোনো গার্ড থাকবে না। ছাত্রদল নিজের মনে বসে পরীক্ষা দেবে। তাদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা হবে। প্রশ্নের উত্তর লিখে তারা শুধু খাতা জমা দেবে দপ্তরে।

এই নিয়ম চালু করবার সময় অন্যান্য শিক্ষকগণ আপত্তি তুলেছিলেন।

কেউ বললেন, বিদ্যালয়ে ভাল ছাত্র নিশ্চয়ই আছে। তারা সারা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করে। পরীক্ষা দিতে বসে তারা কখনই টোকাটুকি করে না।

—কিন্তু— প্রশ্ন তুল্‌লেন আর এক টিচার। —কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে আর এক

দল দুষ্টু ও বেপরোয়া ছেলে সামনে নকল করে পরীক্ষা দেবে। ফলে তারা ভালো নম্বর পাবে। তাহলে পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এই মত সমর্থন করলেন। হেড মাষ্টার মশাই বললেন, আপনাদের যুক্তি আমিও সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তবু বল্‌বো, ছেলেদের বিশ্বাস করে আমরা একবার দেখিনা—! তারা এই বিশ্বাসের মর্যাদা ত' রক্ষা করতেও পারে। জানেন ত' লণ্ডণের পথের ধারে ফুটপাতে-গাদাগাদা খবরের কাগজ পড়ে থাকে, পথচারীরা তাদের প্রয়োজনের মত কাগজ বেছে নিয়ে পয়সা সেইখানেই রেখে দিয়ে চলে যায়। হিসেবে-একটি পয়সাও এদিক-ওদিক হয়না। এক দেশের লোকেরা যা' পারে, আর এক দেশের মানুষ তা পারবে না কেন ? আসল কথা, আমরা ছাত্র-দের ছোটবেলা থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে পারিনা। এবার একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক্ না! আমাদেরও—ওদেরও।

শিক্ষকবৃন্দ তখন প্রধান শিক্ষকের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, আপনার সাধু-সঙ্কল্প আমরা মেনে নিলাম। একবার তাহলে পরীক্ষাই হোক—আমাদের শুভ কামনা-ছাত্রদল মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে কি না।

তখন সারাদিন বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষকের ঘোষণা যথারীতি প্রচার করা হল।

ক্লাশ-টিচারদের জানিয়ে দেয়া হল,-এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ছাত্রদের মধ্যে কি হয়-সেটা যেন তাঁরা অনুসন্ধান করেন আর যথাসময়ে শিক্ষকবৃন্দের আলোচনা সভায় পেশ করেন।

বিদ্যালয়ে ভালো আর সৎ ছেলের অভাব নেই। হেড মাষ্টারের ঘোষণা শুনে অধিকাংশ ছেলেই খুশী হল। তাদের খুশী হবার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস করা হয়েছে। এতে পরীক্ষা দেবার দায়িত্ব ছেলেদের ওপর এসে গেল। গোলমাল হলে-সেজন্য ছেলেদেরই-বদনাম হবে। কাজেই এই সহজ সরল ও সুন্দর ব্যবস্থা সকলেরই স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয়া উচিত।

দুরন্ত আর বেপরোয়া ছেলের দল ঘোষণা শুনে নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে কি আলোচনা করল-সেকথা তারাই ভালো বলতে পারে।

পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলা—ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেতে থাক্‌লো।

অভিভাবকেরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাক্‌লেন না। তাঁরাও হেড মাষ্টারের ঘোষণা শুনে ইস্কুলে এসে শিক্ষক বৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন এবং স্বয়ং প্রধান শিক্ষককে সাধুবাদ জানাতে লাগলেন।

এদিকে বেপরোয়া ছেলেদের দলও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারাও এই ঘোষণার পুরোপুরি সুযোগ নেবে বলে ঠিক করল।

একদল বয়সে বড় ছেলে—যারা ইতিমধ্যে ইস্কুলের পাঠ শেষ করে চলে গেছে—তারা এগিয়ে এলো এই সব ডানপিটে ছেলেদের সাহায্য করতে।

তখন ঠিক করা হল'—প্রশ্ন পত্র বিলি করার পরই প্রত্যেক ক্লাশের দু,একজন ছেলে জল খাবার কিম্বা বাথরুমে যাবার ছুঁতো করে পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে আবে। যথাস্থানে কয়েকটি বাইরের ছেলে অপেক্ষা করতে থাক্‌বে। তারা প্রশ্ন পত্র গুলি সংগ্রহ করে দ্রুত চলে যাবে একটা ঘাঁটিতে। সে ঘাঁটি থাক্‌বে ইস্কুলের কাছেই। সেখানে একদল বড়ছেলে বইটই দেখে চট্‌পট জবাব লিখে ফেলবে। সেই জবাব-গুলি আবার কৌশলে ফিরে আসবে—পরীক্ষা দেবার ঘরগুলিতে। তারপর ছেলের দল পরস্পরকে সাহায্য করবে।

এইভাবে অল্প বিস্তর প্রায় প্রত্যেক বেপরোয়া ছেলেই প্রশ্নপত্রগুলির উত্তর লেখার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

বাড়িতে খোকা পরীক্ষার জন্যে ভালো ভাবে তৈরী হচ্ছে।

কার্তিক আর গনেশ প্রতিদিন একজন শিক্ষকের কাছে রীতিমত পড়াশোনা করে।

খোকাও মাঝে মাঝে গিয়ে ওই শিক্ষক মশায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি জেনে নিতো।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আপত্তি এলো অন্দর মহল থেকে।

বাড়ির গৃহিনী এখন বড় বৌঠান।

তিনি শিক্ষক মশায়ের কাছে খবর পাঠালেন,—তিনজন পড়ুয়াকে পড়াতে গেলে তাঁর সময়ের অভাব ঘটবে। তাছাড়া মাইনে বৃদ্ধির প্রশ্নও এতে জড়িয়ে রয়েছে। কাজেই তিনি আগের মতো কার্তিক আর গনেশকেই পড়াবেন। বাড়িতে আর কোনো পড়ুয়াকে পড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।

খোকা এ খবরটা আদৌ জানত না। একদিন মাষ্টারমশায়ের কাছে কতকগুলি শক্ত অঙ্ক বুঝতে গেল—তিনি তার অসুবিধার কথা সোজাসুজি খোকাকে জানিয়ে দিলেন।

খোকা মনে মনে আঘাত পেলো। কিন্তু পড়াশোনার কাজে সে এতটুকু দমল না। তারপর থেকে সে সরাসরি প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলি বুঝে নিত। এর পর থেকে তার শিক্ষা আরো দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। খোকা মনে মনে ভাবলে, এ আমার শাপে বর হল।

খোকা আসাতেই যে তার ছেলে কার্তিক-গনেশ পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি—একথা বড় বৌঠান কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই তিনি কাতিক-গনেশের মাষ্টার মশাইকে জানিয়ে দিয়েছেন—যে ভাবে হোক-ওদের প্রথম করতেই হবে। আপনি আমার ছেলে দুটিকে মন দিয়ে খুব ভালো ভাবে পড়ান। কাজ উদ্ধার হলে-আমি আপনাকে আলাদা ভাবে পুরস্কার দেবো,—সেকথা কাউকে

জানাবার দরকার নেই। আর একটি কথা সব সময়েই মনে রাখ্‌বেন.—খোকাকে কোনো পড়ায় সাহায্য করা চল্‌বে না।

শিক্ষক মশাই তাই বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন!

কিন্তু গোলমাল বেঁধেছে কার্তিক আর গনেশকে নিয়ে। ওরা চায় সোনাকাকুও তাদের সঙ্গে বসে পড়ুক। কিন্তু মায়ের আদেশ অন্যরকম। তাই খোকাকে বড় পিসির ঘরে বসেই পড়াশোনা করতে হয়। অবশ্য সে ঘরটাও বেশ নিরিবিলি।

ঘুম থেকে উঠেই ওর মা আগে স্নান সেরে নিত্যকার সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে হেঁসেলে ঢোকেন। সেখান থেকে ছাড়া পেতে তাঁর বেলা গড়িয়ে যায়। তখন আবার স্নান করে নিজের ভাতে-ভাত রান্না করে নিতে হয়।

ছোট বৌঠানের এই ব্যবস্থাটা আদৌ পছন্দ হয় না।

সে দু'একদিন তার বড় জাকে বলেছে—দিদি, তুমি না হয় আর একটি শক্ত-সমর্থ বামুণ দিদি দেখে নাও। নইলে আমাদের মামী একেবারে কাহিল হয়ে পড়বেন।

বড় বৌঠান এক কান দিয়ে শুনেছেন, আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছেন। গায়ে বিশেষ মাখেন নি—ছোট জায়ের অনুরোধটাকে।

ছোটবৌ মামীর ভাতে-ভাত রান্না করতেও ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তিনি মৃদু হেসে তাকে সরিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। পরীক্ষকবৃন্দের ধারণা সব ক্লাশেরই পরীক্ষা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে এগিয়ে চলেছে।

প্রধান শিক্ষকের মুখে আর হাসি ধরেনা। তিনি শিক্ষকদের সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন, দেখলেন ত'? ছেলেরা বিশ্বাসের মূল্য রেখেছে।

শিক্ষকরা উত্তর দিয়েছেন রাখলেই ভালো।

এদিকে খোকাদের ক্লাশে খুব নকল করা চল্‌ছে। কিন্তু একদল ছেলে আছে তারা বইয়ের পাতা অবধি উল্টে দেখেনা সারা বছর। হাতের কাছে লেখা উত্তর কিম্বা বই পেয়েও তারা কাজে লাগাতে পারে না। একদিন একটি গুণ্ডা গোছের ছেলে খোকার পেছন থেকে বললে, এই কুশল, বের করে দে ত' বই থেকে কোথায় প্রশ্নের উত্তরটা লেখা আছে। কুশল বললে, আমি এখন ওসব বই-পত্তর ঘেঁটে প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারবো না। যে যা জানো লিখে দাও—

বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষকের কিন্তু ধারণা যে, ছেলেরা দিব্যি টোকাটুকি করছে। তিনি বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ পড়ল ছেলেদের হাতে ভূগোলের বই। তিনি পা টিপে টিপে ঘরের ভেতরে ঢুক্‌লেন। তার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে সেই গুণ্ডা ছেলেরা মুহূর্তের মধ্যে ভূগোলের বইটা সবার অলক্ষে খোকার কোলের ওপর বসিয়ে দিল।

ভূগোল শিক্ষক মশাই ঘরে ঢুকে শুধু বললেন, ছেলেরা দাঁড়াও সবাই—

দাঁড়াতে গিয়ে খোকার কোল থেকে সেই ভূগোলের বইটা ঠকাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ভূগোল শিক্ষক মশাই বইটা কুড়িয়ে নিয়ে খোকাকে জিজ্ঞেস করলে, এর মানে কি?

॥ ঊনিশ ॥

প্রথমে বাইরের বাড়িতে একটা উঁচু গলায় কথা বার্তা শোনা গেল।

ইস্কুল থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছিল কার্তিক আর গনেশ।

প্রথমেই দেখা ছোটকাকার সঙ্গে। ছোটকাকা বাইরের উঠোনে ধান ঝাড়াই-বাছাই দেখছিল! কার্তিক-গনেশ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে তার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল!,

ওদের দুই জনের চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা। ছোটকাকা জিজ্ঞেস করলেন কিরে, তোরা এমন ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছিস কেন? রাস্তায় কুকুরে তাড়া করেছিল নাকি?

কার্তিক-গনেশ হাঁফাতে হাঁফাতে জবাব দিলে, না ছোটকাকা, আজ আমাদের ভূগোলের পরীক্ষা ছিল না? তা ভূগোল স্যার পরীক্ষার সময় লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমাদের সোনাকাকুর কোলের ওপর নাকি ভূগোলের বই পাওয়া গেছে। ভূগোল স্যার সেই বই আর সোনাকাকুকে নিয়ে সোজা হেড মাষ্টারের ঘরে চলে গেছেন। সব শিক্ষকরা এসে সেখানে জড় হয়েছেন। ছাত্ররাও দল বেঁধে জটলা পাকাচ্ছে। তারা বলছে কুশলকে ছেড়ে দিতে হবে—নইলে ইস্কুল বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবে—

এত গুলো কথা একসঙ্গে বলে কাতিক-গনেশ দুইজনেই হাঁফাতে লাগ্‌ল।

ছোটকাকা কিন্তু তাদের কথা উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দূর বোকা ছেলেরা! খোকা কেন নকল করে পরীক্ষা দিতে যাবে? সে ত, পড়াশোনায় খুব ভালো। নিশ্চয়ই ও অন্য কোনো দুষ্টু ছেলের কাণ্ড! তোরা কি শুনতে, কি শুনে এসেছিস!

কার্তিক-গনেশ তাদের চোখ দুটো বড় বড় করে উত্তেজিত ভাবে বললে, না ছোট-কাকা, আমাদের শোনাকাকুকেই ত' ভূগোল স্যার হেড মাষ্টারের ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন। আমরা নিজের চোখে সব দেখে শুনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি—

ছোটকাকা এইবার নিজে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এ কখনোই হতে পারে না। আমাদের খোকা পড়াশোনা আর খেলাধূলা সব তাতেই চৌকস। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি ইস্কুলে যাচ্ছি—

ছোটকাকা যে ভাবে চাষীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিলেন—সেই অবস্থাতেই কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে ইস্কুলের দিকে ছুট্‌লেন।

কার্তিক আর গনেশ তখন ভয়ে ভয়ে অন্দর মহলের দিকে ছুট্‌ল।

প্রথমেই মায়ের একেবারে মুখোমুখী পড়ে গেল দুই ভাই—

ওদের মা হুম্‌কি দিয়ে বললেন. কি এত হৈ-চৈ করে বলছিলি তোদের ছোট কাকাকে?

মাকে ওরা সবাই বাঘের মতো ভয় করে। তাই ব্যাপারটা বলতে একটু ইতঃস্তত করছিল। কিন্তু মায়ের ধমকের সামনে ওরা একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। তাই ছোটকাকাকে যা-যা বলেছিল—এক দমে মায়ের কাছে সব জানিয়ে হাঁফাতে লাগ্‌ল।

বাড়ির বড় গিন্নি এইবার বড় গলা করে বললেন, হুঁ! এ আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। নইলে একেবারে অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেই সরাসরি ক্লাশে প্রথম! পরীক্ষার খাতায় নকল করে অমন প্রথম অনেকেই হতে পারে! ওই যে কথায় বলে না,—দশদিন চোরের আর একদিন সাধুর—। এই সময়ে রান্নাঘর থেকে লক্ষ্মীর একটা বুক ফাটা চীৎকারে বাড়ি শুদ্ধু সবাই সেইখানে গিয়ে ভীড় জমালো।

লক্ষ্মী কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, মায়ের ওই সব কথা শুনে দিদিমা একেবারে উনুনের ধারে ভিরমি খেয়ে পড়েছেন। ভাগ্যিস আমি এই সময়টায় জল গরম করতে এসেছিলাম, নইলে দিদিমার আঁচলে উনুনের আগুন ধরে যেত। আমি তাড়াতাড়ি পড়ি-কি-মরি করে আগে আঁচলটা সামলে নিয়েছি—

বাড়ির ছোট বৌ বললে, এসো, আমরা সবাই মামীমাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাই—তারপর একটা খাটের ওপর শুইয়ে দিই।

সবাই তার কথা সমর্থন করে বললে, হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। উনুনের ধারের এই গরমে কিছুতেই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে না।

তখন সবাই মিলে খোকার মায়ের চেতনা হীন দেহটাকে সাবধানে ধরে ধীরে ধীরে বাইরে নিয়ে এলো।

ছোট বৌ বললে লক্ষ্মী, আমার ঘরটাই কাছে। তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার খাটে একটা বিছানা পেতে দে। এখনকার মতো মামীমাকে ওইখানেই শুইয়ে দি। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে—ওঁর নিজের খাটে নিয়ে গেলেই হবে।

লক্ষ্মী বললে, আমি তাড়াতাড়ি আগে বিছানাটা করে দিচ্ছি কাকিমা—কিন্তু মুস্কিল হল এই যে, খোকার মায়ের জ্ঞান আর ফেরে না! ছোট বৌ মুখের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিয়ে দেখলে—একেবারে দাঁতে-দাঁত লেগে আছে।

এখন উপায়! উপস্থিত সবাই নানা রকম টোট্‌কার কথা বলতে লাগল। কেউ বললে, হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরো—

কেউ জিজ্ঞেস করলে,—হিষ্টিরিয়া নেই ত' খোকার মার? আবার অন্য একজন পরামর্শ দিলে, মাথায় জল ঢাল্‌তে হবে,—তবে যদি জ্ঞান ফিরে আসে—

ছোট বৌ এই সব দেখে ভারী ভয় পেয়ে গেল।

কার্তিক-গনেশকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে তোদের ছোটকাকা কোথায়? কোবরেজ মশাই কিম্বা ডাক্তারবাবুকে ডাক্‌তে হবে—

কার্তিক-গনেশ ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে, আমাদের কাছে খবর শুনে ছোটকাকা যে ইস্কুলের দিকে ছুটে গেলেন! তাঁকে ডেকে নিয়ে আসবো কাকিমা?

কাকিমা খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ রে শীগ্‌গির ছুটে যা, যেখানে তোদের ছোটকাকাকে পাবি বলবি—একেবারে যেন ডাক্তার কিম্বা কব্‌রেজ সঙ্গে করে ফেরে। কি বিপদেই পড়া গেল। এই সময় আবার মা নেই বাড়িতে। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি নে। ও দিদি, তুমি আবার দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? একবারটি কাছে এসে দেখ—

চাপা গলায় বড়বৌ উত্তর দিলে, ছেলের গুণপনা ধরা পড়েছে কিনা,—তাই ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে। ও আপনিই সেরেযোবে। আমি গেলে কি দশটা হাত গজাবে নাকি? আমার বাপু মরবার সময় নেই।

বড় বৌ কোনো দিকে দৃকপাত না করে ঠাকুর ঘরের দিকে চলে গেলেন! শ্বাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে তাকেই সব কিছু দেখতে হবে কিনা।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে বাড়ির ছোটবাবু কোব্‌রেজমশাই আর খোকাকে সঙ্গে নিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে এলো।

ছোটবৌ তাকে একান্তে ডেকে বললে, এতক্ষণ বাড়ির বাইরে ছিলে,—আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে মরি। যাও শীগ্‌গির কবরেজমশাইকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে চলে যাও—। মামীমার জ্ঞান এখনো ফিরে আসেনি।

খোকা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল বারান্দায় এক কোণে। লক্ষ্মী তাকে তাড়াতাড়ি এক থালা খাবার দিয়ে বললে, খুব ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। আমি সব বুঝতে পারি সোনাকাকু। এই খাবার খেয়ে দিদিমার শিয়রে গিয়ে বোসো। আজ পালা করে আমাদের রাত জাগতে হবে,—কাকিমা বলে দিয়েছেন।

খোকা কোনো রকমে খাবারটা গিলে—ঢক্‌ঢক্‌ করে এক গেলাস জল পান করলে। তারপর দ্রুত পায়ে ছোট বৌঠানের ঘরের দিকে চলে গেল।

সেখানে কব্‌রেজমশাই অনেক কষ্টে মায়ের জ্ঞান ফিরিয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীকে ডেকে বললেন, নাড়ি খুব দুর্বল। এক্ষুণি এক গেলাস গরম দুধ খাইয়ে দাও—

তারপর বাড়ির ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ওষুধ আর মকরধ্বজ রেখে যাচ্ছি। কিন্তু দেহ এত দুর্বল কেন? উনি কি ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করেন না? তার ওপর নিশ্চয়ই অত্যধিক পরিশ্রম করেন। একেবারে দীর্ঘকাল বিশ্রাম আর পুষ্টিকর আহার চাই। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কব্‌রেজমশাই চলে যেতেই খোকার মা একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ খোকার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি উন্মাদের মতো উঠে বসে যেন খোকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ক্রমাগত কীল চাপড় আর গালাগালি চলতে লাগলো,—তুই সবাইকার মুখ ডোবালি, নকল করে পরীক্ষায় পাশ করতে গিয়েছিলি ? আমি আর তোর মুখ দর্শন করবো না। তুই—মর্—মর্—খোকা মায়ের হাতে কখনো মার খায়নি। আজ এই ভাবে সকলের সামনে মায়ের হাতের আঘাতে-আঘাতে সে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

তবু মায়ের মারের বিরাম নেই !

এমন সময় হেডমাষ্টার মশাই ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলেন, তিনি চীৎকার করে বললেন, মা, আপনি কুশলকে মারবেন না। আমি এই ভয়ই করছিলাম যে, আপনি ওকে ভুল বুঝ্‌বেন। তাই নিজেই ছুটে এলাম। শুনুন, আমি সব রকম ভাবে অনুসন্ধান করেছি। একটি বেপরোয়া গুণ্ডা গোছের ছেলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কুশলের কোলের ওপর ভূগোলের বইটা চাপিয়ে দিয়েছিল। আমাদের ভূগোল শিক্ষক একটু রাগী মানুষ, তিনিও ভুল বুঝেছিলেন। আমি আপনাকে বলছি মা, কুশলের কোনো দোষ নেই। ওর খাতাও আমি দেখেছি। ও ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। মা, আপনি শান্ত হোন,—এই আমার অনুরোধ।

খোকার মা উত্তেজনায় আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

॥ বিশ ॥

সে রাত বুঝি আর কাটতে চায় না।

প্রবল উত্তেজনায় খোকার মা বারে বারে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছিলেন।

ক্রমাগত একটা হেঁচকি উঠছিল। তাতেও খুব কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।

ছোটবৌ কার্তিক-গনেশের কাকাকে ডেকে চুপিচুপি বললে, তুমি আর একবার কব্‌রেজ মশায়ের কাছে যাও। এই অবস্থার কথা খুঁটিয়ে তাঁকে সব বলো। তিনি যদি আর একবার দেখে ওষুধ পাল্‌টে দেন তা হলে খুব ভালো হয়। আমি কিন্তু মামীমার অবস্থা খুব সুবিধের মনে করতে পারছি নে।

বাড়ির ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—মামীমা এত দুর্বল হয়ে গেলেন কেন ? কবরেজমশাই আমায় যা বলে গেলেন তাতে মনে হল-পুষ্টিকর আহার দূরের কথা, তিনি নাকি আধপেটা খেয়ে আছেন ? তোমরা কি তাকে খেঁতে দাও না ? তিনি এত দুর্বলই বা হয়ে গেলেন কি করে ?

ছোট-বৌ তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর বড় জায়ের কীর্তি কাহিনী সব বলে ফেললে!

ছোটবাবু নিজের মাথার চুল টেনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে কইলেন ছিঃ-ছিঃ কি লজ্জার কথা। আমাদের বাড়িতে এসে মামীমা শুধু দুই বেলা হেঁসেল ঠেলছেন? তাহলে তাঁর শরীর টিকবে কি করে? ব্যাপারটা আমায় একবার জানাবে ত'?

ছোটবৌ এমনি একটু ভীতু ধরণের মানুষ। তাই চুপি চুপি বললে, আমি কি করবো বলো? দিদি আমায় মাথার কিরে দিয়ে বারণ করেছিল। তাই আমি ভয়ে ভয়ে কিছু বলি নি।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি ছুটলেন আবার কবরেজ মশায়ের বাড়ি।

তিনি সব শুনে বললেন, আজকের উত্তেজনাটাই সব নয়। দিনের পর দিন দারুণ পরিশ্রম, তার ওপর প্রায় অনাহারে থাকা। ওই দুর্বল শরীরে আর আছে কি বলো? চলো, আমি আবার ভালো করে দেখি—

কব্‌রেজমশাই এসে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখ্‌লেন। বললেন, নাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। ভেতরে ভেতরে এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন-যে, সত্যি ভাবনার কথা! আমি ওষুধ পালটে দিয়ে যাচ্ছি। কস্তুরী ভৈরবের ব্যবস্থা করতে হবে। ছোট বৌমা, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—সেই রকম ভাবে ওষুধ খাইয়ে যাবে। আজ রাত্তিরটা সাবধান। তোমরা সকলে পালা করে জাগ্‌বে! হ্যাঁ' ভালো কথা, একটু একটু করে ফলের রস খাওয়াও। গরম দুধও মাঝে মাঝে চল্‌বে।

কব্‌রেজমশাই সব কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। ছোটবাবু ঠিক করে দিলেন, কে কখন রাত জাগ্‌বে। তারপর বললেন, আজ ওঁর নড়াচড়া করা আদৌ উচিত হবে না। মামীমা যেখানে যেভাবে যে খাটে শুয়ে আছেন-ঐখানেই থাকুন। ছেলে-মেয়েরা না হয় অন্য ঘরে শোবে আজ।

তারপর কি ভেবে তিনি বললেন, লক্ষ্মী, এক কাজ কর। এই ঘরের মেঝেতে ঢালা বিছানা করে ফেল। আমরা যারা রাত জাগ্‌বো-সবাই এই মেজেতে শুয়ে থাক্‌বো; ঘড়ি ধরে এক একজনকে ডেকে দেয়া হবে।

ছোটবৌ এই সময় এসে ঘরে ঢুকলো। খাটো গলায় কইলে, আজ আর রান্না-বান্নার বেশী দরকার নেই! আমি আলু-পটল-বেগুন-কুমড়ো সব কিছু দিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। ঘরে ঘী আছে, দুধ আছে। ছেলে-পেলেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই অন্য ঘরে শুয়ে পড়ুক—

ছোটবাবু বললেন, ঠিক বলেছ, ছোটদের হুটোপাটি আজ একেবারে বন্ধ। এই ঘরের এক কোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখো—মামীমার চোখে যেন আলো না পড়ে। ওঁর এখন শান্ত হয়ে বেশ কিছুটা ঘুমোনো দরকার।

একটু বাদেই ছোটদের দলকে নিয়ে লক্ষ্মী খাওয়াতে গেল।

ঘরে তখন বাড়ির ছোটবাবু আর ছোটবৌ। ছোটবাবু চুপি চুপি বললে, জানো ছোটবৌ, আজই সন্ধ্যাবেলা গাঁয়েরচিঠি পেলাম। ওরা নানান্ তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ছোটবৌ জিজ্ঞেস করলে, কি লিখেছেন মা? ছোটবাবু উত্তর দিলে, মামীমার কথাই এ চিঠিতে মা বেশী করে লিখেছেন। নানা তীর্থের নির্মাল্য, প্রসাদ, শঙ্খ, মালা—এই সব তিনি মামীমার জন্যে নিয়ে আসছেন। আরো লিখেছেন, মামীমা যেন কিছুমাত্র চিন্তা না করেন,—তার ছেলে খোকা এই বাড়িতেই মানুষ হয়ে উঠ্বে— !

—আমি কি ভাবছি জানো ছোটবৌ? শঙ্কিত মনে ছোটবৌ জিজ্ঞেস করল,—কি? ছোটবাবু বললে, মামীমার যদি সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটে,—তাহলে আমি মায়ের কাছে মুখ দেখাবো কি করে? কি সান্ত্বনা আমি তাঁকে দেবো?

ছোটবৌ বললে, না-না, ওকথা মনের কোনেও স্থান দিওনা। আমাদের অনেক ত্রুটি হয়েছে সত্যি—কিন্তু দেখো, কব্‌রেজমশায়ের ওষুধ খেয়ে মামীমা একেবারে ভালো হয়ে যাবেন। তখন আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—

কিন্তু আমার মন বলছে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে। একই বাড়িতে থেকে আমরা ভালো করে আশে-পাশে তাকাই নি। আলোর নীচেই অন্ধকার—এই কথাই লোকে বলে থাকে। অনেক কিছু মূল্য দিয়েআমরা বুঝি সেই কথা জানতে পারছি। কী লজ্জা! আপন মনে ছোটবাবু কথাগুলো বললেন। তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন, তবু আমি একথা অসঙ্কোচে কইবো—এই ব্যাপারে আমাদের ব্যাটা ছেলেদের চাইতে—তোমাদের মানে, মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তোমরা কিছুতেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না। ভেবে দেখ, একজন নিরাশ্রয়া নিকট আত্মীয়া তোমাদের বাড়িতে এলেন মাথা গোঁজবার জন্য, আর তোমরা নিতান্ত অনাদরে আর অবহেলায় তাঁর জীবন দীপ নিভিয়ে দিলে! এই কথা শুনে ছোটবৌ শিউরে উঠল। বললে, অমন করে তুমি কথা বোলো না, সত্যি আমার ভয় করছে।

ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশের ঘরগুলিতে শুয়ে পড়ল।

বয়স্ক যাঁরা বাড়িতে ছিলেন—তারাও কোনো মতে রাতের আহার শেষ করে নীরবে এসে রোগিণীর ঘরের মেঝেতে বসলেন।

ছোটবৌ বললে, তোমরা সবাই সারাদিন কেবল ছুটোছুটিতে কাটিয়েছ। প্রথম রাত্তিরে তোমরা সব ঘুমিয়ে পড়ো,—আমি আর লক্ষ্মী জাগ্‌ছি। তারপর যখন যেমন দরকার পড়ে তোমাদের ঘুম থেকে তুলে দেবো। খোকা, তোর ওপর দিয়ে আজ অনেক দৌরাত্ম্য গেছে, তুইও শুয়ে পড়। শেষ রাত্তিরে আমি তোকে ডেকে দেবে।

খোকার দেহ-মনের ওপর দিয়ে আজ যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সে আর কিছুতেই বসে থাকৃতে পারছে না! মায়ের খাটের তলায় মেঝেতে সে তার শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিল। ছোটবৌ আর লক্ষ্মী নীরবে খাটের ওপর গিয়ে বসল।

যত রাত বাড়তে লাগলো—রোগিনীর অস্বস্তি যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কবরেজমশাই ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন কিনা ওরা জানে না। কিন্তু রোগিনীর চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নেই। মাথাটা শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। কখনো তিনি বিছানার চাদর খামচে ধরছেন। আবার কখনো হাতের তালুটা চোখের সামনে মেলে ধরে কি দেখবার চেষ্টা করছেন।

লক্ষ্মী বললে, কাকিমা, এখন বোধহয় দিদিমাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। ছোটবৌ বললে, তুই ঠিক বলেছিস। দু'জনে বেশ যত্ন করে ওষুধ খাইয়ে দিলে।

মধ্যরাত্রে ছোটবাবু সজাগ প্রহরী হয়ে রোগিণীর পাশে বসে রইল। তখন রোগিণীর দু'চোখ বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে! অসহ্য আবেগে রোগিণী থর্ থর্ করে কাঁপছেন। যেন কিছু বলতে চাইছেন,—ঠোঁটটা একটু একটু নড়ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না।

আর একবার ওষুধ খাওয়াবার সময় হতে ছোটবাবু মামীমাকে যত্ন করে ওষুধটি খাইয়ে দিলেন।

এর মধ্যে খোকা ঘুম থেকে উঠে বসেছে। ছোড়দা বললেন, খোকা, তুই একটু বোস,—আমায় একটু বাথরুমে যেতে হবে। দরকার পড়লে তোর ছোট বৌদিকে ডাকিস। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি চলে আসছি—

খোকা এসে মায়ের গা ঘেঁসে বসল। কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। মা চোখ বড় বড় করে খোকাকে শুধু দেখছেন। তারপর ফিস্ ফিস্ করে কইলেন। খোকা, চুপ, কথা বলবি নি। দেখতে পাচ্ছিস নে—তোর বাবা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। আর ত' আমি এখানে থাকতে পারবো না।

খোকা একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার অন্ধকার দেয়ালের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। কোণের মাটির প্রদীপটি মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। মা খোকার হাতটা চেপে ধরে বললেন, খোকা, আমি চললাম—কিন্তু তোকে এবার মানুষ হতে হবে—

বাইরের জান্‌লা দিয়ে একটা দমকা হাওয়া এসে কোণের ক্ষীণ মাটির প্রদীপটিকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে।

———

শশী-শ্যামলের সাঁকো

॥ এক ॥

পাড়াগাঁয়ের হাটে-বাজারে হঠাৎ একটা গোলমাল সুরু হলে সচরাচর যা ঘটে থাকে!

জলবিছুটি গাঁয়ের বাজারে সেদিন সকালের দিকে একটা কোলাহল আর চিৎকার সুরু হতে সবাই তৎপর হয়ে ওঠে, কেউ কোমরে কাপড় জড়ায়, কেউ বা কাঁধের গামছা মাথায় ভালো করে বেঁধে নেয়।

—খুড়ো, আমার ঝাঁকাটা ধরো ত' একটু, এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি—!

—ও করিম চাচা, আমার দুধের হাঁড়িটা রইল তোমার কদুর ঝাঁকার পাশে, একটা হাটুরে-কীল দিয়ে হাতের সুখটা করে আসি—

নফর কুণ্ডু গরম জিলিপি কিনে খাচ্ছিল। এদিকে তপ্ত জিলিপি জিব পুড়িয়ে দিচ্ছে—ওদিকে ভিড়ের ভিতর ঢুকে কিল ঘুঁষি চালানোর আকর্ষণও বড় কম নয়। হঠাৎ বলে বসল, রইল তোমার জিলিপির ঠোঙা...ঝগড়া বিবাদ ত' বেশীক্ষণ থাকবে না...বিশেষ করে হাটে-বাজারে। আগে ডান হাতের সুখটা করে আসি তারপর তোমার দাওয়ায় বসে আমেজ করে জিলিপি চিবুনো যাবে।

দোকানি চিৎকার করে ওঠে, ও কুণ্ডুমশাই আগে দাম দিয়ে যান—

কার কথা কে শোনে!

কুণ্ডুমশাই তখন মালকোঁচা আঁটতে আঁটতে ভীড়ের মধ্যে একেবারে মিশে গিয়েছেন!

দোকানি খানিকক্ষণ জিলিপির ঠোঙার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইল, তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে হুঁ। জলবিছুটি গাঁয়ের লোক কিনা! কীল-ঘুঁষি পেলে আর কিছু চায়না! আমার এমন গরম জিলিপি! তাই ফেলে কিনা কিলোকিলি! আস্‌বে ফিরে নাক ভেঙে আর কপাল ফাটিয়ে! বদ-রসিক লোক আর কাকে বলে!

দোকানি আপন মনে খুন্তি নাড়তে থাকে।

পল্লী অঞ্চলে সামিয়ানার বহর দেখে যেমন লোকে নেমন্তন্নের ওজন মাপ করতে বসে তেমনি কোলাহল আর চীৎকারের নমুনা দেখে অনুমান করে কিভাবে কীল-ঘুঁষিটা জমে উঠ্‌বে!

ঠিক এইভাবেই গোলমাল শুনে ছুটে এলো হরিদাস মাঝি, গোবিন্দ হালুইকর, গণেশ নাপিত, কদম কলু, ত্রৈলোক্য তিলি, বিষ্টু গোয়ালা এমনি আরো অনেকে।

কিন্তু ভীড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে তারা যা দেখতে পেলো তাতে সবাইকার উৎসাহ একেবারে জল হয়ে গেলো!

হাটুরে-কীল চালাবার ব্যাপার মোটেই নয়! যতই কোমরে কাপড় জড়াও, কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে মাথায় বাঁধো আর ঝাঁকা রেখে তৈরী হয়ে এসো···ওখানে কারো ট্যাঁ-ফোঁ চল্‌বে না!

নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

আসলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে—পূবপাড়ার চৌধুরীদের ছেলে চন্দনের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ির ফাল্গুনের।

দুটি পাড়া নিয়ে এই জলবিছুটি গাঁ!

পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়া!

মাঝখান দিয়ে একটি খাল বরাবর চিরে দিয়েছে গ্রামটিকে। তারপর আরো খানিকদূর গিয়ে উত্তর অঞ্চলে খালটি দেখতে ইংরাজী অক্ষর Y-এর মতো।

পূবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার জমি কোথাও মিশ খায়নি! মাঝখানের খাল সবসময় ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই পূবপাড়ার লোক যদি পশ্চিমপাড়ায় আসতে চায় তো নৌকা ছাড়া কোনো গতিই নেই। আবার পশ্চিমপাড়ার ছেলেরা পূবপাড়ায় যদি খেল্‌তে আসে তবে ওই খেয়ারই শরণ নিতে হবে। ওপর দিকে খালটি যেখানে Y-এর মাথার মতো ত্রিভুজ আকার ধরেছে সেইখানে বসে রোজকার হাটবাজার। কাজেই পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ায় সবাইকেই ঘাটের নৌকা নিয়ে এসে সওদা করে যেতে হয়। দুটি পাড়ার লোক ছোঁয়োছুঁয়ি সত্যি সইতে পারে না। কাজেই এ-পাড়ার লোকের সঙ্গে ও-পাড়ার মানুষের খট্‌খটি প্রায়ই লেগে থাকে।

জলবিছুটি নাম সেই থেকেই হয়েছে কিনা কে জানে! যে গোলমালটা সুরু হয় ছেলেদের ভেতর দিয়ে, সেটা আস্তে আস্তে সংক্রামিত হয় বড়দের মধ্যে, এইভাবে দুটি পাড়ার বুড়োরাও হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে আড়ালে আব্‌ডালে দুই দলকে পরামর্শ জোগাতে থাকে। ফলে ঝগড়াটাও জমে ভালো,—জলবিছুটির চুল্‌কুনি সারা গাঁয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু আজকের ঝগড়াটা এমন নয় যে, হাটুরে লোকরা চট্‌ করে কিলো-কিলি সুরু করতে পারে।

পূবপাড়ার জমিদার হচ্ছেন—চৌধুরীরা। আর পশ্চিম পাড়ার জমিদার বংশ গাঙ্গুলীরা। সামনা-সামনি এঁদের মধ্যে বেশ ভাব আছে। একবাড়ি থেকে নেমন্তন্ন

হলে অন্য বাড়ির লোকেরা গিয়ে মহানন্দে পাতা পেতে খেয়ে আসে। কিন্তু ভেতর-কার কথা হচ্ছে কেউ কারো নাম সইতে পারে না!

পারবেই যদি তবে জল-বিছুটি নামের সার্থকতা কোথায়?

সাম্‌না-সাম্‌নি এই দুই পরিবারের মধ্যে কখনো ঝগড়া-বিবাদ কিম্বা কথা কাটা-কাটি হয়নি।

আজ সকাল বেলা এই গ্রামটির ওপর কোন্ গ্রহের পূর্ণদৃষ্টি পড়েছিল তা' গ্রহচার্য্যরা ঠিকুজী-কুষ্ঠি মিলিয়ে তার যথার্থ ফলাফল ঘোষণা করতে পারবেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যা' ঘটেছিল—তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই ঃ

পূবপাড়ার চৌধুরী বংশের ছেলে চন্দন গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এবার শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে এসেছে। শহরের ছেলেদের কাছে নিজের জমিদারী আর ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি গোপন বাসনা যে তার মধ্যে লুকিয়ে নেই কে হল্‌ফ করে বল্‌তে পারে? তাই আজ সকাল বেলা বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে ঘাটের পান্‌সী নৌকায় চেপে এসেছে বাজারে। উদ্দেশ্য একটি প্রকাণ্ড মাছ কিনে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে। কলকাতার ছেলে ত'! কত বড় মাছই এরা দেখেছে? যা-ও বা দেখেছে অধিকাংশ বরফ দেওয়া শক্ত মাছ। আর জলবিছুটি গাঁ হচ্ছে খালবিলের দেশের মাঝখানে। যত খুশী মাছ খাও—মাছ মারো আর বিলোও। লোকে বলে, অরুচি হয়ে যায় মাছে। তাই মাঝে মাঝে নিম-বেগুন খেয়ে মুখের স্বাদ বদলে নিতে হয়।

বাজারে আজ প্রকাণ্ড একটি চিতোল মাছ উঠেছে—তাকিয়ে দেখবার মতো। মাঝিরা বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে মাছটিকে।

ওদিকে পশ্চিমপাড়ার জমিদার গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে ফাল্গুন তার জামাইবাবুকে নিয়ে গাঁয়ের বাজার দেখ্‌তে এসেছে। চিতোল মাছটি দেখে তার ভারী পছন্দ হয়েছে। জামাইবাবুকে যদি এতবড় চিতোল মাছের পেটি না খাওয়াতে পারল তবে গাঙ্গুলী বাড়ির মান থাকে কি করে?

ফাল্গুন বললে, মাছটা আমার নৌকায় তুলে দাও মাঝির পো, দর যা' হয় গাঙ্গুলী বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসো—

চন্দন বললে, এটা কেমন কথা? আমার বন্ধুরা পছন্দ করেছে চিতোল মাছটিকে। কাজেই আমাদের কেনা হয়ে গেছে। ও চিতোল মাছ উঠ্‌বে আমাদের পান্‌সীতে—

এখন সমূহ বিপদে পড়ল গোবর্দ্ধন মাঝি। সে দুই জমিদারেরই প্রজা। তার ভিটেবাড়ি পড়েছে পূবপাড়ার চৌধুরীদের জমিতে, আর ধানী-জমি রয়েছে পশ্চিম-পাড়ার গাঙ্গুলীদের আওতায়। কাজেই সে চৌধুরী বাড়ির চন্দনকেও চটাতে পারে না, আবার গাঙ্গুলী বাড়ির ফাল্গুনকেও ফিরিয়ে দিতে পারে না!

তার অবস্থা হল অনেকটা জলে-কুমীর আর ডাঙ্গায়-বাঘের মতো !

কি করবে সে ?

রামে মারলেও মারবে—রাবণে মারলেও মারবে। কাজেই বোবার শত্রু নেই এই সোজা কথা স্মরণ করে সে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বোকার মতো একবার চন্দনের দিকে আর একবার ফাল্গুনের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগ্‌লো। যারা কোলাহল শুনে হাটুরে কীল দিয়ে হাতের সুখ করতে ছুটে এসেছিল তাদের মুখেও কে যেন বোবা-কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল !

একদিকে চৌধুরী বাড়ি···

আর একদিকে-গাঙ্গুলী বাড়ি

এদের চটানোতে বিপদ আছে।

লোকে কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ! কাজেই অতি উৎসাহে কোমর বেঁধে এসে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা আর এক পা-ও এগুতে সাহস পেলেনা, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলেদের রকম-সকম দেখতে লাগ্‌লো !

ওরা একে জমিদার তায় আবার লেখাপড়া জানে ! কাজেই হাটুরে লোকের মতো ত' চট্ করে মারামারি সুরু করতে পারে না···কিছুটা কথা কাটাকাটি চল্‌তে পারে বরং।

কথাও বলে ওরা ওজন করে।

কি যে বলে তা-ও ভালো করে বোঝা যায় না !

হাটে-বাজারে কি কথার দাম আছে ?

কীল-চড়টা পড়লে বোঝা যায় যে, হ্যাঁ একটা কিছু হল।

কিন্তু চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির বচসাতে তার কিছুটাই ঘটল না।

চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা দলে ভারী আর তাদের সঙ্গে রয়েছে বরকন্দাজ। শেষ পর্যন্ত তারাই উৎসাহের আতিশয্যে চিতোল মাছটিকে পান্‌সীতে নিয়ে চাপালো।

গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের যেন তার জামাইবাবুর সাম্‌নে একেবারে মাথা কাটা গেল ! কিন্তু কি করতে পারে সে ?

ওর জামাইবাবুই ওকে এই অপমানের হাত থেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে দিলে। বললে চলো, চলো, আর চিতোল মাছের পেটি খেতে হবে না, তোমার দিদির ট্রাঙ্কে চমৎকার 'জেলি' আছে—টক্-টক্-মিষ্টি-মিষ্টি, তাই চাখ্‌বে চলো—

জামাইবাবুই ওকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চললো ঘাটের নৌকোর দিকে !

কিন্তু গোবর্দ্ধন মাঝি একবার আড়চোখে তাকাতেই বুঝ্‌তে পারলে, ফাল্গুনের মুখ

লজ্জায় আর অপমানে একেবারে লাল হয়ে উঠেছে ! বাজারের আম-কাঁঠাল পাকা গরম আর চড়ারদ্দুর সেই লালমুখে যেন সংসো জলবিছুটি লাগিয়ে দিলে !

এ গাঁয়ের নাম 'জল-বিছুটি' কে দিয়েছিল কে জানে ! কিন্তু যেই দিক—ভবিষ্যৎটা সে দর্পণের মতোই দেখ্‌তে পেয়েছিল নিশ্চয়ই।

ফাল্গুন গাঙ্গুলীবাড়ি ফিরে আস্‌তে তার মুখের সব কথা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সদর থেকে অন্দরে, অন্দর থেকে দাসদাসী, আমলা-কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ।

এ অপমান যেন শুধু গাঙ্গুলী বাড়ির নয়। নায়েব-গোমস্তা থেকে সবাইকার।

নায়েব এসে কর্তার কাছে জান্‌তে চাইলে, পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে খাল থেকে মাছ ছিনিয়ে আনবে কিনা ! এখনও হয়ত চৌধুরীদের পান্‌সী ঘাটে গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি !

গাঙ্গুলীবাড়ির কর্তা কাছারীতে বসে গুড়ুক-গুড়ুক তামাক টান্‌ছিলেন। গাঙ্গুলী-মশাই পাকা বিষয়ী লোক। মৃদু হেসে বললেন, পাগল হয়েছ নায়েব ! ইস্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-ছোক্‌রাদের মতো কি আমি বিবাদ করতে যাবো ? তাহলে গাঙ্গুলীবাড়ির মান-মর্য্যাদা থাকে কি করে ?

নায়েব একবার হাতটা কচ্‌লে নিয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু জামাইবাবুর সামনে আমাদের এই অপমানটা ? এটা কি আমরা একেবারে হজম করে যাবো ? টু শব্দটি করবো না ? চৌধুরী বাড়ির সবাই যে তাতে হাসাহাসি করবে কর্তা ?

নায়েব সত্যি তখন রাগে কাঁপছিল।

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে গাঙ্গুলীমশাই বললেন, আরে, তুমি যে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়লে নায়েব ! জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে হলে আগে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয়। বোসো-বোসো—। অত রাগ্‌লে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় না ? আমি তোমায় পন্থা বাত্‌লে দিচ্ছি।

একটা মোড়া টেনে নায়েব বস্‌ল। কিন্ত উত্তেজনায় চোখের চশমা কপালে তুলে ফেললে।

গাঙ্গুলীমশাই এমন নিশ্চিন্ত মনে তামাক টান্‌তে লাগলেন যেন কিছুই ঘটেনি !

নায়েবের কাঁচা-পাকা গোঁফ উত্তেজনায় তখনো কাঁপছে। তবু প্রভুভক্ত কর্ম-চারীর মতো কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

গাঙ্গুলীমশাই আরো খানিকটা ধোঁয়া উর্দ্ধদিকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, শোন নায়েব, চৌধুরীবাড়ির একটা অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান আছে না ? দিন সাতেক পর ?

মুখখানা কাচুমাচু করে নায়েব জবাব দিলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু বুঝতে পারলেনা যে, আজকের এই মাছের হার-জিতের সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাসনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!

গাঙ্গুলীমশাই শুধোলেন, আমরাও ত' নেমন্তন্ন পেয়েছি এই অনুষ্ঠানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ জবাব আসে নায়েবের পক্ষ থেকে। গাঙ্গুলীমশাই নায়েবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, এই নিমন্ত্রণ আমরা রক্ষা করবো।

নায়েব যেন হক্‌-চকিয়ে যায়!

গাঙ্গুলী মশায়ের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এতবড় একটা অপমানের পর উনি যাবেন চৌধুরীবাড়ি—নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে!

কিন্তু পাকা জমিদারী চাল অনেক সময় নায়েবেরাও ঠিক মতো বুঝতে পারে না!

তাই অবাক হয়ে কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকে হতবুদ্ধি নায়েব।

তামাক টান্‌তে টান্‌তে গাঙ্গুলীমশাই শুধোন, আরে ওই যে বিষ্টু গোয়ালা। যে খাসা দৈ তৈরী করতে ওস্তাদ—সে ব্যাটা আমাদের প্রজা না?

নায়েব উত্তর করে, আজ্ঞে, আমাদেরই প্রজা ত! কিন্তু অগাধ জলে পড়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

চিতোল মাছ থেকে একেবারে খাসা দৈ?

কর্তা কোন নদীতে বুদ্ধির-নৌকো টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?

কর্তা কিন্তু নির্বিকার। বললেন, আজ সন্ধ্যের পর নিরিবিলি বিষ্টু গোয়ালাকে ডেকে পাঠাও—

নায়েব জবাব দেয়, যে আজ্ঞে!

জমিদার বাড়ি থেকে খবর যাওয়া মানে—গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা!

সন্ধ্যের পর গাঙ্গুলীমশাই দাবা খেলতে যাবেন—এমন সময় বিষ্টু গোয়ালা জোড়হাতে এসে হাজির হল।

কর্তা শুধোলেন, কি ঘোষের পো, চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশনে খাসা দৈয়ের বায়না পেয়েছ ত'?

বিষ্টু গোয়ালা ঘাড় কাত করে জবাব দেয়, তা হুজুর পেয়েছি।

কর্তা বললেন দেখ, দুটি দৈয়ের ভাঁড়ের ওপর দিকে থাকবে—ভালো খাসা দৈ, আর নীচে থাক্‌বে কাদা গোলা—বিষ্টু গোয়ালা আঁৎকে উঠে বললে, আজ্ঞে কর্তা— ?

গাঙ্গুলীমশাই চোখ পাকিয়ে জবাব দেন, হ্যাঁ, আমার হুকুম। আর শোনো, এই ভাঁড় দুটিতে খড়ির দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা থাক্‌বে। আচ্ছা বেশী কথা আমি পছন্দ করিনে। এখন এসো—

বিষ্টু গোয়ালা প্রণাম করে পালিয়ে বাঁচে।

কর্তা তখন নায়েবকে কাছে ডেকে বললেন, তোমরা বল্‌ছ গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনকে ওরা অপমান করেছে। এই তো' কথা? চৌধুরীবাড়ির সামাজিক নেমন্তন্নে যখন গাঁয়ের মোড়লরা খেতে বস্‌বেন তখন ওই চিহ্নিত হাঁড়ি থেকে ফাল্গুন পরিবেশন করবে খাসা দৈ গ্রামস্থ মাতব্বরদের—ওই কাদা গোলা দৈ···বুঝ্‌লে?

নায়েব উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি। গ্রামস্থ গণ্যমান্য মোড়লদের কাছে চৌধুরীবাড়ির মান একেবারে ধূলোয় মিশে যাবে! আপনার হুকুম মাথা পেতে নিলাম। চিহ্নিত হাঁড়ির দিকে চোখ থাকবে আমার।

গাঙ্গুলীমশাই আবার ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ এ-বাড়ীর ছেলে ও-বাড়ির ব্যাপারে আগু বাড়িয়ে পরিবেশন করবে এত' গাঁয়ের চিরকালের প্রথা। কেউ সন্দেহ করবে না।

গাঙ্গুলীমশায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।···

নায়েব এগিয়ে এসে কর্তার পায়ের ধূলো নিয়ে জিবে আর মাথায় স্পর্শ করে।

দুটি পাড়ার মাঝখানের খাল আরো যেন চওড়া হল নায়েবের চোখে।

॥ দুই ॥

পূবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশন উৎসবে পশ্চিম পাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েব মশাই যে কৌশলের-জাল পেতেছিলেন, তাকে খুব বড়ো রকম একটা যুদ্ধ-জয়ের পরিকল্পনা বলা চলে।

গ্রামস্থ ইতর-ভদ্র সেই উৎসবে পাত্‌ পেতেছে। সেখানে চৌধুরীবাড়ির সম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলে বাড়ির কর্তার মাথা একেবারে ধূলোয় লুটিয়ে পড়বে।

এ গ্রামের চিরকালের প্রথা যে, এক বাড়িতে বিয়ে' শ্রাদ্ধ কিম্বা কোনো যজ্ঞি ব্যাপার হলে অন্য বাড়ীর ছেলেরা এগিয়ে এসে কোমরে গামছা জড়িয়ে পরিবেশনের কাজে লেগে যায়। সেই হিসেবে পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা পশ্চিম পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠানে এগিয়ে আসে; আবার গাঙ্গুলীবাড়ির ক্রিয়া-কাণ্ডে চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা নিজের কাঁধে দায়িত্বের বোঝা তুলে নেয়।

এবার চৌধুরীবাড়ির অন্নপ্রাশনে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। গাঁয়ের অন্যান্য বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনও এগিয়ে এলো। এ ব্যাপারে চৌধুরীবাড়ির সবাই খুশীই হল। সন্দেহ করবার কি ই বা এতে থাকতে পারে?

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েবের কৌশল-জাল ছিল একেবারে নিখুঁত।

গ্রামস্থ মাতব্বরদের পাতে যখন চৌধুরীবাড়ির দেয়ের ভাঁড় থেকে কাদাগোলা পরিবেশিত হল, তখন একদল লোক একেবারে ছি-ছি করে উঠলেন।

চৌধুরীবাড়ির দাম্ভিকতা গাঁয়ের লোকের অজানা নয়। সেইজন্যে একদল লোক সব সময় ওৎ পেতে বসে থাকে কি ভাবে এই বাড়ির খুঁত খুঁজে বের করা যায়।

এমনিতেই ত, গ্রামদেশে তিলকে তাল করে ঘোঁট পাকানো হয়ে থাকে! তারপর সত্যি যখন ত্রুটি চোখে পড়ে তখন একদল যেমন উল্লাসে মেতে নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, তেমনি আর একদলের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তারা তখন চুপ করে বসে থাকে না ; বিরুদ্ধ পক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য নতুন ফন্দী আঁটতে থাকে।

চৌধুরীবাড়ির এই অপমানে গাঁয়ের অনেক মাতব্বরই বেশী খুশী হল। গাঙ্গুলী-বাড়ির ফাল্গুন—মাছের ব্যাপারে যে অপমান হজম করে রেখেছিল—অন্নপ্রাশনের উৎসবে তার প্রতিশোধ নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে ফিরে এলো!

চৌধুরীবাড়ির লোকেদের কীল খেয়ে কীল-হজম করে থাকতে হল। নিজেদের বাড়িতে সবাইকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন! সেখানে তো আর কারো সঙ্গে অভদ্রতা করা চলে না। তাহলে আর কেলেঙ্কারীর অবধি থাকবে না। সারা গাঁয়ে একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যাবে।

চূড়ান্ত অপমানের পর চৌধুরীমশাই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তারপর খাওয়া-দাওয়ার অন্তে যে ভাবে গাঙ্গুলীবাড়ির নায়েব তাঁর কাছে হাতজোড় করে অতিবেশী বিনয় দেখিয়ে বিদায় নিলে, তখন সব কিছু তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল!

চৌধুরীমশাই নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রিত পরের বাড়ির নায়েবকেও কিছু বল্‌তে পারেন না। যখন মনে মনে ইচ্ছে—লোকটার গলায় গামছা দিয়ে উপযুক্ত শাসন করবার, তখনও দাঁত বের করে হেসে মিষ্টি কথা বলে তাকে বিদায় দিতে হল! যে দাঁত দিয়ে খানিকক্ষণ আগে কাষ্ঠ-হাসি হেসে তিনি নায়েবকে বিদায় দিয়েছিলেন—পরমুহূর্তেই সেই দাঁত তিনি নিজের ঠোঁট কামড়েধরলেন। ঠোঁট দিয়ে খানিকটা রক্তও বেরুলো, কিন্তু সেদিকে চৌধুরীমশায়েরভ্রূক্ষেপমাত্রনেই। এমন করে গাঁশুদ্ধ লোকের সাম্‌নে ফন্দি-ফিকির করে অপমান করে গেল!

অন্দর থেকে দাসী এসে খবর দিলে, কর্তার খাবার ঠাঁই হয়েছে। চৌধুরীমশাই হুমকি দিয়ে উঠে বললেন, সব নিয়ে খালের জলে ফেলে দাও। আজ আমি কিছু দাঁতে কাট্‌বো না।

চৌধুরীমশায়ের রাগ যে কি রকম সাজ্ঘাতিক তা' বাড়িশুদ্ধ কারো অজানা নয়।

ভয়ে আর কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না। সবাইকার পেটে ক্ষিদে চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু কর্তা না খেলে তো কারো পক্ষে পাত পেতে বসা সম্ভব নয়।

চৌধুরীমশাই যে রকম গম্ভীর মুখ করে বাইরের ঘরে বসে আছেন—কার সাধ্যি যে সেদিকে এগোয়!

সারাটা বাড়ি একেবারে থম্‌থমে নিঝুম! বাড়ির গৃহিনী কর্তাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দাসী একবার ধমক্ খেয়েগেছে, কাজেই কেউ আর চৌধুরীমশায়ের সামনে এগিয়ে আস্‌তে রাজি নয়।

হঠাৎ চৌধুরীমশাই হুমকি দিয়ে উঠলেন, ওরে, কে আছিস?

হলধর পাইক সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। হলধর ভালোরকমই জানে যে, এইরকম একটা ঘটনার পর সকলের আগে তারই ডাক পড়বে। সেইজন্য সে একরকম তৈরী হয়েই ছিল। গামছাটাকে সে কোমরে জড়িয়ে একেবারে প্রস্তুত—কখন কর্তার হুমকি আসে!

কর্তা যেন লজ্জায় হলধরের কাছেও মাথা তুল্‌তে পারছিলেন না—এমনি তখন তাঁর মনের অবস্থা!

একটুখানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হলধর বললে, হুকুম করুন কর্তা—এইবার যেন চৌধুরীমশায়ের মুখে কথা ফুট্‌লো। বললেন বিষ্টু গোয়ালাকে গলায় গামছা দিয়ে ধরে নিয়ে আস্‌বি।

হলধর মাথা নুইয়ে বললে, যো হুকুম কর্তা। গ্রাম দেশেও একটা জরুরী কিম্বা সাঙ্ঘাতিক কাজ করার সময় জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের হিন্দিতে কথা বলে ফেলে!

তাতে নাকি কাজের গুরুত্বটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। লাঠি হাতে নিয়ে হলধর তক্ষুণি বেরিয়ে গেল। কর্তা তবু গুম্ হয়ে বসে রইলেন।

চৌধুরীমশায়ের খানসামা একটু বাদেই সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। তার মনে-মনে ইচ্ছে কর্তার খাওয়ার কথাটা আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু সে কিছু বল্‌বার আগেই কর্তা বললেন, তামাক দে গোবিন্দ—

গোবিন্দের কিন্তু এ সাহস নেই যে, তামাকটাকে ছেড়ে আবার খাওয়ার কথাটা পাড়ে! কাজেই সে পাঠশালার সুবোধ ছেলের মতো অম্বরী তামাক সাজতে বসে গেল!

কর্তা তামাক টান্‌ছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন। গোবিন্দ বোকার মতো একবার কর্তার মুখের দিকে, আর একবার কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতো লাগ্‌লো। বাড়ির গিন্নী যে তাকে এত কথা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—সব সে বেমালুম ভুলে গেল!

কথাটা কোন্ ভাবে ভণিতা করে আরম্ভ করা যায় এইটাই সে মনে মনে মক্স করতে চেষ্টা করছিল—এমন সময়ে হলধর হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। মাথাটা নুইয়ে বললেন, কর্তা, গাঙ্গুলী বাড়ির পাইকরা বিষ্টু গোয়ালার বাড়ী আগলে রেখেছে। ওটা তো আমাদের জমি নয়, তাই আপনার হুকুম নিতে এসেছি।

কথাটা শুনে চৌধুরীমশায়ের ভ্রূ কুঁচকে গেল। তিনি আর একবার অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে শুধু বললেন, হুঁ।

ঘটনাটা যে ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে সে কথা বাড়িশুদ্ধ কারো বুঝতে বাকী রইল না!

মীমাংসা না হলে কর্তা জলগ্রহণ করবেন না—এ তার ধনুকভাঙা-পণ! এই প্রতিজ্ঞা তার ভাঙতে পারে কে? এ তাকায় ওর মুখের দিকে—ও তাকায় তার মুখের দিকে।

এ ত' অঙ্ক কিম্বা জ্যামিতির একটা সমস্যা নয় যে, চট করে সমাধান হয়ে যাবে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চৌধুরীবাড়ির সম্মান।

ভীষণ একটা বজ্রপাতের পর—সারা আকাশ ও প্রকৃতি যেমন থম্‌থম্ করতে থাকে—চৌধুরীবাড়ির অবস্থাও হয়েছে ঠিক তেমনি।

হঠাৎ দেখা গেল যে, এক-পা ত্ব'পা করে চন্দন চৌধুরীমশায়ের বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত।

কর্তা তামাকটানা শেষ করে তখন তাকিয়ায় আধশোয়া অবস্থায় চোখ ত্বটি বন্ধ করে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে চৌধুরী বাড়ির হারাণো সম্মান খুঁজে আনবার জন্যে তিনি আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

চৌধুরীমশাইও চোখ মেলে তাকান না—আর চন্দনও কিছু বলতে সাহস পায় না।

একটা থম্‌থমে অসহ্য আবহাওয়া!

আচমকা চন্দনের একটা দম্‌কা কাশিতে কর্তার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

তিনি চিন্তা জড়ানো চোখ মেলে তাকালেন—চন্দনের দিকে। তারপর বললেন, কিছু বলতে চাও আমাকে?

চন্দন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি খেয়ে নিন্। বিষ্টু গোয়ালাকে আপনার সাম্‌নে হাজির করবার ভার আমি নিচ্ছি।

চৌধুরীমশাই হতাশায় এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন—এইবার উৎসাহে উঠে বস্‌লেন। শুধোলেন, তুমি ওকে আমার সামনে হাজির করবার দায়িত্ব নিচ্ছ? আমি একবার বিষ্টু গোয়ালাকে মুখোমুখি দেখতে চাই। এতবড় ওর বুকের পাটা যে, আমার বাড়ির কাজে সে দৈয়ের ভেতর কাদা গোলা দেয়?

চন্দন এইবার খোলামনে কথা বলবার সাহস পেলে; বললে আজ্ঞে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ রাত্রে আমি ওকে আপনার কাছারীতে এনে হাজির করবো। আপনি কিছু মুখে দিন। সারা বাড়ির লোক আপনার জন্যে উপোস করে বসে আছে। আপনি কিছু না খেলে ত' তারা কেউ ভাতে হাত দিতে পারে না।

চৌধুরীমশাই নিজের মনের জ্বালায় এ কথাটা একেবারে ভেবেই দেখেন নি। তাড়াতাড়ি উঠে হাঁক দিলেন,—ওরে গোবিন্দ, শীগ্‌গীরি আমার ঠাঁই করে দিতে বল্,—আর সবাইকে বল খেয়ে নিতে। বাড়িশুদ্ধ লোকের না খেয়ে থাকবার কোন মানে হয়?

চৌধুরী মশায়ের চটির শব্দ ধীরে ধীরে অন্দরমহলের পথে মিলিয়ে গেল!

সারাবাড়ির খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল।

সবাই ক্লান্ত।

তার ওপর মন মেজাজও কারো ভালো নেই। তাই যে যেখানে পারে গা এলিয়ে দিলে।

তখন হলধর পাইকের ঘরে বসল—চন্দন আর হলধরের গোপন পরামর্শ—সভা।

চন্দন বললে, দেখ হলধর খুড়ো, একটা কাজের ভার নিয়েছি। যে করেই হোক্—সে কাজ হাঁসিল করতে হবে।

হলধর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

হাতের লাঠিটায় হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দেয়, তুমি হুকুম দাও না দাদাবাবু! লাঠি হাতে থাক্‌লে আমি আর কিচ্ছু ভয় করি না। না হয় সঙ্গে আরও দু'-চারজনকে নেবো।

মৃদু হেসে চন্দন বললে, না হলধর খুড়ো। ওপথে গেলে বিশেষ সুবিধে হবে না। গাঙ্গুলী বাড়ির জমিতে বিষ্টু গোয়ালার ঘর। সেখানে গিয়ে লাঠি-বাজি করলে বে-আইনী হবে। এবার আমাদের কৌশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে।

ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে হলধর জবাব দিলে, কৌশল আমার মাথায় আসে না দাদাবাবু! আমি জানি এক কৌশল—সে হচ্ছে লাঠির খেল। হুকুম করো, কাচা মাথা কেটে নিয়ে আস্‌বো। তোমরা শহরে গিয়ে বইপত্তর পড়েছ'—কত কৌশল তোমাদের মগজে গিসগিস করছে।

চন্দন হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, সেই রকম একটা ভালো কৌশলের কথাই তো ভাব্‌ছি। কিন্তু মগজে পেরেক ঠুকেও কোনও বুদ্ধি আজ বেরুচ্ছে না!

নিজের ডান হাতের আঙুলগুলি চন্দন চিরুনীর মতো চুলের ভেতর ক্রমাগত চালাতে লাগলো।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে হওয়াতে সে উৎসাহিত হয়ে উঠে বস্‌লো। বললে,

আচ্ছা হলধর খুড়ো, আমার বেশ মনে আছে—বিষ্টু গোয়ালা যখন আমাদের বাড়ি এসে দৈয়ের বায়না নেয়—তখন কথায় কথায় একবার বলেছিল যে, ওর মেয়ে শীগ্‌গীরই শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর কাছে আসবে।

—তা হবে, আমি ত' জানিনে কিছু! হতাশভাবে জবাব দেয় হলধর পাইক।

এত মাথা খাটিয়ে যদি বিষ্টু গোয়ালার মত একটা নিরীহ প্রাণীকে ধরে আনতে হয়—তবে দাদাবাবু জমিদারী রক্ষা করবে কি করে—এই হ'ল হলধর পাইকের এক মস্তবড় ভাবনা।

ইতিমধ্যে কিন্তু চন্দনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে হলধরের দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে খুড়ো। কৌশল আমার মগজে এসে গেছে। এখন তাকে কাজে খাটিয়ে ভালো করে খেলিয়ে তুলতে হবে তোমাকে।

হলধর বোকার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে খানিকটা চেয়ে রইল, তারপর শুধোলে, কি যে কৌশল সেটা খুলে না বললে আমি খেলিয়ে কি করবো?

—তাহলে শোনো হলধর খুড়ো; চন্দন বেশ করে মোড়ার ওপর গুছিয়ে বোসে তার কৌশলের কথা বলতে সুরু করে।

—প্রথমেই একটি বাচ্চা মেয়েকে জোগাড় করতে হবে—যে একেবারে চোখে-মুখে কথা কয়।

হলধর কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল চন্দনের এই রকম ভণিতা শুনে। তাই জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু বাচ্চা মেয়েকে দিয়ে ত' আর বিষ্টু গোয়ালাকে বেঁধে নিয়ে আসা যাবে না!

চন্দন মুচকি হেসে উত্তর করলে, তোমায় আমি আগেই বলেছি যে এখানে, বাঁধা-বাঁধির ব্যাপার থাকবে না। প্রথমে থাকবে প্রথম নম্বরের কৌশল। সেই কৌশলটা কি তাই তুমি আগে শুনে নাও দেখি। কথা কাটাকাটি কোরো পরে, আগে ফন্দীটা শোনো।

—বলো। হলধরের মুখে-চোখে কিন্তু হতাশা! চন্দন বললে, সেই যে ছোট্ট মেয়ে —যার মুখে চোখে কথা যে একটু বেশী রাত্তিরে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে বিষ্টু গোয়ালাকে খবর দেবে যে, তার মেয়ে গরুর গাড়ী করে আস্‌ছিল—পথের মাঝখানে সেই গাড়ী একটা গর্তে পড়ে ভেঙে গেছে। বিষ্টু গোয়ালার মেয়েরও খুব চোট লেগেছে। সে পথে বসে কান্নাকাটি করছে।

এই খবর শুনে কোন্ বাপ চুপ করে থাকতে পারে শুনি?

হলধর পাইক শুধোলে, কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির সেই পাইকের দল? তারা যদি এগিয়ে আসে? যদি বলে, কোথায় মেয়ে পড়ে আছে—আমরা গিয়ে দেখি—

আরে শোনই না—বাধা দিয়ে বলে চন্দন। পাইকরা যদি এগিয়ে দেখতে যায়

তাতে ত' আমাদেরই লাভ। তখন কি করতে হবে—আমি তোমায় সব জানিয়ে দেব। এই বলে চন্দন হলধর পাইকের কানে কানে কি যেন বললে।

হলধর বললে, হ্যাঁ বুদ্ধিটা অবশ্য মন্দ নয়। তবে শেষ রক্ষা হলে হয়। ছোট মেয়ের জন্যে তুমি ভেবো না দাদাবাবু। আমার এক ভাইঝি আছে। চোখে-মুখে যেন একেবারে খৈ ফোটে। তাকে আমি নিয়ে আসছি বাড়ি থেকে। তারপর তুমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

হলধর পাইক তার ভাইঝিকে আন্‌তে চলে গেল।

তখন বেশ রাত হয়েছে।

সারাটা গাঁ যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে।

হলধর আর চন্দন চুপিচুপি চৌধুরী বাড়ির খিড়কীর পুকুরের একটা ডিঙিতে গিয়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে রয়েছে হলধরের ভাইঝি ময়না।

ময়নাকে চন্দন কি যেন সব শিখিয়ে দিয়েছে। ওইটুকু মেয়ের কথাবার্তা শুনে চন্দন ভারী খুশী। হলধরকে ডেকে বললেন, খুড়ো, বড় হয়ে তোমাদের ময়না খুব ভালো 'প্লে' করতে পারবে।

হলধর চোখদুটো বড় করে বললে, কি বলছ দাদাবাবু, পিলে হবে? কাজ নেই আর অত সুখে!

হলধরের কথা বলবার ঢঙ্‌ দেখে চন্দন ত' হেসেই খুন!

ক্ষীণ আলোর ভেতর দিয়ে ওদের নৌকা এগিয়ে চলে।

জোনাকীর মিছিল বেরিয়েছে।—ঝোপঝাড় জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে—আর দূরে মাঝে মাঝে শেয়াল ডেকে উঠ্‌ছে কোন্ বনের অন্তরালে।

বিষ্ণুগোয়ালার বাড়ির পিছনে এক নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে ওরা নৌকো বাঁধলে। তারপর অন্ধকারের আড়ালে এগিয়ে গেল। গাঙ্গুলীদের বাড়ির দুটো পাইক বাইরের ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে আছে দেখা গেল। কেউ কেউ উঠোনে আনা-গোনা করছে। তখনো বোধ করি খাওয়া-দাওয়া চুকে যায় নি।

চন্দন আর হলধর একটা ঘন ঝাপ্‌ড়া গাছের নীচে দাঁড়ালো। তারপর ময়নাকে আর একবার কি সব শিখিয়ে অন্দরে পাঠিয়ে দিলে।

বলিহারি দিতে হয় বটে ময়নাকে—!

এমনভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা বল্‌লে যে, বিষ্টু গোয়ালা হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির বাইরে চলে এলো। বারান্দায় পাইক দুটো ঘুমুচ্ছিল তাদের পর্য্যন্ত ডেকে তুললে না।

চন্দন আর হলধর অন্ধকার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলে—আগে আগে আসছে ময়না—তার পেছনে ব্যস্তভাবে পা ফেলছে বিষ্টু গোয়ালা। হলধর নিজেকে প্রস্তুত

করে নিলে। ওরা কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হলধর পাইক গামছায় বিষ্টুর মুখ বেঁধে ফেললে তারপর অবলীলাক্রমে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে নৌকার ওপরে এনে ফেললে।

চন্দন আর ময়নাও সঙ্গে সঙ্গে এসে নৌকোর ওপর চড়ে বসেছে।

হলধর দড়ি দিয়ে বিষ্টুকে ভালো করে বেঁধে নিলে তারপর আঁধার পথে আবার নিঃশব্দে চৌধুরী বাড়ির ঘাটের দিকে নৌকো চালিয়ে দিলে।

॥ তিন ॥

শেষ রাত্তিরে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির কর্তা-মা বিছানা সবে ছেড়ে উঠে নিজে হাতে উঠোনে গোবরজলের ছড়া দিচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণের শত নাম আউড়ে যাচ্ছেন—এমনসময়ে একটি মেয়েছেলে তাঁর পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো!

কর্তা-মা ভয় পেয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আশী বছরের ওপর বয়স হয়েছে বটে কিন্তু একটি দাঁতও আজ অবধি পড়েনি! গাঙ্গুলী মশায়ের মা তিনি, তাই এবাড়ির সবাইকার কর্তা-মা।

শেষরাত্তিরে এক অলুক্ষুণে কাণ্ড। কোথাকার কোন মেয়েছেলে—সক্কালবেলা তাঁর গায়ের ওপড় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কি মতলব তার কে জানে! এত সকালে গাঙ্গুলী বাড়ির অন্দরে ঢুকে পড়বে এমন সাহস কার?

হাঁড়ির ভেতর যে গোবরজল ছিল আচমকা ধাক্কা লাগতে তা পড়ে গেছে…… হাঁড়িটা গেছে ভেঙে! এমন ত' কখনো ঘটে নি! আজ গাঙ্গুলীবাড়ির কি অকল্যাণ হবে কে জানে। মহাবিরক্ত হয়ে কর্তা-মা ডাকলেন—ওরে বামি, নবাব-নন্দিনী, আমি আশী বছরের বুড়ি কখন উঠেছি;—আর তোর ঘুম এখনো ভাঙ্গলো না? বামি কর্তা-মার খাস-দাসী।

ঘুম তার ভেঙেছিল অনেকক্ষণ।

তবু যতটা সময় বিছানায় পড়ে থাকা যায়। সারাটা দিন ত' ঘানি ঘোরাতেই হবে!

কর্তা-মার হাঁক শুনে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে শুধোলে কি বল্‌ছ কর্তা-মা?

—দেখ্‌না—সক্কালবেলা কোন অজাত-কুজাতের মেয়ে এসে আমার পায়ের ওপর পড়ল? কর্তা-মা চীৎকার করে বললেন।

বামি এগিয়ে এসে গালে একটা আঙুল রেখে বললে, ওমা এযে আমাদের বিষ্টু গোয়ালার বৌ! তা তুমি বাছা এত সকালে এসে কর্তা-মাকে ভয় খাইয়ে দিলে কেন ?

কর্তা-মা এইবার চটে উঠলেন !

—হুঁ ! ভয় আমি পাইনি ! সক্কালবেলা অন্ধকারে এসে ঘাড়ের ওপর পড়ল। তোরা ত' নাক ডাকিয়েই সারা !

বামি হাসি গোপন করে জবাব দিলে, না কর্তা-মা, নাক ডাকাবো কেন ? তোমার এক ডাকেই তো ছুটে এলাম। তারপর বিষ্টু গোয়ালার বৌয়ের দিকে তাকিয়ে শুধোলে, তা বাছা কি বল্‌বে বল না—কর্তা-মার কি দাঁড়াবার সময় আছে ?

বিষ্টুর বৌ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো।

কর্তা-মা চীৎকার করে উঠে বললেন, আ মর! সক্কালবেলা উঠোনে এসে মরা-কান্না সুরু করে দিলি! আজ একটা বিপদ-আপদ না হয়ে যাবে না দেখছি!

সত্যি, শেষ রাত্তিরে বিষ্টু ঘোষের বৌয়ের কান্নাটা একটু বেমক্কা রকমের আর বেয়াড়া ধরণের হয়ে গিয়েছিল।

গাঙ্গুলীবাড়ির অনেকেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেই কান্না শুনে।

সর্ব্বলের আগে ঘুম থেকে বেরিয়ে এলেন গাঙ্গুলীমশাই।

শুধোলেন, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে মা ?

কর্তা-মা জবাব দিলেন, কি জানি বাপু, কিছু বুঝতে পারছি নে। শেষ রাত্তিরে বিষ্টু গোয়ালার বৌ এসে মরা-কান্না সুরু করেছে।

এইবার গাঙ্গুলীমশাই কি যেন আশঙ্কা করলেন। বললেন, ওরে বামি, ভালো করে জিজ্ঞেস করনা কি হয়েছে ?

বিষ্টুর বৌ সাহস পেয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল, বললে, চৌধুরীবাড়ির পাইকেরা এসে গোয়ালাকে জোর করে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেছে।

বিষ্টুর বৌ একটু বানিয়েই বললে। কেননা তাতে কাজ হবে। রাগ না হলে কর্তাদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায় না—এ গাঁয়ের বৌ হয়ে সে কথা তার না-জানা নয়।

গাঙ্গুলীমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কেন ? আমার পাইকরা সব কি করছিল ?

ঘোমটা টেনে বিষ্টুর বৌ জবাব বিলে, তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল কর্তা—

গাঙ্গুলীমশাই গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি এর বিহিত করছি—

নিশ্চিন্ত মনে বিষ্টু গোয়ালার বৌ এইবার উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

বাম্নি কর্তা-মার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বললে, আচ্ছা কর্তা-মা, এই কথাটা ধীরে সুস্থে এসেও ত' বলা যেত। আমাকে ডেকেও খবরটা জানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মিছিমিছি তোমার গায়ের ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ার কি দরকার ছিল শুনি ?

বিষ্টু গোয়ালার বিপদের কথা শুনে কর্তা-মার মন একটু নরম হয়েছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না-না, গায়ের ওপর এসে পড়বে কেন ? আমার পায়ের ওপরই আছড়ে পড়েছিল। তুই তোর কাজে যা বাম্নি—; আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি—

অন্দরের আন্দোলন যখন বন্ধ হল—তখন সুরু হল বাইরের সলা পরামর্শ ! গাঙ্গুলীমশাই গোঁফটা চুমড়ে নিয়ে বললেন, আগে আমি পাইকদের বিচার করবো। গাঙ্গুলীবাড়ির নাম ডোবালে হতভাগারা !

তক্ষুনি একটা চাকর ছুটলো পাইকদের খবর দিয়ে নিয়ে আসতে। কার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা যে কর্তার এত্তেলা পেয়ে চুপচাপ্ বসে থাক্‌বে ?

চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে দুটো পাইক প্রণাম করে এসে সামনে দাঁড়ালো।

নায়েবমশাই কর্তার পাশে বসে রাগে কাঁপছিলেন। তিনি কি একটা জোরালো রকম হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন—এমন সময় ফাল্গুন এসে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল।

বললে, নায়েব কাকা, আপনার বিষ্টু গোয়ালার ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি ইতিমধ্যে সব খবরই সংগ্রহ করেছি। চৌধুরীবাড়ির চন্দনই বিষ্টুকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। হাটে ওরই সঙ্গে চিতোল মাছ নিয়ে আমার বিবাদ বেঁধেছিল। কাজেই ঝগড়াটা হচ্ছে চন্দনের আর ফাল্গুনের। আপনারা বুড়ো-মানুষেরা এর মধ্যে মাথা গলালে আপনাদের মর্যাদা ঠিক না-ও থাক্‌তে পারে। রেষারেষিটা ছেলে-ছোকরাদের মধ্যেই আট্‌কে থাকুক না। আমি কথা দিচ্ছি নায়েব কাকা, চৌধুরীবাড়িকে এমন জব্দ করবো যে, লজ্জায় আর গাঁয়ে ওরা মুখ তুলে কথা কইতে পারবে না !

গাঙ্গুলীমশাই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে ফাল্গুনের কথাগুলি শুন্‌লেন। তারপর মৃদু হেসে উত্তর করলেন, এ ত' ভালো কথাই হে নায়েব ! আমরা আর ক'দিন ! দুজনেই বুড়ো হয়ে পড়েছি। এখন পরকালের চিন্তা করাই ত' ভালো।

নায়েবের কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। প্যাঁচ কস্‌তে তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। তবু কর্তা যখন বল্‌লেন তখন ত' আর আপত্তি উত্থাপন করা চলে না !

মুখখানা ভারী করে শেষ পর্য্যন্ত ঘাড় কাত্ করতেই হল।

খুশী মনে ফাল্গুন বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

জল--বিছুটি গাঁয়ে একঘর পুরুত আছেন।

পালা পার্বণ, বিয়ে, চূড়ো,অন্নপ্রাশন আর সবকিছু সামজিকতায় তাঁদের ডাক পড়ে।

গাঁয়ের লোককে যদি কোনো সামাজিক ব্যাপারে নিমন্ত্রণ করতে হয় তবে বাড়ির লোকের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হয় না—এই পুরোহিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলে তবে তা সিদ্ধ হবে।

ফাল্গুনের মগজে ইতিমধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়ে গেছে।

কিন্তু কোনো কাজই উপযুক্ত পরামর্শ না করে করা ঠিক হবে না।

ফাল্গুনের একটা দল আছে। দুষ্টুবুদ্ধির আবাদ করতে তারা ভারী ওস্তাদ। তাদের সবাইকে ডেকে এনে একটা গোপন বৈঠক বসাবার জন্যে ফাল্গুন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেইজন্যে তার ছোক্‌রা চাকর বিষ্টুকে পাঠিয়ে দিলে—গোটা দলকে খবর দেবার জন্যে।

ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে কানাকানি, ফিস্‌ফিস্‌, চৌকি চাপড়ানো চললো, অবশেষে একথালা করে গাঙ্গুলীবাড়ীর খাবার খেয়ে সর্বসম্মতি ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই সোজা কিন্তু মজাদার।

ফাল্গুনের দলে আছে পুরোহিত বাড়ির একটি ছেলে। তাকে দিয়ে গ্রামস্থ লোককে নিমন্ত্রণ করা হবে, যেন আজ রাত্রেই একটি বিরাট ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির চৌধুরীমশাই। এই খবরটা চৌধুরী বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে একেবারে গোপন রাখা হবে। গ্রামস্থ লোক গিয়ে যখন দেখবে ভোজনের কোন আয়োজনই নেই, তখন চৌধুরীবাড়ীর লোকেরা সকলের কাছে কেমন অপদস্থ হবে। এই কথা মানসনেত্রে অবলোকন করে ফাল্গুনের বন্ধুর দল খুব হাসাহাসি করতে লাগলো।

পুরোহিত বাড়ির ছেলের নাম গণেশরাম চক্কোত্তি। সে ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু আমার জ্যাঠামশাই যখন জানতে পারবে যে, আমিই সারা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন করেছি—তখন কি আর পিঠের ছাল-চামড়া থাকবে ?

—পাগল হয়েছিস তুই! অভয় দেয় ফাল্গুন।—আমাদের বাড়িতে তোকে লুকিয়ে রাখবো। তোর জ্যাঠামশাই আর চৌধুরীবাড়ির লোকজন ত' ছার, গাঁয়ের কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না তুই কোথায় আছিস্‌! চাই কি—দরকার হলে—তোকে আমাদের কলকাতার বাসায় রাতারাতি পাঠিয়ে দেবো।

এই জাতীয় একটা কাণ্ড করার মধ্যে বেশ খানিকটা উন্মাদনা আছে। তাছাড়া বন্ধুদের কাছে বাহবাও কম পাওয়া যাবে না! সকলের ওপর ফাল্গুনের যেমন দিল-দরিয়া মেজাজ—শাল-দোশালা বক্‌সিস্‌ পাওয়ার সম্ভাবনা তো রইলোই!

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে গণেশরাম রাজী হয়ে গেল। বন্ধুরা সবাই পিঠ্‌ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললে, আরে, তোর ভাবনা কি রে? আমরা ত' সবাই পেছনে রইলামই! এইবার চৌধুরীবাড়িতে এমন একটা খেল দেখিয়ে দে' যা' ওরা জীবনে ভুলতে পারবে না!

গণেশরাম কাজে নেমে যেন নেশার ঝোঁকে উড়ে চলে।

একেবারে নারদের নেমন্তন্ন সুরু করে দিলে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বাচ্চা, কাচ্চা, আত্মীয় স্বজন এমন কি গাঁয়ের চাষাভুষো, হাঁড়ি, মুচি, ডোম সবাইকে জনে জনে বলে এলো চৌধুরীবাড়ির এই নেমন্তন্নের কথা। শুনে সবাই খুশী! ভালো-মন্দ ভোজ কে না খেতে চায়? চৌধুরীবাড়িতে তখন মেয়ে-জামাই আত্মীয় কুটুম্ব একেবারে গিস্‌গিস্‌ করছে! তাই সবাই ভাবলে চৌধুরী বুঝি সবাইকে নিয়ে আর একদিন আনন্দ করতে চান। ভগবান দুহাত তুলে দিয়েছেন—অভাব ত' নেই কিছুরই। গ্রামস্থ লোকের আবার পাত পড়বে এটা তো ভাগ্যের কথা।

কামার, কুমোর, জোলা, তাঁতি, ঘাটের মাঝি, ক্ষেতের কিষাণ সবাই মুখ চুলকোতে লাগ্‌লো। যাক্‌ আর একদিন ছেলেপুলেরা পেটপুরে খেতে পারবে। কিন্তু যাদের বাড়ি নেমন্তন্ন তারা এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না!

ঘুর্নির মতো গণেশরাম চর্কিপাক খেতে লাগলো। বগলে ছাতা নিয়ে সে এ বাড়ি থেকে ওবাড়ি—ও-বাড়ি থেকে সে বাড়ি লাটিমের মতো পাক্‌ খেয়ে বেড়াচ্ছে!

একবার গণেশরাম ভাবলে পাশের গ্রামগুলিতেও ঢু মেরে আসবে কিনা। তাহলে রগড়টা জমবে ভালো।

একটি বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা। চুপি চুপি তার মত জানতে সে লাফিয়ে উঠে বললে, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, নারদের নেমন্তন্ন করতে যখন বেরিয়েছিস্‌—তখন ভালো করেই জলটা ঘোলা করে নে না! তারপর গোলে হরিবোলে কে যে আসল দোষী আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব কানমাছি ভোঁ ভোঁ!

একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে খুব খানিকটা হেসে নিলে।

এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে করে যখন কথাটা চৌধুরী বাড়ির অন্দরে পৌঁছলো, তখন সাঁঝের ঘোর হতে আর বেশী দেরী নেই।—ওমা একী সর্বনেশে কাণ্ড! মানুষের সঙ্গে এমন শত্রুতাও লোকে করে! এই কথা বলে বাড়ীর গিন্নি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন।—এখন এতগুলি লোকের মুখে আমি কি দেবো? চৌধুরী বাড়ি এসে সব না খেয়ে ফিরে যাবে? এতে আমার ছেলেপুলের অকল্যাণ হবে না?

বাড়ির গিন্নি না হয় কাঁদতে পারেনা—কিন্তু চৌধুরীমশাইকে ত' বিচলিত হলে চল্‌বে না।

বাড়িশুদ্ধ মেয়ে-জামাই, আত্মীয় কুটুম্ব গিস্‌গিস্‌ করছে। তাদের সবাইকার কাছে চৌধুরীবাড়ির উঁচু মাথা এমন করে হেঁট করে দেবে গাঙ্গুলী বাড়ির ঐ সেদিন-কার পুঁচকে ছোকরা ফাল্গুন? জীবন থাকতে চৌধুরীমশাই তা সইতে পারবেন না।

চুপ করে খবরটা শুন্‌লেন তিনি! তারপর হো-হো করে আপন মনে হেসে উঠলেন।

সবাই ভাবলে হঠাৎ মনে ধাক্কা খেয়ে কর্তা পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

কিন্তু না, অতসহজে কাবু হবার লোক চৌধুরীমশাই নন। তিনি তক্ষুনি বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একে একে হুকুম দিতে লাগলেন। ভিটে বাড়ির প্রজা আছে কয়েক ঘর জেলে। তাদের কাছে হুকুম গেল, এক্ষুনি বড়ো পুকুরে জাল ফেলে কয়েক মন মাছ তুলতে হবে। গোটা কয়েক পাইক ছুট্‌লো আশেপাশে, এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে খাসী পাঁঠা যত দামে পাওয়া যায়—জোগাড় করে আনতেই হবে। আর একদল লোক ছুট্‌লো—গঞ্জে কয়েক মণ রসগোল্লা নৌকোয় করে নিয়ে আসতে হবে। ঘাটের নৌকো দাঁড় টেনে চলে যাবে—কতক্ষণ আর লাগবে? না হয় একটু বেশী রাত্তিরে খাওয়া হবে। কিন্তু ভোজ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেবেন চৌধুরী-মশাই। বাপের জন্মে এমন ভোজ কেউ খায়নি। দরকার হয় প্রতি পাতে পাতে মুড়ো দেবেন তিনি। চৌধুরীবাড়ির ইজ্জত সকলের ওপরে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল বিষ্টু গোয়ালার কথা। সে ত' চৌধুরী বাড়িতেই বসে আছে! চাকর দিয়ে খাসকামরায় বিষ্টুকে নিয়ে এলেন। বললেন দেখ বিষ্টু, তুমি যে বেইমানি আমার সঙ্গে করেছ তাতে তোমার মাথা আমি কেটে নিতে পারি। কিন্তু সব দোষ তোমার আমি মাফ করে দেব—যদি আজ রাত্তিরে সবাইকে খাসা দৈ খাইয়ে দিতে পারো। বিষ্টু চৌধুরীমশায়ের পা জড়িয়ে ধরে বললে, হুজুর মা-বাপ। কিন্তু এত শীগগীর তো দৈ জমবে না। তার চাইতে আমি সবাইকে খাসা ক্ষীর খাইয়ে দেব। একটা নৌকো দিয়ে আমায় ছেড়ে দিন। চৌধুরীমশাই একটা একশ টাকার নোট বিষ্টু গোয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এই তোমার আগাম বক্‌শিস্‌; পরে আরো পাবে। আগে আমার মুখরক্ষা করো—কিন্তু একটি কথা, আমার লোক সঙ্গে যাবে তোমার—

বিষ্টু গোয়ালাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দুজন পাইক একটা নৌকায় চলে রওনা হল।

গাঁয়ের খাল পেরিয়ে বিলের কাছে যেতে আর একটা নৌকা আড়াআড়ি ভাবে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়ালো। তারপর কয়েকটি লোক মুহূর্তের মধ্যে চৌধুরী নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে বিষ্টুকে পাঁজা-কোলে তুলে নিয়ে কিভাবে অদৃশ্য হয়ে

গেল সেটাকে ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। চৌধুরীবাড়ির পাইক দুটো চোখবুজে রাম-রাম চীৎকার করতে লাগলো।

ফাল্গুন বিষ্টু গোয়ালাকে দেখে ভারী খুশী। বললে, এখন তুই আমাদের বাড়ী থাকবি—তোর ভয়টা কিসের? বিষ্টু দাদাবাবুর পা-টা জড়িয়ে ধরে বললে, কিন্তু চৌধুরীমশাই যে আগাম একশ টাকা বকশিস্ দিয়েছেন, আমি যে একেবারে ধনে-প্রাণে মারা যাব দাদাবাবু।

ফাল্গুন হাসতে হাসতে উত্তর করলে, আরে বোকা ওটা তো তোর উপরিলাভ। আরো বকশিস্ পাবি আমার কাছে। এইবার রগড়টা জমবে আরও ভালো।

গণেশরাম শুধোলে, রগড়টা কি ভাই? মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে ফাল্গুন জবাব দিলে, সাইকেল নিয়ে আবার ছোট্ গণেশরাম। সবাইকে নতুন খবর দিতে হবে। বলবি চৌধুরীবাড়ির ভোজ আজ বন্ধ, কেননা গাঙ্গুলীবাড়ী যাত্রা হচ্ছে আজ। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—যাত্রা? আঁৎকে ওঠে গণেশরাম,—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ যাত্রা! হুঙ্কার দিয়ে উত্তর করে ফাল্গুন। তলে তলে আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। এতক্ষণে গাঙ্গুলীবাড়িতে সামিয়ানা খাটানো হয়ে গেল বোধহয়। তারপর চৌধুরীবাড়ি ওই খাসি, পাঁটা আর মাছ···সব খালের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে! একটা প্রাণীও যাতে না যেতে পারে সেজন্য রাস্তায় রাস্তায় লোক মোতায়েন করেছি আমি। ওদিকে যাত্রাদলের কনসার্টও বুঝি বেজে উঠল, হা-হা-হা! দেখি বুদ্ধির খেলায় কে বড়ো—চন্দন—না ফাল্গুন।

॥ চার ॥

গাঙ্গুলীবাড়িতে যাত্রার যে আসর বসেছে—তা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয় খানিকক্ষণ, এ রকম যাত্রার আসর এ অঞ্চলে কখনো সাজানো হয় নি।

ওপরে বিরাট চন্দ্রাতপ, যে বাঁশগুলো খাটিয়ে আসর তৈরী করা হয়েছে, সেগুলি আগাগোড়া দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো, ওপর থেকে দামী সব ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। এক একটা দিক—এক এক দলের জন্যে পৃথক করে সুন্দরভাবে পরিপাটি সাজানো হয়েছে। এক অংশে গাঁয়ের মোড়ল ও মাতব্বরের দল, একদিকে যুবক-সম্প্রদায়, সাধারণ-শ্রেণী অন্যদিকে। ইস্কুলের ছেলেদের জন্যে আলাদা অংশ ভাগ করে রাখা হয়েছে। মেয়েদের জায়গা চিক দিয়ে ঢাকা। প্রত্যেক অংশেই দুটো তিনটে

করে টানা পাখা এবং সেগুলি টানবার জন্য নিযুক্ত চাকরাণ রয়েছে। গাঙ্গুলীবাড়ীর ছোটছেলেরা গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছে সকলের গায়ে। মোটকথা এমন সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে যে—যে-কোনো পালা শুরু হোক না—অতি সহজেই জমে যাবে! দর্শকদল অনেককাল গাঁয়ে যাত্রা শুনতে পায় নি। তাই দীর্ঘকালের অনাহারী ভিক্ষুকের মতো দল বেঁধে সবাই এসে বসে গেছে।

নবজলধর চক্কোত্তির একটা নাম-ডাক আছে নেমন্তন্ন বাড়ীতে, শ্রাদ্ধে, বিয়েতে আর যে কোনো ফলারে। তার ওপর নবজলধর চক্কোত্তি ইচ্ছে করে উপোসী রয়েছেন, চৌধুরীবাড়ির নেমন্তন্নে একহাত দেখিয়ে দেবেন বলে।

সন্ধ্যে না লাগতেই তিনি গুটি-গুটি পা রওনা হয়েছেন—চৌধুরীবাড়ীর দিকে। মুখে তার শ্লোক ধ্বনিত হচ্ছে—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

কিন্তু মাঝপথে গাঙ্গুলীবাড়ির চর ওৎ পেতে বসে আছে সে খবর ত' তিনি আর রাখেন না!

আপনমনে গুন্ গুন করে গান গাইতে গাইতে তিনি এগিয়ে চলেছেন আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তুড়ি মেরে মনের আনন্দ প্রকাশ করছেন।

হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাড়ার একটি ডানপিটে ছেলে। আসলে সে ফাল্গুনের চ্যালা। তার নামটি হচ্ছে—ময়নাচাঁদ।

ময়নাচাঁদ এগিয়ে এসে বললে, এই যে চক্কোত্তিমশাই, আপনার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলাম।

কেন? কেন? চক্কোত্তিমশাই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তা বাবাজী আমার ত' এখন কোনো কথা শোনবার সময় নেই—যাচ্ছি—চৌধুরীবাড়ি, ভয়ানক জরুরী কাজ। স্বয়ং চৌধুরীমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

চৌধুরীবাড়ি, যে কী কাজ ময়নাচাঁদ তা ভালো করেই জানে। কিন্তু সে গুড়ে কি করে বালি দিতে হয় তাও শ্রীমানের অজানা নয়! মনে মনে সে একটু হাসলে। তারপর মুখখানা কাচু-মাচু করে জবাব দিলে, আজ্ঞে আমিও ত' চৌধুরীবাড়ি থেকে আসছি, একটু গোলমাল বেঁধেছে যে!

গোলমালের নামে চক্কোত্তিমশায়ের চোখ দুটি গোল গোল হয়ে উঠল। শুধোলেন আবার কু-গাইস্ু কেন বাবাজী? সেখানে একটা শুভকাজে যাচ্ছি—না-না, তুমি আমায় পিছু ডেকো না। আমার কাছে যদি তোমার কোন দরকার থাকে ত' কাল সকালে এসো—

ময়নাচাঁদ না-ছোড়বান্দা। সে কী আর অত সহজেই চক্রবর্তীকে পথ ছেড়ে

দেয় ? তাই সোজাসুজি বলেই ফেললে তাকে, চৌধুরীমশাই আজকের নেমন্তন্নের ব্যাপারটা বন্ধ রেখেছেন।

এই সংবাদ শুনে চক্কোত্তিমশায়ের মনে হল যেন এক চাপ ঠাণ্ডা বরফ কেউ তাঁর পিঠের ওপর চেপে ধরেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন তিনি।

ভাগ্যিস ময়নাচাঁদ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, তাই তার দুটো মুঠি ধরে ফেলে কোনোরকমে নবজলধর ঠাকুরকে দাঁড় করিয়ে দিলে।

ঠাকুরমশাই নিজে একটু সামলে নিয়ে বললেন, তুই একী ডাকাতে-কথা বলছিস রে ময়নাচাঁদ ? চৌধুরীবাড়ির নেমন্তন্ন আজ একেবারে বন্ধ ? তবে আমার কি উপায় হবে শুনি ?

ময়নাচাঁদ কিন্তু নবজলধর চক্কোত্তির অতশত খেদোক্তি শুন্‌তে রাজী নয়। এমনি ভাবে সে বহু চৌধুরীবাড়িগামীকে গাঙ্গুলীবাড়ির পথে ফেরত পাঠিয়েছে। কাজেই এইটুকু তার মনের মধ্যে স্থির নিশ্চয় হয়ে আছে যে, নবজলধর ঠাকুরকেও ফেরৎ পাঠাতে হবে।

খুব বেশীক্ষণ এই ঝোপে দাঁড়িয়ে সে মশার কামড় খেতে রাজী নয়। তার ওপর কখন চৌধুরীবাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে—সেটা খুব বেশী আরামদায়ক হবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া গাঙ্গুলীবাড়ির আকর্যণও বড় কম নয়। এতক্ষণ যাত্রাদলের লোকেরা সাজ-ঘরে নিশ্চয়ই পোষাক পরতে শুরু করে দিয়েছে।

নবজলধর বজ্রাহত কদলী বৃক্ষবৎ দাঁড়িয়েছিলেন। ময়নাচাঁদ বললে, তাহলে চলুন চক্কোত্তিমশাই, গাঙ্গুলীবাড়ীই যাই—

আঁৎকে উঠলেন চক্কোত্তিমশাই। শুধোলেন, কেন ? গাঙ্গুলীবাড়ি যাবো কেন ? যাচ্ছিলাম চৌধুরীবাড়ির ভোজে, তুমিই ত' বাবাজী রাস্তার মাঝখানে বাগ্‌ড়া দিলে। এমনভাবে মূর্তিমান বিঘ্নের মতো আমার সামনে এসে দাঁড়ালে যে, ভোজের সব বাষ্প উড়ে হাওয়া হয়ে গেল। এখন দাঁড়াও একটু হাঁফ্‌ ছাড়তে দাও—

ময়নাচাঁদ কাউকে হাঁফ ছাড়তে দিতেও রাজী নয়, আবার নিজেও হাঁফ ছেড়ে সময় নষ্ট করবার পক্ষপাতি নয়।

তাই তাড়া দিয়ে বললে, চলুন চক্কোত্তিমশাই, ওদিকে বোধ করি এতক্ষণ যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

এইবার সত্যি আঁৎকে ওঠেন নবজলধর চক্কোত্তি। অ্যাঁ! যাত্রা! কোথায় বিরাট ভোজ—যার নামেই কিনা রসনা লালাসিক্ত হয়ে ওঠে আর কোথায় যাত্রা। যাত্রার নামে চক্কোত্তিমশায়ের একটা ভয় আছে ছেলেবেলা থেকেই। কেন না,—

তিনি অতি শিশুকাল থেকে বুঝে নিয়েছেন্ যে, যাত্রা শোনা মানেই প্রাণভরে—আশ্ মিটিয়ে কাঁদা।

পল্লী অঞ্চলে ত' একটা চলতি কথাই আছে—যাত্রা শুনতে যাচ্ছ? তা সঙ্গে চাদর নিয়েছ ক'খানা?

এখনকার দিনের দর্শক হয়ত হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে হক্-চকিয়ে উঠবে। কথায় থৈ পাবে না। যাত্রা শুনতে যাবে তার সঙ্গে চাদরের কী সম্পর্ক বাপু? কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে এক কথাতেই কার্য-কারণ সবাই বুঝে নিতে পারত। তখন ত' লোকে রোমাল ব্যবহার করতে শেখেনি যে, চট্ করে পকেট থেকে বের করে চোখ মুছে নেবে ফ্যাসান দুরন্ত ভাবে। আর এ কথাও কারো অজানা ছিল না যে, যাত্রা শুনতে বসে যখন লোকে কাঁদতে শুরু করে—তখন এতটুকু ছিটে ফোঁটা চোখের জল পড়ে না। যেন একেবারে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে। সেই জলকে রোধ করতে পারে কয়েকখানি চাদর। যাত্রার আসরে একজন যদি কাঁদতে সুরু করলে অমনি দেখতে দেখতে সবাইকার চোখের জল বন্যায় বেগে বেরিয়ে এলো। সেই বেগ সামাল দেওয়া ত' সোজা কথা নয়। তারপর চক্কোত্তিমশাই অভুক্ত আছেন। খালি পেটে যাত্রা শুনতে বসে যদি শুধু কাঁদতে হয় তবে শেষ পর্যন্ত হেঁচকি উঠবে কিনা তাই-ই বা কে বলতে পারে?

নবজলধর চক্কোত্তি এই সব ভেবে ইতস্তত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁকে বেশী কিছু ভাবতে দিতে রাজী নয় ময়নাচাঁদ। হাত ধরে একরকম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে টানতে টানতে এনে হাজির করল—গাঙ্গুলীবাড়ির প্রাঙ্গণে। এর একটা বিশেষ কারণ অবশ্য ছিল। কেন না, তিনখানা গাঁয়ের লোক জানে—যেখানে নবজলধর চক্কোত্তি—সেইখানে ভোজ। আজ যখন চক্কোত্তিমশাই চৌধুরীবাড়ি না গিয়ে এখানে হাজির আছেন তখন চৌধুরী বাড়ির ভোজ যে সত্যিই স্থগিত রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকতে পারে না।

জনে জনে খোসামুদি না করে যদি শুধু চক্কোত্তিমশাইকে এনে আসরে হাজির করা যায় তবে—লাখো কথা যাবে বেঁচে।

ফাল্গুনেরও এইরকম একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল।

তাই ময়নাচাঁদ নবজলধর চক্কোত্তিকে আসরে বসিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

গাঁয়ের পাঁচজনও তাঁকে দেখে ভালো হয়ে নড়ে-চড়ে বসল আসরে। তাহলে আর খ্যাট বাদ যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এইবার নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা শোনা যাবে।

ময়নাচাঁদ কিন্তু আসরে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করল না। তার মনে মনে বাসনা

রয়েছে—যাত্রাদলের লোকেরা কেমন সাজে তাই সাজঘরে গিয়ে দেখতে হবে। সুযোগ যখন এসেছে—তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

চাকরদের শোবার লম্বা ঘরটা আজ সাজঘরে পরিণত হয়েছে। সেখানে ফাল্গুনের আদেশে পাহারা দিচ্ছে তারই জানা চাকরটা। সুতরাং আর দশজন গাঁয়ের ছেলেকে যেমন ভীড় করতে বারণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন বোধে হাঁকিয়ে দেয়া হচ্ছে—ময়নাচাঁদের ভাগ্যে তা জুটলো না। সে নির্বিবাদে সাজঘরে গিয়ে ঢোকবার সুযোগ পেলে।

লম্বা লম্বা দড়ি টানিয়ে সাজঘরে নানারকম পোষাক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর রাখা হয়েছে নানাধরনের দাড়ি আর চুল। কোঁকড়া চুল, বাবরি চুল, সন্ন্যাসীর চুল, কাঁচাপাকা চুল, যোগিনী চুল, টাকমাথা চুল, টিকিওলা চুল, চুলেরই কতরকম বাহার। সাজেরই কি কিছু কমতি আছে? রাজার পোষাক, মন্ত্রীর পোষাক, সেনাপতির পোষাক, রানীর পোষাক, সখির পোষাক; রাধাকৃষ্ণের পোষাক, নারদের পোষাক; সন্ন্যাসীর পোষাক; ঘেষেরা-ঘেষেরানীর সাজ, রাখালবালকের সাজ, দেবতাদের পোষাক, দৈত্যদের সাজ, বিবেকের সাজ, সুমতি কুমতির সাজ…কত নাম করা যায়? ময়নাচাঁদ যেন বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে রইল। কি পালা হবে—সে কথা জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

কেউ বলে, নহুষ উদ্ধার, কেউ বলে, সীতার বনবাস, কেউ বলে, নলদময়ন্তী আবার কেউ বা বলে 'কংসবধ'! যাই হোক হবেই একটা কিছু। যারা রানী বা সখি সাজবে—পরামাণিক তাদের দাড়ি—গোঁফ উল্টো চাঁছ দিয়ে খুব জোরালো করে কামিয়ে দিচ্ছে। তবু সেই কালো গোঁফের রেখা কি ঢাকা যায়? সাদাচক ঘষছে ক্রমাগত মুখে। বেশীক্ষণ দেখলে সত্যি হাসি পায়।

ময়নাচাঁদ ভাবলে, এর চাইতে আসরে গিয়ে আগে ভাগে স্থান সংগ্রহ করে রাখা ভালো। নইলে ভালো জায়গা অভাবেই যাত্রা শোনা যাবে না।

কি একটা কথা মনে হতে—ময়নাচাঁদ থমকে দাঁড়ালো। সে লোকটা—বাল্মীকি কিম্বা নারদের পোষাক পরছিল তাকে গিয়ে বললে,দেখুন মশাই পালা আপনারা যাই করুন না কেন—হনুমানের লাফঝাঁপ আর তরোয়ালের যুদ্ধ অবশ্য রাখবেন, এই দুটি থাকলেই যাত্রা খুব জমে যাবে। খুব একটা জরুরীকাজ শেষ করেছেমনে ভেবে, ময়না চাঁদ বাঁশ দিয়ে ঘেরাওকরা জায়গায় ঠেলেঠুলে ঢুকে বন্ধুদের মধ্যে বসে পড়ল। যে সব বন্ধুবান্ধব ওর জায়গা রেখেছে তাদের কাছে পানের খিলি এগিয়ে দিয়ে বললে, নে-খা।

অবশেষে যাত্রা শুরু হল—"নল-দময়ন্তীর পালা।

প্রথমে সুন্দরী সখিদের নাচ, দময়ন্তীর গান হংসদূতের আগমন, দেবতাদের

ঈর্ষা…বেশ জমে উঠল। নল-দময়ন্তীর বিয়ে পর্য্যন্ত একেবারে যাকে বলে জমজমাট। কিন্তু নলরাজার রাজ্য হারানোর পর থেকে লোকে এমন হু-হু শব্দে কাঁদতে সুরু করল যে, প্রত্যেকের কাঁধের চাদর ভিজে গেল…শতরঞ্চিও ভিজে ওঠে এই অবস্থা! একে ত' সবাই চৌধুরীবাড়ির নেমন্তন্নে না গিয়ে ক্ষিদেয় হাঁফাচ্ছে, তার ওপর ক্রমাগত কাঁদতে কাঁদতে অনেকেই আসরের মধ্যে নেতিয়ে পড়ল। একঘেয়ে কান্না শুনে শুনে ছেলেরদল ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েদের চোখের জলে পায়ের আলতা অবধি ধুয়ে গেল।

সবাই যদি কাঁদে তবে যাত্রা'শুনবে কে? গাঙ্গুলীবাড়ীর ফাল্গুন ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত মরাকান্না কাঁদলে চলবে কেন?

ময়নাচাঁদ তাকিয়ে দেখে, নবজলধর চক্কোত্তি তার চাদরটাকে ভালো করে নিঙড়ে নতুনভাবে চোখের জল মোছবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

ফাল্গুন দেখলে সব হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে। আসর ভেঙে যদি লোকেরা উঠে পড়ে, তবে চৌধুরীবাড়ির পাইকের দল আবার তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভোজনের আসরে বসিয়ে দেবে। তবে ত' সবই মাটি। গাঙ্গুলীবাড়ির এত কলা-কৌশল, অর্থব্যয়, যাত্রাদল নিয়ে আসা সব ভস্মে ঘি ঢালার মতো হয়ে যাবে।

না—না, এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। দর্শকদলকে যে কোনো উপায়ে হোক চাঙ্গা করে তুলতে হবে। সে হনুমানের লাফ দিয়েই হোক, ঘেসেরা-ঘেসে-রানীর নাচ দিয়েই হোক,—আর বিদূষকের ভাঁড়ামো দিয়েই হোক।

ফাল্গুন উঠে তাড়াতাড়ি সাজঘরের দিকে চলে গেল। যাত্রাদলের অধিকারী তার বিরাট গোঁফজোড়া নাচাতে নাচাতে এসে বললে, আজ্ঞে জমিদারবাবু, কেমন দেখছেন?

ফাল্গুন একটু রাগ করে জবাব দিলে, দেখুন জমিদার আমি নই, আমার বাবা। কিন্তু যে জন্য আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে—তার সবই যে মাটি হয়ে যাচ্ছে।

—কেন কেন? আপনি দেখেছেন ত' দর্শকদল কেমন হাপুস নয়নে কাঁদছে। একেবারে যাকে বলে সবাই অভিভূত হয়ে পড়েছে।—হাত কচলাতে কচলাতে যাত্রা দলের অধিকারী জবাব দেয়। ফাল্গুন ভ্রূ কুঁচকে বলে কিন্তু এত বেশী অভিভূত হলে ত' আমার চলবে না। আমি চাই এমন যাত্রা, যাতে লোকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে! কেউ আসর ছেড়ে চলে না যায়। ছেলের দল চোখ বড় বড় করে কথাগুলো গিলতে থাকে। গাঁয়ের বুড়োরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।…তারা নস্যি নেবার কথাও বেমালুম ভুলে বসে থাকে। পারেন এমন কিছু দেখাতে?

যাত্রাদলের অধিকারী সবিনয়ে উত্তর করে, কিন্তু নলের রাজ্যলাভটা আগে হোক। এইবার দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা ডাকা হবে—

—চুলোয় যাক্ আপনার দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা! আসরই যদি ঝিমিয়ে

পড়ল, লোকই যদি উঠে পালিয়ে গেল, তবে স্বয়ম্বর সভা দিয়ে আমি কি করব মশাই ? তার চাইতে এক কাজ করুন—

আপনমনে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলে ফাল্গুন। তারপর মনের উল্লাসে নিজের কপালে একটা টোকা মেরে বললে, হ্যাঁ হয়েছে। একটা নক্সা বা প্রহসন করুন। এক জমিদারের ছেলে বাজার থেকে প্রকাণ্ড এক চিতোল মাছ জোর করে এনে খেয়েছে। কিন্তু সেই চিতোল মাছ কিছুতেই আর হজম হচ্ছে না। পেট ফুলে জয়ঢাক ! ডাক্তার, বৈদ্যি, হাকিম, তাবিজ, কবচ—না, কিছুতেই না ! পেট শেষকালে ফেটে যায় আর কী ! লাগান এখানে একটা ঘেসেরা-ঘেসেরানীর নাচ ! একজন দু'জন মোসাহেব থাকবে—যাত্রা আপনিই জমে উঠবে। নলদময়ন্তী আগে বন্ধ করে দিন। লোকের কান্নায় আসরের শতরঞ্চি অবধি ভিজে উঠেছে।

যাত্রাদলের অধিকারী নিরুপায় হয়ে শুধোলে, আজ্ঞে নলদময়ন্তী আদ্ধেক হয়ে থাকবে ?—লোকে বলবে কি ?

ফাল্গুন চটেমটে উত্তর দিলে, আরে মশাই লোকে কিছু মনে করবে না। বরং এখনই মনে করছে। হয়ত আসর খালিই হয়ে গেল। আপনি তাড়াতাড়ি ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে দিন যে, আগে একটাপ্রহসন হবে—তার নাম "জমিদার নন্দনের মৎস্য ভক্ষণ"।

এই কথা বলে ফাল্গুন লম্বা লম্বা পা ফেলে সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলো। যাত্রা দলের অধিকারীর আর উপায় কি ? নিজের পাঁঠা যদি নিজেই ল্যাজ কাটে ত' বলবার কিছু থাকে না। তাছাড়া এই জমিদার বাড়িগুলি এত খামখেয়ালী হয় যে, তাদের সঙ্গে কথাবলতে যাওয়াই ঝকমারী।

তখন অধিকারীর আদেশে দময়ন্তী আগেকার পোষাক ছেড়ে ফেলে জেলেনীর সাজ নিয়ে আসরে গিয়ে গান ধরল—

শুন শুন বিবরণ
জমিদার নন্দন—
খায় এক বিশাল চিতোল !
তার পরে হাঁস ফাঁস
বাঁচবার নাহি আশ—
পেট ফুলে জয়ঢাক
বল হরিবোল !

সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছে দর্শকদল ভালো হয়ে বসে, ভাঙা আসর দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে যায়। যারা ঘুমন্ত ছেলেদের কোলে তুলে নিয়েছিল, সেইসব

মা-জননীরা মুখে পান দিয়ে আবার চিকের আড়ালে বসে পড়ে, পাড়ার মাতব্বরের দল কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে নাকে ভালো করে নস্যি গুঁজে তন্ময় হয়ে ওঠে।

জমে ওঠে জমিদার নন্দনের মৎস্য ভক্ষণের পালা। হাসি, হল্লা, টিটকিরিতে আসর জমজমাট।

জেলেনীর নাচ-গান, মোসাহেবের রসিকতা, পণ্ডিতের শ্লোক, কবিরাজের ধমক, জমিদার নন্দনের কাৎরানী শুনে দর্শকবৃন্দ হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এতক্ষণ চোখের জলে আসর ভিজে গিয়েছিল, এইবার হাসির হল্লায় সবাই চাদর শুকিয়ে নিতে লাগ্‌ল।

চৌধুরীবাড়ির লোকেরা আসরের আশেপাশে আনাগোনা করছিল। তারা যখন দেখলে যে, তাদের বাড়ি নিয়েই ঠাট্টা, তামাসা, মস্করা চল্‌ছে—তখন সবাই মরিয়া হয়ে গেল।

কে কি ইসারা করলে ঠিক বোঝা গেল না। চৌধুরীবাড়ির পাইকরা টিকেতে আগুন ধরিয়ে সামিয়ানার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আঁধারে গা ঢাকা দিলে। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। লোকজন প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে পালাতে লাগ্‌ল। চিকের আড়াল থেকে মরা-কান্না সুরু হয়ে গেল। বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন খুলে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে গুড়িয়ে গেল। একেবারে যাকে বলে পাল-চাপা-পড়া যাত্রার আসর। কত লোকের যে ঠ্যাং ভাঙ্‌ল, কতলোকের গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগ্‌ল, কতলোক সামিয়ানা চাপা পড়ে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করতে লাগ্‌লো তার আর ইয়ত্তা নেই। ওরই মধ্যে এক রসিক দর্শক চীৎকার করে উঠ্‌লো—

"যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম শর্মা"

॥ পাঁচ ॥

খুব যদি সাঙ্ঘাতিক একটা ঝড় হয় কিম্বা ভীষণ শব্দ করে একটা বাজ পড়ে তবে সেই অঞ্চলটা কিছুদিনের জন্য একেবারে চুপচাপ থাকে, থমথম করে আকাশ আর মাটি।

জল-বিছুটি গাঁয়ের অবস্থাও এখন সেইরকম।

গাঙ্গুলীবাড়ির সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির ঝগড়া যেভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল—যাত্রাগানের দক্ষযজ্ঞের পর যেন একটা সাময়িক বিরতি দেখা গেল।

আবার কোন্ পক্ষ কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ করবে, সারা গাঁয়ের লোক সেই কথা নানাভাবে আলোচনা করছিল। কিন্তু কোন আলোচনাই প্রকাশ্যে নয়। গাঁয়ের এপাশে-ওপাশে, বাড়ির আনাচে-কানাচে, বৈঠকখানায় ফিস্‌ফিস্ আলাপের সঙ্গে ফস্‌ফস্ তামাকু টানার শব্দে।

এই অবকাশে এক দল প্রবীণ লোক ছাতা বগলে করে দিনের বেলা এক বাড়ি, রাত্তিরের অন্ধকারে আর এক বাড়ির বৈঠকখানায় হাজির হচ্ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খুব জোরদার, যদি কোনরকমে চৌধুরীদের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের মামলা-মোকদ্দমা বাঁধিয়ে দেওয়া যায়, তবে উকিল-মোক্তারের যোগ-সাজসে বেশ হু'পয়সা ঘরে আসতে পারে।

পল্লীগ্রামের নিষ্কর্মা মাতব্বরের দল এই সময়টায় বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

উপদেশ দিয়ে মানুষের উপকার—সেটুকু আর তারা করবে না? তাদের বাপ-ঠাকুর্দ্দা চিরকাল এই কাজ করে গেছেন এবং সেই উপদেশ মতো নির্দিষ্ট পথে চলে কত বাড়িতে যে ঘুঘু চরেছে, কত সংসার ভেসে গেছে, কত পরিবারের হাঁড়ি চির-কালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে, হিসাব করলে তার হদিশ মেলা শক্ত!

জল-বিছুটি গাঁয়ের লোকেরা তাই ভাবছিল খুব শীগ্‌গীর একটা মামলা-মোকদ্দমা সুরু হয়ে যাচ্ছে এই গাঁয়ে।

কিন্তু যারা দিন গুনছিল, যারা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল, যারা বৈঠকখানা গরম করে রেখেছিল এবং যাদের দল রাতারাতি ছুটোছুটি সুরু করে দিয়েছিল তাদের সবাইকে হতাশ করে দিয়ে এগিয়ে এলো পূজোর দিন।

পূজোর কথা মনে হতেই বাংলাদেশের গাঁয়ের লোকেরা আনন্দে হু'হাত তুলে নাচতে সুরু করে দেয়।

খুব সকালবেলা যেন একটা মিঠে সুরের বাঁশি কানে শোনা যায়। সোনালী রোদ বাড়ির উঠোনে, গাছের পাতায়, ফুলের বাগানে, পুকুরের জলে, শিশির ভেজা ঘাসের ওপর যেন সোনার গুড়ো ছড়িয়ে দেয়। নীল আকাশে পাতলা পেঁজা তুলোর মতো হালকা মেঘ খেয়াল-খুশীতে আনমনা সমীরণে ভেসে বেড়াতে থাকে। খাল-বিলগুলিতে শাপলা আর পদ্মের মাতামাতি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়; কোথায় কোন গাছের ফাঁকে নাম-না-জানা পাখী যখন ডাকতে থাকে, তখন কি অমিল আর ঝগড়ার কথা মনে আসে? আপনা থেকেই মনে জাগে মিতালীর কথা, সবাই মিলে আনন্দ করার কথা, অচেনা বনে পথ হারিয়ে যাবার কথা।

কিন্তু জল-বিছুটি গাঁ ক্ষণিক ঝগড়ার কথা ভুললেও—অনেকক্ষণ ভুলে থাকতে পারে না! ওদের রক্তে রয়েছে অমিল!

এই দুর্গা পূজোর কথা থেকেই সুরু হল বিদ্বেষ! কেমন করে সেই কথাই আজ বলি ঃ

ময়নাচাঁদ সেদিন ফাল্গুনের ঘরে বসে আসর জমিয়েছে। কিভাবে গাঁয়ের লোকদের চৌধুরীবাড়ির ভোজ থেকে বঞ্চিত করে গাঙ্গুলীবাড়ির যাত্রাগানের আসরে ভুলিয়ে এনেছিল, তারই মজাদার কাহিনী রসালো করে বলছিল! শেষকালে সে টিপ্পনী কেটে বললে "ভোজের জন্যে চৌধুরীবাড়ি যে মাছ, মাংস আর ক্ষীরের আয়োজন করেছিল—সব গরমে পচে গিয়েছিল! বাড়ির লোক আর কত খেতে পারে বল ?"

ফাল্গুন তার জবাবে উত্তর করলে, 'কিন্তু ময়নাচাঁদ, তোর সেদিনের ব্যাপারে যতই বাহাদুরী দিতে চাস—জিৎটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদেরই হয়েছে।'

ময়নাচাঁদ যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল!

—'ওদের আবার জিৎ হল কি করে শুনি ?'

ফাল্গুন টিপ্পনী কাটলে, 'জিৎ হল না' ? এমন জমজমাট যাত্রাগানের আসরটা ভেঙে দিলে, সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিলে, অমন দামী ঝাড়-লণ্ঠনগুলো গুড়িয়ে গেল···ভাগ্যিস কারো মাথা ফাটেনি! তাহলে ত' আবার থানায় ছুটোছুটি করতে হত!'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফাল্গুন আবার বললে, এতগুলি লোককে তিড়িং-লাফ করালে—আর তোরা বলছিস ওদের জিৎ হয়নি ? এর চাইতে হার কিসে হয় তা ত' আমার জানা নেই।

ময়নাচাঁদ মুচকি হেসে উত্তর করলে, এক মাঘেই ত' শীত পালায় না, আমার মাথায় এক্ষুণি একটা ভালো বুদ্ধি এসেছে।

উদাসভাবে ফাল্গুন বললে, তোর বুদ্ধি ত' তবেই হয়েছে! ময়নাচাঁদের বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে গেলে—গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে হবে না!

আ-হা-হা! শোনোই না আমার মগজের কলটা কেমন কাজ করছে!

ময়নাচাঁদের বুদ্ধির গোড়ার পোকাগুলি যেন সব একসঙ্গে কিলবিলিয়ে ওঠে।

কড়িকাঠের দিকে চোখদুটো আটকে রেখে তাচ্ছিল্যের স্বরে ফাল্গুন জবাব দিলে, আচ্ছা, বলো তোমার মগজের বুদ্ধির ঢেঁকির কাহিনী—

ময়নাচাঁদ ভালো হয়ে উঠে বসে বললে, 'কথাটি খুব গোপনে রাখবে। ফাঁস হয়ে গেলেই চালটা একেবারে বাতিল হয়ে যাবে।'

ফাল্গুন এইবার চটে উঠে বললে, তুই শুধু ভনিতা করবি না আসল কথাটা ভাঙবি ?

তখন ময়নাচাদ আস্তে আস্তে কথাটা ভাঙে। পেটুক মানুষ যেমন নেমন্তন্নবাড়ি

খুব ভালো খাবার একটু একটু করে চেখে চেখে খায়—পাছে সেটা ফুরিয়ে যায়। বলবার ঠিক সেই রকম তার ঢঙ।

চৌধুরীবাড়ির চিরকালের গর্ব যে, ওদের দুর্গাপ্রতিমা গ্রামের সব চাইতে উঁচু। এখন ধরো, তোমরা যদি কাউকে কিছু না জানিয়ে, খুব গোপনে চৌধুরীবাড়ির প্রতিমার চাইতেও গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা আধ হাত বড়ো করে গড়ে তোলো, তা হলে চৌধুরীবাড়ির থেঁাতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে,—ওরা আর গাঁয়ের লোকেদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

ফাল্গুনের কথাটা খুব মনে লাগলো। এইবার সে ভালোভাবে নড়ে-চড়ে বসলো আর কড়িকাঠ থেকে চোখ দুটো নামিয়ে সার্চ লাইটের মতো ময়নাচাঁদের দিকে চোখ ফেরালে।

—হ্যাঁ জব্দ করবার মতো একটা কথা বলেছিস বটে। তোকে আমি সত্যি ভরপেট মিষ্টি খাওয়াবো। ডাক এক্ষুণি কুমোর ব্যাটাকে—

ময়নাচাঁদ তার ঠোঁট দুটোর ওপর তর্জনীটি বসিয়ে ফিস্ ফিস্ গলায় বলে—হি-স-স্! দেওয়ালেরও কান আছে! এমন হাঁকডাক দিয়ে কাজ করতে গেলে সব ভেস্তে যাবে!'

—ঠিক! ঠিক! অতি খাঁটি কথা বলেছিস তুই! মাথা নেড়ে মন্তব্য করলে জমিদার-নন্দন-ফাল্গুন।

—জব্দ যদি করতে হয় তবে ধূর্ত শেয়ালের মতো চুপিসাড়ে পা টিপে টিপে আমাদের এগুতে হবে—যেন কাকপক্ষীতেও না টের পায়!

এই প্রস্তাবটি সত্যি ফাল্গুনের খুব মনে ধরেছে। যাত্রাগানের আসরের পরাজয়ের কথাটা সর্বক্ষণ তার মনে ছুঁচের মতো বিঁধছে।

চিৎকার করে হাঁকডাক দিয়ে নয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে ফাল্গুনকে কাজ করতে হবে। যদি শেষ রক্ষা করতে পারে, তবে গাঁয়ের লোকের কাছে চৌধুরীরা যে অপদস্থ হবে সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশই থাকবে না।

সেইদিনই একটু বেশী রাত্তিরে ময়নাচাঁদ গাঁয়ের কুমোরপাড়াতে গিয়ে হাজির হল।

এরই মধ্যে কুমোরপাড়ায় সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। নানারকম প্রতিমার কাঠামো তৈরী হয়েছে। খড় দিয়ে প্রতিমা তৈরীর কাজেও লেগে গেছে অনেকে দলবদ্ধভাবে। সিংহ আর অসুরের ক্যারামতিটা কতভাবে দেখানো যেতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে কুমোরদের মধ্যে। কুমোরপাড়ার ছোটছেলেরাও এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। কেউ বলছে সিংহ লাফিয়ে উঠবে—একেবারে অসুরের বুক কামড়ে ধরবে!'

আর একজন ঠাট্টা করে বলছে, দূর বোকা! সিংহ কি করে অসুরের বুকে কামড়ে ধরবে? সেখানে ত' মা দুর্গার ত্রিশূল এসে বিঁধবে! কামড়াতে যদি হয়—তবে অসুরের হাতে কিম্বা পায়ে।

আর একজন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, অসুরটা যদি সিংহকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে তা হলে কি রকম হয়? মা-দুর্গার একটু বিপদ হোক না? তা হলে যুদ্ধটা জমবে ভালো। সব সময়ই অসুর ব্যাটা চারদিক থেকে মার খাবে এটা কি ভালো দেখায়?

একদল ছেলে-ছোক্‌রা কুমোর খুব সায় দিলে তাতে। কেউ কেউ বললে, মা দুর্গা যখন অসুরের কাঁধে পা চাপিয়ে দেবে তখন আর বাছাধনকে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না। সিংহ হচ্ছে পশুরাজ—তার সঙ্গে অসুর বেটা কখনো এঁটে উঠতে পারে?

গল্প চলছে মুখে—আর হাতে কুমোরের দল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

এমনি সময় ময়নাচাঁদ গিয়ে হাজির হলো সেখানে। কুমোরপাড়ার যে মোড়ল—গাঁয়ের সেরা সেরা প্রতিমা তৈরী করবার ভার তার ওপরে। বংশানুক্রমে তারা এই কাজ করে চলেছে সেই হিসেবে বর্তমান মোড়ল কৈলাশচন্দর দুই জমিদার—চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা তৈরী করে থাকে। মুন্সিয়ানা আছে এই প্রতিমা তৈরীর কাজে। কৈলাশচন্দর খুব ভালো করে জানে যে, এই দুই জমিদার বাড়ির প্রতিমা দেখ্‌তে সাত গাঁয়ের লোক ঝুঁকে পড়বে।

কোনো রকমে কুমোরের যদি নাম খারাপ হয়ে যায় আর লোকেরা যদি দেখে বলে, কৈলাসচন্দর এবার ভালো প্রতিমা তৈরী করতে পারে নি, তাহলে লজ্জা রাখবার আর ঠাঁই থাকবে না! শুধু তাই নয়, জমিদার বাড়ির কাজ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আবার কখনো এর উল্টো ব্যাপারও দেখা গেছে। যদি লোকের মুখে মুখে রটে গেল যে, চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা অন্যান্য বছরের তুলনায় আরো ভালো হয়েছে, তাহলে জমিদার কুমোরদের মজুরী ছাড়াও বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বকশিস্‌ দেন।

সেইটেই প্রতি বছর আশা করে কৈলাসচন্দর। সেইজন্যে রাত জেগে সে গাঙ্গুলীবাড়ি আর চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা তৈরী করে।

সে যখন শুনলো গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনবাবু তাকে এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন—তখন সে মহা খুশী হয়ে গেল। ভাবলে নিশ্চয়ই কোনো উপরি পাওনা আছে। তাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে, আচ্ছা বাবু চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই।

ফাল্গুনের কাছে গিয়ে কিন্তু আসল কথা শুনে কৈলাশচন্দরের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল। চিরকাল চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা গাঁয়ের সব প্রতিমার চাইতে বড় হয়—একথা কাকপক্ষীতেও জানে। আজ সে কি করে তার অদল-বদল করে দেয়!

ফাল্গুন তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ওকে খুশী করবার জন্যে বললে, 'আরে কৈলাশচন্দর, প্রতিমা তৈরীর ব্যাপারে তোমার কত নামডাক! সেই দূর-শহরের লোক পর্যন্ত তোমার হাতের কারুকার্য্যের কথা শুনেছে। আমার কলেজের বন্ধুরা আসছে তোমার হাতের তৈরী প্রতিমা দেখতে। চাই কি খুশী হলে তারা তোমায় অনেক বকশিস করে যাবে। কিন্তু ওই একটি সর্তে। চৌধুরীদের বাড়ির প্রতিমা থেকে গাঙ্গুলীদের বাড়ির প্রতিমা এ বছর আধ হাত-বড়ো হবে। কেমন রাজী ত'?

নিজের প্রশংসা শুনলে কে-না খুশী হয়! কৈলাসচন্দরের মনটা একটু নরম হল।

ফাল্গুন বুঝলে, এই সুযোগ। Strike the iron while it is hot!

ওর হাতে পাঁচটি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ফাল্গুন বললে, এ তোমার মজুরী নয়। আমি খুশী হয়ে আগাম তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছি—না বললে কিছুতেই শুনবো না। লোভে পড়ে কৈলাশচন্দর টাকা নিয়ে বাড়ি চলে এলো। কিন্তু সে ভয়ানক অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলো। ধর্মভীরু লোক সে—চিরটাকাল সে দুই জমিদার বাড়িরই নিমক খেয়ে আসছে। প্রত্যেক বাড়িরই একটা কুলপ্রথা থাকে। সেটা সে কী করে উল্টে দেবে?

কৈলাশচন্দর খেতে পারে না, শুতে পারে না, ঘুমুতে পারে না…আপনমনে কিভাবে আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। কৈলাশচন্দরের বৌ ক'দিন লক্ষ্য করে বললে, তোমার কি কাণ্ড বলতো? সামনে পূজো…এখনো তোমার কাজে মন নেই…এত প্রতিমা তুমি শেষ করবে কি করে? দাওয়ায় বসে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি মা দুর্গা হেঁটে এসে কাঠামোর ওপর দাঁড়াবেন?

কৈলাশচন্দরের মনের ওপর যে বোঝা চেপে আছে সেটার কথা প্রাণ খুলে কাউকে বলা চলে না। নিজের বৌকেও নয়।

কি জানি যদি কথাটা ফাঁস হয়ে যায়, তবে প্রাণ নিয়ে টানাটানি আর কি!

কাজেই সে বোকার মতো কেবলি তাকিয়ে থাকে, আর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে।

কিন্তু ফাল্গুনবাবু তাকে আগাম পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে রেখেছেন। একরকম রাজিই হয়ে এসেছে, সে কথারই বা খেলাপ কি করে করে?

শেষকালে একদিন গভীর রাতে দুর্গার নাম স্মরণ করে সে গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা বড় করে তৈরী করা সুরু করে দিলে।

কিন্তু কি বিধাতার খেলা—সেইদিনই শেষরাত্তিরে সুরু হল—কৈলাশচন্দরের একমাত্র ছেলের ভেদ-বমি! ছেলে যেন দুবার বমি করেই একেবারে নেতিয়ে পড়লে।

কৈলাশচন্দরের কেবলি মনে হতে লাগল—সে একটা ভীষণ পাপ করেছে। টাকা

খেয়ে চৌধুরীবাড়ির প্রতিমা ছোট করে—গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা যে বড় করে তৈরী করার কাজ সুরু করেছে তাতেই মা দুর্গা তার ওপর রুষ্ট হয়ে এইরকম বিপদে তাকে ফেলেছেন।

সে একবার রুগ্নছেলের কাছে ছুটে যায়···আর একবার বাইরে প্রতিমার কাছে এসে—হাঁটু গেড়ে বলে, হে মা দুর্গা, আমার একমাত্র বংশধরকে তুমি ত' বাঁচিয়ে দাও।

কৈলাশচন্দরের বৌ তাকে এইরকম ছুটোছুটি করতে দেখে কাছে এসে শুধোলে, কি ব্যাপার হয়েছে বলতো? নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ। সব আমাকে খুলে বলো, আমি বুঝতে পারছি—আমাদের সংসারে কোনো পাপ ঢুকেছে—নইলে বাছা আমার এমন করে নেতিয়ে পড়বে কেন?

কৈলাশচন্দর তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, বৌয়ের কাছে নিজের লোভের কথা সব কিছু খুলে বললে।

কুমোর-বৌ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, তুমি সামান্য টাকার লোভে ধর্মকে ভুলতে বসেছিলে? সেইজন্যই আমার একমাত্র শিবরাত্তিরের সল্‌তে নিভতে বসেছে! —আমি তোমার আর কোনো কথাই শুনবো না। বাছাকে যদি বাঁচাতে চাও তবে—এক্ষুণি গিয়ে তুমি গাঙ্গুলীবাড়ির টাকা ফেরত দিয়ে এসো।

কৈলাশচন্দর ভয়ে ভয়ে বললে, কিন্তু ফাল্গুনবাবু যদি পাইক দিয়ে আমায় আট্‌কে রাখে? আমায় মারধর করে? তবে আমার কি উপায় হবে?

কুমোর-বৌ তাকে সাহস দিয়ে বললে, তোমার কোনো ভয় নেই। মা দুর্গার নাম স্মরণ করে তুমি চলে যাও—। বলবে আমি অধর্ম করতে পারবো না। অধর্ম করতে গিয়ে আমার ছেলের এই দশা হয়েছে। আপনারাও ত' ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন—আপনিও ভেবে দেখুন বাবু—

কৈলাশচন্দর লাফিয়ে উঠে বললে, তুমি ঠিক কথা বলেছ বৌ! কিসের এত ভয়? যাই আমি ওদের টাকা ফেরত দিয়ে আসি—

দ্রুতবেগে সে নোট পাঁচটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কুমোর-বৌ মা দুর্গার নামে একটি সিকি মাথায় ঠেকিয়ে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখল। মনে মনে বললে, বাছা আমার ভালো হয়ে উঠলে হরিলুট দেবো।

এই সময় ছেলের মুখে অনেকক্ষণ বাদে কথা ফুটলো। ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আমায় একটু জল দাও না মা—

॥ ছয় ॥

গাঙ্গুলীদের বাড়ির ফাল্গুনের মনে মনে খুব আশা ছিল যে শ্রীদুর্গার মূর্তি তৈরীর ব্যাপারে চৌধুরীবাড়িকে আচ্ছা করে জব্দ করে দেবে। ওরা যখন শেষ মুহূর্তে জান্‌তে পারবে যে গাঙ্গুলীবাড়ির প্রতিমা আধহাত বড় হয়ে গেছে, তখন রাতারাতি সংশোধনের আর কোনো উপায়ই থাকবে না। কালো হয়ে যাবে চৌধুরীমশায়ের মুখ।

গাঁয়ে কুমোর কৈলাশচন্দর তার সব প্ল্যান মাটি করে দিলে! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না। বহু টাকার প্রলোভন সে দেখিয়ে ছিল কৈলাশচন্দরকে। কিন্তু ব্যাটা শুধু চোখের জল ফেলে আর বলে, বাবু, ছেলের প্রাণের চাইতে ত' টাকা আমার কাছে বড় নয়। ছেলেপুলে নিয়ে আপনারও ত' বিরাট সংসার বাবু…আমায় ও আদেশ করবেন না।

লোকটা কেবলি চোখের জল ফেলে সব মাটি করে দিলে। নইলে ফাল্গুনের সর্বশরীর রাগে কাঁপছিল। ইচ্ছে হয়েছিল—চাপকে কৈলাশচন্দরকে ঠাণ্ডা করে দেয়। কিন্তু কিছুই করা হল না ফাল্গুনের। ওই ছেলেপুলে নিয়ে বিরাট সংসারের উল্লেখ করতেই সে যেন কেমন বিপদে পড়ল।

লোকটা নির্বিবাদে পঞ্চাশ টাকার নোট ওর পায়ের কাছে রেখে দিব্বি বাড়ি ফিরে গেল। সে তার এতটুকু অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারলে না!

ফাল্গুনের একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু কি যে সে করবে সেটা ঠাওর করে উঠতে পারছে না। কে জানে, হয়ত এতক্ষণ তার প্ল্যানের কথা ওই কৈলাশ-চন্দই চৌধুরীবাড়িতে জানিয়ে দিয়েছে, আর তারা সেই কথা শুনে কত হাসাহাসি করছে! কৈলাশচন্দরকেও হয়ত সেখানে অত চোখের জল ফেলতে হয়নি! বেশ মোটা বক্‌শিস নিয়ে সে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরে গিয়েছে!

যত এইসব কথা তার মগজে আনাগোনা করে তত বেশী সে মরিয়া হয়ে ওঠে।

নাঃ—এমন একটা কাণ্ড তাকে করতেই হবে—যাতে চৌধুরীবাড়ির লোকেরা বুঝতে পারে যে, পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন বলে কেউ আছে!

দুই উপায়ে মানুষকে সচেতন করা চলে।

এক—মিত্রভাবে ভজনা করে, আর শত্রুভাবে তার সম্মুখীন হয়ে। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দুই দ্বারী ছিল, জয় আর বিজয়। তারা দুজনে কি একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ করে; ফলে তাদের ওপর অভিশাপ আসে যে মর্তলোকে গিয়ে বাস করতে হবে।

বিষ্ণুর মিত্রভাবে থাকলে সাত জন্ম পৃথিবীতে বাস করতে হবে। আর যদি শত্রুভাবে বাস করে তবে তিন জন্মেই তারা শাপমুক্ত হতে পারবে। জয় আর বিজয় শত্রুভাবেই বাস করতে চেয়েছিল। কেননা—বৈকুণ্ঠ আর বিষ্ণুর কাছ থেকে নির্বাসন তারা দুজনে সহ্য করতে পারেনি। তাই তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে আসবার জন্য বরণ করে নিয়েছিল শত্রুভাবে ভজনা করবার তপস্যা!

কিন্তু আমাদের এই ঘোর কলিকালে ফাল্গুন আর চন্দনের মনে কি ছিল তারাই ভালো বলতে পারে। তবে ঘটনার পর ঘটনা যে ভাবে ঘটে যাচ্ছিল তাতে মনে হয় যে, ওরা দুজন পরস্পরকে পরম ও চরম শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল। তবে একটি কথা হচ্ছে এই যে, ওদের আভিজাত্য আর শিক্ষা একেবারে সামনাসামনি মারামারি করতে দুজনকেই বাধা দিচ্ছিল।

ফলে উভয়েই উভয়কে কিভাবে জব্দ করতে পারে, রাতদিন কেবলি সেইসব ফন্দি-ফিকির আঁটছিল।

চৌধুরী বাড়ির চন্দনের মনটা স্বভাবতই খুব খুশী ছিল। কেননা—গাঙ্গুলীবাড়ির যাত্রায় বেশ দক্ষ-যজ্ঞের পালা গাওয়ানো হয়েছিল। যদিও ভোজের গুজবকে ভিত্তি করে অকারণে তাদের অনেক অপব্যয় হয়ে গিয়েছিল, তবু তারা প্রাণখোলা প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল—যাত্রার সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

কাজেই গাঙ্গুলিবাড়ির ফাল্গুনের মনটা তুষের আগুনের মত জ্বলছিল। বাইরে চিৎকার করে, রাগ দেখিয়ে,—গালাগাল দিয়ে রাগ প্রকাশ করবার উপায় ছিল না!

মানুষের রাগ হলে যদি খুব খানিকটা চ্যাঁচামেচি করতে পারে, দশজনকে ডেকে ধমক দিতে পারে, কিম্বা বেশ কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে পায়—তবে সেই দারুণ রাগ কমে যায়।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের যে ক্রোধ তা, সে না পারছে গিলতে—না পারছে ফেলতে। ফলে সেই রাগটা বেলুনের মতো ফুলে বড়ো হয়ে উঠেছে—একেবারে ফেটে না যায় এই শুধু ভয়!

ছলে-বলে-কৌশলে যে করে হোক চন্দনকে গাঁয়ের লোকের কাছে খেলো করতে হবে—তাহলে যদি রাগটা একটু পড়ে।

গ্রামদেশের জমিদারের ছেলেরা যখন রাগে, তখন একদল লোক তাতে ইন্ধন জুগিয়ে আনন্দ পায়। ফাল্গুনের আশেপাশেও সেইরকম একদল ছেলে-ছোকরা এসে ভীড় জমিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সব সময় ফাল্গুনকে তাঁতিয়ে রাখা। তাহলে তারা ওর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারবে—সেই সঙ্গে সকাল-বিকেল থালাভর্তি খাবারও জুটবে।

ফাল্গুনের বন্ধুর দল তাকে এই বোঝালে, যে চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে গাঙ্গুলীবাড়ির

এই প্রতিযোগিতায় তাকে জয়ী হতেই হবে। নইলে সে সারা গাঁয়ে মুখ দেখাবে কি করে ?

সেদিন সন্ধেবেলা গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের ঘরে ময়নাচাঁদ জুটেছে সকলের আগে।

তারপর একে একে এসে হাজির।—নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক, ঘুগ্নী।

এই যে সব অদ্ভুত নামগুলি—এর একটিও কিন্তু বাপমায়ের দেয়া নয়! অতি ছেলেবেলা থেকে বন্ধুমহলে এই সব মজাদার নাম জুটে গেছে ওদের। হা-ডুডু খেলায় সুযোগ পেলেই সবাই লাথি মারত। সেইজন্য ছেলেটির বদনাম রটে 'লাথু' থেকে হয়েছে নাথু। এখন সমস্তটা গ্রাম ওকে নাথু বলেই জানে। তারপর নাথু আসল নাম যে কোথায় তলিয়ে গেছে সে হদিস কেউ দিতে পারবে না। ওর বাবা-মাও বোধকরি সেজন্যে দুঃখিত নন। কেননা—তারাও এখন নিজেদের ছেলেকে 'নাথু' বলেই ডাকেন। ইস্কুলের পাকা খাতায় একটা নাম ছিল বটে—তবে সে নামটা যে কার সেটা বহু কষ্টে গবেষণা করে বের করতে হয়। কাজটা মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের মতই বিস্ময়কর।

হোঁৎকা অবশ্য তার চেহারার সঙ্গে কোনো মতেই বিশ্বাসঘাতকতা করে না। হা-ডুডু খেলার সময় যখন সে বিরুদ্ধ পক্ষে ডাক দিতে যায়—নিজের পক্ষের লোকেরা তখন সব সময়ই খরচের খাতায় নাম লিখে রাখে। বিরুদ্ধ পক্ষও ভালো করে জানে যে, এইবার এই বড় মোষ বলি হবে—সেইজন্যে সবাইকার আর উল্লাসের পরিসীমা থাকে না!

ট্যাপা ছেলেটি ট্যাপা মাছের মতই দেখতে। তার কোন্ বালকবন্ধু এই নামকরণ করেছিল মনে নেই। তবে নামটি কিন্তু অমর হয়ে আছে বন্ধুর দান হিসেবে। কিন্তু ট্যাপা-টোপা হলে কি হবে ?—গায়ে তার খুব শক্তি। কাজেই খেলার মাঠে সবাই তাকে রীতিমত ভয় করে চলে।

শামুক যার নাম—সে তার নামের অর্থতে সুন্দরভাবে সার্থক করে তুলেছে। ছেলেটি অতি কুঁড়ে, শুয়ে থাক্‌তে পারলে উঠে বস্‌তে চায় না। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ভাত খেতে বসে সে দিব্যি ঢুলছে! তার মা এই বয়সেও তাকে টানাটানি করে বিছানায় ঠেলে নিয়ে শুইয়ে দেয়। কিন্তু শামুক কুঁড়ে হলে কি হবে ? মগজ ভর্তি তার দুষ্ট বুদ্ধি কিল্‌বিল্‌ করছে! কথা সে খুব কম বলে। কিন্তু যখন মুখ খোলে—একেবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ে। সুতরাং পরামর্শ দেবার ব্যাপারে তার অনেকটা দাম আছে বৈকি!

আর ঘুগ্নী হচ্ছে শামুকের ঠিক উল্টো। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে দিব্যি চলে যায়। সব তাতেই অনর্গল কথা বলে চলে। তার ইচ্ছাটা, আর কেউ কথা না বলুক—সে

একাই আসরটা জমিয়ে তুলুক। নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে মুখরোচক কথা পরিবেশন করতে পারে বলেই তার নাম দেয়া হয়েছে 'ঘুগনী'।

সন্ধ্যেবেলাকার গোপন পরামর্শ সভা বেশ জমে উঠলো। ময়নাচাঁদ, নাথু, হেঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগনী।

ময়নাচাঁদ বললে, চন্দনকে জব্দ করবার একটা কৌশল আমি আবিষ্কার করেছি, কিন্তু এখন কিছুতেই ভাঙছি নে; ঝোপবুঝে এমন কোপ দেব যে বাছাধন আর তাল সামলাতে পারবে না।

নাথু চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিলে, ও সব কৌশল-টৌশলের ধার আমি ধারি নে। এমন এক লাথি মারবো যে স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে ছাড়বো—

ফাল্গুন ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, তোমাকে আর স্বর্গের দক্ষিণ দুয়ার দেখাতে হবে না। গোঁয়ার গোবিন্দের মতো এমন কাজ করে বসবে যে, আমাদের মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠবে! তার চাইতে কৌশলেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

ট্যাপা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁড়ন দিলে, তা যাই বলো বাপু, গায়ের জোর না থাকলে সবই যেন আলুনি বলে মনে হয়! কেমন যেন ঢিলেঢালা! এক্ষুণি হোঁচট খেয়ে পড়তে হবে এমনি অবস্থা! মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটো—জোর-জোর নিঃশ্বাস ছাড়ো—কোনো ব্যাটা কিচ্ছু করতে পারবে না।

ফাল্গুন কেবলি মাথা নাড়তে থাকে। প্রস্তাবটা তার আদৌ মনের মতো হয় না!

হেঁৎকা বললে, আচ্ছা, আমি একদিন আমার বাড়ি ওকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনি। তারপর তোরা সবাই হুড়মুড় করে আমাদের বাড়ি ঢুকে চন্দনকে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিবি। তখন বুঝবে ঠ্যালা কাকে বলে!

ময়নাচাঁদ হাসতে হাসতে উত্তর করলে, হ্যাঁ যেমন তোর নাম হেঁৎকা…তেমনি উপযুক্ত প্রস্তাব হয়েছে। তুই আর আসরের মধ্যে কথা বলতে আসিস নি! তোর বাড়িতে চন্দন যদি মার খায় তবে চৌধুরীবাড়ির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে তোর ওপর। সেটা কি খুব স্বাস্থ্যকর হবে? একটু ভেবে দেখেছিস কিছু?

ময়নাচাঁদের রসিকতা শুনে হেঁৎকা সচেতন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটোও হয় বড় বড়!

—তাইত! তাইত! তাইত! ভাই, খুব আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিস ময়নাচাঁদ! এক্ষুণি আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি।

ময়নাচাঁদ বললে, তা হলে আমি তোর প্রাণরক্ষা করেছি। এক্ষুনি আমাকে গরম গরম রসগোল্লা দু'সের খাইয়ে দে।

হোঁৎকা বুঝলে, মানুষের প্রশংসা করেও নিস্তার নেই! তাই সে ডান হাতের তর্জনীটি ঠোঁটের ওপর চেপে চুপি-চুপি বললে, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। আর আমি একটি কথাও কইছি নে!

ঘুগনী কি যেন একটা নতুন প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর পরামর্শের ওপর ফাল্গুনের খুব বেশী আস্থা ছিল না। তাই সে শামুকের গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, আচ্ছা, শামুক, তুই সারাক্ষণ এমন চুপচাপ বসে আছিস কেন? একটা যা-হোক পরামর্শ দে—

শামুক চোখ বুজে ঝিমুচ্ছিল কিনা—তাই বা কে বলবে? ফাল্গুনের কথায় বোধ করি তার হুঁস হল। সে অপার আলস্যে একবার প্রকাণ্ড একটা হাই তুললে; তারপর ডান হাতটা মুখের কাছে নিয়ে গোটাকয়েক তুড়ি দিলে। এইবার বোধকরি তার চোখ মেলে তাকাবার ফুরসৎ হল! অর্ধ-নিমিলিত নয়নে সে শুধু কইলে, ও! তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইছ? আমি এতক্ষণ ওদের বিদ্যের দৌড়টা দেখ-ছিলাম। পরামর্শ আমি তোমায় দিতে পারি আর এমন পরামর্শ আমার বুদ্ধির ভাঁড়ে আছে যে চন্দন ত' চন্দন—ওই চৌধুরীবাড়ির সবাই হকচকিয়ে যাবে।

ফাল্গুন যেন বিরাট মরুভূমির মধ্যে এতক্ষণে একটা মরূদ্যান খুঁজে পেল, তৃষ্ণায় যার ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এমন মনোরম আশ্রয় সে কখনো ছাড়তে পারে? তাই সে শামুকের কাছ ঘেঁষে বসে শুধোলে, হ্যাঁরে শামুক, তোর ক্ষিদে পেয়েছে? খানিকক্ষণ আগে খবর পেয়েছি—পায়েস রান্না হচ্ছে। খাবি তুই এক বাটি?

পায়েসের নামে হোঁৎকা একেবারে বেসামাল হয়ে উঠল। মুখ চটকে চোখ দুটো বড় বড় করে মন্তব্য করলে, গরম পায়েস খেতে কিন্তু ভারী মজা! তা আমরাও যখন রয়েছি—শুধু শুধু একা শামুকই বা খেতে যাবে কেন? তা ছাড়া ওর কি প্ল্যান তা আমরা ত' কিছুই শুনতে পারলাম না। সেটা কাজের নাও ত' হতে পারে।

মনে হল শামুক বেশ খানিকটা চটেছে। কিন্তু চটলেও বাইরে থেকে তা বোঝবার কোনো যো থাকে না। শুধু আর একবার চোখটা গোটাগুটি খুলে ফেলে বললে, তাহলে নেহাৎই আমার প্ল্যানটা তোরা শুনবি? কিন্তু শুনে বুঝতে পারবি কিনা—তাই শুধু ভাবছি আমি—

ফাল্গুন জবাব দিলে, আচ্ছা বল না তুই। তারপর আমি আঁচ করতে পারব সেটা কাজের না অ-কাজের!

শামুক মহা আরামে আর একটি মাঝারি হাই তুলে নিলে, তারপর বললে, আচ্ছা তোরা ত' জানিস—চৌধুরীবাড়ির প্রথা হচ্ছে ধূমধাম করে দুর্গোৎসব করা। ওদের বাড়িতে কালী পূজোর নেমন্তন্ন কখনও খেয়েছিস?

শামুকের প্রশ্ন শুনে এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। কালীপূজোর সঙ্গে জব্দ করার কোন পন্থা লুকিয়ে আছে?

আর একটু হলেই শামুক আবার চোখদুটো পরম আরামে বন্ধ করে ফেলেছিল আর কি !

কিন্তু সেই দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিল ফাল্গুন। সে বললে, না-না চৌধুরীবাড়ির কুলপ্রথা নেই কালীপূজো করবার। বহুদিন আগে একবার নাকি চৌধুরীবাড়িতে কালীপূজোর আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির কর্তা ভেদবমি হয়ে মারা যেতে ওরা চিরদিনের জন্যে কালীপূজো বন্ধ করে দিয়েছে।

শামুক ফাল্গুনের কথা শুনে মিটমিটি হাসতে থাকে ! তারপর কৌতুকের সুরে বলে, এখন ব্যাপারটা বুঝে দেখ। আসছে কাল অমাবস্যা—কালীপূজো। গাঁয়ের অনেক বাড়িতেই যথারীতি কালীপূজো হবে। কিন্তু চৌধুরীবাড়িতে তার কোনো আয়োজনই নেই। কারণ এ পূজো তারা করে না ! এখন ধরো, রাত্তিরের অন্ধকারে কেউ যদি চৌধুরীবাড়ির দোরগোড়ায় একটি কালী-প্রতিমা রেখে আসে তাহলে কি কাণ্ড ঘটে ? প্রতিমা বাড়িতে এলে পূজো না করেও উপায় নেই,—অথচ কালীপূজো করলে চৌধুরীবাড়ির সমূহ বিপদ !

ময়নাচাঁদ এতক্ষণ চোখদুটো বড় বড় করে শামুকের পরামর্শ শুনছিল। এইবার তুড়ি মেরে বললে, ঠিক কথা ! এগুলেও বিপদ, পেছুলেও বিপদ।

ফাল্গুনও পরামর্শটাকে একেবারে লুফে নিলে। মুখরোচক মন্তব্য করে বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক ! একেই বলে জলে কুমীর···ডাঙ্গায় বাঘ !

ঘুগনী এতক্ষণে একটা মন্তব্য করবার সুযোগ পেলে।

টেবিলের ওপর জোরালো একটা চাপড় মেরে বললে, ঠিক-ঠিক ! এইবার ঠ্যালা সামলাক চৌধুরীবাড়ি !

সেইদিন গভীর রাত্রে ময়নাচাঁদ, নাথু, হেঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগনীর দল অতি সন্তর্পণে একটি ছোট্ট নৌকো বেয়ে নিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ির খিড়কীর পুকুরের কাছে। নৌকোতে রয়েছে একটি কালীমূর্তি।

পা টিপে টিপে তারা নৌকো থেকে নামলে, তারপর নৌকোটাকে ভালো করে একটি গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে, সবাই মিলে ধরাধরি করে কালীমূর্তিটি নামিয়ে নিয়ে এলো খিড়কীর দরজার সামনে। প্রতিদিন ভোরবেলা চৌধুরী-গিন্নি এই দরজা খুলে খিড়কীর পুকুরে স্নান করতে আসেন।

পরদিন অমাবস্যার প্রভাতে দরজা খুলেই একটি কালীমূর্তি দেখে, চৌধুরী-গিন্নীর মুখের অবস্থাটা কেমন হবে, সেকথা ভেবে মনে সবাই কৌতুক অনুভব করলে।

হেঁৎকা ফিস্‌ফিস করে বললে, তাড়াতাড়ি নৌকো খুলে দে ভাই। কখন কি বিপদ ঘটে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া চৌধুরীবাড়িতে একটা ডাল কুত্তা আছে শুনেছি।

ভয়ের কথাই বলতে হবে।

নিঃশব্দে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ওদের নৌকো কোন পথে মিলিয়ে গেল কেউ তার হদিশ দিতে পারে না!

॥ সাত ॥

ক'দিন ধরে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির লোকদের আস্ফালনে গাঁয়ে পথ চলা দায় হয়ে উঠল!

তাদেরই প্যাঁচে পড়ে নাকি পূব-পাড়ার চৌধুরীরা কালীপূজো করতে বাধ্য হয়েছে।

কেমন জব্দ!

গ্রাম-দেশে এই জব্দ করবার জন্যে যে কত অভিনব পন্থা খুঁজে বের করা হয় তার আর লেখা-জোখা নেই।

সাম্‌না-সামনি মুখে কেউ স্বীকার করবে না যে, এই ফন্দী-ফিকির আমার,—তবে আড়ালে-আবডালে-পথে-ঘাটে বাহাদুরী নেবার অন্ত নেই!

হয়ত দেখা যাবে—ময়নাচাঁদ, নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগনীর দল একটা পুকুরের ধারে জমায়েৎ হয়ে বসেছে। হাতে আছে ছোট বড়শী—টপাটপ পুঁটি-মাছ তুলছে আর জড় করে রাখ্‌ছে।

হাতে জরুরী কাজ চালাচ্ছে বলে মুখ তাদের আদপেই বন্ধ নেই।

মুখরোচক গল্প চলছে—কিভাবে তারা নিশুতি রাতের অন্ধকারে নৌকো করে কালী-প্রতিমা চৌধুরীবাড়ির খিড়কীর দরজার কাছে নামিয়ে রেখে এসেছিল। চৌধুরীবাড়ির কর্তা-গিন্নী তারই ফলে মুখ চুণ করে কালীপূজো করতে পথ পায়নি!

একেই বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

জব্দ যদি করতে হয়—ত' এমনি মজাদার প্যাঁচই মগজ থেকে বের করা চাই। চৌধুরীদের বাড়ির ওপর যাদের রাগ আছে তারা এই জাতীয় ঝাল-মশলা দেয়া মুখরোচক আলোচনায় যোগ দিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসে। আসল কথা হচ্ছে, বেশ খানিকটা জল-ঘোলা করে সময় কাটিয়ে দেয়া।

পাড়াগাঁয়ে ত' সিনেমা, ক্রিকেট, খেলা আর চায়ের দোকানের আড্ডা নেই—তাই যে কোনো উপায়ে হোক—কানকথা বলবার আর গলাবাজি করবার উপায় খুঁজে বের করে নিতে হয়। সেই একটি কথাকে কেন্দ্র করে দিব্যি একটা মাস

কাটিয়ে দেয়া চলে ! যতক্ষণ প্র্যন্ত না আর একটি নতুন উপলক্ষ্য পাওয়া যায়—সবাই নলেন গুড়ের পাটালীর মতো সেই একটি বিষয়কেই চুষে-চুষে রস টেনে নেয় ।

চৌধুরীবাড়ির লোকেদের ঘোল খাইয়ে গাঙ্গুলীবাড়ির লোকেরা তাদের শ্যামা পূজো করাতে বাধ্য করেছে, পল্লীঅঞ্চলে এটা সত্যি দামী কথা। তা নিয়ে গাঁয়ের বৌরা যদি ক'দিন কোন্দল না করল, ছেলেরা গুলতুনি না পাকালো তবে গাঙ্গুলীবাড়ির এই 'ক্যারদানী' যে একেবারে মাঠে মারা যায় !

পাঁচফোড়ন ছড়িয়ে দিতে লাগলো ছেলের দল। কাজেই সল্‌তে উস্‌কে দিলে যেমন নিবু-নিবু প্রদীপ আবার দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে—তেমনি কিছুদিন আগে ঝিমিয়ে-পড়া গ্রাম আবার দিব্যি চাঙ্গা হয়ে উঠল ।

সত্যে আর মিথ্যেয় মিশিয়ে যখন চৌধুরীবাড়ির পিণ্ডি চটকাচ্ছে সবাই মিলে—তখন যদি হঠাৎ দেখা গেল যে, সেই চৌধুরীবাড়ির কোনো গোমস্তা এই পথ ধরে আসছে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই সব ছেলেদের ভোল পাল্‌টে যায় ।

কেননা আড়ালে মুখরোচক আলোচনায় কারো আপত্তি নেই, কিন্তু তাই বলে সামনা-সামনি অপ্রিয় কথা বলে কেউ তাদের বিষ নজরে পড়তে চায় না ! তাছাড়া আরও একটি গোপন কারণ আছে। চৌধুরীদের বাড়ি পালা-পার্বণ, বিয়ে, চূড়োতে ভোজটা দেয় ভালো ; তাদের কি বোকার মতো কটু কথা বলে চটাতে আছে ?

সেইজন্যে সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার ঢঙ পাল্‌টে দিতে হয়। চৌধুরীদের গোমস্তা কাছা-কাছি এলেই তার কানে যায় ছেলেরা পুঁটি মাছ ধরতে ধরতে চৌধুরীবাড়ির ভোজের গুণকীর্তন সুরু করছে আর কেবলি মুখ চোটকাচ্ছে !

জলবিচ্ছুটি গাঁয়ে এইভাবে নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া চলে হরদম।

গাঁয়ের ত্বু'টি পাড়ায় এত দলাদলি—আর এত মনান্তর যে কেউ কারো বাতাস সইতে পারে না।

কিন্তু তা সত্বে মজা এই যে, পাঠশালা কেবলমাত্র আছে ওই পশ্চিম-পাড়ায়। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে একটি চলতি আইন আছে আর একটি সর্বজন পরিচিত মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রটির কথা হচ্ছে ঃ

"লিখিব, পড়িব মরিব ত্বখে
মৎস্য মারিব খাইব সুখে।"

সাধারণ গেরস্ত ঘর—যাদের গোলায় সারা বছরের ধান মজুদ থাকে সেই বাড়ির ছেলেরা অধিকাংশই ওপরের মন্ত্রটি বড়ো নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে।

কিন্তু গাঙ্গুলীবাড়ি কিম্বা চৌধুরীবাড়ির ছেলেদের ত' সেই সোজা সড়কে পথ চললে চলে না ! কাজেই বিদ্যে ভাল হোক বা হোক না হোক পাঠশালায় তাদের যেতেই হয়।

অনেকদিন থেকে জলবিছুটি গাঁয়ের পশ্চিমপাড়ার ওই পাঠশালাটি আছে। গাঙ্গুলীদের ক'পুরুষ আগে কোন জমিদার যে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে-কথা লোকে একরকম ভুলেই গেছে। যারই ছেলে পড়াবার দরকার হয়—দিব্যি চোখ বুঁজে সামন্ত পণ্ডিতের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। গ্রামের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে সামন্ত পণ্ডিত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরী করতে পারেন।

অনেক বয়েস সামন্ত পণ্ডিতের। পড়ানোর চাইতে ঢুলতে তিনি বেশী ভালো বাসেন। তারপর আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলে বেতটা অবলীলাক্রমে সকলের পিঠেই পায়চারী করে বেড়াতে থাকে। কিন্তু বেড়াবার সময়ও সে বেত কিন্তু খুব সাবধানী। বড়লোকের বাড়ির ছেলেদের পিঠে সে কিছুতেই পড়ে না। কেন না সেখান থেকে পালাপার্বণে টাকাটা, সিকিটা, গাছের ফলটি, গরুর দুধটুকুন—পাবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে।

নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে কে খোঁড়া হতে চায়? চৌধুরীদের বাড়ির আর গাঙ্গুলীদের বাড়ির কয়েকটি ছেলে বরাবরই সামন্তমশায়ের পাঠশালায় পড়ে।

যখন তারা একটু সেয়ানা হয়ে ওঠে—আর অভিভাবকেরা মনে করেন যে, এখন ছেলেদের ইংরেজী লেখাপড়া ধরিয়ে দেয়া উচিত—তখুনই তাদের জিয়োনো কই মাছের মতো ওখান থেকে তুলে নিয়ে দু'খানা গ্রামের পর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়।

সামন্ত পণ্ডিতের এজন্য অনুতাপের অন্ত নেই। তিনি সব সময়ই গাঁয়ের লোকের কাছে কাঁদুনী গান—আমি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করি আর বড় ইস্কুল তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায়—ইংরেজী পড়াবে বলে! কিন্তু আমার কাছে থাকলে সে ছেলেটা নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি পেত সেদিকে কারো হুঁস নেই। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, না—না, এ একেবারে ঘোর কলিকাল, কারো উপকার এখানে করতে নেই। কষ্ট করে দুধ জ্বাল দিয়ে বাটিতে ঢেলে রাখবো—আর কেউ ওপর পড়া হয়ে এসে সরটুকু তুলে খেয়ে নেবে। একি সহ্য করা যায়?

সামন্ত পণ্ডিতের আদর আর শাসনে জলবিছুটি গাঁয়ের ছেলেরা শশীকলার মতো বাড়তে আর বিদ্যালাভ করতে থাকে। সেই পাঠশালার গণ্ডীতে চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলী বাড়ির কুচো-কাচার দল হুল্লোড় করে নামতা পড়ে আর কড়াকিয়া মুখস্থ করে। বাড়ির দলাদলিটা ওরা ঠিকমতো বুঝতে পারে না! একসঙ্গে খেলাধূলা করে, দরকার হলে কোমর বেঁধে কুস্তিও লড়েছে, আবার সামান্য একটা পেন্সিল নিয়ে এমন ঝগড়ার সৃষ্টি যেন পৃথিবী একেবারে রসাতলে যায়।···

একটি সুবিধে এই আছে যে, পাঠশালার মধ্যে যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যেই সেটা শেষ হয়ে যায়। কারো বাড়ি পর্যন্ত সেটা আর পৌঁছুতে পারে না।

সামন্ত পণ্ডিত এ ব্যাপারে, খুব সেয়ানা। তাকে শ্যাম আর কূল দুই-ই বজায় রাখতে হবে। তিনি একথা বেশ ভালো করেই জানেন যে চৌধুরী আর গাঙ্গুলী-বাড়ির কুচো-কাচার দল যদি তার পাঠশালায় এসে বিবাদ করে আর সেই বিবাদের সূত্র তাদের বাড়ি অবধি চলে যায়—তবে শেষ পর্যন্ত এমন জট পাকিয়ে যাবে যে, তাকে খোলা শক্ত হয়ে উঠবে!

কাজেই তোরা ঝগড়া মারামারি কর তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাঠশালা থেকে বেরোবার আগে সব "শোধ-বোধ ঘরে চলো" এ কথাটি পরিষ্কার করে যেতে হবে।

আর সত্যি কথাই তো।

ছেলেপুলের ঝগড়া শরৎকালের বৃষ্টির মতোই ক্ষণস্থায়ী। আসে আবার একটুখানি জল ছিটিয়ে চলে যায়।

এই খানিকক্ষণ আগে মারামারি করে কথা বন্ধ হয়ে গেল—আবার পর-মুহূর্তেই দু'জনে একসঙ্গে বসে খোস্ গল্প করছে আর চানাচুর চিবুচ্ছে।

ঝগড়া-ঝাঁটি, মারামারি, আড়ি আছে—কিন্তু দলাদলি আর সঙ্গ ছাড়াছাড়ি নেই। দু'পাক ঘুরে বেড়িয়ে এসেই গলা জড়িয়ে ধরে কথা বলে ওরা।

আড়ি আর ভাবের এই যে লুকোচুরি খেলা সেটা দিব্যি চলেছিল—সামন্ত-পণ্ডিতের পাঠশালায়।

সেদিন পাঠশালা ছুটির পর ছেলের দল হুল্লোড় করে—বই-খাতা-পত্তর নিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলেছিল এমন সময় দেখা গেল যে, উল্টো দিক থেকে সখের বাজার করে ফিরছেন—গাঙ্গুলীমশাই।

মস্তবড় একটা মাছ চাকরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খোস-মেজাজে আসছিলেন গাঙ্গুলীমশাই। তার সামনে পড়ে গেল—চৌধুরীবাড়ির পল্কু।

তিড়িং-লাফ লাফাতে লাফাতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল, খালের ধারের দিকে। সেখান থেকে সবাই দল বেঁধে নৌকো করে বাড়ি ফিরবে।

গাঙ্গুলীমশাই রসিকতা করে বললেন, কিরে পল্কু, টাট্টু ঘোড়ার মতো ত' খুব লাফাচ্ছিস—পরীক্ষা হয়ে গেছে? পল্কু জবাব দিলে হ্যাঁ, আমাদের পরীক্ষা শেষ। এইবার হবে প্রমোশন।

গাঙ্গুলীমশাই চোখ নামিয়ে বললেন, আরে শোন্-শোন্—

পলকু উত্তর দেয়, আমি যে খাল ধারে যাচ্ছি,—

নৌকোয় চড়ে বাড়ি যাবো সবাইকার সঙ্গে—

গাঙ্গুলীমশাই মুচকি হেসে জবাব দিলেন, তা ত' যাবি, বুঝলাম, কিন্তু প্রমোশনের দিন নম্বর নিবি কিসে করে?

এইবার পল্‌কু থমকে দাঁড়ায়।

সে নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। তাই নম্বর কি করে নিতে হয় তা জানে না—খটকা লাগে তার মনে।

সে শুধোয়, তাই তো! কি করে নম্বর নেবো? আপনি বলে দিন না!

গাঙ্গুলীমশাই হাসতে থাকেন।

তারপর জবাব দেন, কি বোকা ছেলেরে তুই পল্‌কু! প্রমোশনের দিন বস্তা নিয়ে এসে নম্বর ভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়—এ কথাটাও তোকে কেউ বলে দেয় নি? আজকে বাড়ি গিয়েই ঠাকুদ্দার কাছ থেকে একটি চটের থলে চেয়ে নিবি। নইলে ছেলেমানুষ তুই,—এত নম্বর বয়ে নিয়ে যাবি কি করে?

পল্‌কু মাথা নেড়ে উত্তর করে, ঠিক কথাই তো বলেছেন আপনি, যে করেই হোক বস্তা একটা জোগার করতেই হবে।

গাঙ্গুলীমশাই তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, এই ত' ছেলের বুদ্ধি হয়েছে!

তারপর হাসতে হাসতে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

এদিকে পল্‌কুর মনে বস্তার কথাটা ভারী ধরেছে

তাই ত'! অনেক নম্বর পাবে সে—৭০—১০০—৫০০ কত পাবে কে জানে! এত নম্বর বয়ে নিয়ে যওয়া ত' সোজা কথা নয়!

সত্যি! একটা ভাববার কথাই হল।

পথে আর কাউকে তার দুর্ভাবনার কথা জানালো না—পাছে সবাই তাকে বোকা ঠাউরে বসে।

নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে সে সরাসরি চলে গেল—তার ঠাকুর্দা চৌধুরী-মশায়ের বৈঠকখানায়—

—ঠাকুদ্দা, আমায় একটা চটের বস্তা কিনে দিতে হবে কিন্তু—

চৌধুরীমশাই দুপুরবেলাকার ঘুম থেকে উঠে বেশ আমেজ করে তামাক টান-ছিলেন। শুধোলেন, হ্যাঁরে পল্‌কু, পাঠশালা থেকে ফিরেই তোর বস্তার কি দরকার হল, শুনি? আমাদের বাজার সরকারের সঙ্গে বাজার করতে বেরুবি নাকি?

পল্‌কু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে, বারে, তা কেন? পাঠশালার প্রমোশনের দিন নম্বরগুলো বয়ে নিয়ে আসতে হবে না? যদি বড় বস্তা নিয়ে না যাই তবে কি করে অতগুলি নম্বর বয়ে নিয়ে আসবো?

নাতির মজাদার কথা শুনে চৌধুরীমশাই হো-হো করে হাসতে থাকেন। বললেন, হুঁ। অনেক বিদ্যে পেটে গিয়েছে, কিন্তু বস্তায় পুরে নম্বর আনবার পরামর্শটা কে দিলে শুনি?

পল্‌কু হাসি-খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উত্তর করলে' বা-রে! আমাদের পশ্চিমপাড়ার

গাঙ্গুলীমশাই। তিনিই ত' আমায় ডেকে বললেন, তোর ঠাকুদ্দার কাছ থেকে একটা বড় চটের থলি চেয়ে নিস···নইলে প্রমোশনের দিন নম্বরগুলো বয়ে নিয়ে যাবি কি করে ?

মাথা দুলিয়ে পল্‌কু শুধোলে, গাঙ্গুলীমশাই ঠিক কথাই বলেছেন ? না ঠাকুদ্দা ? বস্তা কিন্তু একটা না হলে চলবে না।

মুহূর্তে চৌধুরীমশয়ের মুখখানা ভারী হয়ে গেল। তিনি আড়চোখে একবার তার পাশে বসা নায়েবের দিকে তাকালেন। নায়েবমশাইও ইতিমধ্যে পল্‌কুর মুখের কথা শুনে—নড়েচড়ে বসে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন।

চৌধুরীমশাই হাত থেকে গড়গড়ার নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর নায়েবের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা নিজের কানেই শুনলে ত' নায়েব ?

—আজ্ঞে তা শুনলাম বৈ কি।

সবিনয়ে উত্তর করে নায়েব। এরই মধ্যে তার চোখদুটো কুতকুতে ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটা ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া গেল যেন চৌধুরীমশায়ের গম্ভীর গলায়।

চৌধুরীমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, বেশ বুঝতে পাচ্ছি—এ ইচ্ছে করে আমাকেই অপমান করবার জন্যে।

নায়েব হাত জোড় করে ইঙ্গিতে ইন্ধন জুগিয়ে বললে, আজ্ঞে তা ছাড়া আর কি ! মানীর মান নষ্ট করাই ত' ওদের একমাত্র কাজ !

তারপর এদিক-ওদিক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে উত্তর করলেন, এর একটা মুখের মতো জবাব আমিই দিতে পারি—

পল্‌কু কিন্তু ঠাকুদ্দা আর নায়েবমশায়ের কথা কিছুই বুঝতে পারে নি। তাই অসহিষ্ণু হয়ে আবার বললে, আমার বস্তাটা একটু তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিও কিন্তু—

এইবার চৌধুরীমশাই গর্জন করে উঠলেন। বললেন যা—যা—আমার সমুখ থেকে দূর হয়ে যা ! বাচ্চা ছেলেকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে আমায় অপমান করা ! কিন্তু আমার নামও পুবপাড়ার চৌধুরী। বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায় আমার হুমকিতে।

চৌধুরীমশায়ের হুমকিতে পল্‌কু সত্যি ভয় পেয়েছিল। ঠাকুদ্দার এ মূর্ত্তি দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়। তাই তাড়াতাড়ি বই-খাতা-পত্তর নিয়ে একেবারে পালিয়ে গেল অন্দর মহলে মায়ের কাছে।

চৌধুরীময়াই গম্ভীর গলায় ডাকলেন,—নায়েব—

ঘাড় কাৎ করে নায়েব বললেন, আজ্ঞা করুন—

এবার আদেশ করলেন চৌধুরীমশাই।

বললেন, সাত দিনের মধ্যে পুবপাড়াতে আমার এলাকায় একটি পাঠশালা বসাতে হবে। আমার কথার যেন নড়চড় না হয়।

॥ আট ॥

চৌধুরীমশায়ের রাত্রে ঘুম নেই!

সাতদিনের মধ্যে একটি পাঠশালা পূব-পাড়ায় বসাতে হবে। নায়েব জীবনে অনেক কাজ করেছে, আর এজন্যে তার হাতযশও আছে খুব।

রাতারাতি প্রজার বাড়ি ভেঙে দিয়ে তাকে চষা ক্ষেত তৈরী করা, কারণে-অকারণে লোকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া, নদীতে নতুন-ওঠা চর দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে দখল করা, গোপনে কারো সম্পত্তি নিলেম করে নেয়া···এ সমস্ত ভালো-ভালো কাজে চৌধুরীবাড়ির নায়েব এত বেশী দক্ষতা ইতিপূর্বে দেখিয়েছে যে, দেশে গুণের আদর থাকলে কবে সে অশান্তি-সৃজনের নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত!

কিন্তু ভাঙ্গা আর গড়া···এই দুই জাতীয় কাজ একই পথ ধরে চলে না। একজন যদি চলতে চায় ডাইনে—তবে আর একজন যায় বাঁয়ে।

দু'জনের সঙ্গে নাকি চিরকালের আড়ি। নায়েব মহা বিপদে পড়ে গেল।

নায়েবের এক দুষ্কর্মের সাথী ছিল। তার নাম হচ্ছে ফিচ্‌কেরাম। ফিচ্‌কেরামের একটি চোখ। কানা লোকে বলে যে, ওই কানা চোখের ভেতরেই নাকি যত কুমতলব লুকিয়ে থাকে।

অনেক সময় ফিচ্‌কেরামই নায়েবকে নাচিয়ে তোলে মানুষের ক্ষতি করবার জন্যে।

নায়েব ভাবলে, ওরই সঙ্গে আগে একটি পরামর্শ করা দরকার। নায়েব গিয়ে সন্ধ্যের মুখে ডাক দিলে, ওহে ফিচ্‌কেরাম বাড়ি আছ?

সে নিজের দাওয়ায় বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল। আচমকা নায়েবের হাঁক শুনে হুকো-কলকে ফেলে কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে ছুট দিলে। ওদিকে যে কলকের আগুন ছড়িয়ে পড়ে বেড়াতে, তখুনি আগুন ধরে যাচ্ছিল সেদিকে ফিচ্‌কেরামের এতটুকু হুঁস নেই।

ভাগ্যিস তার মেয়ে এসে সেটা ধরে আর ঝাঁট দিয়ে আগুন দাওয়ার নীচে ফেলে নইলে একটা লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল আর কি!

অবিশ্যি এতে দুঃখের কোনো কারণ ছিল না। কেননা এর আগে বহু লোকের বাড়ি ফিচ্‌কেরাম রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

নায়েব গম্ভীর গলায় বললে, ফিচকে, তোর বাইরের দাওয়ায় একটা মাদুর পেতে দিতে বল—দরকারী কথা আছে।

দরকারী কথা থাকলেই ফিচকেরামের দুটো পয়সা উপরি-লাভ হয়। সন্ধ্যে-বেলায় যখন নায়েব নিজেই ছুটে এসেছে,—ডেকে পাঠায় নি, তখন নিশ্চয়ই জরুরী কথাই হবে!

অন্ধকারের মধ্যে তাই ওর একটি চোখ আপনা থেকেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নায়েব কিন্তু তা দেখতে পেলে না।

ফিচকেরামের হাঁক-ডাকে ওর ছোট মেয়েটা এসে একটা মাদুর বাইরের দাওয়ায় পেতে দিয়ে গেল।

ফিচকেরাম বললে, হুঁকোর জল বদলে নায়েবমশাইকে তামাক দে—

মেয়েটা ছুটোছুটি করে তামাক দিয়ে গেল।

মাদুরে বসে নায়েব আপনমনে তামাক টেনে চলেছে—তার গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ কানে শোনা যাচ্ছে।

নায়েবমশায়ের চোখ, মুখের ভাব যে কি রকম হচ্ছে সেটা অন্ধকারের মধ্যে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না!

ফিচকেরাম মনে মনে আঁচ করে নিলে যে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বিশেষ সাঙ্ঘাতিক হবে। নইলে নায়েবমশাই শুধু তামাকই টেনে চলেছে···মুখ খুলছে না কেন?

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে—দূর জঙ্গলাঅঞ্চলে আচমকা শেয়ালের চিকন-সুরের গানের কলিও শোনা যাচ্ছে···আশেপাশে মশার ভ্যান্‌ভ্যানানিরও বিরাম নেই। এইরকম অসহ্য অবস্থায় চুপচাপ আর কতক্ষণ বসে থাকা চলে?

নায়েবমশাই ঘুমিয়ে পড়ল না তো? না, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কেননা গুড়ুক গুড়ুক শব্দ ঠিক একভাবেই কানে এসে ঢুকছে।

এমন সময়ে নায়েবমশাই অন্ধকারের মধ্যে কথা কয়ে উঠল। শুধোলে, হ্যাঁরে ফিচ্‌কে, চট্‌পট একটা পাঠশালা বসাতে পারিস?

নায়েবমশায়ের প্রশ্ন শুনে ফিচকেরাম যেন অগাধ সমুদ্রে পড়ে গেল।

ব্যাপার কি?

মামলা, মোকদ্দমা, জাল, জুয়াচুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চর দখল, অবাধ্য প্রজাকে শায়েস্তা করা, কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া···এর কিছুটাই নয়—একেবারে কিনা নিরামিষ পাঠশালা!

নায়েবমশায়ের হঠাৎ মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায় নি ত'? কেউ সুযোগ

বুঝে ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে দিল নাকি ? দিয়েছে—চাষাদের গাঁয়ের কত নৈশ-বিদ্যালয় পাইক লাগিয়ে দিয়েছে গুঁড়িয়ে !

আজ হঠাৎ ভূতের মুখে রাম নাম কেন ?

ফিচ্‌কেরামকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে নায়েব হঠাৎ চটে উঠে বললে, কি রে ? কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে বড়ো ? ভারী মাতব্বর হয়ে উঠেছিস নয় ?

অন্ধকারে বসে মশার কামড় খেতে খেতে কি জবাব দেবে সে ? তাই কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে শুধোলে, আজ্ঞে পাঠশালা সে ত' কবে চুকে বুকে গেছে ।

সঙ্গে সঙ্গে নায়েব খ্যাক খ্যাক করে ওঠে !

আরে বোকৃচন্দর, তোর জন্যে পাঠশালা বসাচ্ছি নাকি ? চৌধুরীমশায়ের হুকুম—সাতদিনের মধ্যে পূর্ব-পাড়ায় একটি পাঠশালা খুলতে হবে । কাজ যদি হাসিল করতে না পারি—তবে কি বুড়ো বয়সে চাকুরী খুইয়ে ঘরে বসে থাকবো ?

—ওরে বাবা কি সর্বনেশে কথা ।

ফিচকেরাম মনে আঁচ করার চেষ্টা করতে থাকে ।

নায়েবের চাকুরী যাওয়া মানে, তার সংসারে একেবারে হাঁড়ি চড়া বন্ধ ।

পাঠশালা নিয়ে যে এত জ্বালা সে কথা ত' আগে জানা ছিল না ।

নায়েব আবার বললে, আরে, জায়গার জন্যে ভাবিনে । বাইরের অতিথি-শালাটা পরিষ্কার করে নেওয়া ! কর্তাকে বলে ওটা করা যাবে ।

ছোটলোকের ছেলেদের জন্যে গোটাকয়েক চ্যাটাই কিনে দেবো'খন—আর ভদ্দরপাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্যে খান-কয়েক বেঞ্চ—সে একরকম ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিক । কিন্তু আমি ভাবছি পণ্ডিতের কথা ।

এরপর নায়েব আচমকা এমন একটা প্রশ্ন করে বসল—যার ফলে ফিচকেরাম দাওয়া থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল ।

নায়েব শুধোলে, হ্যাঁরে ফিচকে, তুই না হয় ছেলেছোকরাদের পড়া, গায়ে একটা চাদর দিয়ে—টিকি রেখে পণ্ডিত হয়ে বোস ।

আঁৎকে উঠে ফিচকেরাম উত্তর করলে, ওটি আদেশ কোরো না নায়েবমশাই । ওরে বাবা, পাঠশালার পণ্ডিত ! হতে হবে বিদ্যের জাহাজ ! কিন্তু মাইনে জুটবে নগদ পাঁচটি তঙ্কা ।

নায়েব দাওয়ায় একটা থাবড়া মেরে হুঙ্কার দিয়ে উঠে কইলে, হুঁ ! বিদ্যের জাহাজ । ওই যে ও পাড়ার সামন্ত-পণ্ডিত । এমন আরকি বিদ্যে-দিগ্‌গজ ধনুর্ধর শুনি ?

কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা—এই ত' সব পড়াতে হয় । তোর কি ছাই কিছু মনে নেই ?

ফিচকেরাম মনে মনে বললে, তোমার সঙ্গে চলাফেরা করে মা সরস্বতীর কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছিলাম সব বেমালুম ভুলে গেছি!

নায়েব ওকে ঠ্যালা মেরে বললে, যা হোক একটা কিছু বলনা তাড়াতাড়ি। আমার আবার মরবার ফুরসৎ নেই!

ফিচ্‌কেরাম উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, ছেলেদের পিঠে যদি বেমালুম বেত চালালে কাজ হয়—তবে আমি রাজি আছি নায়েবমশাই। ও কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা, ধারাপাত, ব্যাকরণ—কিছুই আমাকে দিয়ে হবে না। পেল্লাদ 'ক' অক্ষর শুনেই 'মুচ্ছো' গিয়েছিল—আমার আবার পাঠশালার নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে!

নায়েবমশাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জবাব দিলে, তবেই তোকে দিয়ে হয়েছে! ছেলে-দের পিঠে বেমালুম বেত চালাবি। জানিস, ওখানে চৌধুরীবাড়ির ছেলেরাও পড়বে। চাই কি চৌধুরীমশাই হয়ত নিজেই গিয়ে হাজির হবেন—কেমন পড়াশুনো চলছে দেখতে!

—ওরে বাবা তাহলে আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কোরো না নায়েবমশাই! কে আর সাধ করে হাঁড়িকাঠে মাথা গলিয়ে বসে থাকে?

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বললে ফিচ্‌কেরাম। তারপর একটুখানি থেমে উত্তর দিলে, আমি কিন্তু একটা বুদ্ধি বাৎলে দিতে পারি।

নায়েব মশাই নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলে, কি, শুনি?

ফিস্‌ ফিস্‌ করে ফিচ্‌কেরাম বলতে সুরু করলে,—বেশ বুঝতে পারছি চৌধুরী-মশাই পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীদের সঙ্গে রেষারেষি করেই এই পাঠশালা খুলতে চাইছেন। এখন আমাদের এমন কাজ করা উচিত, যাতে এক ঢিলে দুই দুই পাখী মারা যায়।

নইলে পৃথিবীতে এত ভালো ভালো কাজ থাকতে—শেষকালে কিনা পাঠশালা। এই নায়েব মশায়ের ইঙ্গিতে সে কত পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছে।

নায়েবমশাই বিরক্ত হয়ে বললে, একটা কথা বলতে গিয়ে তুই বড় ভনিতা করিস ফিচকে। যা বলতে চাস্‌ চটপট্‌ বলে ফেল।

ফিচ্‌কে মুখটা চোট্‌কে নিয়ে একটা আনন্দের ধ্বনি করে উঠল। উত্তর দিলে, আমি সেই কথাই ত' খোলসা করে বলতে চাইছি নায়েবমশাই। তুমি একটু ধৈর্য্য ধরে আমার কথাগুলি শোনো।

—বল।

চলো, আমরা সরাসরি সামন্তপণ্ডিতের কাছে চলে যাই।

—সামন্ত পণ্ডিত? সে রাজি হবে কেন?

নায়েবমশায়ের কণ্ঠে দারুণ বিরক্তি।

—আরো মন স্থির করে শোনো তাহলে। আমরা যদি সামন্ত পণ্ডিতকে রাজি করাতে পারি তাহলে চৌধুরীমশায়ের পাঠশালা ত' খোলা হলই—আবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা যায় উঠে! একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

নায়েবমশাই ফিচকেরামের কথা শুনে হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মাদুরের ওপর একটু নড়েচড়ে বসে গদগদ কণ্ঠে বললে, এটা ত' তুই খুব ভালো বুদ্ধি মগজ থেকে বার করেছিস। সামন্তপণ্ডিতকেই হাত করতে হবে। পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা যাতে উঠে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে—পূবপাড়ার পাঠশালা। এই কাণ্ডটা যখন ঘটবে—চৌধুরীমশাই নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

ফিচকেরাম ফোড়ন দিয়ে উত্তর করলে, চাই কি কর্তা খুশী হয়ে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে পারে, আর শাল-দোশালা বকশিস দেওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

নায়েব মনে মনে খুশী হলেও মুখে সেটা গোপন করে বললে, যা-যা, তোকে আর মেলা বকতে হবে না! চল্ দেখি—সামন্তপণ্ডিতের কাছে আজ রাত্তিরেই যাবো—

ফিচ্‌কে অবাক হয়ে শুধোলে, এক্ষুনি ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—শুভস্য শীঘ্রম্। তুই যে কথা বলেছিস তাই ঠিক! একেবারে যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখী!

দাওয়া থেকে নেমে পড়ে নায়েব মশাই।

ফিচ্‌কেরাম উত্তর দেয়, তাহলে একটু অপেক্ষা করো নায়েবমশাই, আমি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে আসি—

ফিচ্‌কেরামের ঘাটের ডিঙি নিয়ে দুজনে যখন সামন্তপণ্ডিতের বাড়ি উপস্থিত হল —তখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

সামন্তপণ্ডিত বাইরের ঘরে বসে একটি মিট্‌মিটে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের ভাইপোকে পড়াচ্ছিলেন।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—চৌধুরীমশায়ের নায়েব আর সেই সঙ্গে ফিচকে-রামকে দেখে তিনি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।

পণ্ডিতমশাই সত্যি নির্বিবাদী মানুষ।

কারো সাতেও নেই……পাঁচেও নেই।

সংসারে অভাব প্রচুর, তবু কোন ঝামেলায় তিনি যেতে চান না। নিজের পাঠশালাটি নিয়ে দিন কাটান। মনে মনে এই ধারণা আছে যে, যদি কেউ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ত' এই পাঠশালাই পারবে। পাঠশালায় পড়ানো তার কাছে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর আরাধনা করা।

ছেলেদের কাছে কলাটা মূলোটা পান—আর আছে গাঙ্গুলীদের দেয়া বৃত্তি।

ঝঞ্ঝটে পা বাড়াতে তাঁর একান্ত আপত্তি। কিন্তু মূর্তিমান দুটো ঝঞ্ঝাট যখন এত রাত্তিরে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে হাজিরহল—তিনি সত্যি প্রমাদ গনলেন।

সামন্তপণ্ডিতমশাই বেশভাল করেই জানেন যে, চৌধুরীবাড়ির নায়েবের কোন কাজ তার তাছে নেই।

কথায় বলে—একা রামে রক্ষা নেই—সুগ্রীব তার দোসর। সেই নায়েবের সঙ্গে আবার ফিচকেরাম!

আজ নাজানি কার মুখ দেখে তাঁর ঘুম ভেঙ্গেছিল। তবু মনে যে কথা জাগে, সব সময় মুখে সে কথা কোনো মতেই প্রকাশ করা চলে না। তাই সামন্ত পণ্ডিত-মশাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শুধোলেন, এই যে নায়েবমশাই, তা' এত রাত্তিরে বিশেষ আবার কি মনে করে?

নায়েবমশাই বললে, আজ্ঞে আপনার সঙ্গে আমাদের একটু পরামর্শ আছে, কুটিরে জরুরী।

সামন্ত পণ্ডিতমশাই তাঁর ভাইপোকে বই-শ্লেট-পেন্সিল গুছিয়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বললেন। ছেলেটি কিন্তু ভারী অবাক হয়ে গেল।

রোজ রাত্তিরে পড়াশুনোর শেষে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসে। আজ আবার এ নতুন নিয়ম কেন?

সে বললে, এক সঙ্গেই না হয় খাবো'খন—

শেষকালে পণ্ডিতমশাই ধমক দিতে সে মুখভার করে উঠে চলে যায়।

চৌধুরীমশায়ের নায়েব ভণিতা করতে ভালবাসেন না। সোজা-সুজি নিজের মনের কথা জানিয়ে একটি দশটাকার নোট সামন্ত পণ্ডিতের হাতে গুঁজে দেয়।

লোকে সাপ দেখলে যেমন ভয়ে তিন হাত লাফিয়ে পেছু হটে যায়' তেমনিভাবে সামন্তপণ্ডিত আঁৎকে উঠলেন, বললেন, দেখুন নায়েবমশাই; আমি চিরটাকাল গাঙ্গুলী বাড়ির নুন খেয়ে আসছি! পাঠশালার ছেলেরা ভালোবেসে যে যা দেয়—হাত—পেতে নিয়ে থাকি। তাতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু তাই বলে এ অধর্ম আমি করতে পারবো না।

নায়েব ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, দেখুন, আপনি পশ্চিমপাড়ায় পাঠশালা চালিয়ে মাসে পনেরো টাকা পেয়ে থাকেন। আপনি যাতে এখন থেকে আরও দুটাকা বেশী পান, আমি চোধুরীমশাইকে বলে সেই ব্যবস্থা আপনার করে দেবো।

তাছাড়া চৌধুরীবাড়ির ছেলেদের সকাল-সন্ধ্যে পড়িয়ে আরো কিছু পাবেন—

সামন্ত-পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে উত্তর করলেন, আপনি আমায় লোভ দেখাতে এসেছেন?

—এক্ষুণি আমার বাড় থেকে বেরিয়ে যান।

ফিচ্‌কেরাম ফোড়ন দিয়ে বললে, এমন সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লেন পণ্ডিত মশাই, কাজটা কি ভালো হল—?

পণ্ডিত সত্যি চটে গেলেন ; আগে আপনারা নামুন আমার দাওয়া থেকে।

নায়েব রাগে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলে, ছেলেপিলে নিয়ে আপনি ঘর করেন পণ্ডিতমশাই, একটা বিপদ-আপদ হতে কতক্ষণ ? খুব সাবধানে থাক্‌বেন। এই বলে ফিচ্‌কেরামের হাত ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

॥ নয় ॥

আগেকার দিনে সারাদেশময় আড়কাঠির দল ঘুরে বেড়াত। নিরক্ষর গেঁয়ো লোক পেলেই তাকে নানারকম টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে চা-বাগানে কুলি করে চালান দিত। আড়কাঠির মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনে যারা তার ফাঁদে পা দিত—সারা জীবনেও তাদের মধ্যে অনেকে দেশে ফিরে আস্‌তে পারত না! রোগে ভুগে, না খেতে পেয়ে, খেটে খেটে ঐ চা বাগানেই বহু লোক মারা পড়ত। দেশের আত্মীয়-স্বজন তাদের আর কোন সন্ধানই জান্‌তে পারত না।

ফিচ্‌কেরাম এইরকম ছোটখাটো আড়কাঠির কাজ সুরু করে দিলে জলবিছুটি গাঁয়ে।

ওর কাজ অবশ্য চা বাগানে কুলি চালান দেয়া নয়! ওর মহান্ উদ্দেশ্য হল—নায়েবের : আদেশমতো চৌধুরীদের পাঠশালার জন্য পড়ুয়া জোগাড়। যেন তেন প্রকারেণ পড়ুয়া ওকে সংগ্রহ করতেই হবে, নইলে নায়েবের কাছে দাঁত-মুখ খিঁচুনি খেতে হবে।

চৌধুরীমশায়ের একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! ফিচ্‌কেরামের বরং একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু চৌধুরীমশায়ের পাঠশালা ঠিক যথা সময়ে খুলতেই হবে।

চন্দ্র-সূর্য গো-ব্রাহ্মণ সাক্ষী রেখে কাজ। চৌধুরীবাড়ির বাইরের অতিথিশালা একরকম ইঁদুর-বাদুড়ের আস্তানা হয়েছিল। কর্তার হুকুমে নতুন করে বাঁশের বেড়া দেয়া হয়েছে। ঘরামীরা তাতে মাটি লেপে দিয়েছে চমৎকার করে। পাশের ডোবা থেকে মাটি তুলে ভিটেটাকে বেশ উঁচু করা হয়েছে। আল্‌কাত্‌রা বুলিয়ে দেয়া

হয়েছে খুঁটিগুলোর ওপর ! ঝকঝকে তক্‌তকে করে লেপে দিয়েছে দাওয়া। সেই-গুলো শুকিয়ে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

চৌধুরীবাড়ির সবাই বলাবলি করছে,—মা সরস্বতী এমন নিরিবিলি জায়গায় আপনি হেঁটে এসে বিদ্যে দান করে যাবেন।

চৌধুরীমশায়ের নিজের উৎসাহ সবচাইতে বেশী। তিনি বাড়ির মালিদের বলে দিয়েছেন—পাঠশালার দুধারে রজনীগন্ধার ঝাড় লাগিয়ে দিতে হবে। আর ঢোকবার মুখে থাকবে—দুটো কামিনীফুলের গাছ। যখন গন্ধ বেরুবে চারদিক একেবারে ম’-ম’ করতে থাক্‌বে।

সুগন্ধ না হলে নাকি বিদ্যেদেবী পাকাপাকি আসন করে বসেন না। সর্বশুক্লা দেবী সরস্বতী, তাই তাকে সাদা ফুলে তুষ্ট করতে হবে।

কিন্তু গোলমাল বেঁধেছে আসল ব্যাপার নিয়ে। ঘোড়া যদি জোটানো যায় তাহলে লাগামের জন্য আটকায় না। পাঠশালার ঘর ত’ বেশ তৈরী হল।

যত ভাবনা এখন পড়ুয়া নিয়ে।

পড়ুয়া যদি না জোটে তবে মা সরস্বতী এসে চরণযুগল রাখবেন কোথায় ?

সারা ঘর ভরে যাবে···ছেলেদের নামতা পড়ার শব্দে, সারাটা বাড়ি গম্‌গম্‌ করতে থাক্‌বে—তবে ত’ পাঠশালা ! নইলে নিঝুমপুরীতে বিদ্যা দেবেই বা কে নেবেই বা কে ?

এই জরুরী কাজের ভার পড়েছে কিচ্‌কেরামের ওপর ! এ গরু, ভেড়া, ছাগল নয় যে, তাড়িয়ে এনে গোয়ালে আট্‌কে দিলেই দিনের কাজ শেষ হয়ে গেল !

মানুষের বাচ্চা নিয়ে কারবার। তার ওপর তারা পড়তে শুনতে রাজি হয় তবে ত’ ! ধুর্ত শেয়ালের কাজ নয় যে—সন্ধ্যের আঁধারে গেরস্ত বাড়ির আনাচে—কানাচে ঘুরে বেড়াবে, তারপর সুযোগ বুজে হাঁসটা মুরগীটার ঘাড়ে কামড় দিয়ে চুপিসারে পালিয়ে আসবে !

শিকার করতে হবে মানুষের বাচ্চা। তাও শুধু একদিন কোনো রকমে এনে খোঁয়াড়ে ঢোকালে হবে না ; রোজ রোজ আসে, পাততাড়ি বগলে আসে, আগ্রহ করে লেখাপড়া শিখতে আসে—এমন ছেলে চাই একপাল।

রাগে-দুঃখে ফিচ্‌কেরামের নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে হল। ওর আছে শুধু একপাল মেয়ে ! যদি অপগণ্ড একদল ছেলেও থাকত—তাহলে তাদের পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিয়ে নায়েবমশায়ের কাছ থেকে দিব্যি বাহবা কুড়োতে পারত !

ঘরে যখন ব্যবস্থা নেই—তখন ঘরের খেয়ে বনের মোষই তাড়াতে হবে। যেতে হবে আশেপাশের বাড়িগুলিতে—কামার, কুমোর, ছুতোর পাড়ায় যদি সেখানকার শিশুপাল বধ করতে পারে !

দাওয়ায় বসে বেশ খানিকক্ষণ ধরে তামাক খেয়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে ফিচ্‌কেরাম অভিযানে বেরুলো।

প্রথমেই দেখা খালের ধারে মাছ ধরে যে কুসমী বুড়ী তার সঙ্গে—

কুসমী-বুড়ী আপনমনে বিড়বিড় করে কাকে যেন গাল দিচ্ছিল আর খালের অল্প জলে চুনো মাছ ধরছিল।

ফিচ্‌কেরাম গিয়ে খালের ধারে দাঁড়ালো। তারপর শুধোলে, হ্যাঁগো বুড়ী, তোমার ছেলে কোথায় ?

কুসমী-বুড়ী আবার কানে দিব্যি খাটো। সে শুনলে, জেলে কোথায় ? ভাবলে তার সোয়ামীর কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাই মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, জেলে ? হাটে গেছে মাছ বিক্রি করতে। আমি দেখছি—কুচো মাছ কিছু ধরতে পারি কিনা। নেবে নাকি তাজা কিছু কুঁচো মাছ ? সস্তায় দেবো'খন।

ফিচকেরাম দেখলো সমূহ বিপদ! সে জিজ্ঞেস করলে ওর ছেলের কথা। পাঠশালার জন্যে শিকার করা যায় কিনা এই মতলব, নিয়ে আর বুড়ী কিনা টেনে নিয়ে এলো জেলেকে! তার ওপর আবার বলছে মাছ কিনতে! এইরকম ফ্যাসাদে পড়লেই পড়ুয়া জোগাড় হয়েছে আর কি!

ফিচকেরাম তাই তাড়াতাড়ি ওর পাশ কাটাবার জন্যে বললে, তোর ছেলে ফুটি কোথায় ? তাকেই ত' খুঁজছি আমি—

কুসমী-বুড়ী আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে উত্তর দিলে, ও! পুটিমাছের কথা বলছ তুমি ? তা-ও রয়েছে আমার চুপড়ীতে। বেশ তাজা পুটিমাছ। ক'গণ্ডা নেবে তাই তুমি বলনা! আমি বেছে বেছে বড়ো বড়োগুলো তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু পয়সাটা এক্ষুণি নগদ দিতে হবে। আমার পান-দোক্তা ফুরিয়ে গেছে কিনা—তাই অবেলায় মাছ ধরতে বেরিয়েছি। তোমাদের জেলেবুড়ো কোন রাত্তিরে ফিরবে কে জানে ?

কুসমীবুড়ী আপনমনেই বিড় বিড় করে বকে চলে। ফিচকেরাম দেখলে, এখানে বুড়ীর সঙ্গে যত কথা বলতে যাবে ততই মাকড়শার জালে জড়িয়ে পড়বে! বুদ্ধিমানের কাজ হবে একেবারে জবাব না দিয়ে সরে পড়া।

যেমন ভাবা অমনি কাজ!

কুসমী-বুড়ী কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে খালের জলে দাঁড়িয়েই চীৎকার করতে লাগলো, ও বাবু, মিছিমিছি রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন ? না হয় একগণ্ডা মাছ ফাউ দেবো। নিয়ে যাও—একেবারে জলজ্যান্ত লাফাচ্ছে।

জলজ্যান্ত লাফানো মাছ দেখবার কামনা ফিচকেরামের আদৌ ছিল না। সে এখন বুড়ীর হাত থেকে নিস্তার পেলে বাঁচে।

বকের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে সে এইবার সত্যি গোলধার থেকে পালিয়ে এলো অনেক দূরে।

হাঁটতে হাঁটতে ফিচকেরাম ছুতোর পাড়ায় এসে হাজির হল। সঞ্জয় ছুতোর শক্ত আর মোটা কাঁঠাল গাছের ওপর র‍্যাঁদা চালাচ্ছিল। তাকে যোগান দিচ্ছিল তারই দশ বছরের ছেলে বিষ্টু।

ফিচকেরাম বেশ আয়েস করে গিয়ে দাওয়ায় বসল। বললো, একটু ভালো করে তামাক সেজে খাওয়াও ত' ছুতোরের-পো—

জলবিছুটি গাঁয়ে ফিচকেরামের নাম-ডাক ত' বিশেষ ভালো নয়। সবাই ওকে ভয় করে চলে। নায়েবের মোসাহেব বলে কেউ প্রাণ খুলে ওর সঙ্গে মিশতে চায় না। কি বলতে কি বলে ফেলবে—শেষকালে প্রাণ নিয়ে টানাটানি লাগুক আর কি?

দেশে-গাঁয়ের লোকেরা আড়ালে আবডালে বলে, ওরা হচ্ছে কাঁচা খেকো দেব্‌তা—ভালো করতে পারে না কিন্তু মন্দ করবার গোঁসাইঠাকুর। পেন্নাম্ ঠুকে ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

কাঁচা-খেকো দেবতাদের ভয় আছে বলেই তাদের খাতির যত্নটা একটু বেশী করে জানাতে হয়।

তামাকটা সেজে দিয়ে সঞ্জয় ছুতোর আবার নিজের কাজে মন দেয়।

ফিচকেরাম এইবার আস্তে আস্তে আসল কথাটা পাড়ে। বললে, হ্যাঁগো ছুতোরের পো, বিষ্টুকে লেখাপড়া শেখাবে না?

সঞ্জয় যেন এবার সত্যি অবাক হল। এত কথা থাকতে কাঁচা খেকো দেব্‌তা লেখাপড়ার কথা তোলে কেন? ও যদি সোজাসুজি উঠোনে ঢুকে বলত ছুতোরের পো, তোমার লাউয়ের মাচায় দিব্যি লাউ ঝুলছে আমি একটা নিয়ে যাব,—কিম্বা তোমার কলাবাগানে দিব্যি পুরুষ্টু সবরী কলা নেমেছে, এক কাঁদি কেটে দাও, বাড়িতে পূজো আছে কিনা—

তবে সঞ্জয় ঠিক ঠিক বুঝতে পারত কথাটা। কিন্তু এত কথা থাকতে একী কাণ্ড! ওর ছেলে বিষ্টুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ফিচকেরামের রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না? নিশ্চয়ই কু-মতলব আছে লোকটার মনে মনে।

মনে যে কথাই উঠুক কিন্তু মুখে একটা জবাব দিতেই হয়। তাই অতি বিনয় করে সঞ্জয় ছুতোর বললে, আজ্ঞে আমাদের ছেলেদের আবার লেখাপড়া! আমার কাঠের কাজে হাতে হাতে একটু সাহায্য করলে দু'পয়সা ঘরে আসে। পাঠশালায় যে পাঠাবো মাইনে জোগাবে কোত্থেকে? ছেলেটা গায়ে দেবে এমন একখানা জামা কিনে দিতে পারিনে! গরীবলোকের ঘোড়া রোগ হলে কি চলে? লেখাপড়া শিখবে আপনাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

ইচ্ছে করেই সঞ্জয় ছুতোর ফিচ্‌কেরামকে একটু আকাশে তুলে ধরল তাতে যদি শনির কোপ থেকে রেহাই পাওয়া যায় !

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী !

এঁটেল মাটির মতো লেগে রইল ফিচ্‌কেরাম।

বললে, এটা কি একটা কথা হল ছুতোরের পো ? আমি থাকতে তোমার ছেলের লেখাপড়া শেখা হবে না ? একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবোই।

সঞ্জয় মনে মনে ঠিক করে নিলে, পায়ে যখন জোঁক ধরে—তখন তার হাত থেকে বাঁচবার সহজ উপায় হল সেই জোঁকের মুখে নুন লাগিয়ে দেয়া !

তাই হঠাৎ বলে বসল, আচ্ছা বাবু, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে তোমার হাতেই ছেড়ে দেব। তবে কি জানো বাবু, সংসারে এখন বড়ো টানাটানি চলছে। তুমি গোটাদশেক টাকা না হয় আমাকে দাও। আমি তোমার বাড়ি কাঠের কাজ করে শোধ দেবো !

ফিচকেরাম দেখলে এ বড় শক্ত ঠাঁই।

এই হাটে ছুঁচবেচা তার কর্ম নয় ! তাই ওর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে হুঁকোটা খুঁটির সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে এক-পা দু-পা করে ছুতোর বাড়ির বাইরে চলে এলো।

এইবার ফিচকেরাম সত্যি মহা ভাবনায় পড়লো।

চৌধুরীবাড়ির পাঠশালার জন্যে পড়ুয়া জোগাড় করতে গিয়ে যদি তাকে পুঁটি মাছ কিনতে হয় কিম্বা ছুতোরকে দশটাকা ধার দিতে হয় তবে সে অতল জলে ডুবল বলে।

নাঃ, মানে-মানে এই কাজের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়াই ভালো।

ফিচকেরাম ঠিক করলে আজই সন্ধ্যেবেলা গিয়ে সে সব কথা নায়েবমশাইকে বলে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইবে।

এর চাইতে প্রজার ঘর জ্বালানো, লোকের মাথা ফাটানো, রাতের অন্ধকারে ঘর দখল করা প্রভৃতি ভালো ভালো কাজ সত্যি অনেক আরামের।

তাতে একটা উত্তেজনা আছে আর ট্যাঁকেও বেশ দু'পয়সা আসে। পাঠশালার পড়ুয়া সংগ্রহ করার মতো নিরিমিষ কাজে সে আর আদপেই যাবে না।

মনে মনে কথার জাল বোনে—আর হারা উদ্দ্যেশে পথ চলে সে !

হঠাৎ পথের বাঁকে দুখীরামের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তার ছেলে শ্যাম। ফিচকেরাম ভাবলে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো নাকি ? তাই অতি উৎসাহে হাঁক দিলে, ওহে দুখীরাম শোনো শোনো, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম—

দুখী প্রথমটা ভারী হক্‌চকিয়ে গেল। গাঁয়ে এত মানুষ থাকতে বাবু তার কথা ভাবতে যাবে কেন ?

তারপর ভক্তিভরে প্রণিপাত করে বললে, তা আজ্ঞে কর্তা হুকুম করুন। আমার নাম দুখীরাম—কাজেও দুখীরাম। দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারি না। ছেলেটাকেও খাওয়াতে পারি না, বৌয়ের পরণে ছেঁড়া ত্যানা। আপনি আমার কথা ভেবে পথ চলছিলেন কেন? লোকে ত' ঠাকুর-দেবতার কথা ভেবেই কোনো কাজে এগিয়ে যায়।

ফিচ্‌কেরাম মুখে মধু ঢেলে, উত্তর করলে, দ্যাখ দুখী, তোর ছেলেটা বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায়, লেখাপড়া কিছু শেখে না, এই দেখে আমার মনে বড়ো কষ্ট হয়। কতদিন ভেবেছি শ্যাম ছোঁড়াটাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেবো। আজ একেবারে মনস্থির করে তোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। তা জানিস ত' শুভ-কাজে ভগবান সহায় হন। পথেই তোকে পেয়ে গেলাম। একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে সুরু করলে, তা দ্যাখ, আমি সব ঠিক করেই রেখেছি। চৌধুরীদের বাড়ি নতুন পাঠশালা হচ্ছে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সেইখানে শ্যামকে ভর্তি করে দেবো, দেখবি দু'দিনের মধ্যে ও একেবারে বিদ্যের জাহাজ হয়ে উঠবে।

দুখীরাম আর একবার ফিচ্‌কেরামকে মাথা নীচু করে প্রণাম জানিয়ে বললে, তা দেখুন কর্তা, কথাগুলো ত' আপনার ভালোই। শ্যামকে আপনি নিয়ে বিদ্যের জাহাজ করে দেবেন। অত ভরসা আমি করি না। বিদ্যের একটা ছোটখাটো ডিঙি নৌকো করে দিলেই হবে বাবু। তারপর গলা খাটো করে শুধোলে, তা বাবু, কত করে আপনি রোজ দেবেন সেইটে বলুন। অবাক হয়ে ফিচ্‌কেরাম জিজ্ঞেস করে, তুমি বলছ কি দুখীরাম? লেখা পড়া শেখানো হবে—তারমধ্যে আবার রোজের কথা ওঠে কি করে?

দুখীরাম মাথা নীচু করে জবাব দেয়, আজ্ঞে বাবু সবই ত' বুঝলাম, কিন্তু পেটের কথা ভুললে ত' চলবে না! গাঙ্গুলীবাড়িতে আমরা বাপ-ব্যাটাতে খেটে আট আনা করে রোজ পাচ্ছি। ওকে রোজ না দিলে ত' আমি পাঠশালায় দিতে পারবো না। আপনি না হোক ভেবে-চিন্তে যা হয় ঠিককরে আমায় পরে জানাবেন। আচ্ছা, তাহলে এখন আসি বাবু, সারাদিন মুড়ি ছাড়া কিছু জোটেনি, সন্ধ্যের পর দুটো চাল ফুটোনো হবে তবে বাপ-ব্যাটায় কিছু মুখে দিতে পারবো।

দুখীরামও পাশ কাটিয়ে সরে পড়ল। ফিচ্‌কেরাম একেবারে অসহায়। দাঁত কিড়িমিড়ি করে আর সাপের মন্তর আউড়ে পথ চলে। সেইদিন সন্ধ্যের পর নায়েবের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তার কি শলা-পরামর্শ হল তা কেউ জানে না।

• • •

গভীর রাত্রে জল-বিছুটি গাঁয়ের লোক 'আগুন' 'আগুন' চীৎকারে জেগে উঠল।

আকাশ যেন একেবারে লালে লাল হয়ে উঠেছে। কার বাড়িতে আগুন লাগলো ? এমন করে কপাল ভাঙ্‌ল কার ?

সবাই ছুটলো—কারো হাতে কলসী, কারো হাতে ঘটি, কেউবা নিয়েছে বালতি—। হাতে দা নিয়ে ছুটলো কেউ কেউ। চালা কেটে যদি বাঁচানো যায়। কিন্তু বৃথা।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে—সামন্ত পণ্ডিতের বাড়িতে আর পাঠশালায়।

যারা আগুন নেভাবে বলে ছুটে এসেছিল তারা একেবারে অসহায়ের মতো হায় হায় করতে লাগলো। আগুন এমনভাবে জ্বলে উঠেছে যে কিছু বাঁচানোর যো নেই !

সবাই পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশটা দেখতে লাগলো।

পণ্ডিতের বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিচ্‌কেরাম বললে, এইবার পড়বার লোকের অভাব হবে না ; আর পাঠশালার জন্যে পণ্ডিতও দিব্যি জুটে যাবে। নায়েব হেসে উত্তর দিলে, হ্যাঁ এক ঢিলে দুই পাখী !

॥ দশ ॥

পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের চোখে ঘুম নেই ! পূবপাড়ার চৌধুরী-বাড়ি ক্রমাগত তাদের উঁচু মাথা হেঁট করে দিচ্ছে, কিছুতেই ওদের মনের মতো জব্দ করা যাচ্ছে না !

একি কম লজ্জার কথা।

গাঙ্গুলীবাড়িতে যাত্রা-গানের আসরে ওরা কেমন বাড়ি-চড়াও হয়ে কৌশলে সামিয়ানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল ! তারপর আবার এই পাঠশালা নিয়ে বিবাদ। গাঙ্গুলীবাড়ির আশ্রিত সামন্তপণ্ডিতের বাড়ি আর পাঠশালায় আগুন ধরিয়ে দেয়া মানে ওদেরই মুখ লোকসমাজে পুড়িয়ে দেয়া !

যে করে হোক চৌধুরীবাড়ির ওপর এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে যে প্রতিশোধ নেবে ফাল্গুন কোনো মতেই তার হদিশ পায় না।

রাগে দুঃখে ফাল্গুন নিজের ঘরের ভেতর খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, আর নিজের আঙ্গুল নিজেই কামড়াতে থাকে।

আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে তার ভেতর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে গেল সেদিকেও তার এতটুকু হুঁস নেই !

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে ঘরে ঢুকলো ময়নাচাঁদ।

ময়নাচাঁদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই! কোনো রকমে দম নিয়ে বললে, চন্দনের কাণ্ড দেখেছিস্ ফাল্গুন?

আবার কি নতুন ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসল ছেলেটা? ফাল্গুন এমনিতেই ত' তপ্ত খোলায় গরম বালি হয়েছিল, ময়নাচাঁদের কথায় যেন খৈ ফুটে উঠল!

বললে, কি আবার নতুন কাণ্ড করেছে চন্দন শুনি? ময়নাচাঁদ চোখে মুখে কৌতুক আর বিস্ময় ছড়িয়ে বললে, শোন্ তবে মজাটা। আমি গিয়েছিলাম ওপাড়ায় একটা কাজে। আমায় ডেকে হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁরে ময়না, পূবপাড়ার সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার নৌকো বাচ দিবি? আমিই বা পেছু হটে আস্‌বো কেন? বলল্ম, পশ্চিমপাড়া সবসময়ই প্রস্তুত। লড়তে রাজি আছিস? ও বললে, নিশ্চয়। তা হলে আসছে কালই হয়ে যাক্ নৌকো বাচের লড়াই? আমিও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে এলাম।

উত্তেজনায় ময়নাচাঁদের গোটা দেহ দুলতে লাগলো।

একটা সাঙ্ঘাতিক সঙ্ঘর্ষই এখন ফাল্গুন চায়। এমন একটা কাণ্ড অবিলম্বে হওয়া দরকার যাতে বেশ খানিকটা রক্তপাত হয় কিম্বা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে—যেমন নাকি ওর মনের মধ্যে জ্বলছে।

নৌকো বাচের প্রতিযোগিতা? বেশ তাতেই বা আপত্তি কি?

ফাল্গুনের ইচ্ছে হচ্ছিল পুবপাড়ার লোকদের সবাইকে ওদের একেবারে জলের অতলতলে তলিয়ে দেয়! তাতে যদি তার রাগ খানিকটা পড়ে!

ময়নাচাঁদ চন্দনের কথায় সায় দিয়ে এসেছিল বটে......কিন্তু মনে মনে তার একটা ভয় ছিল—যদি ফাল্গুন রাজি না হয় তবে চন্দনের কাছে ওর মুখ থাকবে কি করে? উঁচু গলায় সে জবাব দিয়ে এসেছে।

এখন ফাল্গুনের সম্মতি পেয়ে ময়নাচাঁদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে গেল।

বললে, তা হলে কাকে-কাকে খবর দেয়া যায়—বল ত' ভাই ফাল্গুন,—আমি এখুনি ছুট্‌বো।

ফাল্গুনও বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জবাব দিলে, নৌকো বাচের ব্যাপারে আর ভয়টা কি শুনি? চিরটা কালই ত' পশ্চিমপাড়া পূবপাড়াকে হারিয়ে দিয়েছে। তুই এখুনি চলে যা ভাই ময়নাচাঁদ,—ডেকে নিয়ে আস্‌বি—নাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক আর ঘুগনীকে। তারপর আর সবকিছু ঠিক করে নিতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হবে না।

ময়নাচাঁদ ত' এই-ই চায়!

ঝড়ের বেগে সে বেরিয়ে গেল সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে আনবার জন্যে।

এইবার ফাল্গুনের উত্তপ্ত মগজে যেন ভোম্‌রা বন্‌বন্‌ করে উড়তে লাগলো। যে করে হোক পুবপাড়ার দর্প চূর্ণ করতেই হবে। সে যেন চোখের ওপর দেখতে লাগলো—খালের দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে গেছে—পুবপাড়ার আর পশ্চিমপাড়ার নৌকা বাচ দেখ্‌তে। যে দল জিতবে তার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দেবে গাঁয়ের লোক।

একদলের দলপতি চন্দন আর একদলের অধিকর্তা ফাল্গুন। খালের এক পারের দল পুবপাড়াকে আর এক পারের দল পশ্চিমপাড়াকে গলা ফাটিয়ে উৎসাহিত করে তুলছে। কেউ কেউ অতি উৎসাহে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটতে সুরু করে দিয়েছে। ঐ তো পশ্চিমপাড়ার ছিপখানি বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে চলেছে। ছিপের ওপর বসে মাথু, হোঁৎকা, ট্যাপা, শামুক, ঘুগনী ও আরো কয়েকটি ছেলে। পেছনে হাল ধরেছে—ময়নাচাঁদ।

আনন্দে ও উল্লাসে পশ্চিমপাড়ার লোক উন্মাদের মতো চীৎকার করে উঠল, পুবপাড়ার ছিপখানির আর কোনো আশাই নেই। বেশ খানিকটা পেছনে পড়ে গেছে তারা।

ফাল্গুনের শিরায় যেন রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। এমনি ভাবেই পুবপাড়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে—প্রতি কাজে, সকল প্রতিযোগিতায়।

বাড়ির ভেতর থেকে চাকর এসে বললে, দাদাবাবু, রাত অনেক হয়ে গেছে···মা-ঠাকরুণ আপনাকে খেতে ডাকছেন।

ফাল্গুনের হুঁস ফিরে এলো।

সতি সত্যিই নৌকোবাচে পশ্চিমপাড়া এখনো জয়লাভ করতে পারে নি। সে এতক্ষণ মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করছিল!

কিন্তু আকাশকুসুমই বলো আর দিবাস্বপ্নই বলো—একে জাগ্রত, জীবন্ত আর সত্যে পরিণত করে তুলতে হবে।

অন্যমনস্কভাবে ফাল্গুন অন্দর মহলে খেতে চলে যায়। আনমনে সে শুধু খাবার নাড়াচাড়া করতে থাকে। আগ্রহ নিয়ে খাওয়া আর তার হয়ে ওঠেনা!

মা তার আনমনা ভাব লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে খোকন, পাতের ওপর ত' শুধু আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিস্—ওগুলো কি মুখে তুলতে হবে না?

ফাল্গুনের মনের ভেতর তখন সত্যি যেন আগুন জ্বলছে, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। সে শুধু অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, ক্ষিদে নেই মা!

কিন্তু তার মা ক্ষিদে না থাকবার কোনো কারণই খুঁজে পেলেন না। কেননা প্রতিদিন এর অনেক আগেই ফাল্গুন রাত্তিরের খাবার খেয়ে থাকে। আর তাছাড়া সে যে সব রান্না পছন্দ করে সেদিন রাত্তিরে তাই তৈরী করা হয়েছিল।

আপনমনে মা ভাবতে থাকেন ছেলের কোনো অসুখ করল কিনা। কিন্তু তখন যে ছেলের মগজে নৌকো তীরবেগে ছুটে চলেছে···আর রাশি রাশি বৈঠা পড়েছে খালের জলে—তা তিনি কি করে জানবেন!

রাত্তিরের খাওয়ার পালা শেষ করে ফাল্গুন নিজের ঘরে ফিরে এলো।

মনে মনে তার এ বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে ময়নাচাঁদ আর একবার তাকে খবর দিয়ে যাবে—তা যত রাতই হোক না কেন!

একটি চাঞ্চল্যকর ডিটেকটিভ উপন্যাস হাতে নিয়ে সে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

খানিকক্ষণ পাতা ওল্টাবার পর তার মনে হল যে, উপন্যাসের ঘটনা তার মগজে ঢুকছে না···সে শুধু অকারণেই বইয়ের পাতার ওপর চোখ মেলে রেখেছে!

এইবার সে বুঝতে পারলে যে, তার সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে—কিভাবে পুবপাড়াকে জব্দ করা যায়! সেখানে ডিটেকটিভের গল্প, গোয়েন্দার কাহিনী চেষ্টা করেও ছুঁচ গলাতে পারছে না; ও বইটা ফেলে দিয়ে ফাল্গুন আর একটা ভুতুড়ে গল্প টেনে নিলে।

যে ভুতুড়ে ব্যাপার পেলে ফাল্গুন দুনিয়াতে আর কিছুই চায় না—তাকেও খানিক-বাদে একদম আলুনি বলে মনে হল!

ভূতও যাকে ভয় পায়···সেটা হচ্ছে প্রতিহিংসা! সত্যি···বার বার হেরে গিয়ে ফাল্গুন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। পুবপাড়াকে যে কোনে রকমে হোক শায়েস্তা করতেই হবে।

ময়নাচাঁদ কখন আসবে কে জানে!

এমনও ত' হতে পারে যে আজ রাত্তিরে সে আসবে না, কাল সকালবেলা এসে —খবর দিয়ে যাবে।

ঘড়ির দিকে হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়তেই দেখলে যে, বারোটা বেজে গেছে!

ময়নাচাঁদ এত রাত্তিরে এসে হয়ত ওর ঘুম ভাঙাতে চাইবে না। এই মনে করে ফাল্গুন গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

ঠিক সেইসময় ময়নাচাঁদ নৌকো করে পশ্চিমপাড়ার বিভিন্ন ঘাঁটিতে নিশাচরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ রাত্তিরের মধ্যে সবাইকে খবর তাকে দিতেই হবে। কথা ছিল, দলের সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে আজই হাজির হতে হবে ফাল্গুনের বৈঠকখানায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলে, ইতিমধ্যে রাত অনেক হয়েছে। এই গভীর রাত্তিরে দলবল নিয়ে বোধকরি আর গাঙ্গুলীবাড়ি যাওয়া চলবে না। আসছে কাল সকালেই গিয়ে জুটতে হবে। কিন্তু তার আগে সকলকে খবর দেওয়া চাই।

গলাছেড়ে গান গাইতে গাইতে ময়নাচাঁদ জোরে জোরে নৌকোর বৈঠা টানে।

তর্ তর্ করে এগিয়ে চলে ময়নাচাঁদের নৌকো। ঠিক এইসময় চৌধুরীবাড়ির চন্দনের ঘরে ফিস্‌ফিস্ করে কয়েকটি ছেলে অতি গোপনে কি যেন সলা-পরামর্শ করছিল। তারা সবাই মিলে এতগুলি মাথা একসঙ্গে করে কি আলোচনা করছিল সেকথা কিছুই শোনা গেল না। শুধু একজনের গলা একটু উঁচু পর্দায় উঠল।

সে শুধলো, রাজী হবে ?

জবাব—রাজী আবার হবে না !

—কিন্তু ভার নেবে কে ?

তখন সবাই চুপচাপ !

কেউ সে কাজের ভার নিতে রাজী নয় !

ঘরের মাঝখানে ছুঁচ পড়লেও শোনা যায় এমনি একটা স্তব্ধতা থমথম করতে লাগলো।

একজন বললে, বেশ, তোরা রাজী না থাকিস আমি নিজে যাব—

সবাই অবাক হয়ে বললে, তুই !

উত্তর শোনা গেল,—হ্যাঁ আমি !

তারপর সেই গোপন-সভা ভেঙে গেল।

অনেক রাত্তিরে ময়নাচাঁদ বাড়িতে ফিরে এলো। একটা হিজল গাছের ডালে তার ডিঙি-নৌকাটি বেঁধে রেখে গুন-গুন করে গান গাইতে গাইতে সে বাড়ির দিকে এগুলো !

এমন সময় অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওর দিকে এগিয়ে এলো।

ভূতের ভয় ময়নাচাঁদের নেই।

রাত-বিরেতে শ্মশানে-মশানে বাজি রেখে ঘুরে বেড়াতে সে ওস্তাদ। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই।

সে হাতের বৈঠেটা জোর করে বাগিয়ে ধরলে। তারপর মনের ভয়টা কাটিয়ে ফেলবার জন্যে হাঁক দিলে, কে তুই···আগে নাম বল।

চাপা-গলায় জবাব শোনা গেল,—ওরে ভয় নেই রে, আমি—

এ যে ভূতেরও চাইতে ভয়ানক !

এত রাত্তিরে চৌধুরীবাড়ির চন্দন—একা—তার কাছে !

সত্যি ভারী ভড়কে গেল ময়নাচাঁদ।

প্রথমটা তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুলো না ! তারপর আমতা আমতা করে বললে, অ্যাঁ ! চন্দন ! তুই !

চন্দন হেসে ফেললে :

বললে, তবু ভালো যে ভূত ভেবে ভয় পেয়ে আমার মাথায় বৈঠে বসিয়ে দিসনি।

ময়নাচাঁদের মনে সাহস ফিরে এলো!

জবাব দিলে, ভয় আমি পাইনে। কিন্তু তোর ব্যাপার কি বলত! নিশ্চয়ই গুরুতর একটা কিছু!

—হ্যাঁ খুব জরুরী কথা আছে—আয় আমার সঙ্গে।

দু'জনে বন-পথে একটু এগিয়ে গেল।

ময়নাচাঁদের একবার মনে হল—চন্দন হয়ত ঝোপের আড়ালে লোকজন লুকিয়ে রেখেছে—ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। চন্দন বললে, দ্যাখ ময়না, তুই ত' বাচের সময় হালে থাকবি, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

ময়নাচাঁদ রাগ করে উত্তর দিলে, কি কাজ শুনি?

চন্দন বললে, আগে থেকে চটছিস্ কেন? আমার কথাটাই না হয় মন দিয়ে শোন! কাল বাচের সময় দুটো নৌকাই যখন তীরবেগে ছুটে চলবে, তখন সবাইকে গোপন করে নৌকোর তলাটা দিবি ফাঁসিয়ে! তুই ত' থাকবি সবাইকার পেছনে—তাই ব্যাপারটা কেউ জানতেও পারবে না। এই নে ধারালো ছোট্ট একটা কুড়ুল—দিব্যি পকেটে রেখে দিতে পারবি।

ময়নাচাঁদ তেড়ে মেরে রেগে উঠে একটা শক্ত কথা শোনাতে যাচ্ছিল—এমন সময় চন্দন তার হাতটা টেনে নিয়ে পাঁচটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলে।

গাছের ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ চাঁদের আলোতে ময়নাচাঁদ ব্যাপারটা বুঝে নিলে। তবু নিজের পাড়ার সুনাম, তার হাতে। এই কথা ভেবে সে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না ভাই, আমায় লোভ দেখিও না। পশ্চিমপাড়ার সুনাম আমাকে বজায় রাখতে হবেই।

চন্দন কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না! শুধু আরও পাঁচটি নোট নিঃশব্দে ওর হাতে গুঁজে দিলে।

এইবার সাপের মাথায় যেন মন্তর পড়া ধুলো ছিটিয়ে দেয়া হল। দেখা গেল অবশেষে প্রলোভনই জয়লাভ করল।

ময়নাচাঁদের বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো না, একবেলা চলে ত' আর একবেলা উনুনে হাঁড়ি চড়ে না! এই খবর চন্দন বেশ ভালো করেই জানতো।

দারিদ্র্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাত্তিরের অন্ধকারে চন্দন অতি নীরবে ময়না-চাঁদকে জয় করে নিলে।

বুঝলে এইবার যুদ্ধ-জয় সুনিশ্চিত।

তাই আর কোন কথা না বলে ছোট্ট কুড়ুলটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চন্দন যেমন এসেছিল, ঠিক তেমন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন নৌকোবাচের সময়।

ফাল্গুন যেমন অনুমান করেছিল ঠিক তেমনি।

খালের দুইপারে অগণিত লোক!

একদল পশ্চিমপাড়াকে বাহোবা দিচ্ছে, আর একদল পূবপাড়াকে তারিফ করছে।

দুই-দলেরই লোকজন উৎসুক আর নৌকোবাচের ছিপ তৈরী। দুটো নৌকোর সামনের গালুইতে তেল-সিন্দুর মাখিয়ে জবাফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ধূপ, ধূনা জ্বালিয়ে বরণ করে নেয়া হয়েছে।

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে দুটো নৌকো ছুটবে। সারা গাঁয়ের লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে!

কাচ্চা-বাচ্চা থেকে সুরু করে বুড়ো-বুড়ী পর্যন্ত কেউ আর বাড়ির ভেতরে নেই। সবাই এসে জড় হয়েছে, এই খালের দু'ধারে। সবাইকার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, এরই ওপর যেন তাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

এমন সময় একসঙ্গে বহু শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে সোল্লাসধ্বনি—আর তার পরেই দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে পশ্চিমপাড়ার ছিপখানি পূবপাড়ার ছিপকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল।

ফাল্গুনের আনন্দ দেখে কে!

সে একটা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে পাগলের মতো লাফাতে সুরু করে দিলে।

কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, কেউ ভালো করে বোঝবার আগেই পশ্চিম-পাড়ার ছিপখানি খালের জলে কাৎ হয়ে পড়ে ডুবে গেল! যারা বৈঠা চালাচ্ছিল, তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পারের দিকে সাঁতরাতে সুরু করে দিলে।

ছুটে এলো সাহায্যকারীর দল, প্রাথমিক চিকিৎসার দল আর ডাক্তারেরা। গায়ে যাদের শক্তি আছে—তারাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবসন্ন অনেককে টেনে তীরে নিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে জয়-পরাজয়ের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে। পশ্চিমপাড়ার দল পরম লজ্জায় মুখ নীচু করে, নিজেদের পাড়ায় ফিরে এলো।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই।

কাটা-ঘায়ে নুনের ছিঁটে দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

বিকেলের দিকে একদল লোক সং সেজে বেরুলো। তারা নৌকো করে খাল দিয়ে দুই পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সঙ্গে তাদের কয়েকটা ঢাক, ঢোল আর কাঁসি!

বাদ্যি বাজিয়ে, চ্যাঁচামেচি করে আর, ছড়া কেটে তারা জল-বিছুটি গাঁটাকে তোলপাড় করে তুললে।

পূবপাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাও সেই ছড়া কাটায় যোগ দিলে—

আগা গলুই পাছা গলুই
নড়বড় করে—
পশ্চিমেরি নাওখানি ভাই
তলা খসে মরে !
মরি হায়—হায় রে !

॥ এগারো ॥

ফাল্গুন যে নৌকোবাচে অমনভাবে হেরে যাবে—সে কথা আদপেই ভাবতে পারে নি।

ওর মনে একটা অহঙ্কার আর গর্ব ছিল।

আর সে গর্ব ফাল্গুন করতে পারে। কেননা, নৌকোবাচের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমপাড়া চিরকাল জিতে এসেছে। এবারও যে সে জিতবে, সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কি করে যে হঠাৎ ওদের নৌকোটা এমনভাবে ডুবে গেল—সে কথা এখনও সে ধারণা করতে পারছে না।

অন্যান্য বন্ধুরা এসে অবশ্য ওকে সান্ত্বনা জানাচ্ছে, আর কেউ কেউ এ পরামর্শও দিচ্ছে যে আবার নতুন করে নৌকোবাচের ব্যবস্থা করা হোক, দেখি তখন কে জেতে! বারেবারেই ত' আর পশ্চিমপাড়ার নৌকো ডুবে যাবে না!

এ পরামর্শটা যে মন্দের ভালো সেকথা ফাল্গুন বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু নতুন করে নৌকো বাচের ব্যবস্থা করার মতো উৎসাহ সে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না!

হঠাৎ তার কি খেয়াল হল।

সে তাদের কয়েকজন চাক্‌রাণ-মাঝিকে ডেকে পাঠালো।

তারা এসে হাজির হতেই বললে, দেখ্, তোরা এককাজ কর। ওদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলে, কি কাজ হুজুর ?

ফাল্গুন বললে, এক্ষুণি তোরা কয়েকজন খালধারে চলে যা। নৌকোবাচে যেখানে আমাদের ছিপটা ডুবে গেছে, সে জায়গাটা দেখেছিলি ত' ?

ওদের মধ্যে যে মোড়ল সে জবাব দিলে, আজ্ঞে কর্তা দেখেছি বৈকি। আমি খালের ধারে সেই জায়গায় সোজাসুজি একটি খোঁটা অবধি পুঁতে এসেছি—

ফাল্গুন ওর্ কথা শুনে খুশী হল।

উত্তর দিলে, তা হলে ত' কাজ অনেকটা এগিয়েই রেখেছিস। এখন তোরা এক কাজ কর।

—কি হুজুর ? ওদের কাছ থেকে সাগ্রহ প্রশ্ন আসে।

কেন-না, এই যে পরাজয়—সেটা ত' ওদেরও মনে লেগেছে। পশ্চিমপাড়ার সকলেরই এই হার। সবাই এই পরাজয়ের গ্লানি সমান-ভাগে ভাগ করে নিয়েছে। এ সম্পর্কে যে কোনো কাজে তারা এগিয়ে আসতে চায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত রেখে সকল রকমে সহযোগিতা করতে ওরা উৎসুক। কিন্তু নিজেদের আন্তরিকতার কথা গুছিয়ে বলতে পারে না—তাই অনেক সময় নির্বাক থাকে।

ওদের প্রাণ আছে, নিষ্ঠা আছে আর আছে মিলেমিশে কাজ করবার আগ্রহ! তাই ফাল্গুন যখন ওদের এগিয়ে এসে একটা কাজের ভার নিতে বললে—তখন যেন ওরা সত্যি কৃতার্থ হয়ে গেল!

ওদের মোড়ল আবার বললে, আপনি শুধু হুকুম করুন কর্তা, আমরা জান-প্রাণ দিয়ে খেটে আপনার কাজ উদ্ধার করে দেবো।

ফাল্গুনের মুখে আবার হাসির রেখা দেখা গেল। বললে, হ্যাঁ এইরকম কাজ-পাগ্‌লা মানুষই ত' আমরা পছন্দ করি।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, দ্যাখ এক কাজ কর তোরা। খাল থেকে—ওই নৌকোটা তুলে ফেল্। কোনো অসুবিধে হবে না ত' তোদর ? অবশ্য আমি সবাইকে বক্‌শিস দেবো।

ওরা গরীব হতে পারে কিন্তু বুকের পাটা আছে ওদের—তাই মন ওদের দিল-দরিয়া।

ওদের দলের হয়ে মোড়ল বললে, দেখুন কর্তা, এ ত' আমাদের পাড়ার ইজ্জতের কাজ। আপনি কিন্তু কিন্তু হয়ে বলছেন কেন ? আপনি শুধু হুকুম করে যাবেন—আর আমরা সেই হুকুম তামিল করবো।

—আচ্ছা বেশ! খুব ভালো কথা। তোরা নৌকোটাকে জল থেকে তুলে ফেল্। আমি আসছি!

খুব খুশী মনে সবাই কোমরে গামছা বেঁধে খালের দিকে চলে গেল।

ফাল্গুন খালি ঘরে বসে আপনমনে ভাবতে লাগলো, কেন তাদের এই পরাজয় ?

ওদের দলে যারা বৈঠে ধরেছিল,—সারা গাঁয়ে তাদের মতন জোরদার মানুষ আর সহজে খুঁজে পাওরা যাবে না। বৈঠে চালানোর পদ্ধতিও তাদের চমৎকার !

এত সহজে তাদের হারিয়ে দেয়া সোজা কথা নয়। আর ওই নৌকো ডুবে যাওয়ার ব্যাপারটা। ছিপটা একেবারে নতুন ছিল। তলা ফেঁসে যাবে কিংবা নৌকোয় জল উঠবে এমন কোনো সম্ভাবনাই ত' নেই। তবু কেন এই গোলমেলে কাণ্ডটা ঘটল ?

বাড়ির ভেতর খবর পাঠালো এক কাপ গরম চায়ের জন্য। নইলে কিছুতেই মগজে বুদ্ধি আসছে না !

একটু বাদেই ওর খাস্-চাকরটা ধূমায়িত এক কাপ চা দিয়ে গেল।

ফাল্গুন একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর বুদ্ধির জট-ছাড়াবার চেষ্টা করছে—এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে মাঝির দলের মোড়ল এসে হাজির হলো ওর সামনে।

কাপ থেকে মুখ তুলে ফাল্গুন জিজ্ঞেস করলে, কিরে এমন ছুটতে ছুটতে আসছিস্ কেন ? নৌকো খুঁজে পাওয়া গেল না ?

—নৌকো পাওয়া যাবে না কেন কর্তা ? সে আমরা সবাই মিলে সাঁতরে টেনে টেনে তুলেছি।

—তবে ?

—একটা গোলমেলে কাণ্ড যে দেখলাম হুজুর। সেই কথা বলতেই ত' আপনার কাছে ছুটে এলাম।

—গোলমেলে কাণ্ড ? ব্যাপার কি খুলে বলত।

—আজ্ঞে, নৌকোর তলা কে কুড়ুল দিয়ে ফাঁসিয়ে দিল ?

—কর্তা, একটা কথা বলব ?

—বল নারে ! কিছু জানিস নাকি ?

আজ্ঞে না। জানি নে কিছুই ! তবে এইটুকু বুঝতে পারছি যে, পশ্চিমপাড়ার দলের কেউ 'বেইমানী করেছে।

—ঠিক বলেছিস ! নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পাড়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কি করে জানা যাবে—কে সেই বেইমান ?

জানবার উপায় আছে হুজুর।

—উপায় আছে ? কি উপায় বল ত' ? আমি ত' কিছুই আন্দাজ করতে পারছি নে।

—হুজুর সেই ছোট কুড়ুলটা আমি নিয়ে এসেছি।

—কিন্তু ওটা কার কুড়ুল কি করে জানা যাবে ? নাম খোদাই করা ত' আর নেই !

—আজ্ঞে, গাঁয়ে একজনই কামার আছে। বসন্ত কামার। আমরা সবাই অনুমান করছি—এ কুড়ুল বসন্ত কামারেরই হাতের তৈরী। তাকে কর্তা এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠান। কে এই কুড়ুল ফরমাস দিয়ে তৈরী করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানা যাবে তাহলে!

ফাল্গুন ওর কথা শুনে ভারী খুশী হল। বললে, আরে! তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। লেখাপড়া শিখলে যে তুই নামকরা গোয়েন্দা হতে পারতিস্! মাঝিদের মোড়ল ফাল্গুনের মুখে এই প্রশংসা শুনে ভারী লজ্জা পেলে।

মাথা নীচু করে উত্তর দিলে, কি যে বলেন কর্তা। আমরা শিখবো লেখাপড়া—আর আমরা হব গোয়েন্দা? হুজুরদের পায়ের তলায় পড়ে আছি—সেই আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্যি।

ফাল্গুন আর সময় নষ্ট করতে চায় না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, তোর বকশিসের ব্যবস্থা আমি পরে করছি।

আমাদের একটা পেয়াদাকে ডেকে দে ত'? আর ওকে ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে দে; যাতে সে বসন্ত কামারকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসে। কোনো ওজর —আপত্তি শুনে যেন ওকে ছেড়ে আসে না।

মাঝিদের মোড়ল উত্তর দিলে, সেজন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না কর্তা! আমি একজন পেয়াদাকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক্ষুণি বসন্ত কামারের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মোড়ল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফাল্গুন অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগ্‌লো নিজের ঘরে। নিজেদের দলের মধ্যে এই রকম বেইমান সে পুষে রেখেছে? সেখানে জয় একেবারে সুনিশ্‌চিত—সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল!

আচ্ছা, কুড়ুল নিয়ে এসে এমনভাবে নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দিলে কে?

এক এই হতে পারে যে, নৌকো বাচ সুরু হবার আগে পুরপাড়ার দলের কেউ গোপনে এসে সবার অজান্তে এই কাণ্ডটি করে গেছে! আর না হয়, পশ্চিমপাড়ার দলের কেউ শত্রুপক্ষের টাকা খেয়ে এই দুষ্কর্ম করেছে!

এখন কাকে সে সন্দেহ করবে?

ফাল্গুন তার ছোক্‌রা চাকরকে ডাকলে।

বললে, দেখ, নৌকো-বাচের সময় যারা যারা নৌকো চালিয়েছিল—সবাইকে আমার নাম করে ডেকে এক্ষুণি নিয়ে আয়, বলবি খুব জরুরী কথা আছে! ফাল্গুনবাবু এক্ষুণি আপনাদের সবাইকে ডেকেছেন।

ছোকরা চাকর মনিবের হুকুম তামিল করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মাঝিদের মোড়ল বসন্ত কামারকে নিয়ে হাজির হল ওর কামরায়।

বসন্ত কামার ফাল্গুনকে প্রণাম করে ঘরের এক কোনে দাঁড়ালো, ও ঠিক বুঝতে পারে নি—কর্তা কেন অসময়ে আসতে তলব করেছেন। মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞেস করলে, হুজুর আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? নতুন কিছু দা-কুড়ুল তৈরীর ফরমাস আছে নাকি?

ফাল্গুন একবার ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর প্রশ্ন করলে, আচ্ছা কামারের পো, আজকাল নতুন ধরণের কিসব তৈরী করছ তুমি? অনেকদিন তোমার হাতের কোনো জিনিস তৈরী করাই নি। ভাব্‌ছি ফরমাস দিতেও পারি।

ফাল্গুনের কথা শুনে বসন্ত কামার আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে উঠল। উত্তর দিলে, তা কর্তা, একটা নতুন ধরনের জিনিষ তৈরী করে দিয়েছি চৌধুরীবাড়ির চন্দনবাবুকে।

জিনিষটা কি তাই আগে বল না!

—আজ্ঞে ছোট্ট একটি কুড়ুল! খুব ধার, পাগাল দেয়া কিনা। বাগানের কাজে, গাছ গাছলা কাট্‌তে, জঙ্গল সাফ করতে সব সময় হাতে রাখা চলে। খুব হালকা মোটেই ভারী নয়।

ফাল্গুন শুধু বললে, হুঁ।

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা মাঝির পো, কুড়ুলটা তুমি বসন্তকে একবার দেখাও ত'?

মাঝিদের মোড়ল তখন কুড়ুলটা বের করে বসন্ত কামারের সামনে ধরলে।

বসন্ত খুশী হয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে কর্তা এই ত' সেই কুড়ুল—চৌধুরীবাড়ির চন্দনবাবুকে আমি নিজে হাতে তৈরী করে দিয়েছি। বাবু বুঝি আপনাকে দেখতে পাঠিয়েছেন?

মাঝিদের মোড়ল চোখদুটো বড় বড় করে কামারের পোকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ফাল্গুন চোখের ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ঠিক এইরকম একটি কুড়ুল আমাকে কিন্তু তৈরী করে দিতে হবে বসন্ত। এর চাইতেও তার ধার যেন বেশী থাকে।

বসন্ত কামার আনন্দে গলে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে উত্তর দিলে, আজ্ঞে, তৈরী করে দেবো বৈকি! ওটার চাইতেও সুন্দর আর ধারালো হবে আপনার কুড়ুলটি। ইচ্ছে করলে আপনি পকেটে ফেলেও যাতায়াত করতে পারবেন।

—বেশ তাই করে দাও। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চাই। এই নাও পাঁচ টাকা আগাম।

ফাল্গুন পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

—আজ্ঞে আপনাদেরই খেয়েই ত' মানুষ। এ আপনি পরে দিলেও পারতেন।

এই বলে নোটখানি সাগ্রহে কুড়িয়ে নিয়ে আর একবার ভক্তিভরে প্রণাম করে বসন্ত কামার বেরিয়ে গেল।

ফাল্গুন এইবার মোড়লের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ ভাই মোড়ল, আমি যে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছি—সে কথা এই কামারের পোকে বুঝতে দিতে চাইনে।

মোড়ল উত্তর দিলে, আজ্ঞে সে কথা ত' সত্যই। আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—সব সময় কি সব কথা বুঝতে পারি?

ফাল্গুন বললে, আচ্ছা ঠিক আছে। এইবার তোমরা গিয়ে সবাই বিশ্রাম কর গে, ও বেলা তোমায় আমি আবার ডেকে পাঠাবো।

—আজ্ঞে ডেকে পাঠাতে হবে না। হুজুরের কাছে আমি নিজেই এসে হাজির হবো

এই বলে প্রণাম জানিয়ে মাঝিদের মোড়ল ফাল্গুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ততক্ষণে নৌকোবাচের দলের সকলেই এসে হাজির হয়েছে।

ফাল্গুন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে, তারপর একে একে সব কথাই তাদের খুলে বললে।

সেই ছোট্ট কুড়ুলটা দেখাতেও ভুললে না।

দলের সবাই এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে একেবারে গুম হয়ে গেল।

সকলেই ভাবছে—কেউ আমাকে সন্দেহ করছে না ত'?

এই জাতীয় পরিস্থিতি সত্যিই কষ্টদায়ক! মন খুলে কেউ কথা বলতে পারে না—অথচ একটা অসহ্য বেদনা বুকের ভেতর গুমরে ফিরতে থাকে।

হঠাৎ একজন বলে উঠল, তাইত! আমরা সবাই রয়েছি, কিন্তু ময়নাচাঁদকে ত' দেখা যাচ্ছে না!

সত্যিই ত'! এইবার সকলেই সচেতন হয়ে উঠল। ময়নাচাঁদ আসেনি কেন?

ফাল্গুন ভাবলে, তাইত! হঠাৎ ময়নাচাঁদের কি হল? সে তার ছোকরা চাকরকে ডেকে পাঠালে।

চাকর এসে উত্তর দিলে, আজ্ঞে বাবু, ময়নাচাঁদবাবুকে তার বাসায় পাইনি। তিনি কোথায় গেছেন—বাড়ির লোকজন বলতে পারলে না। সবাই কেমন যেন আমতা আমতা করতে লাগল।

আম্‌তা-আম্‌তা?

এক মুহূর্তে সকলেই যেন কিসের গন্ধ পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। এই যে পশ্চিম-

পাড়ার পরাজয়—এতে সকলের মনেই দারুণ আঘাত লেগেছে—আর সেই পরাজয় যে বিশ্বাসঘাতকতা করে ডেকে এনেছে, তাকে ত' কোনো মতেই ক্ষমা করা যেতে পারে না।

ফাল্গুন বললে, ওর বাড়ির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রলোভনে পড়ে ও চন্দনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে নি ত' ?

ফাল্গুনের কথা শুনে সকলেরই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল!

সবাই বললে, না, না, ময়নাচাঁদকে কিছুতেই ক্ষমা করা চলে না।

ফাল্গুন বললে, এখন আমার খেয়াল হচ্ছে! সেই নৌকোবাচের পর থেকে ময়নাচাঁদ আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! তারপর আর একবারও সে আমার কাছে আসে নি! ব্যাপারটা কি ?

একজন বলে উঠল,—যার মনে পাপ আছে সে ত' পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবেই! আমিও কাল ওর বাসায় একবার গিয়েছিলাম। ওর ভাই বললে, কোথায় যেন নেমন্তন্ন আছে।

নেমন্তন্ন!

আরো সচকিত হয়ে উঠল সকলে!

কে বললে, আবার চন্দনদের বাড়িতে লুকিয়ে নেই ত' ? ভেবেছে সত্যি কথা ত' একদিন বেরিয়ে আসবেই! তখন সে আমাদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? ফাল্গুন এইবার চটেমটে লাফিয়ে উঠল। বললে, ওর কথা আমি একবারও ভেবে দেখিনি! এখন মনে হচ্ছে এই বেইমানী ওরই। আমার হয়েছে একচক্ষু হরিণের দশা। যেদিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কাই করিনি—তীর এসে লেগেছে সেই অঞ্চল থেকে। —যা হবার ত' হয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না! ওকে ধরে আনতেই হবে। তোমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করো—যে করেই হোক্—চন্দনের খপ্পর থেকে নয়নচাঁদকে ছিনিয়ে আনতে হবে!

—হ্যাঁ আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করলাম।

॥ বারো ॥

চৌধুরীবাড়ির একটি গোপন কক্ষ।

সদর আর অন্দরের মাঝখানে এই নিরিবিলি গোপন ঘর। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে, ভেতরে একটি সুন্দর ঘর আছে। চারদিকে ধানের মড়াই এমনভাবে সাজানো যে, মনে হবে—মড়াই ছাড়া এখানে আর কিছু নেই।

কথা হচ্ছিল চন্দন আর ময়নাচাঁদে।

ময়নাচাঁদ এরই মধ্যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

সে বললে, ভাই চন্দন, এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে আমি ক'দিন থাকবো ? বাড়ি যেতে পারছিনে, ভাই-বোনদের কি দুর্দশা হল তা জানতে পারছিনে, বন্ধু-বান্ধবরা আর কেউ আমার মুখদর্শন করবে না! কী কুক্ষণেই টাকার লোভে তোর কথায় আমি রাজি হলাম। নিজের কোলের ওপর সে মাথা নীচু করে অসহায়ের মতো বসে রইল।

চন্দন ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললে, অত অস্থির হয়ে উঠলে কি চলে ভাই? আমি কি চুপ করে বসে আছি? তোর কোনো চিন্তা নেই—সব ব্যবস্থা আমি এর মধ্যে করে ফেলেছিল। তোর বাড়িতে গোপনে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। তোর ছোট বোনটা জ্বরে ভুগছে—সে এমন কিছু নয়। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। তাছাড়া তুই যে আমার এখানে লুকিয়ে আছিস—তা ফাল্গুন ত' ফাল্গুন—গাঁয়ের কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না।

একটু থেমে চন্দন বললে, দিব্যি আরাম করে এখানে খা' দা' থাক—তারপর দিনদশেক বাদে একদিন ভুস্ করে বেরিয়ে গিয়ে বলবি—মাসির বাড়িতে ঘুরে এলাম। তখন তোকে কে কি বলতে পারে—আমি দেখ্বো।

ছোট বোনটার জ্বর হয়েছে শুনে কিন্তু মন ভারী খারাপ হয়ে গেল। ছোট বোনটা ওর ভারী ন্যাওটা। ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারেনা। ওর সঙ্গে সকাল-বিকেল বেড়ানো চাই! আবার ওর সঙ্গে দুবেলা না খেলে ভোম্‌রীর পেটই ভরে না!

ভোম্‌রী নামটা ময়নাচাঁদের দেয়া!

দেখ্তে কালো হলে কি হবে?

চোখ দুটো ভোম্‌রীর ভারী সুন্দর। ভ্রমরের মতই সারাদিন ঘুরঘুর করছে—আর গুণগুণ করে গান গাইছে। ওর ছোটবোন কখনো চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। হয় গল্প করবে—না হয়—গুণ-গুণ করে গান গাইবে!

একটি পুরো গান সে কক্ষনো গায় না।

এ গানের এক কলি, ও গানের দু-লাইন, কোনো গানের আবার শুধু দুটি কথা এইভাবে এক গান থেকে আর এক গানে সে কেবলি লাফিয়ে চলে।

কিন্তু একটি ব্যাপারে ভোম্‌রীর প্রশংসা করতেই হবে। গানের সুরে কক্ষনো তার ভুল হয় না!

কীর্তন থেকে গজল—আবার গজল থেকে ভজন—ভজন থেকে টপ্পা—কিন্তু সুর ঠিক আছে।

সাধে কি আর ময়নাচাঁদ ভোম্‌রী নাম দিয়েছে? নানা ফুলে ঘুরে বেড়ায় বটে

কিন্তু মধুটুকু ঠিক সংগ্রহ করে নিতে জানে। গানের-বনেও দিশেহারা হয়ে পড়ে না। প্রত্যেকটি সুর ঠিক—ঠিক গলায় তুলে নিতে পারে। তাই ত' কীর্তনের আসরে, যাত্রায়, কথকতায় পাঁচালীর আসরে কবিগানে—ওকে নিয়ে যেতেই হবে। নইলে কেঁদে কেটে একেবারে অনর্থ করবে!

তার সেই ছোট্ট ভোম্‌রী-বোনটি জ্বরে পড়ে আছে—ময়নাচাঁদের মন কিছুতেই বশ মানছেনা। হয়ত একাএকা বিছানায় শুয়ে ওর ভালো লাগছে না, এপাশ-ওপাশ করছে আর কেবলি সুন্দরদাকে ডাকছে।

ভোম্‌রী ময়নাচাঁদকে সুন্দরদা বলে ডাকে।

ভোম্‌রী তার সুন্দরদাকে গান শোনাবে, নানারকম গল্প বলবে, গাঁয়ের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে—তবে যদি তার মনে একটু স্বস্তি আসে।

ভোম্‌রীর ম্লান মুখখানির কথা ভেবেই ময়নাচাঁদ আরো বিমর্ষ হয়ে গেল।

চন্দন শুধোলে, এত আকাশ পাতাল কি ভাবছিস রে ময়নাচাঁদ? —আমি ত' বলেছি তোর কোনো চিন্তা নেই। আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছি—সব কিছু ঠিক করে দেবো। শুধু গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনকে আমি উচিত শিক্ষা দিতে চাই।

তারপরে আপন মনেই হো হো করে হেসে উঠল চন্দন! —অবিশ্যি এর মধ্যেই তার বেশ শিক্ষা হয়ে গেছে! পশ্চিমপাড়ার ছিপটা যে অমন ভুস করে ডুবে যাবে—সে কথা বেচারী একবারও ভাবতে পারে নি! তুই বেশ করেছিলি ময়নাচাঁদ। এমনভাবে নৌকোর তলাটা ফাঁসিয়ে না দিলে আমাদের পক্ষে জেতা খুব শক্ত হত! ব্র্যাভো—ময়না—ওয়েলডান! তোর গা কেউ ছুঁতে পারবে না—একথা তুই জেনে রাখ!

হঠাৎ ময়নাচাঁদের মাথাটা চন্ করে ধরে গেল!

চন্দনের অমন প্রশংসায় সে এইবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারল যে, তার নিজের পাড়ার প্রতি কতটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সত্যিই ত' কেবলমাত্র তারই দোষে গোটা গাঁয়ের লোকের সামনে পশ্চিমপাড়ার মুখে অমন চুণ-কালি লাগলো। সে যদি কয়েকটি টাকার লোভে চন্দনের কাছে হাত না পাততো তাহলে পশ্চিমপাড়া নৌকো-বাচে নিশ্চয়ই জিতে যেত—আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত তাদের পাড়ায়। কতকগুলি লোকের মনে সে ব্যথা দিয়েছে, বন্ধুদের মনঃক্ষুণ্ণ করেছে—সারাটা পাড়ার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে! অথচ মজা এই যে, যাদের সুখের জন্যে ও প্রলোভনকে জয় করতে পারে নি—ভিক্ষুকের মতো টাকা চেয়ে নিয়েছে—তাদের কাছেও সে যেতে পারছে না! চোরের মতো পালিয়ে রয়েছে একেবারে শত্রু-পুরীর মাঝখানে।

ফাল্গুন তাকে বিশ্বাস করত বোধকরি সব চাইতে বেশী। আর সেই বিশ্বাসের মূলে সে কুঠারাঘাত করেছে।

কাজটা যে কত গর্হিত হয়েছে—সেকথা এখন ময়নাচাঁদ বুঝতে পারছে!

ময়নাচাঁদকে এমনভাবে ঝিমিয়ে পড়তে দেখে চন্দন বুঝতে পারলে, বাড়ির জন্যে ওর সত্যি মন খারাপ হয়েছে।

তাই সে আর ওকে বেশী ঘাটালে না। শুধু মৃদুস্বরে বললে, তুই একটু শান্ত হ' —আমি তোর চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চারদিকে ধানের মড়াই—তাই দিনেরবেলাতেও ঘরটিকে অন্ধকার দেখায়।

ময়নাচাঁদ সেই ঘরে একা চুপচাপ বসে রইল।

চন্দন অবিশ্যি ওকে পড়বার জন্যে অনেকগুলি গল্পের বই আর ডিটেকটিভ উপন্যাস দিয়েছে—কিন্তু একে অন্ধকার—তাতে ওর মন খারাপ—সেইজন্যে কিছুতেই যেন মন বসছে না! ওর বাড়িতে এখন কি হচ্ছে, সেই কথা ময়নাচাঁদ ভাবতে চেষ্টা করে। সকাল থেকে কি ওর কম কাজ ছিল?

অভাবের সংসার, তাই অনেক কিছু ভাবতে হত ওকে।

খুব ভোরে উঠে এর বাড়ি থেকে লাউ, ওর বাড়ি থেকে কুমড়ো, এক বাগান থেকে কচি বেগুন, অন্য মাচা থেকে ঝিঙে সে সংগ্রহ করে বেড়াতো। তারপর কি রান্না হবে—রান্নাঘরে বসে মায়ের সঙ্গে তাই আলোচনা চলত। ময়নাচাঁদ যে চুরি করে সংসার চালাচ্ছে—একথা ওর আদপেই মনে হত না! ওর দরকার, কাজেই যে সব প্রতিবেশীর বাড়তি আছে, তাদের বাগান থেকে নিলে ক্ষতি কি? বরং ওইটেই যেন ছিল তার ন্যায্য পাওনা!

ময়নাচাঁদের মা-ও ছেলের আনাজ সংগ্রহের ইতিহাসটা জানেন, কাজেই তিনিও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেন না—এ সব তরি-তরকারী কোত্থেকে এলো!

প্রশ্ন করলেই যখন অবাঞ্ছিত কথা শুনতে হবে—বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করা!

ময়নাচাঁদ মেয়েলী-কাজ করতে খুব ভালবাসে। আনাজ কুটে দেয়া, মশলা বেটে দেয়া, জল তুলে মাকে সাহায্য করা—এইসব কাজ করতে ওর ভারি ভালো লাগে আর সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় ভোম্‌রী।

হোক না অভাবের সংসার। ওই ছিল ময়নাচাঁদের স্বর্গ। সেই সংসারের সুখের জন্যে লোভ করতে গিয়ে—মায়ের কোল থেকে সে হল নির্বাসিত!

এই অবাঞ্ছিত সুখ ত' সে চায় নি!

ময়না চাঁদ আপনমনে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে; কোনো খানেই কূল-কিনারার হদিশ পায় না!

খানিকবাদে চন্দনের একটি ছোকরাচাকর এসে মোহনভোগ, ক্ষীরেরছাঁচ, নারকেল

নাড়ু, চিড়ের মোয়া এইসব দিয়ে গেল, তখন আবার নতুন করে ভোমরীর শুক্‌নো মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ভোম্‌রীর জ্বর হয়েছে—হয়ত দু'দিন না খেয়ে আছে! চোখে হয়ত তার জল, 'সুন্দরদা' ডাক সে যেন শুনতে পেলে।

এইসব রাজভোগ তার গলা দিয়ে কিছুতেই যাবে না! কাউকে কোন কথা না বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

তারপর চুপিচুপি গোপন পথ দিয়ে একেবারে খিড়কীর পুকুরের ধারে হাজির হলো।

তার ভাগ্যি ভাল। ছোট্ট একটা ডিঙি-নৌকা দড়ি দিয়ে একটি গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। একটি বৈঠের হাতল উঁকি মারছে পাটাতনের তলা থেকে।

ময়নাচাঁদ আর আগু-পাছু কিছু ভাবলে না। ডিঙি-নৌকোয় উঠে—দড়িটা খুলে দিয়ে বৈঠা হাতে নিয়ে বসে পড়ল।

কিছুতেই সে আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ছুটে গিয়ে ভোমরীকে কোলে নেবে। রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে জিজ্ঞেস করবে, আজ কী পোস্ত দিয়ে ঝিঙে চচ্চরি করবে মা?—

পোস্তটা না হয় আমিই বেটে দিচ্ছি—

নৌকো চালাতে চালাতে ময়নাচাঁদ যেন মায়ের রান্নাঘরের পোস্ত-চচ্চড়ির গন্ধ পেলে।

আশেপাশের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। একমনে বৈঠে চালিয়ে সে চলেছিল খালের ভিতর দিয়ে! হঠাৎ ঝোপের আড়ালে ফিস্‌ফিস্ কথা শুনে তার চমক ভাঙলো।

ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই পশ্চিমপাড়ার ছেলেদের কয়েকটি নৌকো ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাকে ঘিরে ফেললে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বৈঠে ওঠল তার মাথার উপরে। কে যেন বললে, ভালো চাস্ ত' এই নৌকোয় উঠে আয়—নইলে মাথা ফেটে দু'খানা হয়ে যাবে।

আরেক'জন ফোড়ন দিলে, চন্দনের চৌদ্দপুরুষ এসেও তখন প্রাণ বাঁচাতে পারবে না।

ময়নাচাঁদ মরিয়া হয়ে উত্তর দিলে, ভাই, আমি তোদের সঙ্গেই যাবো—কিন্তু আমাকে একবার বাড়ি যেতে দে। ভোম্‌রীর জ্বর হয়েছে, তাকে শুধু একবার চোখের-দেখা দেখে যাবো।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই।

—ওসব ছেঁদো কথায় ভুলছি নে!

—কেন, আজকাল কি তোর টাকার কিছু অভাব?

—চন্দন ত' টাকা খরচ করে ডাক্তার এনে ভোম্‌রীকে দেখিয়েছে।

—সব খবর আমরা রাখি, আর কোনো ফাঁকি চল্‌বে না চাঁদ! ময়নাকে এবার আমাদের দাঁড়ে গিয়ে বসতে হবে। অবশ্য আমরা ছোলা খেতে দেবো।

একজন ফস্‌ করে এসে ময়নাচাঁদের চোখ বেঁধে ফেললে।

তারপর ওদের একখানি ছিপ—শো-শো শব্দে কোথায় যে উড়ে চললো—ময়না-চাঁদ কিছু ঠাহর করতে পারলে না।

যখন ওর চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হল—ময়নাচাঁদ অবাক হয়ে দেখলে—তারা একটি গভীর বনের ধারে এসে পৌঁছে গেছে।

ময়নাচাঁদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি?

খালের ধারে একটা বড় বটগাছের তলায় দুটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ফাল্গুন নিজে;

সে রসিকতা করে উত্তর দিলে, এই বনের মধ্যে ডাকাতে-কালীমন্দির। সেইখানে গেলেই বুঝতে পারবি—কেন তোকে এখানে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে।

ময়নাচাঁদের মুখে তখন আর কোনো বাক্যি নেই।

শান্ত-সুবোধ ছেলের মতো সে ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নামলো। গিয়ে দেখলে, সেদিন যারা নৌকো-বাচে অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা প্রত্যেকেই তার আশে-পাশে আছে।

এমন ঘৃণার সঙ্গে সবাই ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যে, লজ্জায়—ময়নাচাঁদের মুখ আপনা থেকে নীচু হয়ে এলো।

ফাল্গুনই প্রথম এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে।

বললে, বেইমানীটা করেছিলি ভালই! কিন্তু তোর নতুন মনিব চন্দনের দেয়া এই ছোট কুড়লটা নৌকোর ভেতর না ফেলে যদি বাইরে খালের জলে ফেলে দিতিস্‌—তবে এমন করে নিয়শ্চই ধরা পড়তিস্‌ না! ময়নাচাঁদ ওর কথায় কোন জবাব দিলে না, চুপ করে রইল।

আর একজন ফোঁড়ন কাটলে, ও কথাটা ওর মুনিব সময় মত শিখিয়ে দিতে একদম ভুলে গিয়েছিল।

আর একজন টিপ্পনী কাটলে, আর তাতেই ত' এই বিপত্তি!

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে
যদি না পড়ে ধরা
আর ধরা পড়লেই মরা।

সবাই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই হাসির শব্দে বনের গাছের কাকগুলি কা-কা শব্দে উড়ে পালিয়ে গেল।

সরু-পায়ে চলা পথ।

দু'ধার থেকে লম্বা-লম্বা ঘাস গজিয়ে সেই সরু পথকেও প্রায় ঢেকে ফেলেছে। হাতের বৈঠে দিয়ে ঘাস সরিয়ে সরিয়ে ওরা পথ চলছিল।

একটা সাপ সর্-সর্ করে আড়াআড়ি ভাবে সেই পথের ওপর দিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ এমনভাবে সাপ দেখে দলের সবাই থম্‌কে দঁড়ালে, ময়নাচাঁদকে সাজা দিতে এসে ওরা না সাপের বিষে প্রাণ খোয়ায়!

আরো বেশ খানিকটা পথ।

যত যাচ্ছে তত ঘন বন।

শেষকালে মিললো সেই জরাজীর্ণ কালীমন্দির।

সত্যি জায়গাটা দেখলে ভয় করে।

দিনেরবেলাতেই একটা থম্‌থমে ভাব। যেন কত অশরীরী-প্রাণী আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে দেখা যায় না বটে,—কিন্তু একটু চুপচাপ থাকলেই নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

কয়েকজন পুরোহিত এরই মধ্যে পুজোর কাজে লেগে গেছে। নৈবিদ্যি, ফুল, নানারকম পূজোর উপকরণ সব প্রস্তুত। মন্দিরের সামনে হাঁড়িকাঠ পাতা। তাতে আবার তেল-সিঁন্দুর মাখিয়ে দেয়া হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে ময়নাচাঁদ শুধোলে, ব্যাপার কি ভাই ফাল্গুন?

ফাল্গুন জবাব দিলে, তুই ভেবেছিস আমরা এখানে বন-ভোজনের জন্যে তোকে নেমন্তন্ন করে এনেছি? মোটেই তা নয়। আজ এই ডাকাতে-কালীর সামনে নরবলি হবে।

সেকথা শুনে শিউরে উঠল ময়নাচাঁদ।

সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ময়নাচাঁদ যদি কারো কাছ থেকে কোনো আশ্বাসবাণী পাওয়া যায়।

কিন্তু সবাই ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌তে লাগলো।

—চন্দনের দেয়া টাকাগুলি ভারী মিঠে?

—কত হাজার টাকা দিয়েছে তোকে? তাই নিয়ে সারাজীবন চল্‌বে?

—এইবার নতুন মনিব তোর প্রাণ বাঁচাতে পারবে?

ময়নাচাঁদ বুঝলে, এ একেবারে ধূ-ধূ মরুভূমি। এখানে একবিন্দু করুণার বারি বর্ষিত হবে না।

ফাল্গুন হাঁক্‌লে, এইবার বলিটাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আয়—উচ্ছুগ্য করতে হবে।

ময়নাচাঁদ নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলে না! ভয়ে কেঁদে উঠল! বললে, আমার ভোম্‌রী বোনকে তোরা একবার শুধু দেখতে দে, তারপর মেরে ফেলিস্‌ আমাকে—

সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির ওপর মুখ ঢেকে বসে পড়ল।

ফাল্গুন বললে, মরণ-যন্ত্রণা ওর হয়ে গেছে। সত্যি ত' আমরা ওকে প্রাণে মারতে চাই নে!

আর একজন বললে, কিন্তু সবাইকার সামনে ওর শাস্তি হওয়া দরকার। ভুরু কামিয়ে বেইমানকে ছেড়ে দাও। সেই চেহারা ও গ্রামের লোককে দেখাক্‌।

ফাল্গুন বললে, সেই ভালো। বেইমানের সাজা হচ্ছে—ভুরু কামিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চাপিয়ে একেবারে গ্রামের মাঝখানে পৌঁছে দেয়া।

॥ তেরো ॥

ময়নাচাঁদের লাঞ্ছনাকে চন্দন নিজের অপমান বলে মনে করলে। তাই ও যখন ভুরু কামানো আর মাথা মোড়ানো অবস্থায় গ্রামে ফিরে এলো—চন্দন সেটাকে নিজের লজ্জা বলে ভাবলে!

সে ময়নাচাঁদকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালো!

কিন্তু মজা এই যে, ময়নাচাঁদ আর ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না।

সে ভাবলে অপমানের ত' চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

এখন আবার এই মুখ লোকের সামনে বের করি কি করে? সে নিজের অন্দরে বসে ভোম্‌রীর সঙ্গে খেলা করে, তার খেলার ঘোড়া হয়, মায়ের রান্নাঘরে আনাজ-তরকারী কুটে দেয়, বাট্‌না বাটে—কিন্তু কখনো বাড়ির বাইরে আসে না!

চন্দন কিন্তু ভয়ানক চটে গেল।

সে বললে, ভালোরে ভালো! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর—ময়নাচাঁদের অপমানে আমি ভেবে মরছি—আর সে একবার আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে পারলে না? এত দেমাক ওর!

ময়নাচাঁদ কিন্তু এর মধ্যে সার কথা বুঝে নিয়েছে—আমার ফাল্গুন প্রীতিরও দরকার নেই, আর চন্দনের ভালোবাসারও প্রয়োজন নেই! তোমরা আমাকে রেহাই দাও—একটু শান্তিতে নিরিবিলি থাকতে দাও!

আর তাছাড়া ভুরু কামানো আর ন্যাড়া-মাথায় ও বেরুবেই বা কোথায় ? লজ্জা ওর সকল দিক দিয়ে।

পর পর তিন দিন চন্দনের কাছ থেকে লোক গিয়ে ফিরে এলো ; কিন্তু ময়নাচাঁদের এক কথা। আমি এখন বাড়ি থেকে কিছুতেই বেরুবো না ! রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে ! তোমরা তোমাদের জেদ বজায় রাখতে যা খুশী করো, আমি আর ওর ভেতর নেই ! ওই যে কথায় বলে না—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমার হয়েছে সেই অবস্থা !

চন্দন সব কথা শুনে উত্তর দিলে, ময়নাচাঁদ এতগুলি কথা একসঙ্গে বলতে পারলে ? তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে !

চন্দনের এক বন্ধু ওর পাশেই বসেছিল, সে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে উঠল ভাবের আবেগে—

"পঙ্কে বদ্ধ কর করী—
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি—
কারে দাও ইন্দ্রত্ব পদ মা,—
কারে কর অধোগামী—!
সকলি তোমারি ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি !"

চন্দন তখন সত্যি চটে গেছে।

ভালো-ভালো কথা আর তার মগজে ঢুক্‌বে না !

দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিলে—দাঁড়াও। ইচ্ছাময়ী তারার ইচ্ছার খেলটা একবার দেখাচ্ছি ! আগে শায়েস্তা করবো ময়নাচাঁদকে, তারপর দেখে নেবো—পশ্চিমপাড়ার ফাল্গুনকে। দেখি, ওর মগজে কত বুদ্ধি ধরে।

বন্ধুটি বললে, ময়নাচাঁদের ওপর তোর মিছে রাগ। ওর যা শাস্তি হবার তা ত' যথেষ্টই হয়েছে,—আবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন বাপু ?

চন্দন ফোঁস করে উঠ্‌লে সঙ্গে সঙ্গে।

বললে, ও যে শাস্তি পেয়েছে মূর্খামীর জন্যে সেইখানেই ত' আমার আপত্তি। ওর লাঞ্ছনা আমার অপমান হয়ে গায়ে বিঁধছে। ময়নাচাঁদ ছিল আমার আশ্রয়ে।

দিব্যি ছিলি বাপু, খাওয়া-দাওয়া, প্রচুর বিশ্রাম, ওর সংসারের ভার আমি নিজে নিয়েছিলাম। রাশি রাশি গল্পের বই দিয়েছিলাম—দিব্যি পড় না কত পড়বি।

তা ওর ওর ভালো লাগলো না।

আমাকে লুকিয়ে ও চলে গেল বাড়ির বাইরে ! তাতেই ত' ফাল্গুনের খপ্পড়ে পড়ল ! ওঁরা ময়নাচাঁদের এই যে মাথা মুড়িয়ে, ভুরু কামিয়ে, ঘোল ঢেলে গাঁয়ে

এনে ঘোরালে—এ অপমান কি আমার গায়ে লাগে না? একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়!

রাগে আর অপমানে ফোঁস-ফোঁস করতে লাগলো চন্দন।

আর একটি বন্ধু হাসি গোপন করে শুধোয়, তা কি ঠিক করলি চন্দন? ময়না-চাঁদেরই বা কি শাস্তি দিবি। আর ফাল্গুনেরই বা কি শাস্তি বিধান করবি শুনি?

অস্থিরভাবে পাইচারি করছিল চন্দন।

হঠাৎ ওর প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফিরিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। বললে, ময়নাচাঁদের এত সাহস যে, আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তিন-তিন-বার লোক পাঠালাম—আর কিনা তাদের ফিরিয়ে দিলে?

একটুখানি দম নিয়ে চন্দন বললে, ময়নাচাঁদের কি শাস্তি দেবো জানিস্? ওর ঘরে দেবো আগুন লাগিয়ে। দেখি সে কত বড় মানুষ হয়েছে যে আমার কথায় কান দেয় না!

ওর বন্ধুটি কাচু-মাচু করবার ভাব দেখিয়ে দুটি হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বললে, দোহাই তোর চন্দন, এইবার নতুন কোনো প্যাঁচ দেখা! ঘরে আগুন দেয়া যথেষ্ট হয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের ঘরে আগুন দিয়েছিস, যাত্রার আসরে সামিয়ানায় টিকের আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলি—আবার সেই আগুন? এখন থেকে যে গাঁয়ের লোকে তোকে ঘর-পোড়া হনুমান বলে ডাক্‌বে!

চন্দনের চোখে যেন হতাশার ভাব ফুটে উঠ্‌ল।

ধপ্‌ করে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, তা হলে আমি কি করি বলত?

—একটা পরামর্শ দেব শুন্‌বি?

—কি বল না!

—দিন কয়েকের জন্যে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়, মনটাও ভালো হবে আর শরীরটাও সুস্থ থাক্‌বে। এই রেষা-রেষির ভাব নিয়ে—দাঁত কিড়-মিড় করছিস্—রাত্তিরে ঘুমুতে পারছিস নে, নিজের চেহারাটা কি হয়েছে আয়নায় মুখটা ভালো করে দেখেছিস একবার?

তপ্ত-বালিতে খৈয়ের মতো ছিটকে উঠে চন্দন উত্তর দিলে, সৎ-পরামর্শ দিচ্ছিস্ তুই আমাকে! একেবারে যাকে বলে খাঁটি বন্ধুর কাজ করছিস। আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাই, আর ওরা রটিয়ে দিকে যে চন্দন হেরে গিয়ে লজ্জায় পালিয়ে বেঁচেছে! সেটি আমি কিছুতেই সইব না!

—তবে কি করবি শুনি? মানুষের ঘরে আগুন দিবি? ক্রমাগত লোককে শত্রু সৃষ্টি করবি? আর এইরকম ঝামেলা করে নিজের ঘুম নষ্ট করবি আর শরীরটাকে জাহান্নামে দিবি? তোর মতলব কি শুনি?

চন্দন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, শুধু আক্রোশে ফুলতে থাকে। তাই বলে পূবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার দলাদলিতে সে কিছুতেই পরাজয় বরণ করে নিতে রাজী নয়।

—আচ্ছা, একটা দিন তুই শুধু ভেবে দেখ, আমার পরামর্শ নিবি কিনা! এই একটা দিন কোনরকম ঝগড়াঝাটি আর দলাদলির মধ্যে তুই যাবি নে, আমায় কথা দে। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি আবার আসবো! তখন আমাদের খোলাখুলি আলোচনা চলবে!

—বেশ কথা! রাজি হলাম।

চন্দনের সম্মতি পেয়ে সেদিনকার মতো বন্ধুটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চন্দন একটা দিন বসে বসে ভাবতে থাকুক,—ততক্ষণে ফাল্গুনের বৈঠকখানা একবার ঘুরে আসি! দেখি সেখানে আবার কেমন কালনেমীর লঙ্কা-ভাগ হচ্ছে।

ফাল্গুনের বৈঠকখানা ঘরে ঘন ঘন গরম চা আসছে—আর বন্ধুরদল কুড়মুড় পাঁপরভাজা মজা করে চিবিয়ে খাচ্ছে। তার মানে আসর একেবারে জমজমাট।

ফাল্গুন বললে, সেদিন কিন্তু ভারী মজা হয়েছিল। ময়নাচাঁদ মনে করেছিল আমরা ওকে সত্যি-সত্যিই ডাকাতে-কালীর সামনে বলি দেবো!

ঘুগনী ফোঁড়ন দিয়ে এককামড় পাপর খেয়ে মন্তব্য করলে, শ্রীমানের মুখখানি কেমন আমশীর মতো শুকিয়ে গিয়েছিল সেটা তোরা লক্ষ্য করেছিলি?

হোঁৎকা বললে, লক্ষ্য আবার করিনি। আচ্ছা বল ত' তোরা, ময়না তখন কার নাম জপ্ করছিল?

—ডাকাতে-কালীর।

—উঁহু। হলো না! নিশ্চয়ই মনে মনে চন্দনকে ডাকছিল তখন! বিপদহারী মধুসূদন রক্ষা করো।

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

—বিপদহারী মধুসূদন দ্বাপরযুগে দ্রৌপদীর মান রক্ষা করেছিল, কিন্তু বিংশ-শতাব্দীতে চৌধুরীবাড়ির চন্দন শরণার্থী ময়নাচাঁদকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারল না—এটা কি কম দুঃখের কথা? হ্যাঁ, একেবারে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য কাহিনী। কিন্তু ময়নাচাঁদের কাণ্ডটা দেখেছিস? সেই থেকে আর ঘরের বার হয়নি।

—কোন্ মুখে ন্যাড়া মাথা আর কামানো ভুরু মানুষকে দেখাবে?

—ঠিক কথা। হয় ঘোম্টা দিক, আর না হয় অন্দরমহলে গিয়ে আশ্রয় নিক্!

—কাজেই সে একটা পথ ধরেই চলেছে। ওকে কোনোমতেই আর দোষ দেয়া যায় না।

আহা, বেচারী। কি কুক্ষণেই কয়েকটা টাকার লোভে পূবপাড়ার কাছে নিজেকে বিক্রী করে দিলে।

—শুধু বিক্রী করে দিলে? পশ্চিমপাড়ার মান-ইজ্জত একেবারে ফাঁসিয়ে দিলে।

—একটা কুড়ুল দিয়ে ফাঁসালে সে কথাটাও বল্। নইলে আলোচনা জমে কি করে?

—একটা কথা কিন্তু তোরা কেউ ভাবিস্ নে। ময়নাপাখীকে যে যা পড়ায়—সে তাই পড়ে!

—ঠিক। ঠিক। যতদিন ফাল্গুনের কাছে ছিল—ফাল্গুন বলতো' পড়ো ময়না, পড়ো—

আর ঠিক পড়ে যেত।

—তারপর কি কুক্ষণে শ্রীমান চন্দনের হাতে গিয়ে পড়ল। আর সে ছোট্ট কুড়ুল-খানা হাতে দিয়ে বললে, পড়ো ময়না পড়ো—অমনি সে ফাল্গুনের শেখানো ছড়া ভুলে গিয়ে চন্দনের নতুন ছড়া পড়তে সুরু করলে।

পরদিন চৌধুরীবাড়ির চন্দনের খাস-কামরায় তার বন্ধুটির সঙ্গে কথাবার্তা চল্‌ছিল।

বন্ধুটি বললে, কিরে চন্দন! পুরো একটাদিন ত' ভাববার সুযোগ পেলি! ভেবে ভেবে কি ঠিক করলি, তাই আগে শুনি!

চন্দন খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল, ওর কথার জবাব দিলে না। তারপর হঠাৎ সকল দ্বিধা দূর করে দিয়ে বললে, না রে, ভেবে দেখলাম তোর কথাই সত্যি! দিন-কতক আমার বাইরে থেকে ঘুরে আসাই উচিত। ক'দিন থেকে রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না। কেবলি মগজের ভেতর প্ল্যান ভেসে বেড়াচ্ছে কি করে ফাল্গুনকে প্যাঁচে ফেলে জব্দ করা যায়।

ভালো করে ক্ষিদে হচ্ছে না, সারারাত এপাশ-ওপাশ করছি; তার ফলে শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ছি। রদ্দুর উঠে গেলে বিছানা থেকে উঠছি। সারাদিন শরীরটা ম্যাজ-মাজ করছে আর হাই উঠছে! এভাবে কিছুদিন চললে আমার শরীরটা সত্যি ভেঙে পড়বে! তাই ভেবে দেখলাম, তোর কথাই সত্যি।

বন্ধুটি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

বললে, তাহলে আর দেরী নয়—শুভস্য শীঘ্রম্—

চন্দন জিজ্ঞাসু-চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শুধোলে, কি বলতে চাস্ তুই?

—আমি বলতে চাই আর একটা দিনও দেরী করা নয়। কাল খুব ভোরেই

নৌকো করে বেরিয়ে পড়ো। দাঁড় টেনে গেলে মাঝিরা ঠিক সময়মত ষ্টীমার ধরিয়ে দিতে পারবে।

—একেবারে শেষ রাত্তিরেই? আর একটা দিনও সময় দিতে চাস্‌না নাকি?

—সময় নিয়ে লাভ কি? মিছিমিছি অনিদ্রা রোগটাকে বাড়িয়ে তোলা! আমি বাড়ির ভেতর গিয়ে মাসীমাকে বলে দিচ্ছি সব গুছিয়ে-টুছিয়ে দেবার জন্যে।

—বলিস্‌ কিরে? একেবারে পত্রপাঠ পার্শেল পাঠানো? পশ্চিমপাড়ার দল হয় ত' আমার চলে যাওয়ার খবর পেলে, মিটিমিটি হাসবে আর টিপ্পনী কেটে বলবে, চন্দন চৌধুরী ময়নাচাঁদের দশা দেখে আর গাঁয়ে থাকতে সাহস পায়? তাই রাতা-রাতি চম্পট দিয়েছে!

—আরে রেখে দে তোর পশ্চিমপাড়ার টিপ্পনী। যদি যুদ্ধ ঘোষণাই করতে হয় ত' ফিরে এসে একেবারে দুন্দুভি বাজিয়ে সুরু করে দিবি। তার জন্যে তোর এখন যাওয়া আটকাচ্ছে কিসে? চল মাসীমার কাছে, গিয়ে বলি আপনার গুণধর পুত্রকে আর একদিনও গাঁয়ে রাখবো না। সটান পাঠিয়ে দিচ্ছি কলকাতায় তার পিসির বাড়ি।

—আচ্ছা তাই চল। তোর ব্যবস্থাপত্র মেনে নিয়ে দেখি ব্যাধি সারে কিনা!

এই বলে চন্দন উঠে দাঁড়ালো। তারপর বন্ধুকে নিয়ে অন্দরমহলের দিকে চলে গেল।

চন্দনের মা সব কথা শুনে বললেন, এতে আমার খুব মত আছে, এখানে দিন-রাত্তির গেঁয়ো দলাদলি আমার আদপেই ভালো লাগে না! খালি কে কার মাথায় ডাণ্ডা মারবে, কে কার সর্বনাশ করবে এই চিন্তা। তুমি ভালো বুদ্ধি দিয়েছ বাবা। আসুক পিসির বাড়ি থেকে দিনকয়েক ঘুরে।

—ঠিক বলেছেন মাসিমা! আপনার এ রায়ের ওপর আর আপীল চলবে না চন্দন, তুই সুটকেসটা গুছিয়ে নে। একা মানুষ—কিই বা এমন দরকার পড়বে?

এইবার চন্দনের মা একটু কিন্তু-কিন্তু করে উঠলেন।

—একথা বল্‌লে ত' চলবে না বাছা!

—কেন মাসিমা, আবার কি হল?

—চন্দন যাচ্ছে ওর পিসির বাড়ি। অমন খালি হাতে গেলে কি চলে? তাহলে চৌধুরীবাড়ির নিন্দে রটবে যে—।

ও! বুঝতে পেরেছি। মিষ্টির হাঁড়ি গুছিয়ে দিতে চাইছেন? তা বেশ কথা। দিন না সব ব্যবস্থা করে। ইচ্ছে করলে ষ্টীমার-ঘাট থেকেও ও মিষ্টি কিনে নিতে পারে।

—সে হয় না বাছা। আচ্ছা, সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না, আমি সবকিছু

গুছিয়ে দিচ্ছি। ওর পিসির বাড়িতে লোকজন ত' ষষ্টের আশীর্বাদে কম নয়—তাই এমন করে গুছিয়ে দিতে হবে যাতে কুটুম্ববাড়ি নিন্দে না রটে।

তারপর সুরু হল—চন্দনের মার গুছিয়ে দেবার পালা। এক হাঁড়ি ক্ষীরের সাজ, তিলের নাড়ু টিনভর্তি, গাওয়া ঘি আধমনটাক্, নারকেল-নাড়ু এক হাঁড়ি, খোয়া ক্ষীর বৈয়ম ভর্তি। বাগানের নানাজাতীয় ফল দুই ঝুড়ি, মর্তমান কলা দুই কাঁদি। চন্দনের পিসি আচার ভালোবাসে সেজন্যে কয়েকটি বৈয়ম ভর্তি কুলের আচার, আমের আচার, জলপাইয়ের আচার, টোমাটোর আচার, পেয়ারার চমৎকার মিষ্টি জেলি, তাছাড়া পুকুর থেকে সেই রাত্তিরে জাল ফেলে দুটো বড় রুই মাছ ধরা হল।

ক্রমাগত এইসব জিনিষ সারারাত ধরে নৌকোয় ভর্ত্তি হতে থাকলো—খিড়কীর পুকুরের ঘাটে।

চন্দনের মার এক একবার এক একটি জিনিষের কথা মনে পড়ে আর তিনি ছুটে ভাণ্ডার ঘরে গিয়ে হাজির হন। ওর পিসি বঁটি চেয়ে পাঠিয়ে ছিল। গাঁয়ের কামারের তৈরী দুটি ভালো বঁটি নৌকোয় তুলে দেওয়া হল।

এইভাবে ডালা, কুলো, ঝাঁটা, বারকোস, ধামা, মাটির খেলনা ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছুই বাদ গেল না। গাছের তেঁতুল অবধি নৌকোতে উঠল এক হাঁড়ি।

শেষ রাত্তিরে চন্দনের মা দুর্গা নাম জপ করতে করতে ছেলেকে ডেকে তুললেন। মঙ্গলঘটে যাত্রা করানো হল, মণ্ডপ প্রণাম হল, চৌধুরীমশায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে এলো।

তারপর মা-ব্যাটাতে লণ্ঠন হাতে নিয়ে খিড়কীর পুকুরের ধারে এসে হাজির হলো।

মা বললেন, দাঁড়া; সব জিনিষগুলি মাঝিরা গুছিয়ে নিয়েছে কিনা আমি একবার চোখ বুলিয়ে দি।

নৌকোয় উঠে চন্দনের মায়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত যে খাবার জিনিষ তিনি সারারাত ধরে নৌকোয় তুলে দিয়েছেন—তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই! শুধু ঝাঁটাগুলো পড়ে আছে নৌকোয় সামনের গলুয়ের কাছটায়!

চন্দনও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর ওপরে এসে উঠেছিল। সে লণ্ঠনটা ঘুরিয়ে নিয়েই সব বুঝতে পারলে।

হঠাৎ তার চোখ-মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল। বললে নৌকো থেকে নেমে এসো মা! আমি সব বুঝতে পেরেছি। একাজ পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুনের দল ছাড়া আর কেউ করেনি। নিশ্চয়ই তারা কোনো উপায়ে আমার যাবার খবর পেয়েছে! তাই রসিকতা করে গেছে! বুঝতে পারলাম মা, এখন

আমার গ্রাম ছেড়ে যাবার উপায় নেই। ওদের শায়েস্তা করে তবে আমার অন্য কথা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুরো ব্যবস্থা করছি আমি।

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে শেষ রাত্তিরে পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

জল-বিছুটি গাঁয়ের ওপর কালো মেঘ এমন ঘন হয়ে জমে উঠল যে, মাতব্বরেরা দেখে অনুমান করলেন, খুব শীগগীরই একটা দারুণ বর্ষণ হবে।

প্রবল বারিপাতের আগে—আকাশের যে অবস্থা হয় ঠিক সেই রকম। একেবারে থমথমে—এতটুকু হাওয়া নেই—গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না।

পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার নট্‌ঘটি বারো মাসে তের পার্বণের মতো ত' লেগেই ছিল ছিঁটে-ফোঁটা—এখন এক পশলা বৃষ্টির মামলা।

এবার যা ঘনঘটা করে গোটা আকাশ ছেয়ে এলো তাতে বুড়োর দল অনুমান করলে,—গোটা গাঁ বন্যায় না ভেসে যায়।

এক একটা পাড়া ধরে মেঘ জমাট বেঁধে উঠল।

এ পাড়ার কেউ—ও পাড়ার কোনো লোককে দেখলে কথা ত' বলবেই না, উপরন্তু মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে।

হাটে বাজারে যদি গায়ে ছোঁয়া লাগে তবে দুজনেই এমন ভাব দেখায় যে দেহটা বুঝি অশুচি হয়ে গেল—এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে স্নান করে ফেলে গোবর খেয়ে শুদ্ধ হতে হবে। চৌধুরীবাড়ি আর গাঙ্গুলীবাড়িকে কেন্দ্র করে পাকা পোক্তা রকম দুটি দল গড়ে উঠল।

এ যেন একেবারে মানের মামলা।

চৌধুরীবাড়ি হেরে গেলে গোটা পুবপাড়ার মান খোয়া যাবে, আর গাঙ্গুলীবাড়ি পিছু হটলে গোটা পশ্চিমপাড়ার মাথা কাটা পড়বে এমনি সবাইকার মনের অবস্থা।

বারুদ জমানোই আছে শুধু ছোট্ট একটি দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলেই হয়।

বর্ষণই বলো আর ভূমিকম্পই বলো—সেটা যে কোন দিক দিয়ে আচমকা শুরু হবে—সে কথা কেউ বলতে পারে না।

ভেতরে ভেতরে তোড়জোড় চলছে, কান-কথা আর ফিস-ফিস কথা হচ্ছে—এ

বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির ? কোন পাড়া যে অপর কোন পাড়াকে কি প্যাঁচে কাৎ করবে—তারই কসরৎ চলছে—লোকচক্ষুর অন্তরালে—একেবারে গোপনে।

ছোট্ট গ্রামখানি হঠাৎ টলমল করে উঠল ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে কিন্তু সেই চাঞ্চল্য এমন একদিক থেকে এলো; যা এ অঞ্চলের বাসিন্দারা আগেও ধারণা করতে পারে নি।

খবরের কাগজ ত' এ গ্রামের লোকেরা পড়তে পারে না—তাই বাইরের জগতের সংবাদ বিশেষ রাখে না।

হঠাৎ দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে—যাতে ছোট-ছোট বিরোধ আর দ্বন্দ্ব একেবারে ধামা-চাপা পড়ে গেছে।

ব্যাপার সত্যি গোলমেলে।

কল্‌কাতায় জাপানী বোমা পড়েছে।

লোক ছুটে পালাচ্ছে ভেড়ার পালের মতো—

উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে।

তাই-বা বলি কি করে ?

যে দিকে দু'চোখ যায় মানুষ ছুটেছে প্রাণের ভয়ে।

প্রাণ বাঁচাতে পালাতে গিয়ে কত লোক যে প্রাণ খোয়াচ্ছে তার হিসেবই বা কয়জন রাখছে ?

আণ্ডা-বাচ্চা, জরু-গরু, বোঁচকা-বুঁচকি, ধামা-কুলো, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় নিয়ে যে যেদিকে পারে মুক্ত কচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছে—কলকাতায় আর থাকা নয়।

হাতিবাগান না খিদিরপুর—কোথায় যেন বোমা পড়েছে!

জাপানী বোমা!

ওরে বাবা! কলকাতায় প্রাণ কি তাহলে আর থাকবে ?

যার ঘরবাড়ি আছে সে প্রতিবেশীর হাতে সঁপে দিয়ে বল্‌ছে, তুমিই বসবাস কোরো দাদা! যদি ফিরে আসি তবে ফেরৎ দিও, নইলে এবাড়ি তোমার! কিন্তু দোহাই দাদা, দেখো, বাড়ির জিনিষপত্তর যেন খোয়া না যায়!

চাকরী ছেড়ে কেরানী পালাচ্ছে, ঠেলাগাড়ী ফেলে মুটে ছুটছে, গাই ফেলে গোয়ালা ছুট্‌ছে, ছেলে ফেলে মা পালাচ্ছে, রোগী ফেলে ডাক্তার পালাচ্ছে, ইস্কুল ফেলে মাষ্টার পালাচ্ছে আদালত ফেলে, হাকিম পালাচ্ছে, কাগজ ফেলে সম্পাদক ছুট্‌ছে, ঘোড়া ফেলে জকি পালাচ্ছে, গাড়ী ফেলে গাড়োয়ান পালাচ্ছে, মাছ ফেলে মেছুনি ছুট্‌ছে! এমনি ভাবে কলকাতা শহরে একটা পালানো আর ছোটার ধূম পড়ে গেছে! আগে কলকাতা শহরে হাঁটা-চলা যেত না।

মানুষগুলি সব পোকার মতো কোটরে কোটরে বাস করতো। একেবারে ছারপোকার মতোও বলা চলে।

কিন্তু এই পালানোর হিড়িকে একদিকে কলকাতা শহর যেমন খালি হয়ে গেল—বাঙলাদেশের গ্রামগুলি তেমনি ভর্তি হয়ে উঠতে লাগলো!

যারা জীবনে হাওড়া ব্রীজের এপাশে আসেনি—তারা অবধি সইয়ের-বউয়ের-বকুলফুলের-বোনপো-বউয়ের-বোনঝি-জামাইকে ধরে, যে কোনো অজপাড়াগাঁয়ে পিঁপড়ের মতো চলে এলো বোঁচ্কা-বুঁচ্কি কাঁধে করে।

হোক ম্যালেরিয়া, তবু বোমার হাত থেকে মাথাটা ত' বাঁচবে!

এইভাবে জলবিছুটি গাঁয়ের অনেক অচেনা মানুষ এসে হাজির হল।

সাময়িকভাবে এসে নীড় বাঁধলে তারা—কেউ পুবপাড়ার কেউ পশ্চিমপাড়ায়।

জলবিছুটি গাঁয়ের লোকেরা এই সব কাণ্ড দেখে হকচকিয়ে গেল।

যে গ্রামের নাম ভূগোলে লেখা নেই, যার এতটুকু কদর নেই, খবরের কাগজে যে গ্রামের সংবাদ ছাপা হয় না—, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে আসছে কিনা কলকাতার সব নামকরা ব্যবসায়ীরা, বড় ডাক্তাররা, আর একডাকে চেনা বনিয়াদী বড়লোকেরা।

গাঁয়ের মাতব্বরেরা সকাল বিকেল হুঁকো টানে আর বলে, এ হল কি? কালে কালে আরো কত দেখ্বো!

যে সব বড়লোক জীবনে এই প্রথম পাড়াগাঁয়ে এসেছে, তাদের হাতে কোনো কাজকর্ম নেই! কাজেই সখ করে সব বাজার করতে বেরোয়।

দু'চোখে যা দেখে তারই দর করে।

পল্লী অঞ্চলের চাষীদের মুখে যে দাম শোনে তাতেই আনন্দে আর উল্লাসে বত্রিশপাটি দাঁত বিকশিত হয়ে ওঠে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে, বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, ড্যাম চিপ্!

এইভাবে হাটে-বাজারে ওদের নামই হয়ে গেল 'ডেঞ্চিবাবু'।

—ওরে ডেঞ্চিরাবুরা এসেছে, ভালো মাছ দেখা—!

স্থানীয় লোকেরা ওদের দু'চোক্ষে দেখ্তে পারে না! জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা! কোনরকম দরদস্তুও করে না—মুখে বলে 'ড্যাম্ চিপ্ আর পকেট থেকে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

গাঁয়ের মাতব্বরেরা দেখ্লে, ভালো রে ভালো। না হয় তোদের পকেটে কিছু কাঁচা পয়সাই আছে! তাই বলে জিনিসপত্রের দর এমনভাবে চড়িয়ে দিবি?

এত খাঁটি দুধ জীবনে ওরা দেখেনি।

ছয় পয়সা করে দুধের সের শুনে—কলসী কলসী দুধ কিনে নিয়ে যায়—পায়েস খাবে, আইসক্রীম করবে ক্ষীরের বরফি তৈরী করবে, ছানা খাবে—বাটি! বাটি!

ওদের ওপর বিশেষ করে চটল বুড়োরা।

তাদের চিরকালের অভ্যেস—সন্ধ্যের মুখে আফিম খায়। কাজেই রাত্তিরে এক বাটি করে দুধ না খেলে তাদের চলেনা।

স্থানীয় বাসিন্দারা দুধের দাম দেয় নায় মাত্র। তা-ও কত মাসের বাকি পড়ে থাকে কেবা হিসেব কসছে! গোয়ালারা সেজন্য আপত্তি করত না, ধীরে সুস্থে শোধ দিলেই হবে।

এখন আর সেটি হবার যো নেই।

ডেঙ্কিবাবুরা বাজারে এসে নগদ দাম দিয়ে কলসী কলসী দুধ কিনে নিয়ে ঘরে চলে যায়—সে ক্ষেত্রে কি আফিম-খোর বুড়োদের ধারে দুধ দেয়া চলে? গোয়ালার দল এখন বেশ চালাক হয়ে গেছে।

সোজাসুজি মাথা নেড়ে বললে, ধারে হবে না কর্তা,—এগিয়ে দেখুন।

—আরে এগিয়ে আর কোথায় দেখবো ঘোষের পো? একেবারে খালের জলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ব নাকি?

শুধু কি দুধ?

ওদের জ্বালায় মাছ কেনবার যো নেই!

পাকা রুই, বড় চিতোল, গলদা ও বাগদা চিংড়ি—সব কিছু সর্ব্বভুকের মতো ঝুড়ি ভর্ত্তি করে নিয়ে চলে যায়।

—ওলাউঠো হোক ব্যাটাদের—খেয়ে খেয়ে সব সাফ করে ফেললে!

আড়ালে-আবডালে ড়োরা গালাগালি দেয় আর চলতে গিয়ে পথের দুপাশে থু-থু ফেলতে থাকে।

সত্যযুগের মতো ব্রাহ্মণদের চোখে যদি আগুন থাকতো, তবে এই ডেঙ্কিবাবুর দল কবে ভস্ম হয়ে যেতো।

কিন্তু ঘোর কলিকাল।

এ যুগে শকুনের শাপে আর গরু মরে না! ভাগাড়ে শুধু শকুনদেরই মরা-কান্না ওঠে।

ডেঙ্কিবাবুরা দিব্যি খেয়ে দেয়ে, বহাল তবিয়তে ভুঁড়ি বাগিয়ে সন্ধ্যেবেলা নৌকো করে হাওয়া খেতে বেরোয়। কোনো কোনো দল আবার হারমোনিয়াম আর বাঁয়া-তবলা নিয়ে নৌকোর ওপর দিব্যি গানের মজলিস বসায়।

অত চ্যাঁচালে আর ক্ষিদে হবে না?

রাত্তিরে আবার দিস্তে-দিস্তে লুচি-পরোটা-মাংস ওড়াবে 'খন।

এই পঙ্গপালের দল যে কবে পল্লী অঞ্চল থেকে আবার শহরে চলে যাবে, সেই কথাই শুধু ভাবতে থাকে গাঁয়ের মাতব্বরেরা।

আফিম যারা খায়—তারা ত' মারমুখী হয়ে আছে।

সুযোগ পেলেই অন্ধকার পথে দু-ঘা বসিয়ে দেবে। কিন্তু ডেঞ্চিবাবুরা যে নৌকো ছাড়া চলাচল করে না।

কেউ কেউ পানসী ভাড়া করে আবার জলের ওপরেই বসবাস সুরু করছে। নিত্যি পাঁঠা কাটছে, খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের পোলাও চাপাচ্ছে। গন্ধে সারা গ্রাম ম'—ম' করছে।

ঘ্রানেন অর্দ্ধ ভোজনম্ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

—খেয়ে নে ব্যাটারা যত পারিস, কলকাতার শহরে ত' শুধু ভেজাল তেল আর দালদা খেয়ে থাকিস! খাঁটি দুধ-ঘীয়ের মর্ম তোরা কি করে জানবি?

ভট্‌চাজমশাই সেদিন নাকে গামছা চেপে বললেন, আর বল কি বাঁড়ুয্যে, রাত্তিরের কাণ্ড ত' শোনোই নি।

পরনিন্দার গন্ধ পেয়ে বাঁড়ুয্যেমশাই সচকিত হয়ে ওঠেন। —কি—কি? রাত্তিরে ব্যাটারা কি করে শুনি?

ভট্‌চাজমশাই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন—তারপর একবার থু-থু ছিটিয়ে বললেন, আরে ভাই, সে কথা আর মুখে বলবার নয়। বুঝলে, ব্যাটারা একেবারে ম্লেচ্ছ। জাত-জন্ম আর রইল না। সারাটা গাঁকে একেবারে অশুচি করে দিলে।

বাড়ুয্যে কৌতূহল চাপতে না পেরে ভট্‌চাজমশায়ের কাছে আরো এগিয়ে আসেন।

—বলো না ভট্‌চাজ বলো না। কি কাণ্ডটা করে ব্যাটারা! ভটচাজ নিজের দর আরও একটু বাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয়,—কিচ্ছু শোনোনি বুঝি? ম্লেচ্ছেরা বেশী রাত্তিরে নৌকোর ওপর মুরগী জবাই করে। কলের উনুনে শোঁ-শোঁ শব্দে রান্না চাপিয়ে দেয়। আমার বাড়িটা আবার খালের ধারে, ভক্ করে জানালা দিয়ে এমন বেমক্কাভাবে গন্ধ গিয়ে ঢোকে—আমি ত' বমিই করে ফেললাম কাল রাত্তিরে।

কে যেন ফোঁড়ন কাটলে—ঘ্রানেন অর্দ্ধ ভোজনং।

বাড়ুয্যেমশাই উটের মতো তার গলা বাড়িয়ে চারদিকে চোখদুটো একবার ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে—কে বললে এমন কথা?

কিন্তু কে যে টিপ্পনী কাটলে ভীড়ের মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

জল-বিছুটি গাঁয়ে অনেকগুলি পোড়োবাড়ি ছিল। বহুকালের জীর্ণ পুরোনো দালান। এখন আর কেউ বসবাস করে না। চারদিকে ঘন আশ-স্যাওড়ার বন হয়ে গেছে।

দিনেরবেলাতেই সেইসব বাড়ির ভেতর ঢুকতে লোকে ভয় পায়। কথায় বলে গরজ বড় বালাই।

কলকাতায় বাবুদের এখন থাকবার আস্তানা দরকার। কাজেই সেই সব পোড়োবাড়ি সাফ্ করে ফেলা হল, সাপের গর্ত বুজিয়ে দেয়া হল, কিছু কিছু মাটি ঢেলে উঠোনের ডোবাগুলি ভরাট করা হল, আর চুণকাম করা হল বাড়িতে।

তখন আশেপাশের জ্ঞাতিরা মালিক হিসেবে দেখা দিলেন—কলকাতার ডেঞ্চি-বাবুদের সামনে।

কাজে-কাজেই সেইসব বাড়ি ভাড়া নেয়া হল। এইভাবে লোকদের গাঁয়ের দিব্যি একটি আয়ের পথ খুলে গেল। কত গেরস্থ যে ঢেঁকিঘর আর গোয়াল ভাড়া দিয়ে পয়সা পিট্তে লাগলো—তার হিসেব কেউ দিতে পারে না।

এইভাবে আরো দশটি পরিবারের সঙ্গে পূবপাড়ায় এলো—শশীরা আর পশ্চিম-পাড়ায় এলো শ্যামলেরা।

একদিন নদীর ধারে বসে দুটি ছেলে মাছ ধরছে।

কেউ কাউকে চেনে না—জানে না।

ছোট ছেলেটি চট্পট মাছ তুলছে। মাছগুলি অবশ্যি ছোট, কিন্তু খাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। ওর খালৈ প্রায় ভর্তি হয়ে এলো।

একটু বড় ছেলেটি শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। ওর ফ্যাৎনায় এতটুকু টান্ পড়ছে না।

বেচারী আর কাহাতক অন্যের বঁড়শীতে মাছ ওঠা দেখে।

শেষকালে অধৈর্য্য হয়ে উঠল বড় ছেলেটি।

আপনমনেই বলে উঠল, ধুত্তোর! আর ভালো লাগে না—এইবার পালাই—

ছোট ছেলেটি নিজের ফাৎনার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করলে, তোমার বঁড়শীতে বুঝি একটিও মাছ ওঠে নি?

বড় ছেলেটি হতাশভাবে জবাব দিলে,—না।—

ছোট ছেলেটি সেই ফাঁকে আর একটি বড় পুঁটিকে ঘায়েল করে ফেলেছে। ওটাকে ডাঙ্গায় তুলতে তুলতে বললে, তাতে কি হয়েছে? বোসো তুমি। আমার মাছ থেকে তোমাকে ভাগ দেবো'খন—

বড় ছেলেটি লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলে, না-না, তা কেন? তোমারটার ভাগ দিতে যাবে কেন? তুমি একে আমার চাইতে বয়সে একটু ছোট; তার ওপর এই এতক্ষণ রদ্দুরে বসে এত কষ্ট করে মাছ ধরলে, আমাকে মিছিমিছি ভাগ দিতে যাবে কেন? আর আমারও ত' তোমার কাছ থেকে নেয়া ঠিক হবে না।

ছোট ছেলেটি এইবার ফিক্ করে হেসে ফেললে, বড়ছেলেটি শুধোলে, তুমি হাস্লে যে?

ছোটছেলেটি উত্তরে বললে, বিরাট রাজ্যি ত' আর ভাগ করে দিচ্ছি নে। শুধু গোটাকয়েক মাছ ত'। আর তাছাড়া এখানে মাছের কোনো দরকারও নেই। সময় কাট্‌তে চায় না, তাই মাছ ধরে একটু সময় কাটানো। এর থেকে তুমি কিছুটা নিলে আমার ভারও কমবে—আর আমি খুশীও হব।

ছোটছেলেটির কথা শুনে বড়ছেলেটির ভারী ভালো লাগলো। উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, ও। তোমার বুঝি সময় কাট্‌তে চায় না? তা আমার সঙ্গে অনেক গল্পের বই আছে। এসো না একদিন আমাদের বাসায়—

—কোথায় থাকো তুমি? প্রশ্ন করলে ছোটছেলেটি। বড়ছেলেটি একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উত্তর দিলে, ওই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—চিলেকোঠাটি —ওই জলার ধারের পোড়ো-বাড়িটা জঙ্গলে একেবারে ভর্তি হয়েছিল। আমার কাকাই ত' সাফ্ করিয়ে নিয়েছিল। সাপই মারা পড়েছে গোটাকুড়ি, মশা-টশা সব খতম করে দেয়া হয়েছে। একটা ইন্দারা ছিল। সেটাকে পরিষ্কার করে নেয়া হয়েছে। চমৎকার খাওয়ার জল। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি হজমী, খেলেই ক্ষিদে পায়। আমার কাকা নামকরা ডাক্তার কিনা—তাই সব কিছু তার জানা আছে।

কাকার গর্ব্বে ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বড়ছেলেটি শুধোলে, তোমার নাম কি ভাই?

ছোটছেলেটি উত্তর দিলে—

—শশী—

আর আমার নাম শ্যামল।

॥ পনেরো ॥

সে দিন সকালবেলা শশী গেল শ্যামলদের বাড়ি বেড়াতে।

শশী অবাক হয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। যত দু'চোখ মেলে দেখ্‌ছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল।

শ্যামল এতটুকু বাড়িয়ে বলে নি।

জঙ্গলে-ভর্তি জীর্ণ বস্তিটার ওরা একেবারে চেহারা পাল্‌টে দিয়েছে।

বাজে জঙ্গল সব সাফ্ হয়ে গেছে, ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে উঠোনটা, সামনে কঞ্চির বেড়া দিয়ে বাগান তৈরী করা হয়েছে। কোনোটাতে ফুল ফুটেছে, কোনটাতে এখনো ফোটেনি।

ওপাশে একটু তফাতে একটা গোয়ালঘর তৈরী করা হয়েছে। দুটি গাই—একটি ঝি দুধ দোয়াচ্ছে। ফ্যানায় ভর্তি হয়ে গেছে বাল্‌তিটা। দেখে দেখে মজা লাগলো শশীর।

উঠোন পেরিয়ে প্রথমেই বেশ বড় কামরাটা—সেখানে একটা ডিসপেন্‌সারী সাজানো হয়েছে। কত ঢঙের শিশি-বোতলে ভর্তি আলমারী আর তাক্‌গুলো। কত রকমের ওষুধ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শশী মনে মনে ভাবে, মানুষের রোগের যেমন অন্ত নেই, তেমনি ওষুধেরও নেই শেষ।

ওর কিন্তু ওষুধ-বিষুধ খেতে ভারী ভয়।

ছুটোছুটি করেই সে শরীরটাকে ভালো রাখতে চায়। ওর নিজের স্বাস্থ্যটাও ভারী সুন্দর। রোগ-ব্যামো তার ধারে-কাছে আসতে সাহস পায় না। খুব ছুটো-ছুটি করে খেলে, মোটেই কুঁড়ে নয় সে। কাজেই ক্ষিদে পায় প্রচুর। শশী খেতেও পটু।

ওই তপ্ত দোয়ানো দুধ। ওর হাতে দিলে এক্ষুণি চোঁ-চোঁ করে শেষ করে দেবে।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পেছনকার ঘর থেকে।

জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই তোমার খোকা?

তিনি হয়ত মনে করেছিলেন শশীও এক রোগী। কেননা ঘরের ভেতরকার বেঞ্চে অনেকগুলি লোক—ছেলে-বুড়ো বসেছিল।

শশী এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে শ্যামল এই বাড়িতে থাকে।

—শ্যামল? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার ভাইপো। ওরে শ্যামল তোকে কে ডাকছে দেখবি আয়—

বলেই ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে সেই পেছনকার ছোট কুঠুরির ভেতর ঢুকে গেলেন। বোধকরি ওখানেই ওষুধ তৈরী করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে শ্যামল এসে হাসিমুখে হাজির হল। ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ওর দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি যে আমাদের বাসায় চলে আসবে তা আমি ভাবতেই পারি নি।

শশীও হাসতে হাসতে জবাব দিলে, তুমি যা লোভ দেখিয়ে এসেছ, না এসে আর উপায় কি বলো?

—লোভ? শ্যামল আর কিছু খুঁজে পায় না। তোমায় খেতে নেমন্তন্ন করে-ছিলাম নাকি? আমার ত' মনে নেই। তা হলে কাকিমাকে খবর দিতে হয়।

এইবার হো-হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে শশী। এরই মধ্যে ভুলে

গেলে শ্যামল ? তুমি যে বলে এলে তোমার অনেক বই আছে! নিয়ে চলো আমাকে সেই বিরাট ভোজের আসরে—

শ্যামলের এতক্ষণে মনে পড়ে যায়। বইয়ের কথা শশীকে বলেছিল বটে!

—তাই বলো! আমি ত' ভেবেই পাইনে—কি লোভ দেখিয়ে এসেছিলাম।

একটু লজ্জিত কণ্ঠে উত্তর করে শ্যামল।

তখন দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

ভেতরে ঢুকতেই ডানহাতি রান্নাঘরে একটি মহিলা রান্না করছিলেন। তিনি ওদের দু'জনকে একসঙ্গে আসতে দেখে মুচকি হেসে বললেন, তাহলে এতদিনে আমাদের শ্যামলের একটি বন্ধু জুটল! যে মুখচোরা ছেলে—তোর সঙ্গে সেধে কে আলাপ করতে আসবে শুনি ?

—আমি এসেছি কাকিমা!

এই বলে শশী এগিয়ে গিয়ে কাকিমাকে টিপ্ করে এক প্রণাম ঠুকে দিলে।

—বারে! খুব মিশুকে ছেলে ত'! কি করে জানলে আমি কাকিমা ? শশীকে প্রশ্ন করেন তিনি।

শশী হাসতে হাসতে উত্তর করলে, সে কথা জানেন না বুঝি কাকিমা ? আমি যে একজন নামজাদা গোয়েন্দা,—রবাটব্লেকের মাসতুতো ভাই! বাড়িতে ঢুকেই গন্ধ শুঁকে সব কথা বলে দিতে পারি। এমন কি রাজ-জ্যোতিষী পর্য্যন্ত দেখে ভিরমি খেয়ে পড়বে।

—বাঃ! ভারী মজাদার বন্ধু জুটেছে ত' শ্যামল তোর! কিন্তু তুই যা মুখচোরা ছেলে—শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারবি ত' ? আমার কিন্তু ছেলেটিকে ভারী ভালো লাগছে। তা আর কি কি গুণ আছে তোমার ? আগে শুনি কি তোমার নাম ?

কাকিমা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন! শশী চট্‌পট্ উত্তর দিলে, নাম আমার শশী। আমাকে ওই নামেই ডাকবেন। কেননা এখন ঘন ঘন আমাকে এই বাড়িতে দেখতে পাবেন কিনা! এমন একটি কাকিমা ছেড়ে খুব দূরে দূরে থাকা যাবে না—সেকথা বাড়িতে ঢুকেই বুঝতে পারছি। আর গুণের কথা জিজ্ঞেস করছেন ? গোয়েন্দার গুণের পরিচয় এই মুহূর্তে আমি দিয়ে দিতে পারি। এই ধরুন আজকে আপনি কি কি রান্না করছেন ?

কাকিমা হাসিভরা মুখে শুধোলেন, ধন্যি ছেলে বাপু তুমি! বাড়িতে ঢুকেই বলে দিতে পারবে—আমি কি কি রান্না করছি ? হাত দেখাতে হবে নাকি ?

শশী কৌতুকের সুরে উত্তর দিলে, না-না, হাত দেখাতে হবে কেন ? আপনার শাড়ীর পাড় দেখেই আমি বলে দিতে পারবো, আজ আপনি কি কি রান্নার ব্যবস্থা করছেন।

—আচ্ছা বলত শুনি! বলতে পারলে খাইয়ে দেবো তোমাকে।

কাকিমা আশ্বাস দেন।

শশী বললে, তাহলে মন দিয়ে শুনুন। নানারকম তরকারী দিয়ে একটা ঝাল-চচ্চড়ি, লাউয়ের শাক, আর পুকুরের পোনামাছের ঝোল। আমড়ার টকও থাকতে পারে।

কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠলেন।—নিশ্চয়ই তুমি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছ। নইলে ঠিক ঠিক বললে কি করে!

শশী জবাব দিলে, সত্যি বলছি কাকিমা! রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি আমি আদৌ মারি নি। আপনাদের শ্যামলের সঙ্গেই এই প্রথম আমি এবাড়ি ঢুক্‌ছি—

শ্যামল এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আর কাকিমার সঙ্গে ওর মজার কথা-বার্তা শুন্‌ছিল।

এইবার সে এগিয়ে এসে শুধোলে, আচ্ছা শশী, তাহলে ঠিক-ঠিক রান্না কি হবে—তুই কি করে বলতে পারলি? সত্যি করে বল্‌ত, তুই কি গুনতে জানিস?

তেমনি কৌতুকের সুরে চোখদুটি নামিয়ে শশী জবাব দিলে মোটেই না।

কি করে রান্নার কথা বলতে পারলাম—সেই কৌশলটি এইবার জানিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কাকিমা মন দিয়ে শুনুন।

প্রথম কথা এই যে, আপনার যে ঝিটি দুধ দুইছে—আমি আসবার সময় দেখলাম যে তার সাম্‌নে একটি ঝুড়ি রয়েছে এবং সেটা সদ্য-তোলা লাউশাকে ভর্তি। অনুমান করা শক্ত নয় যে, বাড়ির গৃহিণীর আদেশেই এই লাউশাক কাটা হয়েছে এবং আজ তা রান্না হবে।

ওদিকে আপনাদের বাড়ির সামনেকার পুকুরে একটি ছোক্‌রা চাকর—সেটা অবশ্য আন্দাজে বলছি—এইমাত্র একটি পোনামাছ বঁড়শীতে টেনে তুলেছে! ডাক্তারের বাড়ি যখন, তখন শরীরের পক্ষে অপকারী সরষে বাটা চলবে না। কাজেই মাছের ঝোল হবে—বিশেষ করে তাজা মাছের ঝোল, সেইটেই অতি সহজে অনুমান করে নেয়া যেতে পারে। এইবার ঝাল-চচ্চড়ির কথা। আমি অন্দরমহলে ঢুকবার মুখেই ঝাল-চচ্চড়ির গন্ধ পেয়েছি। মনে হয় এটা কাকীমার নিজের মনের মতো তরকারী, তারপর আমড়ার টক। রান্নাঘরের চৌকটের সামনে কয়েকটি আমড়া পড়ে আছে—ঢোক্‌বার মুখে দেখেছি। কাজেই ওটা দিয়ে যে টক্ হবে সেটা গবেষণা করে বলতে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না! আপনি কি বলেন কাকিমা?

শশীর কথা শুনে কাকিমার চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, এত যখন তোমার বুদ্ধি, তখন তুমি লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে জজ হবে। আশীর্বাদ করছি আমি।

শশী কাকিমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর দিলে—জজ হতে পারবো কিনা জানি না, কিন্ত আজ ত' নগদ-নগদ কাকিমার স্নেহ পেলাম, তাঁর দাম আমার কাছে অনেক বেশী।

এতক্ষণে শ্যামলের মুখে কথা ফুট্‌ল৷

সে অনুযোগের সুরে বললে, বারে! আমার বন্ধুকে কি তুমি আট্‌কে রাখবে? আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না? আমার গল্পের বইগুলি ওকে দেখাবো যে!

কাকিমা মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, তাহলে বন্ধুর ছোঁয়া লেগে তোর মুখেও বোল্ ফুটেছে বল! ভালো লক্ষণ বলতে হবে। আচ্ছা! ওকে নিয়ে তোর ঘরে বসা। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

শশী বলে উঠল, এর ওপর আবার খাবারও আছে! নেমন্তন্ন ছিল শুধু বই দেখবার। ফাউ জুটল খাবার!

কাকিমা উত্তর দেন, শুধু খাবারই বা খাবে কেন? গোয়েন্দাগিরি করে যে সব রান্নার নাম করলে তাও চেখে যেতে হবে তোমায়। অবিশ্যি চারকটা যদি মাছ সত্যি ধরে থাকে। নইলে মিছিমিছি নিরামিষ রান্না খেতে তোমায় বলবো না।

—মাছ যে ধরা পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! তবে আমি কি ভাবছি বলুন ত' কাকিমা?

কাকিমা শুধোল,—কি ভাবছ শুনি? আমি আর তোমার মতো গুন্‌তে জানি নে!

শশী-শ্যামলের সঙ্গে ওর ঘরে যেতে যেতে উত্তর দিলে, ভাবছি আজ কার মুখ দেখে আমার ঘুম ভেঙেছে? গল্পের বই পাবো, কাকিমা পেলাম,—আর সেই সঙ্গে পেলাম পাইকারী হারে নেমন্তন্ন!

—দুষ্টু ছেলে!

এই বলে কাকিমা গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। শশীর জন্যে দু'একটি বেশীপদ রান্না করতে হবে। অন্ততঃ ওর গণনা যে ভুল সেটা প্রমাণ করবার জন্যে।

একজন লোভী-লোককে যদি চোখ বেঁধে, নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্যে পূর্ণ একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ চোখের বাঁধন খুলে দেয়া যায়—তার মুখের অবস্থা যেমন হয়—শ্যামলের পড়বার ঘরে ঢুকে শশীর চোখমুখের ভাবও অনেকটা সেইরকম হল।

তাইত! গল্পের বইয়ের কথাই সে শুনেছিল। কিন্তু এই অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তার এমন বিরাট আয়োজন আছে, সে কথা শশী আদপেই ভাবতে পারে নি।

যেদিকে চোখ যায় শুধু বই আর বই!

আর কত রঙ-চঙে মজাদার বই!

শশী যে সব বইয়ের শুধু নাম শুনেছে, কিম্বা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় লোভনীয়

বিজ্ঞাপন দেখেছে, সেইরকম কত মজাদার বই যে সারে-সারে তাকে সাজানো আছে —হিসেব করতে গেলে একেবারে হিম্‌সিম্ খেতে হয়।

যাকে বলে—একেবারে "বাঁশবনে ডোম কানা।"

কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নেবে ?

আর শুধু কি কেবল গল্পেরই বই ?

কত মজার বিদেশী ছবির বই, দেয়ালে নানাদেশের ম্যাপ, গ্লোব, কত বাঁধানো বই, লুডো, স্নেকস্ এণ্ড ল্যাডার প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

শশী উল্লসিত হয়ে বললে, শ্যামল, তোমার কাকা, তোমাকে সত্যি ভালো-বাসেন। নইলে এমন উজাড় করে বইপত্তর কিনে দিতে পারতেন না। আচ্ছা ভাই, তোমার বাবা নেই ?

শ্যামলের চোখদুটো ছলছলিয়ে এলো। সে উত্তর দিলে, না ভাই। বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। খুব ছেলেবেলা থেকেই কাকিমার কোলে মানুষ। কাকিমারও কোনো ছেলে-পুলে নেই। একটা ভাই বা একটি বোন থাকলে আমারও এমন একলা একলা ঠেক্‌ত না।

শশী ওকে ভোলাবার জন্যে বললে, আর মন খারাপ করতে হবে না। আমি রোজ আসবো তোমার কাছে—আর এই বইগুলি গিলতে থাকবো। তোমার ছোট ভাই নেই বলে দুঃখ করছিলে শ্যামল ? আচ্ছা ধরো, আমিই তোমার ছোটভাই হয়ে গেলাম। তাতে আপত্তি নেই ত' ?

—আপত্তি ? শ্যামলের মনটা পুলকে ঝিল্‌মিল করে ওঠে।

—তুই যদি আমার ভাই হোস্ ত' আমরা দু'জনে মিলে অনেক বই পড়তে পারবো ! আচ্ছা তুই কবিতা লিখতে পারিস্ ?

এই কথাটা জিজ্ঞেস করেই শ্যামল ভারী লজ্জা পেয়ে গেল।

শশী চালাক ছেলে, অমনি ধরে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলে, ও ! বুঝতে পেরেছি, তুমি বুঝি কবিতা লেখো লুকিয়ে লুকিয়ে ? যাচ্ছি আমি এক্ষুণি কাকিমার কাছে, সব তাঁকে বলে দেবো।

শ্যামল যেন হঠাৎ অথৈ জলে পড়ে যায়।

প্রায় আঁৎকে উঠে বলে, না—না, কক্ষনো নয় ! দোহাই তোর, কাকিমাকে কিছু বলতে পারবি নে ! তাহলে কিন্তু আড়ি হয়ে যাবে।

—হুঁ ! আড়ি অমনি হলেই হল !

ফোড়ন কাটে আর মুখটিপে হাসতে থাকে শশী।

এইবার শ্যামলের একটু সাহস ফিরে আসে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে,

আচ্ছা ভাই শশী, তুই কবিতা লিখিস না? কেউ আবার কবিতা না লিখে থাকতে পারে নাকি?

শশী জবাব দেয়, না রে, আমি কবিতা লিখি না। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে আমার ভারী মজা লাগে।

শ্যামলের আনন্দ আর ধরে না। বললে, তাহলে ত' মজাই হল! আমি কবিতা লিখবো, আর তুই ছবি আঁকবি। বড় হলে আমাদের এই হবে আসল কাজ। কেমন?

শশী বললে, কথাটা ত' মন্দ নয়। তুমি লিখবে কবিতা আর আমি আঁকবো ছবি! দেশের কত লোক সেই কবিতা পড়বে, মুখস্থ করবে, সেই ছবি দেখবে—আর আমাদের সুখ্যাতি করবে।

—শুধু সুখ্যাতি?

ওর মুখের কথা শ্যামল টেনে নেয় ভবিষ্যতের মধুর-স্বপ্নে।

—দেশ-বিদেশে যাবে সেই কবিতা আর ছবি। বিদেশের লোকেরাও কিনবে সে ছবি আর কবিতা। কত অর্থ হবে আমাদের। দেশ-বিদেশ থেকে আহ্বান আসবে।

আমরা বিমানে করে চলে যাবো—সেই সব অজানা দেশে। ভারতের মর্মবাণী ছড়িয়ে দেবো সবাইকার দ্বারে দ্বারে।

শশী আবার ওর কল্পনা নিজের কাছে টেনে নেয়—

—হ্যাঁ ভারতের মর্মবাণী এক তরুণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। পৃথিবীর গুণীজনেরা তোমাকে দেবে নোবেল—পুরস্কার। দেশের বুকে বিদ্যুৎবেগে আসবে সেই খবর। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হবে সেই সন্দেশ। ধন্য ধন্য পড়ে যাবে দেশে আর বিদেশে।

শ্যামল বললে, আর ভারতের শিল্পীর আঁকা সেই অপরূপ চিত্রগুলি স্থান পাবে বিদেশের সব আর্ট গ্যালারীতে। সেখান থেকে নতুন সম্মানলাভ করবে সেই তরুণ শিল্পী। একটা ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। শিল্পী নিজে যাবে তার সঙ্গে। সবদেশে পাবে বিপুল সম্বর্ধনা। সেরা শিল্পীর সেরা সম্মান নিয়ে আবার ফিরে আসবে জন্মভূমির বুকে।

হঠাৎ কাকিমার আবির্ভাব ঘটলো সেই ঘরে। তিনি মুচকি হেসে বললেন, তোমরা রূপকথা তৈরী করছ বুঝি মুখে-মুখে? কিন্তু রূপকথার প্রথম কথাই ত' পক্ষীরাজ ঘোড়া। সেটা আগে জুটেছে ত' তোমাদের?

শশী উত্তর দিলে, এই বিমানের যুগে পক্ষীরাজ ঘোড়ার আর ঠাঁই নেই কাকিমা। সে তার ডানা গুটিয়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশে পালিয়ে গেছে!

—তাহলে খুব বিপদ বলতে হবে। কাকিমা মন্তব্য করেন।

—না-হয় এক কাজ করো তোমরা। এই খাবারগুলো আগে শেষ করে ফেলো।

এই বলে তিনি দুটি রেকাবী রাখলেন ওদের সামনে।

—জানো ত' খালিপেটে শুধু আকাশকুসুমই রচনা করা যায়—কিন্তু পেটের ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে। কাজেই সেই আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলা দরকার।

শশী তাকিয়ে দেখলে রেকাবীর ভেতর ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেল কুচি, চিড়ের মোয়া আর খানিকটা ছানা ও চিনি। সে বললে, আপনি ঠিক বলেছেন কাকিমা। তাহলে কল্পনার রাজ্যি থেকে একেবারে বাস্তব জগতে ফিরে আসা যাক্। এইরকম মুখরোচক খাবার সামনে রেখে কোনোরকম আকাশকুসুমই রচনা করা চলে না।

বলেই গপাগপ্ দক্ষিণ হস্তের কাজ সুরু করে দিলে।

সারাটা দিন শশীর কেটে গেল শ্যামলদের বাড়িতে। শ্যামলের কাকাবাবু কাকিমার কাছ থেকে সব শুনে ওদের বাসায় চাকর দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শশী কিন্তু দুপুরবেলা খেতে বসে অবাক! লাফিয়ে উঠে বললে, একি কাকিমা! আমার গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে কিছুই মিলছে না যে! রুইমাছের ঝাল, চিংড়ির কালিয়া, মুগের ডালে মাছের মুড়ো,—ওটা আবার কি —পায়েসের বাটি? তাহলে আপনি বলতে চান, গোয়েন্দাগিরিতে আমি ফেল করলাম? তারপর হতাশার সুরে বললে, হায়-হায়, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে!

ওর কথা বলবার ধরণে কাকা আর কাকিমা হেসে উঠলেন।

॥ যোল ॥

একমাত্র দুখিনী মা ছাড়া শশীর সংসারে আর কেউ নেই। সাধারণ ছেলের চাইতে শশী অনেক বেশী মেধাবী।

শশীর এক মামা ওর পড়ার খরচ চালাতেন।

কলকাতা শহরে বোমা পড়তে, সেই মামাই উদ্যোগী হয়ে শশী আর তার মাকে এই জলবিছুটি গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির সঙ্গে ওর মামার পরিচয় আছে। তিনিই এখানে এসে থাকবার যোগাযোগ করে দিয়েছেন।

এখানে এসে একটি ছোট খড়ের ঘর ভাড়া নিয়ে শশীর মা আছেন। মা আর ব্যাটা নিয়ে সংসার।

বারান্দার একটি দিকে ঝাঁপ আট্‌কে একটা ছোট কুঠরীর মতো করা হয়েছে। সেইখানেই দুজনের রান্না। কোনো ঝামেলা নেই তাদের। কতকগুলো শিকে ঝুলিয়ে নেয়া হয়েছে। দুপুর বেলাটা শশীর মা ইচ্ছে করেই একটু বেলায় রান্না করেন। সেই ডাল-তরকারী সন্ধ্যেবেলার জন্যে তোলা থাকে শিকেতে। শুধু সন্ধ্যার পর খানকয়েক আটার রুটি গড়িয়ে দেন। এখানে অবশ্য দুধ খুব সস্তা, তাই দুধ দিয়ে রুটিও খেতে পারে।

মায়ের একমাত্র কামনা ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক।

শশী তার মায়ের মনের কথা বুঝতে পারে। ক্লাসে লেখাপড়ায় ও খুব ভালো ছেলে। তা ছাড়া ছবি আঁকার দিকে শশীর খুব ঝোঁক। এখানে এসে কলকাতার মতো রঙ্‌ জোগাড় করতে পারেনি, তাই নানারকম ফুল তুলে, অনেক রকম ফল কুড়িয়ে এনে, এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে—বহুরকম পরীক্ষা করে নানারঙ্‌ সে আবিষ্কার করেছে। তাই দিয়েই সে আজকাল ছবি আঁকে।

ছবি আঁকার কাজটা সে কিছুতেই বন্ধ করে না।

সকালবেলার পর সে হয়ত ছবি আঁকতে বসল—

তখন আর তার নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না।

কোনো রকমে ছেলেকে টেনে তুলে নাইয়ে দেন মা।—আবার সে তুলি নিয়ে যেই বসে—কখন সন্ধ্যে হয় জানতেও পারে না!

ছবি আঁকতে বসে শশী একেবারে তন্ময় হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীরা যেমন ধ্যান করতে বসে এ-ও ঠিক তেমনি। একেই বলে সাধনা।

শশীর মা শশীকে কেন্দ্র করে কত স্বপ্ন দেখেন।

এই ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে—দশজনের একজন হবে! এক ডাকে সবাই তার নাম বলতে পারবে—তবেই ত' তার বুকখানা ভরে উঠবে। সত্যিকারের শান্তি পাবেন তিনি জীবনে।

মায়ের একটিমাত্র কামনা তিনি ছেলের উপার্জ্জনে ঘুরে ঘুরে তীর্থ করবেন।

সেই আকাঙ্খার দিন কি তাঁর জীবনে সত্যি আসবে? তত দিন কি তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন?

তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মা স্বপ্ন দেখেন। দুপুরবেলা যখন সারাটা গাঁ ঘুমিয়ে ঝিমোয়,—রদ্দুর খা-খা করতে থাকে, খুব উঁচু আকাশে যখন একটি চিল ডেকে চলে যায়—মায়ের মনে হয়—তার ছেলের সুনাম অত উঁচুতেই চলে যাবে, মেঘ ছাড়িয়ে সেই সূয্যিমামার কাছাকাছি।

হয়ত তারও নাগালের বাইরে!

তা হোক। তবু তার ছেলে বড় হোক, 'জ্ঞানী হোক, সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে

যাক্ তার মাথা। সবাই আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করবে,—ওই শশীবাবুর মা যাচ্ছেন। সেই গর্ব বুকে নিয়ে তিনি মরে যেতেও পারেন। শশীর মনে-মনেও রয়েছে কত কামনা। কিন্তু সে মুখ ফুটে কাউকেই কিছু বলে না। তার মাকেও নয়। যদিই সে কামনা না ফলে!

ছবি আঁকার ঝোঁক আছে বলে বই পড়ার নেশাও তার বড় কম নয়। যেই শুনেছে শ্যামলের বাড়িতে নানারকম বই আছে অমনি ছুটে গেছে সেখানে। নইলে ছেলে হিসেবে সে একটু কুঁড়ে।

বাগান করছে ত' তাই নিয়েই মেতে আছে। ছবি আঁকার বেলাতেও সে বিশ্ব-সংসার ভুলে যায়। আবার যখন বই নিয়ে বসে—মনে হয় সারাটা দুনিয়াকে সে একদিকে সরিয়ে রাখতে পারে।

মা অনেক সময় গভীর রাত্তিরে উঠে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এই ছেলে কি তার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারবে? ওর বাবার যা আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা সফল করে তুলতে পারবে জীবনে?

আপনমনে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে মা তবু ভাবেন।

তাঁর বুক ঠেলে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

মা তাঁর মনের বাসনা মুখ ফুটে ছেলেকে বলতে পারেন না,—ছেলেও নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের রাঙা-ছবি মায়ের কাছে তুলে ধরতে লজ্জা পায়।

এইভাবে হাসি-কান্নার দোলায় সুখে-দুখে এগিয়ে চলেছে মা আর ছেলের প্রাত্যহিক জীবন।

এখানে এসে মা লক্ষ্য করেছেন যে, কলকাতার চাইতে শশীর শরীরটা ভাল আছে। খাঁটি দুধটা পড়ছে তাতে ওর স্বাস্থ্যটা বেশ একটু উন্নতির দিকেই যাচ্ছে বলে মনে হয়।

আর ছেলে ভাবছে, কলকাতার মতো ঘিঞ্জি-শহরে মায়ের ত' দিন কাটতো অন্ধ-কূপ রান্নাঘরে।

এখানে বেশ খোলামেলা।

হোক্‌না খড়ের ঘর তবু তাতে আলো-হাওয়া খেলছে প্রচুর। ঘরের সামনেই একটা পুকুর আছে।

মা কাজে-অকাজে বারবার ওই পুকুরঘাটে যাচ্ছে—তাতে একটা হাঁটা-চলা পড়ছে। ওখানে মায়ের একেবারেই ক্ষিদেই হতো না। এখানে সেকথা বলবার যো নেই।

ঘর-গেরস্তালির কাজ ছাড়াও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেক বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে বেড়াতে আসেন; আবার মাকেও সেইসব বাড়িতে যেতে হয়।

সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটাহাটি, মাটির সঙ্গে একটা যোগ, তাছাড়া কচি আনাজ-তরকারী, খাঁটি দুধ, ভালো গাওয়া ঘি, এইসব জড়িয়ে মায়ের স্বাস্থ্যটা যে এখানে ভালই আছে—তা দেখে শশীর সন্তোষের সীমা নেই।

মাকে বলেছে, তুমি সকাল-সন্ধ্যে সময় করে যদি মাইল দুয়েক পথ হাঁটতে পারো, তাহলে তোমার শরীর বেশ ভালো হয়ে যাবে।

মা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছেন, পাগল ছেলে। সকালবেলা ঘর-গেরস্তালীর কাজ ফেলে, আমি বুঝি সাহেব-মেমদের মতো ছড়ি-ছাতা হাতে হাওয়া খেতে যাবো? সে সব তোরা কর। আমাদের তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—এখন ত' গঙ্গার দিকে পা বাড়িরেই আছি—

শশী জবাব দেয়, তুমি যদি পা বাড়িয়ে থাকো মা, তবে আমাকেও সঙ্গে নিতে ভুলো না। আমাকে ফেলে একা-একা রাত্তিরে তোমার ঘুম হবে না যে।

—অমন অ-কথা—কু-কথা বলিস নে শশী!

ধমক্ দিয়ে উঠে শশীর মুখের কথা বন্ধ করে দেন মা! ওই যে তার একমাত্র শিব-রাত্রের সল্‌তে। মায়ের চোখে অকারণেই জল এসে যায়।

সেদিন সকালবেলা পড়াশুনো শেষ করে, শশী তাদের ঘরের সামনে তার ছোট্ট জমিটিতে কতকগুলি ফুলগাছ লাগাচ্ছিল। এমন সময় তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে তাকালো, একটি ছেলে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

শশীকে ফিরে তাকাতে দেখে সে হেসে বললে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—বেশ ত'! এসো না। আমার ত' একা একাই দিন কাটে। শশী আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিলে।

—কি ফুলগাছ লাগাচ্ছ তুমি?

—বেলফুল আর দোপাটি। ফুটলে পরে কেমন চমৎকার দেখাবে। ফুলের বাগানে বসে ছবি আঁকতে ভারী মজা লাগে। তা এখানে ত' খুব বেশী জমি নেই। যেটুকু আছে সেইখানে আমি নানারকম ফুলগাছ লাগাচ্ছি।

ফুলের বাগানে তোমার এত সখ তা একদিন চৌধুরীবাড়ি বেড়াতে এসো না। ওরা হচ্ছেন গাঁয়ের জমিদার। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ওখানে আমাদের কেমন মজলিশ বসে! চৌধুরীবাড়ির ছেলে চন্দনের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই?

—না ভাই, আমার মামার সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির জমিদারের আলাপ আছে। তাঁদের চেষ্টাতেই ত' আমরা এই ঘরখানি পেয়েছি থাকবার জন্যে। চন্দনের নাম শুনেছি—কিন্তু তার সঙ্গে এখনো আমার আলাপ হয় নি।

—তাহলে বলি শোনো, একটা দরকারী কথা জানাতেই আমি এসেছি!

—কিঁ দরকারী কথা? ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে শশী।

—দেখ, আমার নাম হচ্ছে খঞ্চা। আমাকে বেশ ভালো করে চিনে রাখো চন্দনই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

—চন্দন পাঠিয়েছে? ওদের বাগান দেখতে বুঝি! তা একদিন যাবো'খন বেড়াতে।

—বেড়াতে ত' বটেই! তাছাড়া আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে আমরা জুটি!

—সে ত' ভারী মজার কথা। আমারও অনেকগুলি বন্ধু জুটবে।

আরো একটা দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বলনা শুনি! তোমার নাম হচ্ছে খঞ্চা,—কেমন মজাদার নাম, তবু তুমি এমন কিন্তু-কিন্তু করে কথা বলছ কেন?

—বলি শোনো। তুমি হচ্ছ পুবপাড়ার লোক,—খালের ওধারের পশ্চিমপাড়ার লোকের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা করবে না।

কথাটি শুনে শশীর ভারী মজা লাগলো!

তবু কৌতূহল গোপন করে জিজ্ঞেস করলে, এই গ্রামের বুঝি দুটি পাড়া আছে?

—হুঁ!

—পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়া?

—হুঁ।

—এ পাড়ার লোকের সঙ্গে বুঝি ও-পাড়ার লোকের কথা বন্ধ?

—হুঁ।

—আচ্ছা ভাই, কোন পাড়াটা ভালো?

—সে কথা আর জিজ্ঞেস করতে? পুবপাড়া।

—গাঁয়ের নামটা কি ভাই?

—কী মুস্কিল! এখানে বাস করছ···তাও জানো না?

—ও! মনে পড়েছে! জল-বিছুটি।

—হু! জল-বিছুটি। গায়ে লাগলেই চুলকোয়।

—তোমাদের সকলেরই বুঝি চুলকানি হয়েছে—তাই ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া থাকতে পারো না?

ঝগড়া কি আর আমরা বাঁধাই?

—তবে?

—ওই পশ্চিমপাড়ার লোকগুলোই দুষ্টু। সব সময় ওরা গোলমাল আর মারামারি বাঁধাবার চেষ্টায় থাকে। তাই ত' আমরা কেউ ওদের সঙ্গে মিশিনে। তুমি যখন পুবপাড়ার লোক,—তুমিও মিশবে না।

—কিন্তু ভাই ও-পাড়ায় যে আমার এক বন্ধু আছে। সে পুবপাড়ারও নয় পশ্চিমপাড়ারও নয়,—সে হচ্ছে কলকাতার ছেলে।

—তা হোক। জল-বিছুটি গাঁয়ে এসে বাস করলে একটা দলে যোগ দিতেই হবে। হয় পুবপাড়া, না হয় পশ্চিমপাড়া।

—ঠিক বলেছ তুমি! মাছ মারতে গেলে গায়ে কাদা লাগাতেই হবে।

—হ্যাঁ ভাই, এইবার বুঝে নিয়েছ তুমি! আচ্ছা আজ যাই, আমি আর একদিন আসবো। আমার নামটা মনে রেখো। আমার নাম হচ্ছে খঞ্চা।

মহানন্দে হেলতে-দুলতে খঞ্চা চলে গেল!

সেইদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরই শশী এক পা দু'পা করে শ্যামলের বাড়ি হাজির হলো। প্রথমেই দেখা কাকিমার সঙ্গে। তিনি ওকে দেখেই একগাল হেসে ফেললেন।

—এই ত' আমার নতুন ছেলে এসে হাজির হয়েছে! বোকা ছেলে! কাকিমার কাছে আসতে হলে খাওয়া-দাওয়ার আগে আসতে হয়। নইলে মনে হবে—ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে।

—তাই নাকি কাকিমা, প্রথমদিন সেইরকম এসে খুব জিতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা জানা রইল। এইবার ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করতে করতে সিধে আসব কাকিমার বাড়ি।

—ঠিক কথা। মা আর কাকিমাতে কি কিছু তফাৎ আছে? যখন খুশী এসে পাতা পেতে বসে যাবে।

—কিন্তু কাকিমা, সেদিন ত' ঝক্‌ঝকে থালা পেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো কথা মনে পড়েছে। সেদিন যে বাড়ি ঢোকবার মুখেই মৎস্যযাত্রা হয়েছিল। পুকুরের ধারেই দেখলাম—আপনাদের ছোকরা চাকর দিব্যি বঁড়শিতে একটি পোনা মাছ তুলে ফেলেছে!

—তা আফ্‌শোসের কিছু নেই! আজকেও ঘণ্টা একটা বড় কাতলা মাছ ধরেছে।

—অ্যাঁ! তাই নাকি? ঘণ্টা বুঝি ওর নাম? তাহলে ওর সঙ্গেই পাকাপাকি একটা যোগাযোগ করতে হবে। বঁড়শিতে মাছ উঠলেই শ্রীমান ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে জানিয়ে দেবে। আর আমি খালের ওপারে পুবপাড়ায় বসে দিব্যি শুনতে পারবো। বুঝবো, আজ কাকিমার ওখানে দিব্যি খ্যাট্ জুটবে।

—না বাছা, ঘণ্টা বাজাবার দরকার হবে না। মন চাইলেই সোজা চলে আসবে। তোমার কাকিমার ভাঁড়ারে শশীর খাবারের কোনদিনই অভাব ঘটবে না।

—সেকথা আমি প্রথমদিনই বুঝতে পেরেছি কাকিমা। আসবো বৈকি! ক্ষিদে পেলেই একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়।

—আচ্ছা যাও, শ্যামলের ঘরে গিয়ে গল্প করোগে। কিন্তু বিকেলে যাবার আগে দেখা না করে যেও না।

শশী উত্তর দিলে, সেকথা আর বলতে।

শশীকে দেখতে পেয়ে শ্যামল ফস্ করে উঠে দাঁড়ালো।

শ্যামল মুখটিপে হেসে বললে, হুঁ বুঝতে পেরেছি!

—কি বুঝলি শুনি?

—নিশ্চয়ই কবিতা লিখছিলে।

—তোর কাছ থেকে লুকোবার যো নেই! আচ্ছা, তোকে শুনিয়ে দেবো, কি লিখছিলাম।

—কবিতা শুনবো পরে। তার আগে দরকারী কথা আছে।

—কি কথা?

—এ গাঁয়ের নাম কি জানো ত'?

—হ্যাঁ, জল-বিছুটি।

—সেই জল-বিছুটির আস্বাদ পেয়েছি।

—কি রকম?

পুবপাড়ার চৌধুরীবাড়ির জমিদার তনয়—চন্দন, তার এক চ্যালা এসেছিল আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

—কি বাণী দিয়ে গেল শুনি?

—বললে, জল-বিছুটি গাঁয়ের নাকি একটি আইন আছে। পুবপাড়ার লোক পশ্চিমপাড়ার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে না!

—আর কিছু?

—হ্যাঁ, জমিদার তনয়ের সঙ্গে অবিলম্বে গিয়ে দেখা করতে হবে, এবং তার বাগান দেখতে হবে—আর সেই সঙ্গে নতুন উপদেশ গ্রহণ করে আসতে হবে।

শ্যামল এইবার হেসে ফেললে।

—হাসছ যে?

—তুমি কি মনে কর যে জমিদার-নন্দন শুধু পুবপাড়াতেই আছে? পশ্চিমপাড়ায় নেই।

—তোমার কাছেও লোক এসেছিল নাকি?

—নিশ্চয়ই, নইলে আমার মান-সম্মান থাকে কি করে? লোক এসেছিল গাঙ্গুলী-বাড়ির ফাল্গুনের কাছ থেকে।

—কি উপদেশ লাভ হলো?

—অবিকল এক। ভদ্রলোকের এককথা যে! পুবপাড়ার মানুষের সঙ্গে মেলা-

মেশা আদপেই চলবে না। যোগ দিতে হবে ফাল্গুনের দলে—আর দলদলিটাকে জাঁকিয়ে তুলতে হবে।

এইবার শশী একটু চুপ করে রইল।

তারপর শ্যামলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বললে, আসল ব্যাপারটা কি জানো শ্যামল। আমাদের বাঙলাদেশের গ্রাম-অঞ্চলে সত্যিকারের শিক্ষার একান্ত অভাব। তাই এইসব পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া-বিবাদ এমন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

—ঠিক কথা বলেছিস ভাই শশী।

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল।

—এইখানে আমরা যদি পাঠাগার গড়ি, নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করি, ছেলেদের একসঙ্গে করে ব্যায়ামাগারে কাজ সুরু করি—তাহলেই পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া মিটিয়ে দিতে পারি।

শশী বললে, আয় আমরা দু'জনে চুপচাপ এই কাজ হাতে নি। তাহলেই জল-বিছুটি গাঁয়ের নাম মধুচন্দন হতে পারবে।

শ্যামল উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, সত্যি, কাজের মতো কাজ। প্রতিটি ঘরে আর প্রতিটি মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে।

উৎসাহে আর উদ্দীপনায় ওরা পরস্পরের হাত চেপে ধরছে। মুখে কিন্তু ওদের দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

॥ সতেরো ॥

কাউকে কিছু না জানিয়ে, কোনোরকম প্রচার না করে শশী ও শ্যামলের অতি গোপনে তাদের সংগঠনের কাজ সুরু করে দিলে।

স্থান নির্বাচন সম্পর্কেও ওরা খুব সচেতন ছিল।

একেবারে ভদ্রপল্লীকে বাদ দিয়ে পাতার বাইরে এককোণে বাগ্‌দীদের অঞ্চলে ওরা রাতারাতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় খুলে বসল।

ইতিমধ্যেই বাগ্‌দীদের মোড়লদের সঙ্গে শশীর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একটা খড়ের ঘরের বারান্দায় বিদ্যালয় বসল। প্রথম শুধু ছেলেদের নিয়েই কাজ সুরু হল। তারপর কয়েক রাত যেতেই বুড়োরাও হুঁকো হাতে এসে জাঁকিয়ে বসল।

যখন বুঝল শশী আর শ্যামলের আন্তরিকতার অভাব নেই, আর পূবপাড়া ও পশ্চিমপাড়ার দলাদলির ভেতর এ দুটি ছেলে যেতে একান্ত অনিচ্ছুক,—তখন বড়রাও

বর্ণ পরিচয় নিয়ে বসে গেল লেখাপড়া শিখতে। বাপ প্রতিযোগিতা সুরু করল ছেলের সঙ্গে, আর ঠাকুর্দ্দা পাল্লা দিয়ে পড়তে লাগলো নাতির সঙ্গে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই এমন আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গেল যে, শশী ও শ্যামল দু'জনেই উৎসাহিত হয়ে উঠল।নিরক্ষর মানুষদের এমন একটি ভগবান-দত্ত ক্ষমতা যে, থাকে ওরা অতি সহজেই লোকের আন্তরিকতা বুঝতে পারে আর তাদের কাছ থেকে ডাক এলে সবাই পোষাপাখীর মতো ধরা দেয়।

এইভাবে শশী ও শ্যামল অতি অল্পদিনের মধ্যেই গাঁয়ের তথাকথিত, ছোটলোক আর নিরক্ষরদের মধ্যে এত বেশী আপনার হয়ে উঠল যে, কথাটা এ-কান থেকে ও-কান হয়ে শেষ পর্যন্ত পূবপাড়ার চৌধুরীবাড়ি এবং পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়িতেও পৌঁছুলো। এই খবর পেয়ে চৌধুরীবাড়ির চন্দন আর গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন—উভয়েই বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠল।

বিশেষ করে চন্দনের রাগ ত' হবারই কথা।

তারা অনেক চেষ্টা করেও চৌধুরীবাড়িতে পাঠশালা বসাতে পারে নি। আর এ'দুটো বাইরের ছেলে কিনা গাঁয়ে এসেই ছোটলোকদের একজোট করে নিয়েছে।

এতেও যদি রাগ না হয় ত' হবে কিসে?

শেষকালে উড়ে এসে জুড়ে বসে, ওই দুই চ্যাংড়া ওদের গাঁয়ের ওপর মোড়লী করবে? তখন ছোটলোকেরা কি আর জমিদারবাড়ির কথা শুনতে চাইবে?

এরই মধ্যে এমন আর একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার ফলে গাঁয়ের ছোটলোকেরা আরো শশী-শ্যামলের মুঠোর মধ্যে এসে গেল।

গাঁয়ের ভদ্রপল্লী যেখানে শেষ হয়ে গেছে—আর বাগ্‌দীপাড়া সুরু হয়েছে, ঠিক সেইখানে বহুকালের একটি এঁদো-পুকুর আছে। যত রাজ্যের জঞ্জাল লোকে সেই-খানে ফেলে। তবু বাগ্‌দীপাড়ার বৌ-ঝিরা সেই পুকুরের জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে।

ফলে বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা নিত্যি—তিরিশদিন নানারকম অসুখে ভোগে।

বুড়ো বাগ্‌দীরা দুঃখু করে বলে, আগে এরকম ছিল না বাবু! আমাদের পাড়ার সকলকার স্বাস্থ্যই বেশ ভালো ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে ভদ্রপাড়ার ঝি-চাকরেরা এই পুকুরে জঞ্জাল ফেলতে সুরু করেছে, তখন থেকেই এর জলটা খারাপ হয়ে গেছে! অথচ আমাদের আর কোনো উপায় নেই! ভদ্রপল্লীর পুকুর ত' আমাদের ছুঁতে দেবে না! কাজেই এই পুকুরের জলই সবাই কলসী ভর্তি করে নিয়ে যায়। তাই অসুখ-বিসুখও ছোটদের আর ছাড়ে না!

এই পচা নোংরা জল যে ওরা দিনের পর দিন খেতে দিচ্ছে, আর নিজেরাও ব্যবহার করছে সে জন্যে বাগদীপাড়ার কারো এতটুকু নালিশ নেই!

যেন এইটেই ওদের প্রাপ্য! বিধাতাপুরুষ ওপর থেকে তাদের জন্যে এই পচা জলই বরাদ্দ করে দিয়েছেন। ভালো জলের আশা করা ওদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র!

ব্যাপারটা যে গোটা গাঁয়ের একটা অবিবেচনার কাজ তাই নয়, এতে ভদ্রপল্লী নির্মমতাও অতি কুৎশিৎভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

শশী আর শ্যামল এই ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করলে, কি করে এই নরক থেকে ওদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

শশী বললে, পুকুরটা পরিষ্কার আমাদের করতেই হবে। তাতে বাগ্‌দীপাড়ার সবাই স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পাবে। আর নিজেদের চেষ্টায় সে ছোটদের স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়, তারও একটা প্রমাণ হাতে নাতে ওরা বুঝতে পারবে।

মোটামুটি একটা পরিকল্পনা ওদের তৈরী হয়ে গেল যে, একদিন বাগ্‌দীপাড়ার সবাই মিলে অনেকগুলি নৌকো নিয়ে ওই জঞ্জাল ভর্তি-পচা পুকুরটাই ঢুকে পড়বে তারপর হাতাহাতি গোটা পুকুরটাকে পরিষ্কার করে ফেলবে, শশী আর শ্যামলও এই কাজে হাত লাগাবে। তা হলেই সকলে উৎসাহিত হয়ে এই কাজে যোগ দিতে আর আপত্তি করবে না।

একদিন খুব সকালবেলা গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে দেখলে যে, শশী-শ্যামলের পরিচালনায় গোটা বাগদীপাড়া এসে পুকুরটার চারপাশে জড় হয়েছে। জোয়ানরা সরাসরি পুকুরে নেমে গিয়ে জঞ্জাল সাফ করতে লাগলো, নৌকো ভর্ত্তি জঞ্জাল নিয়ে এসে পুকুরপারে ফেলতে লাগলো, আর মেয়েরা ঝুড়ি করে সেইসব জঞ্জাল আর পাঁক মাঠের মাঝখানে ফেলতে লাগলো। এতে নাকি জমির সার হবে।

ওরা কেউ কাজকে ভয় করে না; সবাই গায়ে খেটে খায়। তাই একটা পুকুরকে পরিষ্কার করতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হল না!

শশী পুকুরের জলে পোটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ছড়িয়ে দিয়ে বললে, সাতদিন এই পুকুরের জল কেঁউ খেতে পারবে না। জলটা থিতিয়ে যাক, তারপর তোমরা সবাই এই পুকুরের জল ব্যবহার করে দেখো—কেমন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়।

পাড়ার মোড়ল বললে, তুমি বলছ বটে দাদাবাবু, কিন্তু এই সাতদিন বাগ্দীপাড়া বেঁচে থাকবে কি করে? দু'দিন খালিপেটে থাকা যায়—কিন্তু জল ছাড়া ছেলেপুলেরা বাঁচবে কি করে?

শ্যামল তখন এগিয়ে এসে উত্তর দিলে, সেজন্যে তোমাদের কোনো ভাবনা নেই। আমরা যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি তার সামনে ত' বিরাট পুকুর রয়েছে—এই সাতদিন তোমরা সেই জল কলসী করে নিয়ে আসবে।

পাড়ার মোড়ল জিব কেটে বললে, আরে রাম রাম! তুমি বলছ কি দাদাবাবু,

তোমাদের বাড়ির পুকুরের জল কি আমাদের বাড়ির বৌ-ঝিরা নিয়ে আসতে পারে? আর ওদের ছুঁতেই বা দেবে কে?

শ্যামল উত্তর দিলে সেজন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই! আমার কাকা আর কাকিমা আছেন। আমি আর শশী গিয়ে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলি তবে নিশ্চয়ই তারা অনুমতি দেবেন।

শশী এইবার উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে, কাকা আর কাকিমা একেবারে মাটির মানুষ। কেউ পুকুর থেকে খাবার জল নিয়ে গেলে যে, সেই পুকুর অপবিত্র হয় না —একথা তারা জানেন। বরং তৃষ্ণার জল দিলে পুন্যি হয় এই কথাই তারা বিশ্বাস করেন। কাজেই এ নিয়ে তোমরা আর ভাবনা চিন্তা কোরো না।

শশী-শ্যামল যে পরামর্শ দিয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত তাই হল। কেন না শ্যামলের কাকা আর কাকিমার কাছে সব কথা খুলে বলতে তারা দুজনেই হাসতে লাগলেন।

—আমাদের পুকুর থেকে জল নিয়ে যাবে ওরা এত' ভালো কথাই রে! আমরা কেন মিছিমিছি আপত্তি করতে যাবো?

কাকাবাবু এই কথা বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। আর কাকিমা রসিকতা করে বললেন, বরং ভালই হল। এত লোক যদি কলসী ভর্তি করে তৃষ্ণার জল নিয়ে যায়—তবে হিসেব করলে অনেকখানি পুন্যিই জমা হবে। মৃত্যুর পর যখন যমরাজার বিচারশালায় নিয়ে গিয়ে হাজির করবে—জোড়হাত করে বলবো, আগেই নরকে পাঠিও না প্রভু, আমাদের শশী-শ্যামলের বুদ্ধি পরামর্শে আমরা তৃষ্ণার জলদান করেছিলাম। কাজেই নিশ্চই কয়েক মন পুন্যি হিসেবে জমা হয়ে আছে!

যমরাজ অমনি চিত্রগুপ্তকে আদেশ দেবেন,—ওহে চিত্রগুপ্ত, তোমার হিসেবের খাতাটা বের কর দেখি---!

নাকের ডগায় কলম লাগিয়ে সূচিপত্র দেখে বহু কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া হিসেব করে চিত্রগুপ্তকে বলবেন---হ্যাঁ কিছু পুন্যি জমা আছে বটে। তাহলে আর বুড়োবুড়িকে নরকে পাঠানো চলে না!

ধর্মরাজ বলবেন হুঁ! স্বর্গরাজ্যেই ওদের জন্যে দুটি আসনের ব্যবস্থা করে দাও!

অমনি কৌতুক আর আনন্দের মাঝখান দিয়ে কাকা-কাকিমার অনুমতি পেয়ে, শশী ও শ্যামল খুশীমনে বাগ্দীপাড়ায় খবরটা দিতে গেল।

ওখানে পৌঁছে আর এক বিপত্তির কথা তাদের কানে এলো।

কোনো বাড়ির ঝি এসে নাকি একরাশ পুরোনো কাঁথা পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে গেছে। খবর নিয়ে জানা গেল---সেগুলি এক বসন্তরোগীর বিছানার কাঁথা।

শশী বললে, আগেই লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে, সোজা পথে কাজ করবার চেষ্টা করা যাক। শ্যামল কিন্তু ভারী চটে গিয়েছিল।

সে জিজ্ঞেস করলে, সোজা পথটা কি শুনি ?

শশী বললে, সোজা পথটা কি দেখবে ? আচ্ছা দেখাচ্ছি তোমায়। এই বলে একটা ভাঙা টিন সে জোগাড় করলে। তারপর আলকাৎরা দিয়ে তার ওপরে লিখলে ঃ

পানীয় জলের পুকুর
কেউ আবর্জনা ফেলিবেন না।

এই ব্যবস্থা করে সে চুপচাপ বসে রইল না। বাগ্দীপাড়ার একদল ছেলে জোগাড় করলে। দু'জনেরই কাঁধে চাপিয়ে দিলে ঢোল! তাদের একটি নৌকোয় তুলে নিয়ে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে আসবে ওরা। সারা পথ ওরা ঢোল বাজাবে আর বলবে—

বাগ্দীপাড়ার পুকুর পরিষ্কার করা হয়েছে…
ওখান থেকে ছেলে বুড়ো সবাই খাবার জল নিচ্ছে---
কেউ আর ওখানে জঞ্জাল ফেলবেন না-—
ডুম-ডুমা-ডুম-ডুম

এই ঘোষণা শোনবার জন্যে খালের দুপাশে মানুষ জমে গেল।

কেননা জলবিছুটি গাঁয়ে এইজাতীয় ঘোষণা এই প্রথম। ভদ্রপল্লীর বৃদ্ধেরা বলতে লাগলো অ্যাঁ! কালে কালে এ কি হল! ওদের এত বুকের পাটা যে, নোংরা পুকুরে জঞ্জাল ফেলতে নিষেধ করে? চিরকাল দেখে আসছি—ভদ্রপল্লীর সব জঞ্জাল ওইখানে ফেলা হয়,—আজ ওরা হঠাৎ এমন কি মাতব্বর হয়ে উঠল শুনি ?

কিন্তু শশী-শ্যামলের ব্যবস্থা অতি পাকা।

এই ঘোষণার পর ওদের আদেশে দু'জন করে বাগ্দী পালা করে রাত-দিন পুকুরটি পাহারা দিতে লাগলো। হাতে রইল ওদের তেলপাকানো বাঁশের লাঠি!

ইচ্ছেয় হোক—অনিচ্ছায় হোক কোন বাড়ির ঝি-চাকর আর জঞ্জাল ফেলবার জন্যে সেপথ মাড়ালো না।

তখন নতুন করে সেই রোগীর কাঁথা পুকুর থেকে তুলে ফেলে আবার প্রতিষেধক অষুধ ঢেলে দেয়া হল। বাগ্দীপাড়ায় আবার জানিয়ে দেয়া হল—একমাস যেন কেউ এই পুকুরের জল ব্যবহার না করে!

পানীয় জলের সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান হয়ে গিয়েছিল।

শ্যামলের কাকা আর কাকিমা ঘাটে বসে দেখেন বাগ্দী-বৌরা ঘোমটা দিয়ে ওদের পুকুরে আসছে আর কলসী-ভর্তি জল নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে!

কিন্তু বাগ্দীদের বারণ আছে…খালি হাতে পাড়ার বৌরা যেন কেউ শ্যামলদের পুকুরের জল নিতে না যায়!

তখন দেখা গেল কেউ লাউটা, কেউ কুমড়োটা, কেউ বা শাক, কেউ একসের দুধ, কেউ ঘরের তৈরী গুড় নিয়ে এসে হাজির হয়েছে!

কাকিমা ওদের স্নেহের অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন, বললে, তোমাদের বাছা, কাউকে কিছু দিতে হবে না। পুকুরের জল নেবে নাওনা! আবার কলা, মূলো, শাক, লাউ এসব নিয়ে আসছ কেন?

বৌরা ঘোমটা ফাঁকে জবাব দেয়, না-না দাদাবাবুরা খাবে। আমাদের ছেলে-পুলেরা ভালো হোক্, এই আশীর্বাদ করো মা। আমরা যা হাতে করে এনেছি—তা পায়ে ঠেলে দিও না।

এর ওপর আর কোনো কথা চলে না!

বাগ্‌দীদের জল নিয়ে পথ-ঘাট দিয়ে হাঁটাচলা করতে দেখে গাঁয়ের লোকেরা অশ্বস্তিবোধ করে।

গাঁয়ের বুড়োর দল হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে টিপ্পনী কাটে—

"পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে"!

কিন্তু মজা এই যে, ওরা প্রতিবাদও করে না—আর জল নেয়াও বন্ধ করে না!

ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে এঁটে উঠবে কে?

ওদিকের পুকুরের পাহারাও শশী-শ্যামল উঠিয়ে নেয় নি।

বাগ্‌দীপাড়ায় লোকের অভাব নেই,—আর ওরা খাটতেও নারাজ নয়। পালা করে দু'জন লোক রাতদিন লাঠি হাতে ঠায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে! এইবার ফেল কে জঞ্জাল ফেলবি!

ওদের মন্ত্র হচ্ছে—আমরা কারো সঙ্গে ঝগড়া করবো না, কিন্তু আমরা অন্যায়ও কিছু হতে দেবো না! এ মন্ত্র ওদের শিখিয়েছে শশী আর শ্যামল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবধি মুখস্থ করিয়েছে—কবিগুরুর বানী—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
তবু ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।"

পুকুর পরিষ্কারের কাজ তাই বলে বন্ধ থাকে নি।

জঞ্জাল সাফের পর পঙ্কোদ্ধার।

একাজেও বাগ্‌দীরা ছেলে-বুড়ো মিলে এগিয়ে এসেছে আনন্দের সঙ্গে। এমন আপনার করে এর আগে ত' আর কেউ তাদের ডাক দেয় নি! তাই ত' দুটি বিদেশী ছেলের মিষ্টি কথায় ওরা বশ হয়ে গেছে।

ওদের মনে হচ্ছে,—এ এক নতুন খেলা!

বাগ্‌দীপাড়ার সবাই এমন কাজের নেশায় মেতে গেছে যে, একদিন পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর মিলে শশী-শ্যামলকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে বললে, দাদাবাবু, পুষ্করিণীটাকে ত' তোমরা উদ্ধার করে দিলে। এইবার আমাদের ছেলেপেলেদেরও উদ্ধার করে দাও। শূয়োরছানার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়।

শশী আর শ্যামল তো হেসেই খুন!

শশী বললে, আমরা কি নিমাই যে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করবো?

মোড়ল বললে, আমি সে উদ্ধারের কথা বলি নি। ওদের এমন করে মানুষ করবার ব্যবস্থা করে দাও যে, লোকে ওদের আর ঘৃণা না করে। আমাদের জীবন ত' একরকম করে কেটে গেল। ওরা লেখাপড়া শিখুক, দশজনের একজন হোক—মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখুক। দোহাই দাদাবাবু, তোমাদের পায়ে পড়ি, একটা ব্যবস্থা তোমরা করে দাও আমরা সারাজীবন যেমন—দূর-দূর ছাই-ছাই শুনে সকলের কাছ থেকে দূরে সরে রইলাম—ওদের ভাগ্যে যেন তেমন অবহেলা না জোটে।

শ্যামল বললে, আচ্ছা মোড়ল ভাই, একটা আলাদা খোলামেলা খড়ের ঘর আমাদের তৈরী করে দিতে পারিস? তাহলে তোদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের একটা ব্যবস্থা করা যায়।

মোড়ল ওদের কথা শুনে খুশী হল। বললে, এ আর বেশী কথা কি দাদাভাই? আমরা আলাদা ভিটে করে একটা সুন্দর খড়ের ঘর তৈরী করে দিচ্ছি।

যে জঞ্জালভর্তি পুকুরটাকে পরিষ্কার করা হয়েছিল তারই দক্ষিণ পাড়ে বাগ্‌দীরা নিজেদের পরিশ্রমে প্রথম মাটি তুললে সেই পুকুর থেকে। বিরাট একটা উঁচু ভিটে করা হল।

এইখানেই উঠবে ছোটদের জন্যে একটি সুন্দর খড়ের ঘর। মোড়ল বলে, এমন ঘর তৈরীকরে দেবো যে, সবাই দালানফেলে এইটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

বাগ্‌দীপাড়ার মোড়ল মিছে গর্ব করে নি।

প্রথমেই মোড়ল পাড়ায় জানিয়ে দিলে যে, দুইজন করে 'মানুষ' সব বাড়ি থেকে এসে এই ঘর তোলার ব্যাপারে খাটবে।

মোড়লের কথা কেউ অমান্য করতে পারে না। তাছাড়া এটা হচ্ছে ছোটদের কাজ। সব বাড়িতেই ছেলে-পুলে আছে। সকলেই কোমরে গামছা জড়িয়ে মোড়লের কাছে এসে বলে, কি কাজ দেবে দাও।

খাটবার লোকের অভাব নেই। সকলেই জানে এটা আমার ঘরের কাজ। মজুরী জুটবে না বটে কিন্তু মনের মতো জিনিসটি গড়ে উঠবে। এই ঘরেই পাড়ার সব ছেলে মানুষ হবে। সেটা হবে ওদের তীর্থস্থান। ওরা গয়া, কাশী, বৃন্দাবন যেতে চায় না, ওদের নোংরা পাড়ার মধ্যেই গড়ে তুলতে চায় একটি সুন্দর আস্তানা যেখানে পাড়ার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে আর ফোটাফুলের মতোই বেড়ে উঠবে।

মোড়ল দেখলে, জন খাটবার লোকের অভাব নেই। সে তখন শশী আর শ্যামলকে নিয়ে আর একদিন বসল। বললে, দাদাবাবু, তোমাদের মনে কি রয়েছে ...আমাকে সব খুলে বলো। শুধু একখানি ঘর কেন? ঘর, বাগান, খেলার জায়গা

সবকিছু আমরা মেহনৎ করে গড়ে দেবো—তোমরা শুধু বসে একটা মোটামুটি ছক করে আমার হাতে ফেলে দাও।

শশী আর শ্যামল দেখলে মোড়ল নিরক্ষর হলে কি হবে—খুব দামী কথা সে বলেছে। প্ল্যান করে একটি সুন্দর "শিশু-কেন্দ্র" ওরা গড়ে তুলতে পারে, কেননা সবাই খাটতে আর পরিশ্রম করতে উৎসুক। বনের জন্তু-জানোয়ারের সাহায্যে রামচন্দ্র সাগর বন্ধন করে ছিলেন, এরা ত' মানুষ।

দু'জনে তখন খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসল শিশুকেন্দ্রের পরিকল্পনা করতে হবে।

॥ আঠারো ॥

দু'রাত্তির জেগে—অনেক ভেবে-চিন্তে, গোটাকয়েক নক্সা এঁকে শশী একটি চমৎকার পরিকল্পনা করে ফেললে।

শশী ত' এমনিতেই ছবি আঁকতে ওস্তাদ। তাই তার পক্ষে নক্সা আঁকার কোনো অসুবিধেই হয়নি। সেই নক্সাটি সে শ্যামলকে বোঝাচ্ছিল।

মাঝখানে হবে একটি লম্বা হলঘর। চারদিক খোলা; সেই ঘরে পাঠশালা বসবে। এই ঘরের পাশে আর একটি ঘর হবে। সেই ঘরে পাঠাগার স্থাপন করা হবে। খুব সামান্য ভাবে এই পাঠাগারটি সুরু করা হবে। ছড়ার বই, রূপকথার কাহিনী, ছোট ছোট গল্পের বই। এইসব নিয়েই কাজ আরম্ভ করা হবে। তারপর ছেলেমেয়েরা যেমন যেমন শিখে উঠতে পারবে—সেই চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বই পাঠাগারে কেনা হবে। সারা গাঁয়ের লোকের কাছেই চাঁদা চাওয়া হবে, সে ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করা হবে না। খুশী হয়ে সে যা দেবে তাই সাদরে গ্রহণ করা হবে। কেউ যদি দিতে না চান—তার ওপরও জুলুম করা হবে না।

মাঝখানকার ঘরের একপাশে থাকবে যেমন পাঠাগার—অন্যদিকে আর একটি খোলামেলা ঘর উঠবে—সেটা হবে ব্যায়ামাগার। সাধারণতঃ খোলা মাঠেই ছোটদের খেলাধূলা আর ব্যায়াম করানো হবে। তবে বৃষ্টি হলে এই খোলামেলা ঘরে ছেলেরা ব্যায়াম করতে পারবে। একটি ছোট কুঠুরীমতো থাকবে—তাতে ব্যায়ামের সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখা হবে। এ ছাড়া গাছের ডালে ছোটদের জন্যে দোলনা বেঁধে দেয়া হবে। প্যারালালবার ইত্যাদি কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরী করে দেয়া যেতে পারে। রাত্রে পাঠশালায় নৈশবিদ্যালয় বসবে।

এই তিনটে ঘরকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি বাগান তৈরী করতে হবে। বাগানের কাছে ছেলেমেয়েরাই সকাল-সন্ধ্যে খাটবে।

শুধু যে ফুলের গাছই এখানে হবে তা নয়, একপাশে শাক-সব্জী, লাউ-কুমড়ো ইত্যাদিরও ফলন হবে। সেইগুলি গ্রামে বিক্রী করে যে পয়সা পাওয়া যাবে তা পাঠাগারের উন্নতির জন্যে ব্যয় করা হবে। মেয়েরা দুপুরবেলায় এখানে বসে সমবেত ভাবে ঝুড়ি, বেতের মোড়া, ডালা, কুলো ইত্যাদি তৈরী করবে। সেগুলো বিক্রী করে যে আয় হবে তা-ও শিশুকেন্দ্রের উন্নতির জন্যে খরচ করা হবে।

যে পুকুরটি পরিষ্কার করা হয়েছে—সকলের উপকারের জন্যে তার জল যাতে আরো পরিষ্কার হয় এবং নির্ভাবনায় সবাই যাতে পানীয় জল হিসাবে তা ব্যবহার করতে পারে সেজন্যে সকল রকম সাবধানতা অবলম্বন করা হবে এবং প্রতিষেধক ঔষধও ব্যবহার করা হবে। এই পুকুরটি এখন বেশ বড় হয়েছে। এখানে মাছের পোনাও ছেড়ে দেয়া যায়। সেই মাছ যখন বড় হবে—পাড়ায় পাড়ায় তা বিক্রী করা যাবে, সেই আয় থেকে শিশুকেন্দ্রের অনেক উন্নতি বিধান করা চলবে।

পুকুরের চার পাড়ে আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। এখন সাত ভূতে এসব লুটে-পুটে খায়। কারও এদিকে দৃষ্টি নেই। শিশুকেন্দ্র গড়ে উঠলে এখানকার ছেলেরাই সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবে। এই ফল বিক্রী করেও প্রতিবছর একটা আয় হবে। কেন্দ্রের তহবিলে সেই টাকা জমা পড়বে—আর প্রয়োজন মত খরচ করা হবে।

আরও একটি পরিকল্পনা শশী করেছে। একটি তাঁতঘর বসানোর ব্যাপার। কিছু অর্থ সংগৃহীত হলেই একটি তাঁত বসানো যেতে পারে। সেজন্যে একটি আলাদা ঘর তৈরী করতে হবে। মেয়েরা নিজেদের অবসর সময়ে এই তাঁতঘরে এসে কাপড় গামছা বুনবে। সেগুলোও লোকের কাছে বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারবে।

শ্যামলের ভারী পছন্দ হল নক্সাটা।

তখন তারা দুজনে মিলে মোড়লকে গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে।

মোড়ল আপন মনে মাথা নেড়ে বললে, এ ত' সবই ভালো কাজ দাদাবাবু, আচ্ছা, আমরা কোমর বেঁধে লাগছি। তোমরা যে নক্সা এঁকেছ—আমরা ঠিক-ঠিক সেই রকম ঘর তুলে দেবো। তারপর তোমাদের কাজ তোমাদের হাতে।

মোড়লের সম্মতি পেয়ে সাড়া পড়ে গেল গোটা বাগ্দীপাড়ায়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ চললো দুবেলায়।

একদল ঝুড়ি করে মাটি বয়ে নিয়ে এসে ফেলছে। একদল সেই মাটি দুরমুজ্ দিয়ে পিটিয়ে ভিটে তৈরী করছে, একদল পাড়ার বিভিন্ন বাঁশ-ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বয়ে নিয়ে আস্ছে আর একদল সেই বাঁশ কেটে খুঁটি তৈরী করছে।

একটি লোক যদি ওদের কাজের পদ্ধতি দাঁড়িয়ে দেখে, তবে সত্যি অবাক হয়ে যাবে সমস্ত কিছুর শৃঙ্খলা আর সুব্যবস্থায়।

যে সব মাটি ঝুড়ি ভর্তি করে ওপরে এনে ফেলা হচ্ছে—মেয়েরা আবার দলবদ্ধ-ভাবে তার ভেতর জল ঢালছে—যাতে ভিটেগুলি খুব শক্ত আর মজবুত হয়।

বিভিন্ন ঘরের যে বেড়া হবে—তারই কাজে লেগে গেছে একদল ছেলে, তারা বাঁশকে বেশ সুন্দর করে ছেঁচে পাতলা করে ফেলছে—তারপর এমন সুন্দরভাবে বাঁশের বেড়া তৈরী করছে যে, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

গোটা বাগ্দীপাড়ায় যেন একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ সুরু হয়ে গেছে। যারা প্রত্যহ জন খাটতে যায় তারাও ফিরতি মুখে এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা এই শিশুকেন্দ্রে মেহনত করে খুশী মনে ঘরে ফিরে যায়।

ওদিকে বাগ্দীপাড়ায় কাজ এগিয়ে চলেছে—ঠিক তার উল্টো পিঠ হিসেবে সারা গাঁয়ে একটা আলোচনা উঠেছে পাড়ার মাতব্বরদের মুখেমুখে।

—ছোট লোকদের 'নাই' দিয়ে মাথায় তোলা।

—জলবিছুটি গাঁয়ে এইরকম কাণ্ডকারখানা আর কখনো হয় নি!

—হুঁ! দুটো বাইরের ছোঁড়াই যত অনিষ্টের মূল। নইলে আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা কখনো ছোটলোকদের মাথায় তুলে ধেই-ধেই করে নাচতো না।

—বুঝতে পেরেছি। পিপীলিকার পাখা হয় মরিবার তরে।

—কিন্তু এ ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে।

—যারা কখনো মাথা তুলে আমাদের মুখের দিকে চাইতে পারত না—তারা টক্কর দিয়ে ইস্কুল পাঠশালা বসাচ্ছে। আবার কুস্তির আখড়াও নাকি খুলছে।

—পথ দিয়ে হাঁটবার সময় একপাশে সরে দাঁড়াতো সব। এখন কনুয়ের ধাক্কা মেরে চলে যাবে।

—হুঁ। আর বারণ করলে কুস্তির প্যাঁচ লাগিয়ে দেবে।

—ঠিক কথা। আগুন আর শত্তুরকে কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দিতে নেই। পায়ের নীচে শেষ করে দিতে হয়।

গ্রামের বৈঠকখানা ঘরগুলিতে ক্রমাগত হুঁকোর ওপর কলকে পুড়ছিল আর এই জাতীয় আলোচনা লাফালাফি করে ফিরছিল একের মুখ থেকে অন্যের মুখে!

বাগ্দীপাড়ার এইসব সংগঠনমূলক কাজ সবচাইতে চক্ষুশূল হয়েছিল চৌধুরীবাড়ির চন্দনের। কেন না তারা একবার পাঠশালা গড়তে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারে নি!

ফলে হল কি—পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা গেল পুড়ে; কিন্তু ওরাও আর নতুন পাঠশালা স্থাপন করাতে পারলে না!

সামন্ত পণ্ডিতের অবস্থা দেখে আর কেউ এগিয়ে এলো না পাঠশালার গুরুমশাই-গিরি করতে। হয়ত দুচারজন একাজের উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু গাঁয়ের সবাই

ভালো করে জানত যে, পুবপাড়ার আক্রোশে যদি পশ্চিমপাড়ার পণ্ডিতের বাড়ি পোড়ে—তবে পুবপাড়ায় যে নতুন করে গুরুমশাইগিরি করতে যাবেন—পশ্চিমপাড়ার ক্রোধাগ্নিতে আবার কবে নতুন পণ্ডিতের ঘরও ভস্মে পরিণত হবে।

কথায় বলে,—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। দরকার নেই পণ্ডিতিতে, বরং বাজারে আলুপটল বিক্রী করা ভালো তবু এদের রেষারেষির মাঝখানে পড়ে কোনদিন পৈতৃক প্রাণটা চলে না যায়।

গাঁয়ে সেই পাঠশালা হল, তবু পুবপাড়ায় নয়—হল কিনা একেবারে বাগ্‌দীপাড়ায়।

এ লজ্জা চৌধুরীবাড়ির চন্দন কোথায় লুকিয়ে রাখবে? একদিন সন্ধ্যের মুখে ঘাটের নৌকো করে খাল ধরে গিয়ে সেই পাঠশালা দেখে এলো চন্দন।

কী চমৎকার করে গড়ে তুলেছে ওরা পাঠশালার ঘর। যেন একেবারে ছবির মতো।

চারদিকে বাগান, কাছেই পুকুর। সেই এঁদো-পচা পুকুর বলে চেনাই যায় না! পাঠশালার ভিটে আর মেঝে এমন সুন্দর করে গোবর নিকোনো যে, মনে হয় মা সরস্বতী বুঝি একান্তে এসে এইখানে তার চরণযুগল রেখেছেন।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলো সঙ্গী-সাথী নিয়ে চন্দন।

চন্দনের সঙ্গী-সাথীরা একদিন শশীকে ডেকে নিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ি। অবশ্য খাবারের নেমন্তন্ন করেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসা হল। শশীরর মামা চৌধুরীবাড়ির পরিচিত ব্যক্তি, কাজেই শশীর ওপর ওদের একটা জোর আছে বৈকি।

চন্দন শশীকে তার নিজের বৈঠকখানাঘরে খাতির করে বসালে। নানারকম আলাপ-আলোচনা চলল।

দেশের হালচাল, কলকাতায় জাপানী বোমা, লোকের মনোভাব, ফুটবল প্রভৃতি আলোচনা যখন কিছুতেই জমল না—তখন চন্দন জলবিছুটি গাঁয়ের কথা তুললে।

দেখ ভাই শশী—

চন্দন সুরু করলে একটা অনুরোধের সুরে।

—ছোটজাতের লোকেরা আমাদের গাঁয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারত না। তোমাকে আমরা আপনার লোকই বলব। কেননা তোমার মামা বহুবার আমাদের বাড়ি এসেছেন—একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন। তুমিও পুব-পাড়াতেই এসে তোমার মাকে নিয়ে বসবাস করছ। অন্য পাড়ার লোকেরা কে কি করছে আমার দেখার দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে ত' আমি বন্ধুভাবে কাছে ডাকতে পারি—

শশী বললে, নিশ্চয়ই পারো ভাই। সব চাইতে বড় কথা আমরা সমবয়েসী। আমরা যদি চাই তবে অনেক কিছু ভালো কাজ করতে পারি এই গাঁয়ে—

—ভালো কাজ করতে চাও করো না—

নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলে চন্দন।

—কিন্তু তোমাকে ভাই ওই বাগ্দীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। ওদের সঙ্গে মিশে তুমি পাঠশালা বসাচ্ছ, পুকুর পরিষ্কার করছ, বাগান তৈরী করছ, পাঠাগার স্থাপন করছ…কিন্তু কেন? এতে কি ভস্মে ঘী ঢালা হচ্ছে না? তুমি পাঠশালা গড়তে চাও বেশ ভাল কথা। আমার বাড়ির ঘর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। একটা শুভদিন দেখে তুমি কাজ সুরু করে দাও।

এই কথা বলে চন্দন ওর মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

শশী প্রথমটা কিছু উত্তর দিতে পারল না। খানিকক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল!

তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিলে, দেখ ভাই চন্দন, আমরা এ যুগের ছেলে। কেউ যদি আপনার জন মনে করে কাছে ডাকে আর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায়—তবে কি তাকে বিমুখ করতে পারি? আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হবে পেছনে যে পড়ে আছে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়া আর প্রাণপণে তাকে টেনে তোলা। নইলে সেই যে একদিন পেছনপানে টেনে আমায় কাদায় ফেলে দেবে! আর শুভদিনের কথা বলছ? আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিনই শুভদিন—যদি আমরা শুভসঙ্কল্প নিয়ে কাজ সুরু করতে পারি। আমাদের নিষ্ঠার ওপরই নির্ভর করে সেকাজ জয়যুক্ত হবে কিনা!

শশীর কথা শুনে চন্দনের চোখদুটো এক মুহূর্তে জ্বলে উঠল। তবে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করলে তার রাগটাকে বাগে আনতে।

ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বললে. তাহলে তুমি ওই বাগ্দীদের সঙ্গ ছাড়তে রাজী নও?

শশী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলে, বাগ্দী বলে কোনো কথা নেই। ওরা যদি বাগ্দী না হয়ে বাহ্মণ হত তাহলেও আমি একই কথা কইতাম। যাদের নিয়ে একটা কাজ সুরু করেছি মাঝপথে তাদের ছেড়ে আসি কি করে ভাই? আমরা এই কাজে সকলেরই সাহায্য চাই। আর তুমি নিজেও জানো যে, এই কাজটা যদি ভালোভাবে রূপ নিতে পারে তবে গোটা গাঁয়ের তা থেকে উপকার পাবে।

এইবার চন্দন তার রাগটাকে আর চেপে রাখতে পারলে না। চড়া গলায় উত্তর দিলে, তুমি কি বলছ শশী, তুমি নিজেই ভেবে দেখ নি! তুমি কি মনে কর যে, ভদ্রপাড়ার ছেলেমেয়েরা ওই বাগ্দীদের সঙ্গে ওই পাঠশালায় পড়তে যাবে? শহর থেকে নতুন এসেছ কিনা, তাই পল্লী অঞ্চলের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। তুমি কি জানো, ওদের পাড়ার কাউকে ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়?

মৃদু হেসে শশী উত্তর দিলে, সে তোমাদের কুসংস্কার। এই পৃথিবীতে সবাই সমান—সবাই মানুষ। ওরাও যদি লেখাপড়া শেখে তবে দেশের উন্নতিবিধান ওদের দ্বারাও সম্ভবপর হবে। শুধু একটি কথা ভেবে দেখ চন্দন, ওই বাগ্দীপাড়ার একটি

ছেলে যদি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে এই জেলারই শাসক হয়ে আসে—তবে কি তুমি তাঁকে এই অঞ্চলের জমিদার হিসাবে সম্মান দেখাবে না ?

মানুষ যখন যুক্তির কাছে হেরে যায় তখন চটে যায় আরো বেশী।

চৌধুরীবাড়ির চন্দনেরও সেই দশা হল।

সে শশীর খাঁটি কথাগুলোর উপযুক্ত জবাব দিতে পারলে না বলেই আরো বেশী তপ্ত হয়ে উঠল।

চেয়ারের হাতলে একটা ঘুঁষি মেরে চন্দন বললে, আমি তোমার অত তত্ত্ব কথা শুনতে চাইনে। এই জল-বিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় কবে তুমি আমার কথা মানবে না—এই কি তুমি বলতে চাও ? এখনো তুমি ভালো করে ভেবে দেখো শশী—

এক মুহূর্তের জন্যে শশীর মুখখানা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। চোখের কোনে আগুনের ঝিলিকও দেখা গেল।

কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে নিলে। তারপর ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে, দেখ ভাই চন্দন, এইমাত্র তুমি যে কথার ইঙ্গিত করলে আমি তার প্রতিবাদ করি। তুমি বললে জল-বিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় বসবাস করলে তোমার কথা মেনে চলতেই হবে। কিন্তু আমি যদি বলি,—এটা বাংলা দেশ-এখানে সকলেরই সমান অধিকার আছে—তবে কি উত্তর তুমি দেবে ? তাছাড়া আমি তোমার ভিটে বাড়ির প্রজা নই। জল-বিছুটি গাঁয়ের পুবপাড়ায় বসবাস করছি বটে ; তবে যে কুঁড়ে ঘরে আমি থাকি তার ভাড়া দি মালিকের কাছে। দেশে একটা আইন কানুন আছে। তুমি আমাকে চোখ রাঙিয়ে ওভাবে কথা বলতে পারো না। স্বাধীনভাবে চলাফেরার আর দশের উপকার যাতে হয় এমন কাজ করার অধিকার সকলেরই আছে। হুমকি দিয়ে মানুষকে বশ করা যায় না। এ যুগের মানুষ প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে। একটা কথা তুমি ভুলে গেছ যে, আজ আমাকে তোমার বাড়ি আমন্ত্রণ করে এনেছিলে। বাড়িতে ডেকে এনে অথিতিকে অপমান করবার প্রথা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই—আমাদের ভারতবর্ষে ত' নয়ই। আচ্ছা ভাই নমস্কার।

মাথা উঁচু করে ধীর মন্থর গতিতে শশী চৌধুরীবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

চন্দন কিম্বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গ আর কারো কিছু বলবার সাহস হল না।

শশীকে এত দেরী করে পাঠশালা ঘরে পৌঁছুতে দেখে শ্যামল ত' রেগেই অস্থির।

—হুঁ জমিদার বাড়ি নেমন্তন্ন বলে এত দেরী করে আসতে হয়। এদিকে যে আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ ! লোকজন সব ঠায় বসে আছে। নক্সা কে বুঝিয়ে দেবে শুনি ?

শশী মৃদু হেসে উত্তর দিলে, জমিদার বাড়ি গিয়ে যে রাহুগ্রাসে পড়ে গিয়েছিলাম ; আর একটু হলে আমাকে ওখানে বন্দী করে রাখতো !

অ্যাঁ! একেবারে বন্দী! তারপরেই যুদ্ধ ঘোষনা? কি বলিস?

মোড়ল পাশেই বসে ছিল। বললে, না না হাসি ঠাট্টার কথা নয়। কি হয়েছিল আমায় সত্যি করে বলতো দাদাবাবু? ওই জমিদারের জুলুম আমরা সাত পুরুষ ধরে সহ্য করছি! তোমার ওপর কোনো অত্যাচার হলে আমরা আর কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবো না। গোটা বাগ্দীপাড়া গিয়ে হাজির হবো ওই চৌধুরীবাড়ির সামনে।

—না-না অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই।

শশী শান্ত করে মোড়লকে। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা শ্যামল আর মোড়লকে খুলে বলে।

শ্যামল উত্তর দিলে, ও! আমরা এতগুলো মানুষ যে কাজ করছি সব বুঝি ভস্মে ঘী ঢালা হচ্ছে! তোদের ওই চন্দনের সঙ্গে আমার একদিন হয়ে যাবে—তা কিন্তু বলে দিচ্ছি!

ওর কথার ঢঙ দেখে শশী হো হো করে হেসে উঠল। বললে, কিন্তু গায়ের জোরে ওর সঙ্গে তুই পেরে উঠবিনে শ্যামল আমরা শুধু ভস্মে ঘী ঢালছি আর ও রোজ গরম-ভাতে ঘী ঢালছে। কাজেই বুকের পাটা ওর বড়।

ওই কথায় মোড়লও হো হো করে হেসে উঠল। এমন সময় বাগ্দীপাড়ার ছেলে-মেয়েরা ধামা ভর্তি গরম মুড়ি, গুড়ের বাতাসা আর নারকেল নিয়ে এসে হাজির।

বললে, দাদাবাবু, তোরা খাবিনে?

শশী লাফিয়ে উঠে উত্তর দিলে, খাবো আবার না? জমিদারবাড়ি নেমতন্ন করে খেতে দেয়নি। তার ওপর ঝগড়া করে রীতিমত ক্ষিদে পেয়ে গেছে। দে শিগগীর কি-কি এনেছিস। এই বলে একটা মুড়ির ধামা নিজের কাছে টেনে নিলে।

॥ উনিশ ॥

সেদিন শ্যামল সন্ধ্যেবেলায় হাসতে হাসতে পাঠশালার আটচালায় এসে উপস্থিত হল।

তাকে অমনভাবে হাসতে দেখে শশী জিজ্ঞেস করলে, মিছি-মিছি একা-একা হাসছ যে?

শ্যামল এইবার হো হো করে হেসে উঠল।

বললে, মিছিমিছি তোকে কে বললে? আচ্ছা তুই জলছবি দেখেছিস? —জল-ছবি আর দেখবো না কেন? আরো যখন ছোটছিলাম—বইয়ের পাতায় কত জলছবি লাগিয়েছি—

শশী উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দেয়।

শ্যামল বললে, জলছবি যখন কাগজে ছাপা যাবে, তখন তার জৌলুষ বিশেষ ধরা পড়ে না। কিন্তু জল দিয়ে ভিজিয়ে যখন বইয়ের পাতায় সেই জলছবি লাগানো হয়। তখন তার রঙ একেবারে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে দেখেছিস ত'?

শশী অসহিষ্ণু হয়ে উত্তর দেয়, তা আর দেখবো না কেন? কিন্তু জলছবির সঙ্গে তোমার হাসির সম্পর্কটা কোথায় তা ত' বুঝতে পারছিনে।

—আরে বোকা সেই কথাই ত' বলতে চাইছি।

অতি পুলকে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে শ্যামল।

শশী বললে, তা হলে ভূমিকা না করে সোজাসুজি জলছবির রহস্যটা উদ্ঘাটন করো দেখি—

শ্যামল মুখ টিপে একটু হাসলে। তারপর বললে, তোকে ত' পুবপাড়ার চৌধুরী-বাড়ির চন্দন নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত শাসিয়ে দিলে, এ অঞ্চলের বাগ্দীদের সঙ্গে না মিশতে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা হল ঠিক জলছবির মত—

—কী হেঁয়ালী করো মানে বুঝি না। শশী বললে আপন মনে।

—মানে এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাকে গাঙ্গুলীবাড়ির ফাল্গুন কিন্তু নেমন্তন্ন করে নি। সে চুপি চুপি রাত্তিরে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

উত্তর দিলে শ্যামল।

শশী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, অ্যাঁ ফাল্গুন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? তা কি বললে শুনি? খুব বুঝি নিন্দে করলে বাগ্দীদের? আর বললে, ওর দলে যোগ দিতে? নাঃ দেখছি বাগ্‌দীদের কপাল নেহাৎই মন্দ। কেউ ওদের ভালো দেখতে পারে না।

শ্যামল কিন্তু শশীর কথা শুনে মুচকি মুচকি হাস্‌তে লাগলো। জবাব দিলে, উহুঁ! তুই যা ভেবেছিস—মোটেই কিন্তু তা নয়।

—তবে?

শ্যামল বললে, বাগ্‌দীদের প্রস্তাব ঠিক ওর উল্টো। সে বললে, বাগ্‌দীদের নতুন করে পাঠশালা খুলছে—তাতে আমার খুব সহানুভূতি আছে। যদি টাকার প্রয়োজন হয় আমি দেবো। এই রকম ভালো কাজে সকলেরই সাহায্য করা উচিত!

আমার হাতে সে একশ টাকার দু'খানি নোট চাঁদা হিসেবে দিয়ে গেছে!

শশী অবাক হয়ে বললে, অ্যাঁ সত্যি?

তারপর খানিকটা ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে, হ্যাঁ অঙ্ক মিলে গেছে এইবার আসল কারণটা জলের মতো বোঝা গেল।

শ্যামল শুধোলে, অঙ্ক মিলে গেছে কিরে? যা হয় খোলাখুলি সব কথা খুলে বল।

শশী উত্তর দিলে, তা হলে বলি শোনো। পূবপাড়ার চৌধুরীরা পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছিল। সে জন্যে ফাল্গুনের মনে মনে দারুণ রাগ আছে, এখন যখন সে দেখলো যে, বাগ্দী এক জোট হয়েছে—আর নতুন করে পাঠশালা গড়ে তুলছে, তখন তার আনন্দ হবারই কথা? সত্যি একটা ভালো কাজ বলে ওর আনন্দ হয় নি! হয়েছে চন্দনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করে। সেই জন্যেই ফাল্গুন এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে!

শ্যামল বললে, তা যে জন্যেই হোক। আমাদের কাজে সাহায্য পাচ্ছি, তখন নেবোনা কেন? সকলের কাছ থেকেই আমরা চাঁদা নেবো এই ত' আমাদের মূল কথা।

শশী উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই। আমরা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে যাব। যার খুশি দেবে যার ইচ্ছে দেবেনা। ভিক্ষের চালে ত' কোনো বাদ্‌-বিচার নেই। ওরা এই সব আলোচনা করছে,এমন সময় বাগ্দীপাড়ার মোড়ল এসে সেখানে হাজির হল।

শ্যামল আর শশী মোড়লকে সব কথা খুলে বলেল।

মোড়ল সব শুনে মাথা নাড়তে লাগল।

বললে, ঠিক আছে দাদাবাবু। চাঁদা দিলে আমরা সকলকার কাছ থেকেই মাথা পেতে নেবো। দশের কাজে আমাদের না নেই।

শশী উত্তর দিলে ঠিক কথা। আমিও ত' সেই প্রস্তাবই করছিলাম।

শ্যামল ফোঁড়ন কেটে বললে, কিন্তু আমার ভাই মন সারা দিচ্ছে না। ফাল্গুনের আসল উদ্দেশ্যটা ভেবে দেখতে হবে। ও চায় বিরোধ। দুর্যোধন যখন কর্ণকে রাজ্য দান করেছিল—তখন দয়াপরবশ হয়ে একাজ করেনি। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে একজন জোরালো সাথী পাওয়া গেল এই হল তার দানের একমাত্র কারণ!

—সে তুমি যাই বল না কেন—শশী মন্তব্য করলে-দশজনের কাছ থেকে চাঁদা নেয়াই যখন ঠিক হয়েছে, তখন কারো সাহায্য আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি নে। কারো মনের কথা জেনে আমাদের লাভ কি? আর সেটা জানা ত' সব সময়ে সম্ভব-পর নয়। যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করে একটা পয়সা দিচ্ছে সেটাও আমরা হাসিমুখে নেবো, আবার যে দুশো টাকা অনায়াসে ফেলেদিচ্ছে, তাও আমরা আনন্দের সঙ্গেগ্রহণ করবো। যে কাজে আমরাহাত দিয়েছি, তাত' শোধ করতে হবে।

মোড়ল কিন্তু হাসতে লাগলো।

বললে, পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার রেষারেষিতে যদি আমাদের কাজ হয়ে যায় হোক না। এমনিতে ত' জমিদারেরা ভালো কাজে এক পয়সা খরচ করতে চায় না, না হয় ঝগড়া ঝাঁটিতে কিছু খসুক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামল মন্তব্য করলে, আচ্ছা তাহলে তাই হোক শশী একটা দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, এই যে পুবপাড়া আর পশ্চিমপাড়ার দলা-দলি—এক পাড়া আরেক পাড়াকে কোনমতেই সহ্য করতে পারে না, এর কারণ কি জানো ?

শ্যামল প্রশ্ন করলে কি কারণ শুনি ? শশী বললে, আমার মনে হয়—বিভেদ সৃষ্টি করেছে গ্রামের মাঝখানকার খালটি। এই খালটি গ্রামটাকে চিরে দুভাগ করে দিয়েছে। এপাড়ার মাটি ওপাড়ার মাটিকে ছুঁয়ে বাচতে পারে না তাই এপাড়ার মানুষ ও পাড়ার মানুষের মনের নাগাল পায় না ! দুটো খালের মাঝখানে যদি একটি বাঁশের সাঁকো তৈরী করা যায়। তবে এপাড়ার লোক সহজে ওপাড়ায় চলে যেতে পারে। এপাড়ার পায়ের ধূলি ওপাড়ায় গিয়ে পড়বে। আপনা থেকেই মানুষের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাতে পূবপাড়ার লোক পশ্চিমপাড়ার মানুষকে অতখানি পর বলে ভাবতে পারবে না।

মোড়ল মাথা নেড়ে উত্তর করলে, সে কথা ত' সত্যি দাদাবাবু, কিন্তু কি জানো, এ গাঁয়ের রক্তে রয়েছে বিরোধ,দাঙ্গা আর মারামারি, তুমি আমি বললে কেউ শুনবে ?

কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

শশী আপন মনেই বললে, কার আত্মত্যাগে যে এই বিরোধের অবসান হবে—সে কথা একমাত্র অন্তর্যামীই বলতে পারেন ! আমরা মিছে ভেবে মরি। শুভক্ষণ এলে দুই পাড়ার মনের মিল হতে বাধ্য।

মোড়ল বললে ঠিক কথা দাদাবাবু, আমরা সামান্য মনিষ্যি, অত আর ভেবে কি হবে বলো ? তার চাইতে চলো, কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়ি।

সেদিনকার আলোচনা ওইখানেই শেষ হয়ে গেল।

প্রথমে দেখা গেল একমাত্র বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরাই পাঠশালায় পড়তে আসছে।

শশী আর শ্যামল দুজনে পড়াতে সুরু করলে।

তখন দেখা গেল—ভদ্রপল্লীর ছেলেরাও দু-একজন করে আসছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অভিভাবকদেরও আনাগোনা সুরু হল। কেউ কেউ গোপনে শশী কিংবা শ্যামলেকে ডেকে বললেন, বাবাজি, তোমরা পাঠশালায় যত্ন নিয়ে পড়াচ্ছ এত' গাঁয়ের ছেলেদের ভাগ্যের কথা। কিন্তু একটা ব্যাপারের দিকে তোমরা যদি নজর না রাখো, তবে ছেলেমেয়েদের এখানে পাঠানো মুস্কিল।

ওরা প্রশ্ন করে কি ব্যাপার ?

অভিভাবকদের মধ্যে কেউ উত্তর দেন, এই বাগ্‌দীদের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়ে-দের এক সঙ্গে বসার কথা। হাজার হোক—ওরা ছোট জাত ত'। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা কি ওদের সঙ্গে বসতে পারে ? একেবারে গন্ধে ভূত পালায়। যে করে হে'ক্—তোমরা কথা দাও—আলাদা আলাদা ওদের বসার ব্যবস্থা করবে—

তাহলেই আমরা ছেলেমেয়ে পাঠাতে পারি। পড়াশুনো না করে ওরা সবাই গরু হয়ে গেল যে।

শশী শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, দেখুন, বিদ্যাস্থানে আলাদা ব্যবস্থা করা ত' সম্ভবপর নয়। সবাইকে একই আসনে পড়াশুনা করতে হবে। অবশ্য ছেলেরা একদিকে বসবে—আর মেয়েরা একদিকে বসবে—এই রকম বন্দোবস্তই করা হয়েছে। তবে একটি কথা আপনাদের জানাতে পারি—ছেলেমেয়েরা যাতে সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে।

ধীরে ধীরে ভদ্রপল্লীর অভিভাবকেরাও এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। এদিকে মোড়লের সঙ্গে আলোচনা করে শশী-শ্যামল বাগ্দীপাড়ার ছেলেমেয়েদের জানিয়ে দিলে যে, সবাইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পাঠশালায় আসতে হবে।

এই ঘোষণায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেল।

ছেলেমেয়েরা নিজেদের জামা-কাপড় নিজেরাই ক্ষার অথবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা শিখে নিলে। আস্তে আস্তে ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেল যে, ঘামে জামা, ফ্রক ভিজে গেলে—ওরা নিজেরাই গরজ করে কেচে নিতো। সেজন্যে আর বড়দের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হত না।

বাইরে থেকে এসে যাঁরা এই গ্রামে বসবাস করছিলেন—তাঁরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অভাবটা খুবই অনুভব করছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া তাঁদের মনে বিশেষ দাগ কাটতে পারে নি!

পশ্চিমপাড়ার পাঠশালাটা পুড়ে যেতে গাঁয়ের লোকেরাও বুঝছিলেন যে, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার আর কোন উপায়ই গ্রামে রইল না।

এখন শশী আর শ্যামলের চেষ্টাই যখন এমন সুন্দর একটি পাঠশালা তৈরী হল, ওরা দু'জন যত্ন করে ছোটদের পড়াতে লাগলো—তখন ছেলেমেয়ে পাঠাতে কারো আর আপত্তি থাকল না।

দেখতে দেখতে প্রচুর ছেলেমেয়ে এসে পাঠশালায় ভর্তি হয়ে গেল।

শশী আর শ্যামল দেখলে, ওদের দু'জনের পক্ষে এত ছেলেমেয়েকে পড়ানো সম্ভব নয়। তাতে পড়াশুনা ভালো হবে না—আর বাধ্য হয়েই ওদের শেখানোর কাজে ফাঁকি দিতে হবে।

তখন ওরা দু'জনে পরামর্শ করে—শ্যামলের কাকিমা আর শশীর মাকে নিয়ে একটি গোপন আলোচনা সভা বসালে।

শশী বললে, কাকিমা, আপনাদের কোন কথাই আমরা শুনতে রাজী নই। পড়ানোর লোকের অভাবে এমন সুন্দর পাঠশালাটা উঠে যাবে?

শ্যামলের কাকিমা হাসতে লাগলেন।

—তাই বলে আমরা পাত্‌তাড়ি বগলে করে তোদে ইস্কুলে গিয়ে হাজির হবো নাকি ?

শশী উত্তর দিলে, তা কেন ? তোমরা কেন পাত্‌তাড়ি নিতে যাবে ? সে ত' নেবে ছেলেমেয়েরা। তোমরা শুধু গিয়ে ওদের দু'ঘণ্টা করে পড়াবে। খুব ছোট যারা তাদের অ-আ—ক-খ শেখাবে আর ১-২ পড়াবে।

শশীর মা বললেন, তোদের দু'জনের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? এটা কি কলকাতা শহর ? আমরা দুজন যদি পাঠশালায় পড়াতে যাই, তবে এই পাড়াগাঁয়ে একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তখন আমরা এ অঞ্চল ছেড়ে পালাতে পথ পাবো না

শশী ফোঁস করে উঠে উত্তর দিলে, হুঁ ! তা বৈকি ! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ালে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ? আর গাঁয়ের বৌ-ঝিরা যে পরনিন্দা আর পরচর্চা করে, পাড়া বেড়ায়—সেটা বুঝি খুব ভালো কাজ ?

শ্যামলও চুপ করে বসে থাকল না। নিজের যুক্তির তূণ থেকে চোখা-চোখা বাণ ছুঁড়তে লাগলো।

বললে, আচ্ছা কাকিমা, যদি প্রয়োজনের সময় বিদ্যাদানই করতে না পারবে, তবে দিন-রাত এত বই পড়ো কেন ? নিজের বাড়িতে এতবড় একটা পাঠাগারই বা গড়ে তুলেছ কেন ? ছেলেবেলায় কি পড়োনি—

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

কাকিমা শ্যামলের বক্তৃতা শুনে হাসতে লাগলেন। বললেন, তুই আবার কবে এত কথা বলতে শিখলি ? শশীর ছোঁয়া লেগে একেবারে বক্তা হয়ে উঠলি যে ?

শশীর মা ফোঁড়ন কাটলেন, ঠিক বলেছ বোন ! শশীর মুখে যেন সব সময় খৈ ফোটে। ও শ্যামলটাকে পর্যন্ত বাচাল করে তুলেছে।

—তা বাচালই করি, আর যাই করি—তোমাদের কিন্তু নীচু ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর ভার নিতে হবে।

উত্তর করে শশী।

শ্যামল আবার এই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব যোগ করে দেয়—আচ্ছা কাকিমা, তুমি যে আমাদের পাঠশালায় কতকগুলো শ্লেট দেবে বলেছিলে, সেকথা কি একেবারে ভুলে গেলে ?

কাকিমা বললেন, শ্লেট না হয় কিনে দিচ্ছি, কিন্তু পড়ানোর কাজ থেকে আমাদের রেহাই দিতে হবে।

শশীর মা মন্তব্য করলেন, আমার মনে হয়—এইসব কুবুদ্ধি শশীর মগজ থেকেই বেরিয়েছে। নইলে শ্যামলের মাথায় এসব কখনো আসে না !

শুনে কাকিমা হাসতে লাগলেন।

বললেন, হ্যাঁ আপনি যা বলেছেন দিদি ! প্রথমদিনই আমাদের বাসায় গিয়ে ও যা গোয়েন্দাগিরির কসরৎ দেখিয়েছিল—তখনই আমি আঁচ করে নিয়েছিলাম—বড় হলে শশী জজ্ হবেই। বিচারবুদ্ধি ওর মাথায় একেবারে গজ্‌গজ করছে। এত বুদ্ধি সামাল দিয়ে মগজে লুকিয়ে রাখতে পারলে হয় !

শশী উত্তর দিলে, সবই আমি স্বীকার করে নিচ্ছি কাকিমা। না হয় আপনার কথা রাখবার জন্যে আমি হাইকোর্টের জজই হবো।

কিন্তু আপনারা দুজনে আমার কথা রাখুন। পাঠশালায় পড়ানোর ভার নিতেই হবে। কোনো ওজর-আপত্তি এ ব্যাপারে শুনবো না।

ওদিকে পূবপাড়ায় চৌধুরীদের চন্দন রাগে নিজের হাত কামড়াতে থাকে। এই পাঠশালার ব্যাপারে তার কোনো কথাই থাকছে না।

সে যখন বুদ্ধি করে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা পুড়িয়ে দিয়েছিল—তখন তার এতটুকু মনের জোর ছিল যে, পূবপাড়ায় চৌধুরীবাড়িতে একটি সুন্দর পাঠশালা বসাতে পারবে।

কিন্তু পরে দেখা গেল যে, জোর করে একটি জিনিস পুড়িয়ে দেয়া খুব সোজা। কিন্তু একটা কিছু গড়ে তোলার মতো শক্ত কাজ আর নেই।

যতই সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে পাঠশালাটি গড়ে তোলবার জন্যে ততই সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। হাজার ফন্দি-ফিকির করেও সে পড়ুয়া সংগ্রহ করতে পারে নি।

চৌধুরীমশাই অতিথিশালাটি যেভাবে সুন্দর করে সারিয়ে দিয়েছিলেন—তাতে চন্দনের আশা ছিল যে, পড়ুয়াদের নামতার শব্দে সারাটা বাড়ি গম্‌গম্ করতে থাকবে। কিন্তু এখন সেই ঘরটি ইঁদুর-বাঁদুর আর চামচিকের আড্ডা হয়েছে। রাত্তিরে কতকগুলো ঘেয়ো-কুকুর সেখানে গিয়ে আস্তানা করে।

এ পরিকল্পনা ও চন্দনের মনে ছিল না। তাই বাগ্দীপাড়ায় যখন প্রথম পাঠশালা গড়বার কথা হল—সে আড়ালে থেকে বরাবর বাধা দেবার চেষ্টা করেছে···কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হতে পারে নি।

আজ যখন সে দেখতে পেলে যে, বাগ্দীপাড়ার সেই পাঠশালায় শুধু যে পশ্চিম-পাড়ার ছেলেমেয়েরাই যাচ্ছে—তা নয়। তার কথা অমান্য করে পূবপাড়ারও বহু অভিভাবক তাদের বাড়ির ছোটদের সেইখানে ভর্তি করে দিচ্ছে—তখন সে নিজের রাগ লুকিয়ে রাখবার ঠাঁই পায় না। একবার সে ভেবেছিল যে, তার অমোঘ অস্ত্র ছাড়বে।

তার মানে নায়েবকে পাঠিয়ে ওই নতুন গড়া পাটশালাটা পুড়িয়ে দেবে। তা' হলেই তার সমস্ত রাগ শান্ত হবে।

এজন্যে যে গোপনে গভীর রাত্রে লোক না পাঠিয়েছিল তাও নয়। কিন্তু শশী-শ্যামল আগে থেকেই এই আশঙ্কা করে বরাবর পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে।

বাগ্‌দীপাড়ার লোকেরা বহু পরিশ্রম করে এই পাঠশালাটি গড়ে তুলেছে। একেবারে বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী করেছে বললেও চলে।

শশী-শ্যামলের পরামর্শে ওরা সারারাত জেগে পাহারা দেয়। চারজন করে দলে থাকে। একদল দু'ঘণ্টা ঘোরে, তারপর আর একদল এসে ওদের জায়গা দখল করলে—তারা পাঠশালার মেঝেতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। এইভাবে সারারাত পাহারার কাজ চলে।

নায়েব বুঝলে, এটা পশ্চিমপাড়ার পাঠশালা নয় যে, ফস্‌ করে দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই হল।

দু'তিন দিন চেষ্টা করে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে নায়েব। একদিন ত' অন্ধকারে বাগ্দীদের লাঠির ঘাও খেয়েছে।

চন্দন কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এইভাবে গ্রামে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নষ্ট হতে বসেছে। ফাল্গুনকে শায়েস্তা করবার জন্যেই সে গ্রামে রয়ে গেল। কিন্তু যখন শুনতে পারলে যে, সেই ফাল্গুনই গোপনে বাগ্‌দীদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছে, তখন সে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুধু বাকি রাখলে।

যে করেই হোক পশ্চিমপাড়ার ওপর পূবপাড়ার টেক্কা মারতেই হবে।

চন্দন নতুন ফন্দি-ফিকির ভাবতে থাকে।

॥ বিশ ॥

শশী আর শ্যামলের পড়ানোর সুখ্যাতি চারদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, শুধু জলবিছুটি গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাই নয়, আশেপাশের গ্রামগুলি থেকেও অনেক পড়ুয়া এসে জুটেছে।

এখানে একে পড়ানো ভালো হয়, তার ওপর নামমাত্র মাইনে নেয়া হয়ে থাকে। যারা খুব গরীব শশী ও শ্যামলের ব্যবস্থায় তারা বিনা মাইনেতেই ভর্তি হয়ে যায়।

ওদের দু'জনের তাগিদে শশীর মা ও শ্যামলের কাকিমা রীতিমতো ছোটদের পড়াতে সুরু করেছেন। এখন তাঁদের এইকাজে এত মন বসে গেছে যে, একদিন পাঠশালায় না এলে তাঁদের একটুও ভালো লাগে না; মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি এখানে আসবেন মনে করে খুব সকাল থেকেই ঘরের কাজ সারতে সুরু করে দেন।

ইতিমধ্যে শশী-শ্যামলের পরামর্শে ও মোড়লের সাহায্যে আর একখানি আটচালা ঘর তোলা হয়ে গেছে। কারণ, এঘরে আর ছেলেদের ধরছিল না।

পাঠশালায় শশীর মা ও শ্যামলের কাকিমার নাম হয়ে গেছে বড়-মাসিমা, আর ছোট-মাসিমা, পড়াশুনার সময় মার খেতে হয় না, পিঠে বেত পড়ে না—সেটা এ অঞ্চলে এক তাজ্জব ব্যাপার।

এর আগে পশ্চিমপাড়ার পাঠশালায় সামন্ত-পণ্ডিত সব সময়ই বেশ বেতের ব্যবহার করতেন। সেজন্যে অনেক ছেলে পাঠশালায় যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারাটা দিন আমবাগানে আর লিচুতলায় কাটিয়ে ঠিক সময়মতো গিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হত। মায়েরা মনে করতো—ছেলেরা না জানি কত বিদ্যেরঝুলি ভর্তি করে নিয়ে এলো।

কিন্তু এখন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। বড় মাসিমা আর ছোটমাসিমা এমন সাপের গল্প বাঘের গল্প, আর পক্ষিরাজের কাহিনী বলেন যে, ছোটরা কোনোদিন পাঠশালায় না আসতে পারলে পা ছড়িয়ে বসে কান্নাকাটি সুরু করে দেয়।

সেইজন্যে ছোটদের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়ে বাপ-মায়েরাও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকেন।

এখন দুটি আটচালা তৈরী হতে—ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাদের খেলাধূলা, হুল্লোড় আর নামতা পড়ায় সেখানে কানপাতা দায় হয়ে উঠেছে।

আরো মজার ব্যাপার হয়েছে এই যে, সবাই বড়মাসিমা আর ছোটমাসিমার কাছে পড়তে চায়। এর অবশ্য আরো একটা গোপন কারণ আছে। মাসিমারা মাঝে মাঝে নানারকম পিঠে তৈরী করে এনে ছেলেমেয়েদের খাওয়ান। এই বাল্য-ভোগ দেখবার জন্যে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা এসে ভীড় জমায়! সত্যি তখন এক আনন্দের হাট বসে যায়।

একদিন শশী পাঠশালার দাওয়ায় হতাশ হয়ে বসে পড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, সর্বনাশ হয়ে গেল আমার।

না জানি কি ঘটেছে ভেবে শ্যামলের কাকিমা ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোর আবার কি হল শশী?

শশী কপালে করাঘাত করে উত্তর দিলে, আর আমার চাকরী বুঝি আর থাকে না,—সবাই বলে বড়মাসিমা আর ছোটমাসিমার কাছে পড়ব!

ওর ওই রকম হতাশ ভাব আর কথা বলবার ধরণ দেখে—যারা আশে-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ছোটমাসিমা কিন্তু কৌতুক করতে ছাড়লেন না। বললেন, আসল ব্যাপারটা কি

হয়েছে আমি জানি। আজ আমরা কিছু পিঠে পাঠশালায় নিয়ে এসেছিলাম—ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ করে দিয়েছে। এককণাও আর পড়ে নেই। এই জন্যে শশীর এত দুঃখ। নিজের লোভের কথা ত' মুখ ফুটে বলতে পারে না—চাকরীর জন্যে হা—হুতাশ হচ্ছে।

আবার একটা হাসির ধূম পড়ল।

এরই দিন কয়েক পরের ঘটনা।

শশী আর শ্যামল সন্ধ্যের দিকে পাঠশালার পাশের পুকুরটার ধারে চুপচাপ বসে ছিল। শ্যামল যে শুধু কবিতা লিখতে পারে তাই নয়, বাঁসী বাজাতেও সে ওস্তাদ। সুন্দর একটি পূরবী সুর ধরেছিল সে, আর সেই সুর কাঁপন লাগিয়েছিল নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে।

এমন সময় মোড়ল এসে চুপচাপ বসল ওদের পাশে। বহুক্ষণ ধরে সুরের ঝঙ্কার আকাশ-বাতাসকে মাতিয়ে রাখলো।

বাঁশী থেমে গেলেও দীর্ঘকাল তিনজনে চুপচাপ বসে রইল। কারো মুখে যেন আর কোনো কথা জোগাচ্ছিল না।

হঠাৎ শান্ত পুকুরের বুকে একটা ঢিল ছুঁড়লে যেমন আচমকা শব্দ হয়—ঠিক সেই রকম নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে মোড়লই প্রথম কথা শুরু করলে।

—দাদবাবু একটা দরকারী কথা ছিল যে।

শশী রসিকতা করে বললে, এই বাঁশী শুনেও কি একটা সন্ধ্যে দরকারী কথা ভুলতে পারলে না মোড়ল ভাই?

মোড়ল হাসতে হাসতে উত্তর দিলে, উহুঁ। ছেলেমেয়েদের তাগিদ যে। তোমাদের কাছে বলবার সাহস নেই—তাই আমাকে গিয়ে সব ছেঁকে ধরেছে।

—ব্যাপার কি বল ত' মোড়ল ভাই? বড় মাসিমা আর ছোট মাসিমার কাছে নতুন করে পিঠে—পায়েসের হামলা সুরু করতে হবে নাকি?

—উহুঁ! এবার আর পিঠে পায়েসের হামলা নয়। এবারের আবদার আরও একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে।

—খুলেই বলো না মোড়ল।

—বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা বায়না ধরেছে ওরা পাঠশালায় সরস্বতী পূজো করে অঞ্জলি দেবে। সারা গাঁয়ে কোথায়ও ত' ওদের মন্দিরে উঠতে দেয়না। অঞ্জলি দেয়া ত' দূরের কথা।

শশী উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলে, এটা ত' বড় ভালো প্রস্তাব করেছ মোড়ল। দেবী সরস্বতীর পূজো করবে ছেলেমেয়েরা, এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?

শ্যামল বললে, বিদ্যাপীঠে সরস্বতীদেবীর পূজো হবে না ত' আর হবে কোথায়? কিন্তু একটি সর্তে সবাইকে রাজি হতে হবে।

—সর্তটি কি শুনতে পাইনে?

প্রশ্ন করে শশী।

শ্যামল জবাব দিলে, পূজোর সমস্ত আয়োজন ছেলেমেয়েদের নিজে হাতে করতে হবে। প্রতিমা তৈরী থেকে সুরু করে পূজো করা পর্য্যন্ত।

মোড়ল আঁৎকে উঠে উত্তর দিলে, সেটা কি করে হবে দাদাভাই? বাগ্‌দীর ছেলেমেয়েরা ত' আর বামুনের কাজ করতে পারে না। পূজোর সময় পুরোহিত তোমাদের আনতেই হবে।

শ্যামল রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলে, তাহলে শোন মোড়ল, আমি এর ভেতরে নেই।

—কেন দাদাভাই, তুমি এত রাগ করছ কেন? ভয়ে ভয়ে মোড়ল শ্যামলের অভিমান দূর করতে চেষ্টা করে।

শ্যামল বললে, রাগ করছি কি আর সাধে? তুমি নিজে মুখেই ত' বললে, গ্রামের কোনো মন্দিরে বাগ্‌দীদের ছেলেমেয়েদের উঠতে অবধি দেয় না। অঞ্জলি দেয়া ত' দূরের কথা। পূজোর জন্যে সেই পুরহিতের পা ধরেই যদি সাধাসাধি করতে হয়, তবে তোমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েদের বিদ্যার অর্চ্চনা করে লাভ কি—শুনি?

মোড়ল জিজ্ঞেস করলে, তাহলে আমাদের পাঠশালায় পূজো কি হবে না দাদাভাই?

—কেন হবে না?

শশী এইবার মোড়লকে শান্ত করতে এগিয়ে আসে।

—আসলে তুমি শ্যামলের কথাটাই ধরতে পারো নি। শ্যামল বলতে চাইছে, নিজের চেষ্টায় যেমন লেখাপড়া শেখা যায়—ঠিক তেমনি বিদ্যার দেবী বাণীর পায়েও অঞ্জলি দেওয়া চলে। সেজন্য কোনো পাণ্ডার দরকার হয় না। জানো ত' জাতির জনক মহাত্মাজী বহুভাবে দেশের লোকদের কাছে একথা বলে গেছেন যে, মানুষ সবাই সমান। কেউ বড়ো, কেউ ছোট নয়। ভগবানকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। তিনিই ত' মন্দির প্রবেশের আন্দোলন সুরু করেছিলেন।

মোড়ল বললে আমরা মুখ্যু মানুষ, অত কথা ত' আমরা বুঝিনে দাদাভাই, তাহলে কি করতে হবে সেইটেই আমাকে বুঝিয়ে বলো। ছেলেমেয়েদের বড়ো ইচ্ছে তারা পাঠশালায় সরস্বতী পূজো করে, মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়। কিন্তু ভয়ে সেকথা তোমাদের কাছে বলতে সাহস করছে না। আমি মাসিমাদের কাছে কথাটা পাড়তে বলেছিলাম। ওরা তাও এগুচ্ছে না, বললে ভয় করে।

শশী উত্তর দিলে, আসল কথাটা কি জানো মোড়ল, মন থেকে এই ভয়কে দূর করতে হবে। মা সকলের কাছেই সমান। বড় লোকের ছেলেরাই তাদের মাকে শুধু ভালোবাসে, ভক্তি করে? কেন, গরীব ছেলে-মেয়েরা কি তাদের মাকে ভালবাসে না? স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, ভালোবাসা এসব ত' শুধু ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া নয়। এই কথাগুলি আগে তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। আমরা মানুষ এই কথাটা আগে বুঝতে হবে। তবেই মা বীণাপাণির অর্চ্চনা করবার অধিকার জন্মাবে।

—ঠিক কথা বলেছ দাদাভাই। তোমরা কত লেখাপড়া করেছ। কত পুঁথি পড়েছ। শক্ত কথা সোজা করে আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারো। আমরা মনে মনে যদি বা বুঝি মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পাইনে। সাধে কি লোকে আমাদের বাগ্দী বলে?

মোড়ল যখন এই কথাগুলি বললে, তখন তার দুচোখে জলে ভরে উঠেছে।

শ্যামল বললে, উহুঁ। আবার তুমি গলদ করে বসলে মোড়ল। 'মানুষ' বলে নিজেদের ভাবো, মনের দ্বিধা সব দূর হয়ে যাবে।

মোড়ল এইবার শুধোলে, আচ্ছা তা না হয় ভাবলাম। কিন্তু আমি ওই কাচ্চা বাচ্চাদের কি বলবো? কাল সকালে এসেই ত' আমায় ছেঁকে ধরবে। তখন আমি ওদের কি জবাব দেবো?

শশী উত্তর দিলে, ওদের যখন ইচ্ছে হয়েছে—মা সরস্বতীর পূজো নিশ্চয়ই হবে। তবে শ্যামল যে প্রস্তাব করেছে আমারও সেই মত। প্রতিমা তৈরী করা, পূজোর আয়োজন করা, পাঠশালা সাজানো, পূজো করা, অঞ্জলি দেয়া, ভোগ রান্না করা সব ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে করতে হবে। রাজি আছ?

মোড়ল মুখ কাচু-মাচু করে বললে, তা তোমরা যখন বলছ—তখন ইচ্ছেয় হোক -অনিচ্ছায় হোক রাজি হতেই হবে। কাল সকালে বাচ্চা-কাচ্চাদের—সেই কথাই বলি—

গাঁয়ের বামুনরা যখন শুনলে যে, বাগ্দীপাড়ার পাঠশালায় স্বরস্বতী পূজো হবে, আর বাগ্দীর ছেলেমেয়েরাই পূজো করবে—তখন তারা একেবারে শিউরে উঠল।

বাঁড়ুয্যে বললে শুনছ ভট্চাজ? ঘোর কলি যে ঘনিয়ে এসেছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। নইলে কেউ কোথাও, কখনো শুনেছ যে বাগ্দীরা মায়ের পূজো করবে? এ বিধান ওদের দিলে কে?

ভট্চাজ উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই কলকাতার সেই বখা ছেলে দুটো। নইলে এত বড় বুকের পাটা কার যে, আমাদের এই জলবিছুটি গাঁয়ের বুকের ওপর বসে ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে?

বাঁড়ুয্যে বললেন, না-না! এই সব অনাচার আর কিছুতেই সহ্য করা উচিত হবে না। চল, আজই আমরা সবাই মিলে চৌধুরীবাড়ি যাই। চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করা দরকার!

পরাণ মুখুজ্জে বললে, কেন, আমাদের পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীমশাই রয়েছেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার সঙ্গেও পরামর্শ করা যেতে পারে।

বাঁড়ুয্যে চটে-মটে উঠে উত্তর দিলে, দেখ মুখুজ্জে যা জানোনা, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বলি খবর কিছু রাখো? ওই বাগ্‌দীপাড়ার পাঠশালা তোলার ব্যাপারে গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলে ফাল্গুন কত টাকা গোপনে ঢেলেছে, শুদ্ধু ওই চৌধুরী-দের সঙ্গে রেষারেষি করে। এখন ঠ্যালা সামলাও। ওরা ব্রাহ্মণের কেমন মান-মর্য্যাদা রাখলে নিজের চোখের ওপর দেখলে ত'?

মুখুজ্জেমশাই লজ্জিত হয়ে বললেন, সে কথা ত' সত্যি। কথা ত' যথার্থ।

সেইদিন সন্ধ্যেবেলা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এক গোপন বৈঠক বসল চৌধুরী বাড়িতে। চৌধুরীমশাই এ ব্যাপারে হুঁ-হাঁ বিশেষ কিছুই বললেন না। কিন্তু চন্দন এগিয়ে এসে সমস্ত ভার নিলে। বললে গ্রামের বুকের ওপর বসে বাগ্‌দীদের এই অনাচার কিছুতেই সহ্য করা হবে না। দরকার হয় দাঙ্গা করেই এই পূজো বন্ধ করতে হবে। চন্দন ওদের সামনেই লেধ্ব পাইককে ডেকে তৈরী থাকতে বললে।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল খুশী হয়ে চন্দনকে আশীর্বাদ করে, যে যার ঘরে ফিরে এলেন।

ওদিকে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ির ফাল্গুনের চ্যালা ঘুগনী গোপনে বাগ্‌দী-পাড়ার মোড়লের সঙ্গে দেখা করলে। বললে তুমি কিচ্ছু ঘাবড়ে যেওনা মোড়ল ফাল্গুনবাবু সব খবর পেয়েছেন। চৌধুরীরা যদি তোমাদের পূজো বন্ধ করতে আসে তবে ফাল্গুনবাবু লাঠিয়াল দিয়ে সব হটিয়ে দেবেন। তোমরাও বাগ্‌দীপাড়ার সবাই তৈরী থেকো। যত টাকা লাগে ফাল্গুনবাবু দু'হাতে খরচ করবেন! তবু তিনি পূবপাড়ার চৌধুরীদের এক হাত দেখে নেবেন।

ঘুগনী তেমনি গোপনে চলে যাচ্ছিল, আবার কি ভেবে ফিরে এলো। তারপর ফিস্‌-ফিস্‌ করে বললে, কিন্তু একটি কথা। কাক-পক্ষীতেও যেন একথা জানতে না পারে। দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার কিনা। একেবারে চুপচাপ থাকাই ভালো!

মোড়ল উত্তর দিলে, সে ত' ঠিক কথাই। তবে আমার দুই দাদাবাবুকে ত' জানিয়ে রাখতে হবে।

ঘুগনী দু'হাত নেড়ে বারণ করে বললে, না, না। ওরা বাইরের লোক। পাঠশালা নিয়ে আছেন, ভালো কাজ করছেন, সেই ভালো। গাঁয়ের দাঙ্গা-হাঙ্গাঙ্গামার মধ্যে ওদের জড়িয়ে লাভ কি?

মোড়ল তখন মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, সেকথা ঠিক।

ওদিকে পাঠশালায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে গেছে। এমন আনন্দের সন্ধান ওরা জীবনে পায়নি ?

দেবদারু পাতা দিয়ে গোটা পাঠশালাটা সাজাচ্ছে, লাল নীল হল্‌দে সবুজ কাগজ দিয়ে শেকল তৈরী করছে, একটা সালুর ওপর তুলো দিয়ে 'স্বাগতম্' লেখা হচ্ছে।

আর একদিকে একদল ছেলে—এঁটেল মাটি ছেনে নিয়ে মূর্তি গড়ছে। মূর্তি ওরা ভালোই গড়তে পারে কিন্তু এতদিন এ গাঁয়ে সে অধিকার তাদের ছিল না। একটু-খানি গড়া হচ্ছে আর সবাইকে ডেকে দেখাচ্ছে—দেখুন ত' মাসিমা, কেমন হল ? এই হাতে মা সরস্বতী বীণা ধরে থাকবেন ত' ? পায়ের নীচে থাকবে—শ্বেতপদ্ম আর রাজহাঁস। হাতে চলছে কাজ আর মুখে চলছে নানারকম আলোচনা।

বড়মাসিমা আর ছোটমাসিমা দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের দিয়ে উনুন তৈরী করাচ্ছেন। শ্যামল বলেছে ওদেরই ভোগ রান্না করতে হবে। আর সেই ভোগ দেবীকে উৎসর্গ করে—প্রসাদ সকলকে পরিবেশন করা হবে। ওদের হাতের রান্না যে এ গাঁয়ের কেউ ছোঁবে—একথা বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসই করতে চাইছে না।

শশী আর শ্যামল সবাইকে কাজ ভাগ করে দিয়েছে। কে কে ফুল জোগাড় করবে, কে কে নৈবিদ্যি সাজাবে, কারা বাসন মাজবে, কে পুজো করবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। পুজো শেষ হয়ে গেলে সব ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেবীর চরণে অঞ্জলি দিতে হবে।

ওরা এবার মায়ের চরণে অঞ্জলি দেবে—ভাবতেও সবাইকার দেহে-মনে শিহরণ জাগছে।

গভীর রাত। শশী নিজে একটি কাজের ভার নিয়েছে। সেটা ছেলেরা পারবে না।

নিজের দাওয়ায় বসে সে মা বীণাপানির একটি চালচিত্র তৈরী করছে। মনের মতো করে সে কারুকার্য করছে। ছবি আঁকতে বসলে ত' ওর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না। তাই বুঝতে পারছিল না রাত কত হয়েছে। ওদিকে তার পাশে বসে শ্যামল মহাপুরুষদের 'বানী'গুলি বড় বড় অক্ষরে লিখছিল। পুজোমণ্ডপের চার-দিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া হবে।

দুই ছেলের কাণ্ড দেখে শশীর মা হতাশ হয়ে দাওয়ায় আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলেন।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো বাগ্‌দীপাড়ার একটি ছেলে। বললে, দাদাবাবুরা, শীগ্‌গির এসো, পুবপাড়ার চৌধুরীবাবুরা লোকজন নিয়ে আমাদের পূজোর প্রতিমা

ঘনাইতে আসছে। এদিক থেকে পশ্চিমপাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ির পাইকেরাও খালের ধারে জমায়েৎ হয়েছে।

মোড়লও লোকজন আর লাঠি-সোটা নিয়ে হাজির হয়েছে খালের ধারে। এক্ষুণি একটা দাঙ্গা বাঁধবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শশী আর শ্যামল এই কথা শুনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল খালের ধারে।

চীৎকার করে উঠল, তোমরা কেউ মারামারি কোরো না, থামো সব—শান্ত হও—

হঠাৎ চৌধুরীবাড়ির চন্দন হুকুম দিলে, এই ছোঁড়াদুটোই যত অনিষ্টের গোড়া। হলধর, চালাও সড়কী—

কেউ কিছু ভালো করে বোঝবার আগেই, তীরবেগে দুটি সড়কী এসে শশী-শ্যামলকে আমূল বিদ্ধ করলে। খালের দু'পারের লোক হায়-হায় করে উঠল।

ওদের দু'জনের রক্তে জল-বিছুটি গাঁয়ের জল রাঙা হয়ে গেল। মায়ের বোধনের আগেই অকালে বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল।

কয়েক বছর কেটে গেছে।

জল-বিছুটি গাঁয়ের বাগ্‌দীরা সেই রক্তে-রাঙা খালের ওপরে বেঁধে দিয়েছে এক বাঁশের সাঁকো। এ পাড়ার মাটি ও পাড়ার মাটিকে এখন স্পর্শ করে আছে। শশী আর শ্যামলের আত্মোৎসর্গে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। এখন ও পাড়ার ছোট্ট একটি ছেলে এই সাঁকোর ওপর দিয়ে, এই পাড়ার পাঠশালায় পড়তে আসে পাত্‌তাড়ি বগলে নিয়ে।

বলে, শশী-শামলের সাঁকো আছে—ভয় কি ?

জল-বিছুটি গাঁয়ের সব বিরোধের উৎস—সেই দুই জমিদার বংশ এখন গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। যেখানে ঝগড়া আর মারামারি নেই—সেই গ্রামে তাঁদের আর মন বসে না।

প্রতিবছর সরস্বতী পূজোর আগের রাত্তিরে গ্রামের বৌ-ঝিরা শশী-শ্যামলের নাম করে, খালের জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়। তাদের একান্ত আশা, এই প্রদীপের আলোতে পথ চিনে ওরা দুটি ভাই আবার এই গাঁয়ে ফিরে আসবে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥